HEALTH.

(Bengali)

১ম সংখ্যা। ফাল্গুন — February ৯ম বর্ষ

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল ও

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল. এ. এম. এস

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

AFTER
MALARIAL &
ENTERIC FEVERS

সূচী।

নবম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৩৭। [১ম সংখ্যা

স্বাস্থ্যই যথার্থ সুখ

দৈহিক স্বাস্থ্য যে একটী উপভোগ্য জিনিষ একথা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুস্থতা বা স্বাস্থ্য মঙ্গলের হেতু এবং সুস্থদেহে মানব যত সুখী হয়, এরূপ সুখ সে অন্য কোনও অবস্থায় উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে সব ব্যবস্থা করিলে দেহ সুস্থ হয় তাহার ভিতর যথেষ্ট সুখ ও মঙ্গল নিহিত আছে। এরূপ লোকের অভাব নাই যাঁহারা মনে করেন যে স্বাস্থ্যনীতি প্রতিপালন করা বিশেষ কঠিন ও কষ্টকর। তাঁহাদের মতে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এমন অনেক বিষয় প্রতিপালন করিতে হয় যাহা তাঁহারা পছন্দ করেন না; আবার এমন অনেক বিষয় ত্যাগ করিতে হয় যাহা তাঁহারা প্রীতিকর বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে হইলে এমন অনেক খাদ্য ভক্ষণ করিতে হয় যাহা তাঁহাদের অপ্রীতিকর; আবার এমন অনেক খাদ্য ত্যাগ করিতে হয় যাহা তাঁহারা তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুস্থদেহে জীবন ধারণ করিতে হইলে সংযমী হইতে হইবে; যাহা অমঙ্গলজনক বা অনিষ্টকর তাহা ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা উচিত তাহাই করিতে হইবে। যাহা অনিষ্টকর তাহা কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না, যাহাতে দেহ অসুস্থ হয় তাহা নিশ্চয়ই মঙ্গল বা সুখের অন্তরায়। যে সমস্ত কারণে ব্যাধি উপস্থিত হইয়া দেহ পীড়িত হইবার সম্ভাবনা, সে সমস্ত কার্য্য যদি সুখকর হইত তাহা হইলে পৃথিবী মজার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইত এবং মঙ্গলময় ও সুখকর ব্যবস্থা অমঙ্গলে পরিণত হইত।

প্রকৃতি কখনও আমাদের সহিত বিদ্রূপ করে না; যদি যন্ত্রণা ও কষ্টের ভিতর দিয়া সুস্থ হইতে

হইত তবে প্রকৃতির কার্য্য ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের মধ্যে গণ্য হইত। স্বাস্থ্য এত সুন্দর, উপভোগ্য এবং প্রীতিকর জিনিষ যে তাহা পাইবার জন্য চেষ্টার ভিতরেও সুখ এবং আনন্দ আছে। যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনে স্বাস্থ্যলাভ হয় তাহারা যে চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রতিপালনে যে আনন্দ ও সুখলাভ হয়, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সে সুখ বা আনন্দ কখনও মনে উদয় হয় না।

একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলিয়াছেন যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা বড়ই ভ্রান্তিমূলক। অনেকে বলিয়া থাকেন, "যতদিন জীবন ধারণ করিব, ততদিন সুখে থাকিব। আনন্দে জীবনটা কাটাইয়া দিব, যাহা ইচ্ছা যাইবে তাহাই খাইব; যাহা ইচ্ছা যাইবে তাহাই করিব—তাহাতে যদি শীঘ্র ধরাধাম ত্যাগ করিতে হয় সেও ভাল।" কিন্তু ঐরূপভাবে জীবন যাপন করিয়া নানাবিধ ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করায়, অজীর্ণরোগে কষ্ট পাওয়ায় বা ব্যাধিগ্রস্ত মূত্রাশয়ের যন্ত্রণা ভোগ করায়, যে কি সুখ আছে তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। বস্তুত অকালে মৃত্যু হইয়াও যদি শীঘ্র যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহা হইলেও জীবনব্যাপী রোগের যন্ত্রণার চিত্র যে ভীতিপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলেই প্রায় আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা নীতির বিরোধী হইয়া উঠি। খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক রুচি বিকৃত হইলে যে সমস্ত খাদ্য আমাদের পক্ষে অহিতকর আমাদের তাহাই ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। উদরাময় হইলে লোকের চাউল ও কড়াইভাজা খাইবার ইচ্ছা হয়, অথচ ঐ খাদ্য ঐ ব্যারামের সময় বিশেষ অনিষ্টকারী। প্রথম প্রথম তামাকু সেবন কালে অনেকেই ইহার আস্বাদন অস্বাভাবিক ও কটু বলিয়া বিবেচনা করেন; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা উচিত যে মানব শরীর তামাক সেবনের বিরোধী। লোকে যে সব দ্রব্যকে জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে তাহার ভিতর এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা আমাদের দেহের পক্ষে অনিষ্টকারী। আমাদের অনেকগুলি রুচি শিক্ষার উপর নির্ভর করে; আবার অনেকগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন ইচ্ছা করিলেও সে সব অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া পড়ে। তামাকু, মদিরা, চা, কফি, সরিষাচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, প্রভৃতি দ্রব্য তাহাদের মাদকতা শক্তির প্রভাবে আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া আমাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলে। এসব দ্রব্য সেবন করিবার ইচ্ছা রুচির উপর নির্ভর করে না; কালক্রমে আমরা তাহাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। বাল্যজীবনের সংস্কার বশতঃ বা অন্যের মুখে কোনও খাদ্য দ্রব্যের অপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া আমরা ঐ খাদ্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া থাকি। অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ আমরা বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়াই খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে মতামত পোষণ করিয়া থাকি।

খাদ্য সম্বন্ধে কোনও কোনও বিশেষ রুচির বশীভূত হইয়া যদি আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের রুচি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছে, তবে আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক এবং সে কার্য্যও তত কঠিন নহে। অনেক লোকে লবণ, শর্করা, এবং চর্বিযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ অসুবিধাজনক বিবেচনা করিলে হ্রাস করিয়া দেন। বিবেচনা পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিলে এরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে

পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয়, আহারের পর পূর্ব্বের ন্যায় কোনও কষ্ট অনুভূত হয় না এবং অনেক সময়ে জীর্ণ-ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে দেখা যায়। যাঁহার ভাত বেশ হজম হয় না, তিনি যদি অন্নভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট আটা বা সুজির রুটী খাইতে আরম্ভ করেন তবে অনেক সময়ে সুফল ফলিয়া থাকে। অনেক সময়ে রাঁধিবার পাত্রের পরিবর্ত্তন করিলেও সুফল হয় এবং পরিপাকশক্তির ব্যাঘাতের হ্রাস হইয়া থাকে। ধাতব পাত্রে রন্ধন অভ্যাস থাকিলে মাঝে মাঝে এরূপ করাই বিধেয়। বহুদিনের ব্যবহৃত পাত্রকে বিশ্রাম দিয়া, অন্য নূতন বা পুরাতন পাত্র ব্যবহারে সুফল হইয়া থাকে।

যে খাদ্য খাইতে ইচ্ছা হয় এবং যাহা ভক্ষণ সময়ে মনে আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা সহজে পরিপাক হইয়া যায়। রসনার তৃপ্তিকর খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে—অবশ্য রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে এসব বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে চলা উচিত, কারণ রোগীর রুচি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেনা, তাহা বিকৃত হইয়া যায়। স্বাস্থ্য পালনের বিধির ভিতর এমন উপদেশ কোথাও নাই যে, যে সব খাদ্য আমরা পছন্দ করিনা, সেই সব খাদ্য আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে হইবে। জোর করিয়া কোনও খাদ্য খাইবার অভ্যাস স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী। রসনার তৃপ্তিকর করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক; অথচ দেখিতে হইবে সে খাদ্য যেন স্বাস্থ্যকর হয় ও পরিপাক শক্তির অনিষ্ট না করে। ভালরূপ রন্ধন করিতে জানা জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষরূপ মঙ্গলজনক। পাকপ্রণালী স্বাস্থ্যবিধি-সঙ্গত হইলে তাহাতে দৈহিক উপকার দর্শিয়া থাকে।

প্রকৃতি মানবজাতির জন্য অসংখ্য প্রকারের খাদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে, সুতরাং খাদ্য নির্ব্বাচনের জন্য আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। সকলেই নিজের মনোমত খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন।

মনে করুন যদি পালংশাক ও গাজর খাইতে ভাল না লাগে তবে কেন তাহা খাইবেন? ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা পালংশাক ও গাজর খাইতে নিষেধ করিতেছি, কারণ খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের খাদ্যরূপে যে যথেষ্ট উপকারিতা আছে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। পালংশাক না হইলে কিংবা গাজর সিদ্ধ না খাইলে যে আমাদের চলিবে না তাহা নহে; তবে কথাটা এই যে ইহারা অতিশয় উপকারী হইলেও ইহাদের স্থান পূরণ করিতে পারে এমন বহু খাদ্য আছে; জোর করিয়া অরুচিকর খাদ্য খাইবার প্রয়োজন নাই।

অনেকে মনে করেন যে কোনও একটা বিশেষ খাদ্যের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ করা উচিত, আধুনিক খাদ্য সংস্কারকগণের এইরূপ মত; ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অনেকে নিজ প্রিয় খাদ্য-বস্তুর এরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন যে মনে হয় পৃথিবীতে তাহা ছাড়া বোধহয় অন্য সুখাদ্য আর নাই। খাদ্য যে কেবল দেহ ধারণের জন্য নয়, ইহা যে উপভোগ্য বস্তু তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ এরূপ নানাবিধ খাদ্য আছে যাহাদের আঘ্রাণ বা সুরভি মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে। আমাদের মধ্যে অনেকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া খাদ্যের এই প্রকৃতিদত্ত সুরভি বা সুগন্ধের উন্নতি করিবার আশায় কার্য্যতঃ তাহা নষ্ট করিয়া থাকেন। এসব বিষয়ে প্রকৃতির অনুসরণ করাই

কর্ত্তব্য, কারণ প্রকৃতি আমাদের অপেক্ষা বহু বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সহিত কার্য্য করিয়া থাকে।

অনেক উদ্ভিজ্জ পদার্থ, যেমন ফল, বাদাম, মুলা, ছোলা প্রভৃতি খাদ্য, সিদ্ধ না করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। নানাপ্রকার খাদ্যের সংযোগে রসনার তৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। প্রকৃতিদত্ত খাদ্যের যে সুগন্ধ বা আস্বাদন থাকে তাহাকে অভ্যাস-[illegible] তৃপ্তিকর করিতে পারিলে খাদ্য উপভোগ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহার একটা সীমা আছে। সিম, জলপাই বা পটোল গাছ হইতে তুলিয়াই কেহ ভক্ষণ করিতে চাহিবেন না এবং এরূপ ভক্ষণের পক্ষপাতী হইবার জন্যও কেহ পরামর্শ দিবেন না; কারণ শিম, পটোল ও জলপাই রন্ধন করিবার প্রণালী আছে এবং উহাদিগকে সেইরূপ প্রণালীমত ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য। অনেকে খাদ্যকে সামান্যভাবে প্রস্তুত করিয়া খাইতে ভালবাসেন। অনেক খাদ্য স্বভাবতঃই এত সুন্দর যে তাহাদিগকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতে হয় না। খাদ্য নির্ব্বাচনের জন্য [illegible] কোনও কালে চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। কমলালেবু, কিসমিস, গোল আলু, লেটিউস শাক, শিম, মটরসুটি, অপক্ক ফল, সবুজ পত্রযুক্ত শাকসমূহ, গোটা গমের দানা প্রভৃতি খাদ্য এতই উৎকৃষ্ট যে আমাদের পছন্দমত একটাকে বা একাধিককে ত্যাগ করিয়া অনায়াসে অন্যগুলিকে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

কেবল খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তম খাদ্য যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য অনেক ব্যবস্থার উপর সুস্থ থাকা নির্ভর করে। রাত্রজাগরণ করিয়া যে সমস্ত আমোদ প্রমোদের দ্বারা আমরা চিত্তবিনোদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি সে সকলের অপেক্ষা গভীর সুনিদ্রা যে বিশেষ উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্ম্মল বায়ু মধ্যে অঙ্গচালনায় বা ব্যায়ামে বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাতে উৎকট পরিশ্রম হয় না এরূপ ক্রীড়ায় দৈহিক আনন্দ অনুভূত হয় এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। যে সব কার্য্য করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে বা যাহাতে দৈহিক শক্তি ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সব কার্য্যে মন স্বভাবতঃই প্রফুল্ল হয় এবং সে সব কার্য্যই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণ। এইরূপে প্রকৃতি আমাদিগকে আমাদের হিতজনক কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। যখন আমরা সরল ও উচিত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করি, যখনই আমরা অস্বাস্থ্যকর বা বিকৃতরুচির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি, তখনই আমরা অমঙ্গলের সূচনা করি। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের নিদান, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট পথ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান। অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হইলে তাহা পুনরায় উপার্জ্জন করা যায়, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি স্বাস্থ্যকে নষ্ট করিয়া অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের অন্বেষণ করে; হীরার বদলে কাচ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা শীঘ্রই তাহাদের কার্য্যের ফলে নিজ নিজ জীবনকে ভারবোধ করিয়া তুলে। স্বাস্থ্যই জীবনের সুখ, স্বাস্থ্যের ভিতর দিয়া যে সুখ আসে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাহাই জীবনের প্রকৃত আনন্দ। সুস্থদেহীর অপেক্ষা সুখী লোক জগতে বিরল।

বাঙ্গলা দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ

(লেখক—ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি,)

বাঙ্গলা দেশে প্রতিবৎসর যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার হারের সহিত অন্য দেশের মৃত্যুর হারের তুলনা করিলে বিশেষরূপ চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়। এই মৃত্যু সংখ্যার ভিতর যক্ষ্মারোগের মৃত্যুর হার তুলনা করিয়া দেখিলে মন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলার পল্লীসমূহে, এই ভয়ঙ্কর রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেকেরও সংবাদ পাওয়া যায় না; কারণ কি রোগে মৃত্যু হইয়াছে বাঙ্গলার সকল পল্লীতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে তাহা সঠিক নির্দ্ধারিত হয় না। অনেক সময়ে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হইলেও উহা অন্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে রিপোর্ট পাওয়া যায়, তাহাকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলে বুঝিতে হইবে যে ভয়ানক রোগে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক সহস্রে মৃত্যুর হার ২·৪। ইংলণ্ডে এই রোগে প্রত্যেক সহস্রে মৃত্যুর হার একজনের অপেক্ষাও কম এবং জার্ম্মাণীতে মৃত্যুর হার ১·২।

একথা যদি স্মরণ করা যায় যে এই রোগে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি কালের করাল গ্রাসে পতিত হয় তাহাদের মধ্যে যুবক ও যুবতীগণের সংখ্যা অধিক তবে এই ভয়ঙ্কর রোগে দেশের যে কত ক্ষতি হয় তাহা সহজে অনুমান করা যায়। যাঁহার উপর সমস্ত পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ভর করে এরূপ কোন যুবক যদি এই প্রাণনাশী রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সেই পরিবারের যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাঙ্গলাদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলেও চিকিৎসক সমাজ এপর্য্যন্ত এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন; দেশের আইনসভা ও আইনপ্রণেতাগণও ইহার প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা করিতেছেন না। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে যদি "নিবারিত হইতে পারে, তবে ইহা নিবারিত হয় না কেন?" কিন্তু সে মহৎ বাক্য উপলব্ধি করিবার মতন লোক বাঙ্গলায় কোথায়? ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশের অপেক্ষা ইংলণ্ডে এই রোগে মৃত্যুর হার অধিক ছিল; কিন্তু দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে এবং নানাবিধ উপায় ও ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এই রোগের মৃত্যুর হার হ্রাস হইয়া যায়। যে সমস্ত কারণে এই রোগের প্রকোপ ইংলণ্ডে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্বন্ধে সংস্কার ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা।

২। কিরূপে এই ব্যাধি সংক্রামিত হয় ও উৎপন্ন হয়।

৩। নিবারণের প্রতিকার কল্পে চেষ্টা।

৪। সময় থাকিতে রোগ নিরূপন ও তাহার চিকিৎসা।

৫। যাহাতে সহজে রোগ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালায় এই ভয়ানক রোগ নিবারণের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন সমবেত চেষ্টা করা হয় নাই; দুই একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবিষয়ে সামান্য একটু আধটু চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কোনও বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদিনে বাঙ্গলায় একটী মাত্র স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ প্রচেষ্টা সমুদ্রে শিশির বিন্দু পতনের ন্যায়। বিলাতের লোক অবগত ছিলেন যে এরূপ চেষ্টায় কোনও ফল হইবে না; তাই তাঁহারা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এবিষয়ে পথ প্রদর্শক হইলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে Tuberculosis Order নামক আইনে নিয়ম করা হয় যে দুগ্ধবতী গাভীর স্তনে কোনওরূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে তাহা ঘোষণাদ্বারা প্রচার করিতে হইবে; এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের Dairy Act অনুসারে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। তাৎকালীক প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ সাহেব Viscount Astorকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা এবিষয়ে যে সব সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই গৃহীত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগত চেষ্টায় এবিষয়ে বিশেষ কোনও সুফল ফলিবে না; এবিষয়ে দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন। বোম্বাই প্রদেশে যে Anti-tuberculosis League স্থাপিত হইয়াছিল তাহার চেষ্টায় বিশেষ সুফল লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু Sarda Act পাশ হইবার ফলে বালিকাকে যদি গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা বা কষ্ট সহ্য করিতে না হয়, তবে এবিষয়ে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা। এবিষয়ে দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি সাহায্য করিতে অগ্রসর না হন, তবে দীর্ঘকালব্যাপী সুফলের সম্ভাবনা অল্প। বাঙ্গলার দপ্তর এখন আয় ব্যয়ের সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে না, সুতরাং যাহাতে বিশেষরূপ অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা আছে সেরূপ কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিভাগ, মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ড সমূহ, দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ এবং সমগ্র বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভা যদি এবিষয়ে একযোগে কার্য্য করেন তবে প্রভূত কল্যাণ ও সুফল ফলিবার বিশেষ আশা আছে।

এবিষয়ে ব্যবস্থাপক সভা যদি এইরূপ আইন পাশ করেন যে কাহারও গৃহে যক্ষ্মারোগ উপস্থিত হইলে কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিতে হইবে তবে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। মিউনিসিপালিটী আইন করিয়া সাধারণে যে স্থান ব্যবহার করেন সে সকল স্থানে থুথু ফেলিতে নিষেধ করিতে পারেন। সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির অজুহাতে মিউনিসিপালিটী নানা বিভাগে যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকেন তাহা না করিয়া যদি সেই অর্থ সঞ্চিত করিয়া যক্ষ্মারোগ দমনের জন্য ব্যয় করেন তবে যে দেশের অনেক উপকার করা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিউনিসিপালিটীসমূহ যে অনেক বিষয়ে অর্থ নষ্ট করিয়া থাকেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশহিতের নামে তাঁহারা অন্য কাহারও হিতসাধন করিয়া থাকেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার একটী

প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ মিউনিসিপালিটী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ইংরাজী V অক্ষরের ন্যায় আকৃতিযুক্ত পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ না করিয়া পুরাতন প্রথা অনুসারে ড্রেন নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে। গবাদি পশুবিভাগ সহরের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত পশুগণের সহজে একটী হিসাব বা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন; এবং সেই তালিকানুযায়ী ব্যাধিগ্রস্ত পশুসমূহের দ্বারা করদাতাগণের যাহাতে কোনও অমঙ্গল না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট গবাদি পশুর স্বাস্থ্যো-ন্নতির জন্য ও নির্দ্দোষ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়া যক্ষ্মারোগের বিস্তার নিবারণ কল্পে সাহায্য করিতে পারেন। এক্ষণে বাঙ্গালার পল্লী-সমূহে স্থানে স্থানে যে Co-operative Milk Supply কোম্পানী দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রভূত অপকার সাধিত হইতেছে। তাঁহারা কেবল দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকেন; গাভীর খাদ্যের প্রতি কোনও দৃষ্টি দেন না। অপ-কৃষ্ট খাদ্য খাইয়া গাভী যে দুগ্ধ প্রদান করে তাহার উপকারিতা অনেক কম। গাভীর খাদ্যে তৈলাক্ত দ্রব্য (fatty food) থাকা উচিত। খাদ্যে ভিটামিন 'বি'র (Vitamin B) অভাব হইলে দেহ যক্ষ্মারোগের আক্রমণে সেরূপ বাধা দিতে পারে না। কোনও কোনও বিখ্যাত চিকিৎসক খাদ্যে ভিটামিন 'বি'র অভাবকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জান্তব চর্ব্বি বা তৈলই (মাখম, ঘৃত, সর প্রভৃতি) প্রধানতঃ ভিটামিন 'বি' এবং একথা অবিদিত নাই যে বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্যে এই জিনিসের বড়ই অভাব। পাশ্চাত্য জাতি সমূহ মাখম, পণির ও চর্ব্বির যথেষ্ট ব্যবহার করেন; রুটীর সহিত মাখম তাঁহাদের সকলের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য খাদ্য একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না; কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক খাদ্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। প্রতিদিন সাধারণ বাঙ্গালী যে খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে মাত্র অর্দ্ধ ছটাক সরিষার তৈল তাহার সহিত মিশ্রিত থাকে। তাহাও উদ্ভিজ্জ তৈল, জান্তব তৈল বা fat নহে। অধিকাংশ বাঙ্গালীই এত দরিদ্র যে শিশুগণের প্রতিপালন জন্য তাহারা দুগ্ধ ক্রয় করিতে অক্ষম। মাখম ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও বিলাসের দ্রব্য; সাধারণতঃ বৃহৎ পরিবারের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানে ও বালকবালিকাগণের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়; উত্তম খাদ্য কিনিবার জন্য অর্থ থাকে না। তাহা ছাড়া ভদ্রত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে খাদ্য দ্রব্যের খরচ কমাইয়া পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিতে হয়; সুতরাং উপযুক্ত ও উত্তম আহারাভাবে দেহ নিস্তেজ ও ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাবের ইহাই এক কারণ।

ক্ষয়কাশের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করিবার জন্য এবং যাহাতে সহজে এই ভীষণ ব্যাধি মানুষকে আক্রমণ করিতে না পারে তাহার উপায় সাধনের জন্য সভ্য জগতে এই রোগের জীবাণু অতি অল্পমাত্রায় পুনঃ পুনঃ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শত-করা নিরানব্বই জন লোককে এইরূপে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতা এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে যক্ষ্মারোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য টিকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় কালিকাতার

চিকিৎসক সমাজের এই প্রশংসনীয় চেষ্টা এখনও সাধারণের নিকট সেরূপ উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নাই।

বহুমূত্র রোগে কোনও লোক বেশী দিন কষ্ট পাইলে বা ভুগিলে তাঁহার এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই জনের দেহ প্রকাশ্য বা লুপ্তভাবে এই বহুমূত্র ব্যধিকে আশ্রয় দিয়া থাকে। এবিষয়ে ডাক্তার Mac Cay সাহেবের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে সাধারণ বাঙ্গালীর শোণিতে শতকরা 0·1 ভাগ শর্করা দেখিতে পাওয়া যায়; আবার স্থূলকায় বাঙ্গালীর শোণিতে ঐ শর্করার ভাগ শতকরা 0·13, ইহা একজন ইয়োরোপবাসীর রক্তে শর্করার ভাগের অপেক্ষা যে অতিশয় বেশী তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ duodenumএ যাপ্য শ্লেষ্মার (chronic catarrh) অবস্থিতি এবং দ্বিতীয় কারণ বাঙ্গালী জাতির খাদ্য মধ্যে শ্বেতসারের বাহুল্য। খাদ্যে শ্বেতসারের বাহুল্য হেতু দেহ পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয়; ইহার ফলে দেহাভ্যন্তরস্থ tissue cells পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শিশুগণ পল্লীগ্রামে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ খাইতে পায় না, কারণ পল্লীগ্রাম হইতে প্রায় সমস্ত দুগ্ধ কোনও না কোনও আকারে সহরে আমদানী হয়; এই আমদানীর ফলে পল্লীগ্রামে দুগ্ধ মহার্ঘ হয় এবং গরীবলোকে তাহা ক্রয় করিয়া শিশুগণকে খাওয়াইতে পারে না। গো-দুগ্ধের অভাবহেতু প্রসূতিগণের স্তনেও প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধের উৎপত্তি হয় না; কারণ দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শিশুগণ দুর্ব্বল ও রুগ্ন দেহ লইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং আধুনিক জীবন-সংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় সরকারী ডাক্তারগণের উপর স্কুলের এবং ছাত্রাবাসের বালক-বালিকাগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জেলায় বা মহকুমায় স্থাপিত বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে ও ব্যায়াম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন। ইহাতে চাকরীর কর্ত্তব্য এবং দেশবাসীর প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে এই উভয়বিধ দায়িত্বেরই প্রতিপালন করা হয়।

খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে দেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান সমূহকে অর্থাৎ মিউনিসিপালটী সমূহকে আরও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সরকারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শক সমূহ যাহাতে তাঁহাদের কার্য্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

উন্মাদের চিকিৎসা

(ডাঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষাল, M. B.)

রাঁচি সহরের মানসিক ব্যাধি সমূহের বিখ্যাত চিকিৎসক Col. Omer Berkeley Hill গত ডিসেম্বর মাসে রোটারী ক্লাবে 'মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন ঃ—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের মানসিক ব্যাধিসমূহের কোনও চিকিৎসালয়ে Clifford Beers নামে একজন রোগী ছিলেন। ছয় বৎসর চিকিৎসার পর তিনি রোগমুক্ত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে গৃহে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি গৃহে গমন করিয়াই "হৃত মনের পুনঃপ্রাপ্তি" (A mind that found itself) নামক এক পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে উন্মাদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অবস্থান কালীন তাঁহার মনে যে সব ভাবের বা চিন্তার উদয় হইয়াছিল তিনি সে সকল সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তক প্রকাশ করিলে পর আমেরিকায় তাহা লইয়া বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, কারণ চিকিৎসা জগতে এরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। উন্মাদের মনের ভাব ব্যাধিমুক্ত উন্মাদ ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নয়, এবং ব্যাধিমুক্ত হইলে এপর্য্যন্ত কোনও উন্মাদ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া কিছুই বলিতে সক্ষম হয় নাই। বিয়ার্স সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত হাসপাতাল আছে তাহাদের উন্নতির জন্য এবং উন্মাদের চিকিৎসা প্রণালীর সংস্কারের জন্য নিজ জীবন নিয়োগ করিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন।

বিয়ার্স সাহেব ক্রমশঃ এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ এতদূর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন যে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বোষ্টন সহরের কোনও অট্টালিকায় চতুর্দ্দশ ব্যক্তি মিলিত হইয়া মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা জন্য একটী সোসাইটী স্থাপন করিলেন। ইহার নাম হইল 'Connecticut Society for Mental Hygiene'! 'মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব' এই নামটী বিখ্যাত চিকিৎসক Dr. Adolf Meyers দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক ব্যধিগ্রস্ত উন্মাদ সমূহের চিকিৎসার তৎকালীন পদ্ধতির উন্নতি এবং পাগলের চিকিৎসার জন্য যে সব হাসপাতাল ছিল তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন। এই সভার শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় উহার সভ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার যশ চারিদিকে এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে ইহা আর প্রাদেশিক

সোসাইটী বলিয়া পরিগণিত না হইয়া সমস্ত যুক্ত প্রদেশের সোসাইটী বলিয়া গণ্য হইল। তখন ইহার নামের পরিবর্ত্তন হইয়া American Association for Mental Hygiene এই নাম হইল। উন্মাদের চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতি ও তাহাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল সমূহের সংস্কার করা কর্ত্তব্য, এই উদ্দেশ্য লইয়া যে সোসাইটীর আরম্ভ হইয়াছিল তাহার কার্য্য এক্ষণে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। লোকে যাহাতে এই দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত না হইতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন, বাতুল আইনের সংস্কার, বিদ্যালয়ে অবস্থান কালীন ছাত্রগণের মানসিক মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা, গৃহে যাহাতে বালকবালিকাগণের মানসিক চাঞ্চল্য না থাকে তাহার বিধান, লোকে কি কি কারণবশতঃ নানারূপ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ শাস্তি বিধান কর্ত্তব্য, বাতুলের চিকিৎসা-কালীন কোন্ প্রণালীতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা আবশ্যক, শ্রমজীবীগণের মঙ্গল বিধান, কোন্ বালক বা বালিকা কোন্ ব্যবসায়ের উপযুক্ত ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে সোসাইটী মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিল। এই সোসাইটীর কার্য্য আমেরিকা হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে ফরাসীগণের ও জার্ম্মানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। ফরাসী-দেশে ও জার্ম্মানীতে এইরূপ সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডেও National Council of Mental Hygiene নামে এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে Captain H. Stedman সিমলা পাহাড়ে Indian Association for Mental Hygiene নামে সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ওয়াশিংটন সহরে মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসভার অধিবেশন হয়। এই মহা-সভায় পাঁচটী মহাদেশ হইতে ৫২টী জাতির প্রায় তিনসহস্রাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দেশ-পতি Hoover এই মহাসভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সভায় Clifford Beersকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া একটী আন্তর্জাতিক কমিটী গঠিত হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে ভারতীয় Mental Hygiene সমিতির ৩৪৭ জন সদস্য বা সভ্য আছেন। সমিতির উদ্দেশ্য অতি মহান্। (১) মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন এবং যে সব কারণে মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হয় তাহাদের নিবারণ. (২) মানসিক বিকার সম্বন্ধে সাধারণের যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহাদের অপনোদন (৩) এবং শিশুগণের এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের যাহাতে চিত্তের প্রফুল্লতা থাকে তাহার উপায় বিধান করা। কলিকাতা সহরে এই সমিতিতে যে সভ্যগণ আছেন তাঁহারা অতিশয় উৎসাহের সহিত সমিতির কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন; কিন্তু লাহোর, মাদ্রাজ ও সিংহলেও এই সমিতির শাখা সমূহ কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু বোম্বাই সহরে এপর্য্যন্ত এই সমিতি সম্বন্ধে লোকের তত আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে না হয় তাহার উপায় বিধান করা যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ সাধারণে এক্ষণে সে তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্যাধি নিবারণ কল্পে চেষ্টা করিতেছেন; আমাদের বালক-বালিকাগণের মানসিক স্বাস্থ্য যে সে চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সে কথা বোধ হয় কেহ বিস্মৃত হইবেন

না। অত্যাচারিত, উপায়বিহীন, নানা দুশ্চিন্তা ও কষ্টের মধ্যে প্রতিপালিত, আশার আলোক হইতে বঞ্চিত শিশুগণ জীবনের শান্তিময় ও সুখের পথ খুঁজিয়া পায় না; তাহার ফলে তাহারা হয় পাপীর ও অপরাধীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, নচেৎ জীবনভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া তাহারা উন্মাদে পরিণত হয়। একথা এতদূর সত্য যে বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকায় ও কিয়ংপরিমাণে ইউরোপে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া Child Guidance Clinic নামে সমিতি সমূহ নানাস্থানে স্থাপিত হইতেছে। শিশুগণের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নানাস্থানে যে সব হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, সেই সব হাসপাতালে পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বালকবালিকাগণকে চিকিৎসার জন্য লইয়া যাইতে পারেন। এসব স্থানে তাঁহারা বিনা ব্যয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শ পাইয়া থাকেন। এই সব হাসপাতালে কেবল যে শিশুগণের উন্মাদরোগের চিকিৎসা করা হয় তাহা নহে, যাহাতে শিশুগণের আদৌ চিত্তবিকার না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয় এবং এইরূপে বহু বালক বালিকাকে বাতুলতা হইতে কিম্বা ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে নানারূপ পাপাচার হইতে রক্ষা করা হয়। ভারতবর্ষে এক্ষণে যে রাজনৈতিক অপরাধের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কে জানে হয়ত আমরা তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতাম, যদি এদেশে আমেরিকার ন্যায় বালকবালিকাগণের চিকিৎসার জন্য বাতুলালয় সমূহ স্থাপিত থাকিত। মনস্তত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন যে আইন প্রণয়ণ করিয়া দেশের এই মানসিক ব্যাধির উপশম হইবেনা; কারণ আইন ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হয়, ব্যাধির মূল বা উদ্দেশ্য ধরিয়া প্রণীত হয় না। এই কারণে এদেশে মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিশেষরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক; কারণ মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব রোগের আদিকারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হয় এবং যে সমস্ত কারণে মানবজাতির সুখ বা মঙ্গলের অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় সে সমস্ত বিষয়ের মূল কারণের চিকিৎসা করিয়া থাকে। কি কি কারণে এই মানসিক ব্যাধি বা বিকৃতি উপস্থিত হয় তাহাদের অন্বেষণ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গোবীজের টীকা

(ডাঃ শ্রীতারকনাথ মজুমদার, M. B., D. T. M., D. P. H., কলিকাতা
করপোরেশনের প্রধান Health Officer)

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ঘোষণা করিয়াছেন যে এই বৎসর কলিকাতা সহরে সংক্রামকভাবে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে। বসন্তরোগ হইতে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা থাকিলে গোবীজের টীকা লওয়া আবশ্যক; একবার মাত্র টীকা লইয়া যাঁহারা মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহাদের ইহা জানা আবশ্যক যে পুনঃ পুনঃ টীকা লইলে তবে এই দুরন্ত রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

মানুষের ন্যায় গোজাতিরও বসন্তরোগ হইয়া থাকে। গোজাতি হইতে প্রাপ্ত বসন্ত রোগের বীজকে বা বিষকে হীনশক্তি করিয়া উহা মনুষ্যের দেহে প্রয়োগ করা হয়; ইহারই নাম টীকা দেওয়া। টীকা দিবার পর মনুষ্যের দেহ সামান্যরূপ অসুস্থ হয়—বসন্তরোগের চিকিৎসকগণ উহাকে Vaccinia এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই টীকা দিবার ব্যবস্থা প্রথমে ভুবনবিখ্যাত Edward Jenner নামে এক-জন ইংরাজ আবিষ্কার করেন। গোবীজের টীকা দিবার ব্যবস্থার পূর্ব্বে আমাদের দেশে মানবদেহস্থ বসন্তের বীজ লইয়া মনুষ্যের দেহে টীকা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থায় সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা আছে দেখিয়া আমাদের গভর্ণমেণ্ট উহা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রহিত করিয়া দেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার টীকা লওয়া বাধ্যতামূলক করিয়া আইনে ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু দ্বিতীয়বার কিংবা পুনঃ পুনঃ টীকা লইবার জন্য কোনও আইন পাশ করা হয় নাই। টীকা দিবার আইনে ব্যবস্থা আছে যে শিশুর জন্মের ছয় মাসের মধ্যে উহাকে টীকা দিতে হইবে।

নিরাপদ হইতে হইলে পুনঃ টীকা দিবার প্রয়োজন।—

একবার টীকা লইলেই যে আর কখনও বসন্ত রোগ হইবে না একথা কেহই বলিতে পারেন না। কাহাকে কতবার টীকা লইতে হইবে এবং একবার টীকা লইলে যে উহার ফল কতদিন বর্ত্তমান থাকিবে সে সম্বন্ধেও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন দৈহিক স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি অনুসারে বহুদিন বা অল্পদিন এই টীকার ফল বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। যে ব্যক্তি একবার এই দুরন্ত রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এই রোগে তাঁহার পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। যিনি ভালরূপ পুনঃ পুনঃ টীকার বীজ লইয়াছেন তাঁহার বসন্ত হইবার সম্ভাবনা বিশেষরূপ হ্রাস পাইয়া থাকে। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়াছে যে টীকার ফল কয়েক বৎসরের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়, তখন এই দুরন্তরোগে আক্রান্ত

হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে যদি কেহ এই রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ টীকা লইতে হইবে। একবৎসর টীকা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। একবার বা পুনঃ পুনঃ টীকা লওয়া কিছুই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নহে। টীকা দিবার জন্য কলিকাতা সহরে শিক্ষিত টীকাদারগণ মিউনিসিপালীটী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বিনাব্যয়ে সাধারণকে টীকা দিয়া থাকেন। মিউনিসিপালিটীর যে টীকা বীজের ডিপো বা আড্ডা আছে তাহা হইতে টাট্কা গ্লিসারিন মিশ্রিত বীজ (glyccrinated lymph) লইয়া টীকাদারগণ টীকা দেন। শুধু তাহাই নহে, মিউনিসিপালীটীর যে রাসায়নিক পরীক্ষাগার আছে তাহাতে ঐ বীজ পরীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলে তবে উহাতে টীকা দিতে অনুমতি দেওয়া হয় এবং টীকাদারগণের মধ্যে বিতরিত হয়। যে সকল ব্যক্তি জ্বর রোগে আক্রান্ত থাকেন, বা যাঁহাদের কোনওরূপ চর্ম্মরোগ থাকে, কিংবা যাঁহাদের দেহে কাউর রোগ (eczema) বর্ত্তমান থাকে, এরূপ লোককে টীকা দেওয়া হয় না; কারণ এরূপ অবস্থায় টীকা দিলে দেহস্থ রোগ অনেক সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনও স্থানে বসন্ত সংক্রামকভাবে দেখা দেয় তখন ঐ সকল বিষয় বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। বসন্ত সংক্রামকভাবে দেখা দিলে টীকা লওয়াই ব্যবস্থা।

শিশুর টীকা: শিশুর জন্মগ্রহণের পরই উহাকে টীকা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের টিকা লইবার কোনও বাধা নাই কিংবা এক পরিবারস্থ একজনের টীকা হইলে অন্য সকলের তাহাতে বিপদের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এক পরিবারস্থ সকলের এক সঙ্গে টীকা লইবার সুবিধা না থাকিলে সেই পরিবারস্থ কাহাকেও যে টিকা দেওয়া যাইতে পারেনা এধারণা ভ্রান্তিমূলক ও সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহার যখন সুবিধা তিনি তখনই টিকা লইতে পারেন; যদি অন্য কাহারও কোনও কারণে স্থগিত রাখিতে হয় তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

বসন্তের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই যে বসন্ত রোগ দেখা দেয় তাহা নহে। দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া এই বিষ শক্তি সঞ্চার করিতে থাকে এবং কিছুকাল পরে দেহের উপরিভাগে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ এই বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইবার পর দ্বাদশদিনের মধ্যে বসন্ত দেখা দেয়। প্রথমবার টিকা দিবার সময়ে টিকার বীজ অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেহে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে রক্ষা করে; দ্বিতীয়বার বা তাহার পর টিকা হইলে এই বীজ আরও অতিশীঘ্র দেহে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে নিরাপদ করিয়া দেয়।

টিকা লইবার কতদিন পরে টিকার ফল দেখা দেয়:—

কখনও কখনও টিকা দিবার পর যিনি টিকা লইয়াছেন তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন; ইহা দেখিয়া অনেক লোক ভীত হইয়া পড়েন; সুতরাং পূর্ব্ব হইতে বসন্তরোগের বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে টিকা দিবার পর টিকার ফল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা এস্থলে বিবৃত করা হইল। যদি মনুষ্যদেহে মাত্র একদিন এই বিষ প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে —তবে টিকা দিলে দুরন্ত বসন্তরোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়; যদি বসন্তের বিষ

দেহে দুই দিন হইতে ছয়দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে টিকা দিলে ঐরোগ আর প্রকাশ পাইতে পারে না। সাত আট দিন ঐ বিষ দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবার পর যদি টিকা লওয়া যায়, তবে বসন্ত হইতে পারে, কিন্তু আক্রমণ মৃদুভাবে হইয়া থাকে; প্রায় সাংঘাতিক আকার ধারণ করে না। যদি বসন্তরোগের বিষ শরীরে নয় হইতে দ্বাদশ দিন প্রবেশ লাভ করিবার পর টিকা লওয়া হয়, তবে তাহাতে বসন্তের আক্রমণের প্রকোপ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বসন্তবিষ দেহকে জর্জ্জরিত করিয়া জ্বর হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে টিকা লইলে তাহা ফলোপদায়ক হয় না কিংবা আক্রমণের তীব্রতার হ্রাস হয় না। তবে এরূপ স্থলে বসন্তের গুটিকা সমুহ শীঘ্র পাকিয়া যায় কিংবা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের দেহে কতদিন বসন্তের বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; সুতরাং বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিলে যতশীঘ্র সম্ভব টিকা লওয়া কর্ত্তব্য। কলিকাতা মিউনিসিপালীটি কর্ত্তৃক প্রস্তুত গ্লিসারিন মিশ্রিত গোবীজের টিকা লইলে বসন্তরোগে আক্রমিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অত্যন্ত সাবধানতার সহিত টীকা দিলেও সময়ে সময়ে দেহের উপর গুটীকা বা ক্ষতচিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। গ্লিসারিণ মিশ্রিত টাটকা গোবীজের (কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক প্রস্তুত) টীকা লইলে এবং যে স্থানে টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা সুপরিষ্কৃত রাখিতে পারিলে কোনওরূপ অসুবিধা বা বিপদের সম্ভাবনা এত কম যে তাহা গণনার মধ্যে আনা যাইতে পারে না। গোবীজে টীকা লইলে ঐ বীজ হইতে যক্ষ্মা বা উপদংশ রোগে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ প্রত্যেক গরুকে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে তাহা হইতে বীজ গ্রহণ করা হয়; আর গোজাতির কখনও উপদংশ (Syphilis) হইতে দেখা যায় না। কোনও কোনও স্থলে প্রথমবার টীকা লইবার পর টীকা উঠিতে দেখা যায় না। তাহার প্রধান কারণ টীকা দিবার অব্যবহিত পরেই কোনও কারণে টীকার বীজ মুছিয়া যায়। কোনও কোনও স্থলে দেহের স্বাভাবিক প্রকৃতি টীকা উঠিবার পক্ষে বাধা দিয়া থাকে; কারণ এরূপও দেখা গিয়াছে যে কোনও কোনও শিশুকে তিন চারিবার টীকা দিলে তবে টীকা উঠিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রথমবার টীকা দিলে যদি টীকা না উঠে তবে যতদিন না টীকা উঠে ততদিন পুনঃ পুনঃ টীকা দেওয়া উচিত। প্রথমবার কিংবা দ্বিতীয়বারে টীকা না উঠিলে ভয়ের কিংবা নিরাশ হইবার কারণ থাকে না।

টীকা দিবার পরের অবস্থা :—প্রথমবার টীকা লইলে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট অবস্থা হইতে দেখা যায়। প্রথম চারিদিন আঁচড়ের স্থানে সামান্যরূপ বেদনা অনুভূত হয়। পঞ্চমদিনে আঁচড়ের উপরিভাগ সামান্যরূপ লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং ষষ্ঠদিনে এক কিংবা একাধিক গুটীকা বহির্গত হইতে দেখা যায়। সপ্তম দিনে উহার চারিদিক লাল ও কঠিন হইয়া গুটীকা পূর্ণাঙ্গ হয়। অষ্টমদিনে গুটীকা বা টীকা বিশেষরূপ কঠিন ও লাল হইয়া উঠে এবং চড় চড় বা টন টন করিতে থাকে এবং মুক্তাফলের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

এই সময়ে দেহে উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং টীকার স্থান যন্ত্রণাদায়ক ও বেদনাযুক্ত হয়; সময়ে

সময়ে বাহুর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইতে দেখা যায়, এবং ক্ষুধার অভাব এবং বমনেচ্ছা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সময়ে কেহ যেন গুটীকা বা টীকাকে স্পর্শ করিয়া তাহাতে কোনওরূপ আঁচড় না দেন। এ বিষয়ে শিশুর টীকা হইলে বিশেষরূপ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। টীকার স্থান বিশেষরূপ লাল, স্ফীত বা যন্ত্রণাদায়ক হইলে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর Boric Compress দিলে ঐসব যন্ত্রণার লাঘব বা উপশম হয়। দুইদিন ঐরূপ Compress দিলেই যথেষ্ট হয়। একাদশ বা দ্বাদশ দিনে স্ফীতি এবং লালবর্ণ কমিতে আরম্ভ করে এবং পরে টীকা সম্পূর্ণরূপে কঠিন হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং একটী বোতামের আকার ধারণ করে। একবিংশতি দিবসে এই বোতামের উপরিভাগ খসিয়া পড়িয়া যায় এবং সেই স্থলে একটী গোলাকার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে।

টীকা দিবার পর মানবদেহের কিরূপ অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত বিষয় এস্থানে সন্নিবদ্ধ করা হইল; কারণ টীকা দিবার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে যদি টীকার দাগ না উঠে বা উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণও সময়ে সময়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় কি করা উচিত সেই বিষয়ের সাধারণ নিয়ম

(লেখক—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, B. Sc.,)

অভাবিত দুর্ঘটনা নানা কারণে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং প্রত্যেক ঘটনাই কোন এক "বাঁধাবাধি" নিয়মের অধীন হইতে পারে না কিন্তু তাহাদের কয়েকটি সাধারণ মূলসূত্র দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

প্রথম।

১। রোগীকে প্রথম পরীক্ষা করিয়া যাহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে স্থিরকৃত হইবে।

২। এই প্রাথমিক পরীক্ষাতে রোগীর আঘাত লঘু কিম্বা গুরু, তাহা যথাসাধ্য নির্ণয় করা উচিৎ।

৩। যদি রোগীর জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে আঘাতের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

রোগী অজ্ঞান থাকিলে, দুর্ঘটনার ধারা হইতেই আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

দ্বিতীয়।

ঘটনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ যথাসম্ভব পরিদর্শন করা উচিৎ।

ইহাতে সেবাকারী, রোগী সেই স্থানে থাকিলে আর কোন আনুসঙ্গিক বিপদে পতিত হইবেন কিনা

এবং কোনরূপ সত্বর সাহায্য পাইতে পারেন কিনা, বুঝিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া আহত হইতে পারেন কিম্বা কোন গ্যাসপূর্ণ ঘরে আহত হইয়া থাকিতে পারেন, এই অবস্থায় রোগীকে যথাসত্বর স্থানান্তরিত না করিলে আরও কোন বিপদ আসিতে পারে কিম্বা রোগীকে সেই-স্থানে রাখাই শ্রেয়, এই সকল বিষয় সেবাকারীকে যথাসত্বর নির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতে হইবে।

তৃতীয়।

এক্ষণে আঘাতের অবস্থা ও স্থান বেশ সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করুন।

প্রায়ই কোন দুর্ঘটনায় রোগীকে দেখিলেই আঘাতের স্থান ও অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

(১) হাত, পা অসাধারণ ভাবে বক্র হইতে পারে।

(২) জামা কাপড়ে গাড়ীর চাকার কালদাগ থাকিতে পারে কিম্বা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

(৩) শরীরের কোন অংশ হইতে রক্তপাত হইতে পারে।

যদি রোগী অজ্ঞান থাকে।--

১। মুখমণ্ডলের বর্ণ ও চর্ম্মের অবস্থা দেখুন।

২। নাড়ী ও চক্ষু পরীক্ষা করুন।

৩। মাথায় হাত দিয়া দেখুন, খুলির অস্থি ভঙ্গ হইয়াছে কিনা!

৪। রোগী কিরূপ ভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে দেখুন এবং বিশেষ ভাবে ওষ্ঠ দ্বয়ের স্পন্দন লক্ষ্য করুন।

চতুর্থ।

আঘাতের বিবরণ ও লক্ষণ নির্ণয় করিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করুন।

১। আঘাত হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই রক্তপাত বন্ধ করাই কর্ত্তব্য।

২। যদি রক্তপাত তেমন ভীতিপ্রদ না হয় ত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় অবলম্বন করুন।

(i) নিকটে কোন চিকিৎসক থাকিলে তাঁহাকে ডাকিতে পাঠান। চিকিৎসক আনিতে পাঠাইবার সময় রোগীর বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে যদি সম্ভব হয় ত লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহা হইলে চিকিৎসক তাঁহার প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি ও অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন।

(ii) যদি রোগী কোন বিপদজনক কিম্বা খোলা দূষিত হাওয়ায় থাকে ত তাহাকে স্থানান্তরিত করাই আবশ্যক।

যদি আশু কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে ত রোগীকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করা উচিৎ। কিন্তু রোগী নাড়াইতে, যাহাতে আরও কোন বিপদ ঘটিতে না পারে সেই বিষয়ে যথা সাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ যদি রোগীর কোন স্থানে অস্থি ভঙ্গ হইয়া থাকে ত নিম্নলিখিত বিপদটির আশু সম্ভাবনা।

রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার সময়, ভাঙ্গা হাড়ের ধারাল মুখটি মাংসের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে পারে ও এমন কি চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে। উহাতে সরল ভঙ্গ (Simple fracture) মিশ্র ভঙ্গে (Compound fracture) পরিণত হইবে এবং আঘাতের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

রক্তহীনতা এবং তাহার প্রতিকার

১। সিরাপ-হিমোজেন—দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর রক্তহীনতা দুর্ব্বলতা এবং অন্যান্য জটীল উপসর্গ দূর করিবার জন্য বহু গবেষণা এবং পরীক্ষার ফলে সদ্য রক্তকণিকা হইতে সিরাপ-হিমোজেন প্রস্তুত হইতেছে। হাঁসপাতালের রোগীদিগকে ব্যবহার করাইয়া এবং পরে তাহাদের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধ ব্যবহারে রোগীর দেহে অতি সত্বর অধিক পরিমাণে রক্তকণিকা গঠিত হয়।

২। হিমো-হাইপোফস্‌ফাইট কোং—হাঁপানী, পুরাতন সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদি, যক্ষ্মা এবং যাবতীয় ফুস্‌ফুসের পীড়া ও তৎসহ রক্তহীনতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অতিশয় হিতকারী।

৩। হিমো-স্যারসা প্যারিলা—(হিমোজেন উইথ্‌ গোল্ড ও আয়োডাইজ্‌ড্‌ স্যারসা প্যারিলা) উপদংশ (সিফিলিস্‌) পারাদুষ্টি স্নায়ুর বিকার, রক্তদুষ্টি, বাত ইত্যাদি সহ রক্তহীনতায় ইহার তুল্য ঔষধ নাই।

৪। হিমো লেসিথিন্‌ ফস্‌ফেইট্‌—(হিমোজেন উইথ্‌ গ্লিসারো-ফস্‌ফেইটস্‌, ষ্ট্রীকনীন, আর্সেনিক, লেসিথিন ইত্যাদি) স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অবসাদ, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, পুরুষত্বহীনতা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি উপসর্গসহ রক্তহীনতা বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ অত্যাশ্চর্য্য ফলদায়ক।

৫। হিমোজেন উইথ লিভার একষ্ট্রাক্ট—বহু গবেষণার পরে মিনট্‌ ও মার্ফি প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ্‌ লিভার একষ্ট্রাক্ট নামক রক্তহীনতার আশ্চর্য্য মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ লিভার একষ্ট্রাক্ট হিমোজেনের সহিত মিশ্রিত থাকায় এই ঔষধটী সর্ব্বপ্রকার রক্তহীনতাই আশ্চর্য্য ফলদায়ক।

৬। কুইনো-হিমোজেন—(হিমোজেন উইথ্‌ কুইনাইন্‌ ষ্ট্রীক্‌নীন, আর্সেনিক ইত্যাদি) ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর ও তজ্জনিত রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতায় মহৌষধ।

৭। সিরাপ হিমোজেন উইথ নরম্যাল সিরাম—রক্তহীনতার সহিত অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য বর্ত্তমান থাকিলে বিশেষতঃ যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়প্রবণ ধাতুতে ইহা সমধিক উপযোগী।

৮। রেডিও-হিমোজেন—(হিমোজেন উইথ্‌ ইর‍্যাডিয়েটেড্‌ ভিটামিন কোং) রক্তহীনতা ও তৎসহ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বাল্যাবস্থায় শরীরের স্বাভাবিক পরিপুষ্টির অভাবজনিত ক্ষীণতা, পুরাতন ফুস্‌ফুসের পীড়া, বেরি বেরি রোগে খাদ্যাভাব জনিত দুর্ব্বলতা ও কাজে অক্ষমতা, ক্লান্তি সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ ঔষধ।

৯। হিমো-মল্ট—সিরাপ হিমোজেনের সহিত মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত হওয়ায় এই ঔষধটী সুস্বাদু ও সুপাচ্য হইয়া পরিপুষ্টির অভাব, ফুসফুসের দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতায় আশ্চর্য্য ফলদান করে।

১০। ম্যারো হিমোজেন—শারীরিক পুষ্টির অভাব, রক্তহীনতা এবং অস্থিমজ্জার রোগে ম্যারো হিমোজেন অর্থাৎ মজ্জা ও স্প্লীন একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত হিমোজেন আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়।

রোগীকে স্থানান্তরিত কিম্বা যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক, চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে সত্ত্ব সেবার নিম্নলিখিত কয়েকটি মত অবলম্বন করিলে উপকার পাইবেন ঃ—

১। আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব আরামে রাখুন।

ক। দৃঢ় গাত্রবস্ত্র আল্গা করিয়া দিন।

খ। রোগীকে সাধারণতঃ শান্তভাবে শোয়াইয়া রাখিবেন কিম্বা কিছুতে ঠেস দিয়া আরামে বসাইয়া রাখিবেন।

গ। যদি মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হইয়া থাকে ত রোগীর মাথা নীচু করিয়া সোজাসুজি ভাবে শায়িত করুন। যদি রক্তবর্ণ হয় ত মাথা উঁচু করিয়া কম্বল কিম্বা অন্যকোন সুবিধা মত দ্রব্যের বাণ্ডিল করিয়া তাহার উপর ঠেস্ দিয়া রাখুন।

চ। যদি বমন হয়, মাথাটি একদিকে হেলাইয়া দিন, যাহাতে মুখ হইতে বমনের দ্রব্যগুলি সহজে বাহির হইতে পারে, ও বায়ুনালীতে প্রবেশ করিতে না পারে, কারণ বায়ুনালীতে কিছু প্রবেশ করিলে দম বন্ধ হইতে পারে।

ছ। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকিলে, তাহাকে জল কিম্বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধ পান করাইতে চেষ্টা করিবেন না, কারণ এমত অবস্থায় রোগীর কিছু গলাধঃকরণ করা একেবারে অসম্ভব।

২। পোষাক অপসারণ।

ক। পোষাক অপসারণ করিতে হইলে প্রথমে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন, এবং অনাহত প্রত্যঙ্গের দিক হইতে পোষাক খুলিয়া আসুন ইহাতে আহত অঙ্গ হইতে সহজেই পোষাক খুলিয়া আসিবে। এরূপ করিলে, যদি অস্থি ভঙ্গ হইয়া থাকেত তাহাতে কোন ক্ষতি করিবে না।

খ। সময় বিশেষ পোষাক কাটীয়া খোলাই ভাল। পোষাকের যেই স্থানে সেলাইয়ের জোড় আছে, সেই স্থান হইতে কাটিয়া কিম্বা ছিঁড়িয়া ফেলাই ভাল। যখনই কোন সাংঘাতিক আঘাত কিম্বা বিশেষরূপে আহত অঙ্গাদি পরীক্ষার আবশ্যক হইবে, তখনই যথা সত্বর পোষাক কাটিয়া ফেলিবেন।

গ। পোষাক খুলিবার সময় কি করিবেন ভাবিয়া লইবেন ও মিছামিছি রোগীকে উন্মুক্ত রাখিবেন না।

৩। সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অবস্থায় অগ্রে বিশেষ মনোযোগী হউন।

ক। সর্ব্বাগ্রে রক্তপাত বন্ধ করুন।

খ। মিশ্র অস্থি ভঙ্গ হইলে বাড় (Splints) বাঁধিবার অগ্রে ভঙ্গস্থলে কিছু ড্রেসিং স্থাপন করুন।

গ। দগ্ধ স্থান ড্রেস করিবার অগ্রে রোগীর অবসাদের (Shock) প্রতিকার করুন।

ঘ। মস্তক রাখিবার দ্রব্য (Head rests) টুর্নিকে (tournequets) বাড় (Splints) ড্রেসিং (dressings) এবং খাটিয়া (Stretcher) প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা সত্বর যোগাড় করিয়া ফেলুন।

৪। ক্ষত স্থান রক্ষা করুন।

সর্ব্ব প্রকার ক্ষত স্থান যথা সত্বর কোন Sterile (বীজাণুনাশক ঔষধে সংশোধিত) দ্রব্যে আবৃত করুন। ইহার অভাবে ক্ষত স্থান উন্মুক্ত করিয়া কাপড় চোপড় আলগা করিয়া দিন যাহাতে ইহা ক্ষত স্থানে ঘসড়াইয়া না যায়।

৫। রোগীর অবসাদ লক্ষ্য করুন।

রোগী বিশেষ আহত হইলে, তাহার অবসাদ (Shock) পরীক্ষা করা সদাই আবশ্যক, এবং যদি

অবসাদের কোন লক্ষণ দেখা যায় তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারে সচেষ্ট হউন।

এই সঙ্গে জানিয়া রাখা উচিৎ যে যদিও রোগী অবসাদ গ্রস্থ না হয় তথাপি রোগীকে যথা সম্ভব গরমে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা ও পদদ্বয় গরম রাখা সদ্য সেবার সাধারণ নিয়ম।

৬। অকারণ জনতা দূর করুন।

ক। আহত ব্যক্তিকে উন্মুক্ত বায়ুতে রাখা উচিৎ, অকারণ ভীড় হইলে বায়ুরোধ হইতে পারে এবং রোগী নির্ম্মল বায়ু হইতে বঞ্চিত হয়।

খ। সর্ব্বদা ভীড় ঠেলিয়া রোগীর স্থান পরিস্কার করুন এবং যাহাতে কেহ রোগীকে অকারণ ব্যস্ত না করে সেই বিষয়ে মনোযোগী থাকিবেন।

সময় সময়, জনতার লোকদিগকে আবশ্যকীয় কিম্বা অনাবশ্যকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়, কারণ তাহাতে জনতা আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আমরা কয়েকটি ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলিব।

Tetanus ধনুষ্টঙ্কার।

বিবরণ।—

ধনুষ্টঙ্কার একটি মারাত্মক রোগ। শরীরে সামান্য আঘাতে কোন ক্ষত হইলে, তাহাতে এক জাতীয় বীজাণু প্রবেশ করিয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। এই বীজাণু রাস্তার ধূলায় এবং ঘোড়ার বিষ্ঠায় খুব বেশী পরিমাণে থাকে।

লক্ষণ।—

ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ নানা রকম। তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই, ঘাড় এবং মুখের নীচের চোয়াল শক্ত হইয়া যায়। এই রোগ খুবই মারাত্মক এই রোগ শতকরা ৫০ হইতে ৮৫ জন মারা যায়।

চিকিৎসা।

কোন রকম ক্ষতে যদি রাস্তার ধূলা লাগে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোন চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইয়া antitetinus serum ইনজেক্সন করান উচিৎ কোন কোন অবস্থায় সপ্তাহে একবার করিয়া তিনটি ইন্জেক্সন লওয়া উচিত।

Abrasion (ঘর্ষণ জনিত সামান্য আঘাত)

শরীরের চামড়া যদি কোন বন্ধুর জিনিসে ঘর্ষিত হইয়া সামান্য ক্ষত হয় তাহাকে abrasions কহে।

চিকিৎসা।—

যদি ধূলা ক্ষতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা বোরিক এসিড সলিউসনে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলা উচিত। যদি ক্ষতের উপরিভাগ পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে ইহা প্রয়োজন নাই। Dilute টিংচার আইডিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ তাহাও দরকার হয় না এবং ইহাতে ক্ষত যন্ত্রণাদায়ক হয়। শেষে ক্ষতে boric acid ointment কিম্বা Zinc ointment লাগাইয়া Sterile সঙ্গে ড্রেস করিয়া দিন।

(ক্রমশঃ)

মাছের ব্যবহার

(কবিরাজ শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত এই তর্কই চলিয়া আসিতেছে যে নিরামিষ খাদ্য ভাল, না আমিষ খাদ্য ভাল ? এ তর্ক কেবল প্রাচ্যে নহে, প্রতীচ্যেও আছে। বাস্তবিকই এ তর্কের মীমাংসা করা সুকঠিন।

স্বাস্থ্যের পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি 'বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধের গুণ ও তাহার ব্যবহার' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা সারবান খাদ্য। মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা সারবান খাদ্য নহে বটে কিন্তু যতগুলি সারবান ও জীবনী-শক্তি-বর্দ্ধক উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য আছে তন্মধ্যে একটি।

আমাদের দেশে মৎস্য ও মাংস দুগ্ধের তুল্য সুখাদ্য নহে একথা স্বীকার্য্য। কারণ আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, সেইজন্য অল্পেই খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় নিমন্ত্রণ বাড়ীতে দেখা যায়, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ার ফলে নানা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু মৎস্য-মাংস যদি বেশী থাকে তাহা হইলে পর দিবস তাহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু নিরামিষ খাদ্যে এতাদৃশ আশঙ্কা নাই। যথা, ভাত বেশী হইলে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে পর দিবস 'পান্তা' কোন প্রকারে চলিতে পারে। নিরামিষ ডাল, তরকারীও এক রাত্রি পরেই মৎস্যের ন্যায় অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে না। এখানে আমাদের একটা কথা বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত যে, এক রাত্রিরও বাসী খাদ্য স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বর্জ্জনীয়। তবে এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমিষ খাদ্যের ন্যায় নিরামিষ খাদ্য বাসী হইলেও আমিষ খাদ্যের ন্যায় শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না।

খাদ্য গ্রহণ অনেক পরিমাণে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। মৎস্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা বাঙালীর একটা জন্মগত অভ্যাস। বাঙালীকে যদি এখন মাছের ঝোল ও ভাতের পরিবর্ত্তে রুটি, ছাতু প্রভৃতি দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীর্ণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। পরিপাক যন্ত্র সে খাদ্য ঠিক মত পরিপাক করিবে না পরন্তু অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যাধি উৎপন্ন করিবে। এই একই অবস্থা সকল জাতির ও সকল দেশের লোকের। বাংলার পুষ্করিণীতে, খালে, বিলে, নদীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য উৎপন্ন হইত ও এখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণে হয়, বাঙালী সেই মৎস্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করাই জন্মাবধি অভ্যাস করিয়াছে। এই অভ্যাসকে একটা দোষের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। অনেকে বলেন, মৎস্য-মাংস সেবন করিলে অযথা ইন্দ্রিয়বৃত্তির

উত্তেজনা আইসে। এ কথা যে একেবারে অসত্য তাহা নহে। বেশী পরিমাণে মৎস্য-মাংস সেবন করিলে এরূপ হইবারই সম্ভাবনা। যাঁহারা ব্রহ্মচারী, সাত্ত্বিক অথবা অবিবাহিত যুবক-যুবতী তাঁহাদের নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করাই সঙ্গত। তবে একটা কথা, অনেকে বাংলার বিধবাদিগের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, তাঁহারা মৎস্য-মাংস সেবন করেন না বলিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য বিধবা-জীবনে ভাল হইয়া থাকে। কেবল মৎস্য-মাংস ছাড়ার জন্য বাংলার সন্ন্যাসিনী বিধবা কুলের স্বাস্থ্য ভাল হয় না; আর একটা জিনিষ তাঁহাদের ভিতর আছে, যাহাকে আমরা বলি, ব্রতাচার, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রতাচার, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যদি না থাকে তাহা হইলে নিরামিষ ভোজন করিলেই সে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত স্বাস্থ্যলাভ করা অসম্ভব। বাংলা দেশে কোন কোন সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা নিরামিষ ভোজী। আমার মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ নহেন। তাহা হইলে আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে কেবল মৎস্য-মাংস ছাড়িলেই ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না। এজন্য চাই সংযম শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালন।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম বর্ণে বর্ণে পালন করেন এবং যাঁহারা সত্ত্বগুণ বজায় রাখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে মৎস্য উপযোগী নহে। এই সকল লোকের পক্ষে মৎস্য ত্যাগ করাই ভাল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাদ্য অনেক পরিমাণে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। বাঙালীর মৎস্য সেবন করা অভ্যাস। সেই জন্য অল্প পরিমাণে নিয়মিত টাট্‌কা সুরন্ধিত মৎস্য সেবন করিলে অযথা ইন্দ্রিয়বৃত্তির উত্তেজনা না আনিয়া বল বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। কাহার পক্ষে কিরূপ মৎস্য প্রয়োজন সে সকল কথা পরে বলা যাইবে।

বেশী পরিমাণ মৎস্য সেবন করিলে ব্রহ্মচর্য্যের হানিকর হইলেও যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না, তাঁহারা যদি অল্প পরিমাণে নিয়মিত মৎস্য সেবন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের যথন বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে ও অযথা ইন্দ্রিয় বৃত্তির উত্তেজনা হয় না এবং বাংলা দেশে যখন মৎস্য সেবন করা দেশাচার তখন আমরা মৎস্যকে সারবান খাদ্যের মধ্যে একটি বলিতে পারি।

আমাদের পরিপাক যন্ত্র আহার পাইবার জন্য বসিয়া আছে। আহার পাইলেই পরিপাক করা তাহার কাজ। এ সকল কথা পূর্ব্বে 'আহার' নামক প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরিপাক যন্ত্র যদি সাধারণ খাদ্য পায় তাহা হইলে সে পরিপাক করিয়া দিয়া রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুকে বর্দ্ধিত করে কিন্তু যদি আমরা কেবল অসার খাদ্য দ্বারা উদর গহ্বর পূর্ণ করি, পরিপাক যন্ত্র তাহা পরিপাক করিয়া মলই বৃদ্ধি করিবে। এই জন্যই আমাদের নিয়মিত ভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া নিয়মিত ভাবে জীবনী শক্তি-বর্দ্ধক উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য পরিপাক যন্ত্রকে দিতে হয়। পরিপাক যন্ত্রকে নিয়মিত ভাবে খাদ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য, পরিপাক যন্ত্রের একটা অভ্যাস থাকে এবং সেই খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় আসিলে পরিপাক যন্ত্র স্থির থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের নিমিত্ত নিয়মানুবর্ত্তিতারও বিশেষ প্রয়োজন।

যেহেতু জীবনী-শক্তি বর্দ্ধক উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যের মধ্যে মৎস্য অন্যতম, সেইজন্য অদ্য আমরা

এই প্রবন্ধে কয়েক প্রকার মৎস্যের কথা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। মৎস্য একটি তুষ্টিকর পুষ্টি বর্দ্ধন খাদ্য। মৎস্যের সাধারণ গুণের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, সকল মৎস্যই কফ-পিত্ত জনক ও বাতঘ্ন। তাহা হইলে আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে, সকল মৎস্যই কফ-পিত্ত-জনক বলিয়া কফ ও পিত্ত-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে মৎস্য উপযোগী নহে। রক্তদুষ্টি হস্তপদে জ্বালা প্রভৃতি যদি কাহারও থাকে তাহা হইলে মৎস্য সেবন করা একেবারে নিষিদ্ধ। অপর দিকে যাঁহাদের কফ-পিত্ত দোষ নাই, নিয়মিত পরিশ্রম ও বিবাহিত জীবন যাপন করেন ও দীপ্তাগ্নি তাঁহারা মৎস্য সেবন করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন। মৎস্য সেবনে বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা পুষ্টিকারক ও বৃষ্য এবং মধুর স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও গুরু।

রোহিত মৎস্য।

মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা বহু হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া রোহিত মৎস্য সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও মৎস্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সুতরাং এসম্বন্ধে যতবেশী আলোচনা হয় ততই ভাল। যাহা সত্য তাহা কখনও পুরাতন হয় না; ইহাই আমার ধারণা। মৎস্য সারবান খাদ্যের মধ্যে অন্যতম এবং এ খাদ্য বাঙ্গালী ত্যাগ করিতে পারিবে না। সেই জন্যই এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন।

আপনারা বোধ হয় একটা প্রবাদ শুনিয়া থাকেন যে, 'মাছের ভেতর রুই।' প্রকৃতই এ প্রবাদ অতি সত্য। যত প্রকার মৎস্য আছে তাহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে রোহিত মৎস্যই শ্রেষ্ঠ চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

"শৈবলাহারভোজিত্বাৎ স্বপ্নস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ॥"

অর্থাৎ, রোহিত মৎস্য শৈবাল খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং নিদ্রা সেবন করে না বলিয়া দীপনীয়, পাকে লঘু ও মহাবলকারক।

এই রোহিত মৎস্য সম্বন্ধে সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"কষায়ানুরসস্তেষাং শষ্পশৈবালভোজনঃ।
রোহিতো মারুতহরো নাত্যর্থং পিত্তকোপনঃ॥

অর্থাৎ, রোহিত মৎস্য কষায়ানুরস বিশিষ্ট এবং শৈবাল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। এই মৎস্য বায়ুনাশক ও অতিপিত্তপ্রকোপন নহে।

তাহা হইলে আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই মৎস্যের তুল্যগুণ-বিশিষ্ট কোন মৎস্যই নহে। এই মৎস্য অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা নিয়মিত উচিত মাত্রায় সেবন দ্বারা শরীরে বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাঁহারা অর্দ্দিত (ফেসিয়াল প্যারালিসিস্) নামক বাতব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন তাঁহারা এই মৎস্যটী অবশ্য সেবন করিবেন। সেবনের মাত্রা জীর্ণ করিবার সমর্থ অনুসারেই হওয়া উচিত। রন্ধন বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ, যাহাতে বেশী মশ্লা দিয়া রন্ধিত না হয়।

রোহিত মৎস্যের মস্তকও একটি সুস্বাদু ও তৃপ্তিজনক খাদ্য। যাহাদের হাড়ের পুষ্টি কম তাহাদের পক্ষে বিশেষ হিতজনক। ঊর্দ্ধ জত্রুগত ব্যাধিতেও রোহিত মৎস্যের মস্তক সেবন করিতে দিতে পারা যায়। আপনারা হয়ত' শুনিয়া থাকিবেন, বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারে মাছের মাথা আনিলে ছোট বালকবালিকাগণকে ভুলাইয়া বয়স্কেরা তাহাদের বলেন, 'মুড়ো খেলে বুড়ো হয়'। এরূপ করা নিতান্তই

অন্যায়। অল্প-বয়স্ক যাহারা তাহদের ভিতর মাছের মাথা খাইবার প্রয়োজন অনেকেরই আছে। আজ-কালকার বাংলায় শিশুসন্তানদিগের হাড়ের পুষ্টি এবং শরীর ঠিকভাবে গঠিত হয় না। এজন্য সারবান খাদ্য ও পরিশ্রম তাহাদিগকে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আর যদি অল্প বয়স হইতেই শরীর সুগঠিত না হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আপনারা জানেন, যে জমির উর্ব্বরা শক্তি কম সে জমির ফসল ভাল হয় না। যদি ইহার কারণ অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে রোপিত তৃণ বা লতা বা বৃক্ষ ঠিক মত খাদ্য গ্রহণ করার উপযোগী সামগ্রী জমি হইতে পায় নাই। এতদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভাল সার--তৃণ, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতির জীবনী শক্তি বর্দ্ধনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। গাছের বাঁচি-বার জন্য যেমন জমির সার, আলোক, বাতাস প্রভৃতি প্রয়োজন, তেমনি মানবের সারবান্ খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু, পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যের নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন।

আমরা এখন বুঝিলাম, রোহিত মৎস্যের মস্তকও বেশ একটি সারবান্ খাদ্য। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ যাঁহারা মৎস্য সেবন করেন সকলেরই এই মৎস্যের মস্তক সেবন করা উচিত। রোহিত মৎস্যের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখি, আমাদের দেশে মৎস্য চাষের বিশেষ সুবন্দোবস্ত নাই। শুনিতে পাই, পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা নানা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় মৎস্য শিকার করিয়া থাকেন। তাহাতে চারা মাছগুলি নষ্ট হয় না। আমাদের দেশে ধীবর সম্প্রদায় মাত্র মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহারা জানে না, কেমন করিয়া মৎস্য চাষ করিতে হয়। তাহাদের এ বিষয় শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। মৎস্যের ব্যবসা ও বেশ একটি লাভজনক ব্যবসা। যদি আমরা মৎস্য বেশী পরিমাণে পাইবার আশা রাখি তাহা হইলে এ কার্য্যটী অবশ্য করনীয়। এই রোহিত মৎস্য একধারে বহু ডিম্ব প্রসব করে—গণনা করিয়া ঠিক করা যায় না কত। কিন্তু সকল ডিম্ব কি ফুটিবার অবসর পায়? এত ডিম্ব তাহা হইলে যায় কোথায়? কেন তাহা হইলে আমরা আজ রোহিত বা অন্যান্য ভাল মৎস্য কম পাইতেছি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বহু জলজ প্রাণী এই মাছটীর শত্রুরূপে রহিয়াছে। ভাল মৎস্যগুলিকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আর এক কথা—বাংলার নদীগুলির অবস্থা আজকাল ভাল নহে। ভাল মৎস্য ভাল স্থান না পাইলে থাকিতে পারে না। আজকাল এদেশের নদীগুলি কচুরীপানাতে ভরিয়া গিয়াছে। রোহিত মৎস্য শৈবালভোজী সত্য কিন্তু ঐ মহা অনিষ্টকর কচুরী-পানা ভোজী নহে। যে নদীতে কচুরী-পানা আছে সেই নদীতে বেশী পরিমাণে এই মৎস্যের শত্রু নানা মৎস্য ও জলজ জীবের আবাসস্থল হইয়া উঠে, এই জন্য কচুরীপানাটীকেও আমরা এই মৎস্যের শত্রুর পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি।

কাৎলা মৎস্য।

কাৎলা মৎস্য রোহিতের ন্যায় বড় জাতীয় মৎস্য। এই মৎস্যের সংস্কৃত নাম, মোকিকা। যাঁহারা দীপ্তাগ্নি-বিশিষ্ট তাঁহাদের পক্ষে এই মৎস্য উপযোগী। যাঁহাদের কোষ্ঠাগ্নির জোর কম তাঁহাদের পক্ষে এই মৎস্য উপযোগী নহে। এই মৎস্যের মস্তক রোহিত মৎস্যের মস্তকের ন্যায় বলবর্দ্ধক নহে। তবে রোহিত মৎস্যের ন্যায় না হইলেও ইহা বলবর্দ্ধক।

এই মৎস্যের গুণ, মধুর রসযুক্ত, পাকে গুরু, পিত্ত ও বায়ু নাশক, শ্লেষ্মা বর্দ্ধক, বৃংহন ও বৃষ্য।

(ক্রমশঃ)

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতার একটি কারণ

শ্রীবিমলচন্দ্র রায়।

মধ্যাহ্নে আহারের পর বাহিরের গৃহে আসিয়া বসিতেই কি জানি নিদ্রায় চক্ষু ঢাকিয়া ধরিল। কখনই ঘুমাইব না সংকল্প করিয়া কলম এবং খাতা খানি হাতে করিয়া বসিতেই বন্ধুর পূর্ব্বদিনের অনুরোধটী মনে পড়িল। বন্ধু বলিয়াছিলেন—"ওহে, আজকালকার আবহাওয়া অনুযায়ী একটা গল্প লিখে আমাকে দিও ত।" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"কি রকম ?" বন্ধু উত্তর করিয়াছিলেন—"এই দেশমাতৃকার জন্য বীর সন্তানের আত্মত্যাগ ;—এই ধরণের একটা।" আমি ত এবিষয়ে একেবারে সিদ্ধহস্ত, তবুও নিজের সম্মানটুকু দুরস্ত রাখিবার জন্য বলিয়াছিলাম—"আচ্ছা দেখ্ ব।" আজ কাগজ কলম হাতে করিয়া বন্ধুর নিকট প্রতিশ্রুত 'আচ্ছা দেখ্ ব' বাক্যটীর সার্থকতা রাখিবার জন্য চক্ষু মুদিয়া ভাবরাজ্যে ডুব দিলাম ; কিন্তু দেশমায়ের জন্য কাহারা যে শতকষ্ট, নিপীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করিয়া দু'এক মিনিট জীবিত থাকিবে বা জলজ্যান্ত অবস্থায় আত্মত্যাগ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়াও যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্লীহা, লিভারযুক্ত ধামাসদৃশ পেট লইয়া লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান সম্মুখে দাঁড়ায়, বিরক্ত হইয়া ভাবরাজ্য হইতে বাস্তবরাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম। ধ্যান ভঙ্গ হইতেই কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ, নাকে চশমা আটা, মাথায় লম্বা টেরী, মুখে বিড়ীযুক্ত কয়েকটী দেশমায়ের সন্তান চোখে পড়িল। ভাবিলাম—এরাই আবার দেশমায়ের জন্য জ্বলন্ত আত্মত্যাগ করিবে! হায়, অদৃষ্ট ! গল্প সল্প লেখা আমার অভ্যাস নাই ; সুতরাং ভাবরাজ্যে ডুব দিয়াও বড় সুবিধা করিতে পারিলাম না। একটা নিছক মিথ্যা মনোরঞ্জন করিয়া লিখিতে বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। হঠাৎ ছেলেবেলার পড়া একটা কবিতার দুই লাইন মনে পড়িল।—

"If you find your task is hard
Try try try again."

আবার কাল্পনিক রাজ্যে ডুব দিলাম। এবার দেখিলাম চক্ষু কোটরাগত, শীর্ণ শীর্ণ হস্তপদ বিশিষ্ট, হাঁড়ীসদৃশ পেটটা লইয়া আপাদমস্তক খদ্দরমণ্ডিত একটী যুবক সম্মুখে দণ্ডায়মান! যুবকই ত বটে ? হাঁ, যুবকের বয়সই দেখিয়া বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। একেই বেচারী চলশক্তিহীন, তাহার উপর ঐ মোটা মোটা কাপড় জামা, চলিতে বেচারী হাঁপাইয়া পড়িতেছিল। বুঝিলাম দেশের লোক এই অসুবিধার জন্যই খদ্দর এখনও গ্রহণ করিতেছে না। যাহা হউক যুবকটী বোধ করি বীরদর্পেই দেশমায়ের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে বাহির হইয়াছে ; আর সেই বীরপ্রসবিণীর কঙ্কালসার দেহটী আসন্ন-পুত্র বিচ্ছেদে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। বীরজায়া স্বামীর এই জয়যাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহার অর্দ্ধ শক্তি দান করিতেছেন—ভূমিতে চেতনাহীনা হইয়া।

কল্পনারাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। বীর যুবকের বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা, বীরপ্রসবিণীর পুত্র-শোকজনিত হাহাকার. বীরজায়ার স্বামী-বিচ্ছেদহেতু অর্দ্ধমৃতাবস্থা প্রভৃতি দৃশ্য আমাকে ভাবাইয়া তুলিল, ভাবিলাম—সত্যই আজ আমাদের এইরূপই অবস্থা। এই সমস্ত লোকই কখনও শত কষ্ট, বিপদ এমন কি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশের এবং দশের সেবার নিজদিগকে অর্পণ করিবে? "হাসিও পায় দুঃখও ধরে।" আপাততঃ বন্ধুর অনুরোধটী আর রাখিতে পারিলাম না; আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের সকলের নিকট বলিতে প্রয়াস পাইব।

যুবক-যুবতীরাই দেশের, সমাজের, জাতির মেরুদণ্ড। দেশের উন্নতি করিতে হইলে—পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে হইলে যুবক-যুবতীরাই করিবে। সমাজ হইতে নানাপ্রকার কুপ্রথা উচ্ছেদ করিয়া উন্নত ও পুষ্ট করিতে ও যুবক যুবতীরই প্রয়োজন। এক কথায় দেশের জাতির সম্বলই হইতেছে যুবক-যুবতীরা। যে সমস্ত দেশে যুবতীরা শিক্ষিত, উত্তম স্বাস্থ্যযুক্ত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রে বিভূষিত,সে সমস্ত দেশ প্রতি মুহূর্ত্তে উন্নতি সাধন করিবে। অপরদিকে যে সমস্ত দেশের যুবক যুবতীরা ভগ্নস্বাস্থ্যযুক্ত এবং অশিক্ষিত সে সমস্ত দেশের উন্নতি অসম্ভব যদি না স্বাস্থ্যে শিক্ষায় তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে। আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় যুবক যুবতীরা বড়ই পশ্চাৎপদ। সেই জন্যই আজ দেশের এই দুর্গতি। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যুবক এবং বালকদের স্বাস্থ্যের মোটামুটি নমুনা আপনাদের সম্মুখে ধরিব। Students' welfare committee ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে যাহা দেখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলে বোঝা যাইবে।

শতকরা ৪৮ জন বাঁকা

,, ৩৩ জনের দৃষ্টিশক্তি খারাপ।
,, ৩১ ,, দন্ত দোষযুক্ত।
,, ৫ ,, পাইওরিয়া।
,, ৫৫ ,, ফুস্‌ফুসের দোষ।
,, ৫ ,, হৃদ্‌পিণ্ডের দোষ।
,, ৩ ,, প্লীহার দোষ।
,, ৫২ ,, কর্ণরোগ।
,, ২৪ ,, পুংলিঙ্গের ব্যাধি।

ইহা ছাড়া অন্ত্র-বৃদ্ধি, যকৃতের দোষ, হাইড্রোসিল, নাসিকা রোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার দুষ্ট রোগে ছাত্রগণ ভুগিয়া থাকে। কলিকাতার কতকগুলি কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে ইহাই দেখা গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে যাহা দেখা গিয়াছে তাহাতেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

শতকরা ৪৫ জন বক্রাকার।

,, ৪৩ জনের দাঁত খারাপ।
,, ২০ ,, দৃষ্টি খারাপ।
,, ১৪ ,, ফুসফুসের দোষ।
,, ১৪ ,, হজমের দোষ।
,, ২০ ,, টন্‌সিল বৃদ্ধি।
,, ১২ ,, লিভারের দোষ।

ইহা ছাড়া হৃদ্‌রোগে, কেশরোগে, প্লীহার দোষ আমাশয়ে, এবং আরও শত প্রকার ব্যাধিতে বহু ছাত্র ভুগিয়া থাকে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় শতকরা ৩০ জন ভুগিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ছাত্রেরা শতকরা ৩৫ জন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন।

দেশের বালক এবং যুবকদের স্বাস্থ্য ইহা হইতেই মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যাহারা ছাত্র তাহাদের অবস্থাই যখন এইরূপ তখন সাধারণ বালক এবং যুবকদের স্বাস্থ্য যে ইহাদের অপেক্ষা ভাল তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কেন না ছাত্রেরা সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে,—তাহারা অশিক্ষিতদের অপেক্ষা নিজ নিজ স্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ, যখন তাহারাই এইরূপ শতপ্রকার ব্যধিতে ভুগিতেছে, তখন অশিক্ষিতরা যে আরও অনেক প্রকার ব্যাধিতে ভুগিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? আরও একটী কথা আছে। আমাদের দেশ একেই দরিদ্র। সুতরাং যাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে তাহাদের অবস্থা যে কিছু ভাল একথা অনেকটা স্বীকার করিতেই হইবে। সাধারণ বালক এবং যুবকরা যে পরিমাণে আহার পায়, শরীরের প্রতি যতটুকু যত্ন লইতে পারে, রোগ-ব্যাধিতে যতটুকু চিকিৎসা করাইতে পারে ছাত্রেরা তাহাদের অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর আহার পায়, শরীরের প্রতি বেশী যত্ন লইতে পারে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা ব্যাধি নিরাময় হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহাদের পারিবারিক অবস্থা কিছু ভাল। আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমার এই কথাটীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশের লোকের অনেকের এরূপ অবস্থা যে জীবন ধারণের উপযুক্ত আহারও তাহারা যোগাইতে পারে না। এক্ষেত্রে যাঁহাদের পুত্র কন্যারা শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে, তাঁহাদের অবস্থা কি ভাল নয়?

যাক্, তাহা হইলে দেখা যায় যে শতকরা ১০ জন যুবক এবং ১০ জন বালক পূর্ণস্বাস্থ্যযুক্ত কিনা সন্দেহ। ছাত্রীদের স্বাস্থ্য এরূপভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই; তবে তাহাদের স্বাস্থ্য যে ইহাপেক্ষাও খারাপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ স্বাস্থ্যযুক্ত বালক বালিকারাই আবার ভবিষ্যতে যুবক যুবতীতে পরিণত হইবে এবং এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্যযুক্ত যুবক যুবতীদের উপর নির্ভর করিয়া দেশ ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবে—এই কথা মনে হইলে নিরাশায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে অন্য কোন সুসভ্য দেশের বালক বালিকা এবং যুবক যুবতীদের স্বাস্থ্য এরূপ হীন নহে।

আমাদের দেশে শতকরা ৯ জন লিখিতে পড়িতে জানে। অন্যান্য সুসভ্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষায় আমরা খুবই পশ্চাৎপদ। জাপানে শতকরা ৯৮ জন শিক্ষিত, আমেরিকায় ৯৬ জন এবং জার্ম্মাণীতে ৯১ জন শিক্ষিত, ইংলণ্ডে ৯৪ জন।

দেশে যে শিক্ষার হার এত কম ইহার অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা একটী প্রধান কারণ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। আর্থিক দুরবস্থা যেমন দেশে শিক্ষাবিস্তারের একটী অন্তরায়, তেমনি আমাদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায়। অনেকে বলিবেন—"ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার নাম যে বড় করলে না?" ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধিগুলিও আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গেরই এক একটা কারণ, কিন্তু এ সমস্ত ব্যাধিগুলি আমাদের জীবনকে মরুভূমি সদৃশ করিয়া দিলেও এগুলিকে আমি গৌণ কারণ বলিয়া ধরিব। মুখ্য কারণ হইতেছে আমাদের উদাসীনতা, আলস্য, প্রতীকারের চেষ্টাহীনতা। আপনারা হয়ত বলিবেন, "বাপুহে, ম্যালেরিয়া,

বদহজমই ত' আমাদের এরূপ করেছে"। কথাটা প্রকৃতই। কিন্তু আমরা জানিয়াও ত' প্রতীকারের উপায় করিতেছি না। ঘরে আগুন ধরিলে সাধ করিয়া কি কেহ ঘরের ভিতরে থাকিয়া পুড়িয়া মরে? আমাদের প্রতি ঘরে যে এই সমস্ত ব্যাধিরূপ আগুন ধরিয়াছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে এখনও পারিতেছি না। যেদিন বুঝিব সেদিন হয়ত আর এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় আমাদের থাকিবে না। দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য যে কিরূপ—সে খোঁজ কেহ রাখেন কি? দেশের ছেলেমেয়ের দূরের কথা নিজের ঘরে যে দুই একটী ছেলেমেয়ে আছে, তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকেও বোধ হয় কেহ দৃষ্টিপাত করেন না। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য দেখিয়া মনে হয় যে আর দুই পুরুষের মধ্যেই আমাদের নাম এ ধরাধাম হইতে চিরতরে লুপ্ত হইবে। আজকাল কার ছেলেমেয়েরা আবার ভবিষ্যতে পুত্র-কন্যার পিতামাতা হইবে, তাহা হইলে সে সমস্ত পুত্রকন্যারা যে কিরূপ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ছোটকালে গল্প শুনিয়াছি, আমাদের পুরাকালের পূর্ব্বপুরুষেরা নাকি ৪।৫ হাত লম্বা এবং তদনুযায়ী চওড়া ছিলেন এবং প্রলয়ের পূর্ব্বে মানুষ নাকি এত ক্ষুদ্র হইবে যে বেগুন গাছের তলায় হাট বসাইবে। আমাদের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, প্রলয়ের দিন সন্নিকট, কারণ আর দুই এক পুরুষের মধ্যেই বেগুন গাছের তলায় হাট বসাইবার উপযুক্ত আমরা হইব। আমাদের দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বেকার লোকেরা বাঁচিতেন গড়ে ৫০।৫৫ বৎসর আর এখন আমাদের গড়ে আয়ু ২৩ বৎসর। অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের আয়ুর হারের সহিত আমাদের গড় আয়ুর তুলনা করিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়। ইংলণ্ডের লোক বাঁচে ৫০ বৎসর, আমেরিকায়, ৫৬, এবং জাপানে ৪৮ বৎসর। আমাদের অস্তিত্ব যে অচিরাৎ লুপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? যদি এখনও আমরা এই অকাল মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সঙ্ঘ-বদ্ধ ভাবে প্রতীকারের উপায় না করি তাহা হইলে বাঁচিবার উপায় নাই। তবে খুবই সুখের বিষয় যে দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে। অনেকেই আজ নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য আজও সমবেত চেষ্টার অভাব থাকিয়া যাইতেছে। যতদিন না সমবেত চেষ্টার দ্বারা আমরা আমাদের অবস্থা প্রতীকারের চেষ্টা করিব, ততদিন বিশেষ কোন ফল আমরা পাইব না। আজ পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের ন্যায় পরের পদানত না হইয়া উন্নত হইতে হইলে আমাদের প্রথমে চাই স্বাস্থ্য—এবং শিক্ষা। বড়ই দুঃখের বিষয় যে দেশের ছেলেমেয়েরা আজও নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি কোন যত্ন লয় না। অনেকে বলেন যে আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণই হইতেছে শিক্ষাহীনতা। কথাটা অনেকাংশে সত্য, কিন্তু শিক্ষাহীনতা অর্থে যদি তাঁহারা লেখাপড়া না জানা মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা ঠিক নহে। অসভ্য জাতিরা লেখাপড়া জানে না কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে তাহারা কেমন নীরোগ ও স্বাস্থ্য-বিভূষিত। তবে এটা ঠিক যে শিক্ষাহীনতা আমাদের অকাল-মৃত্যুর এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। সে শিক্ষাহীনতা যে কিরূপ শিক্ষার অভাব তাহা পরে বলিব।

তাহার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখি যে, আজকাল আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি এরূপ শিক্ষা আমাদের আরও মৃত্যুর দুয়ারে পূর্ব্বেই পৌঁছাইয়া দিতেছে। দৃষ্টান্ত—স্কুল, কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য। এখন দেশের ছেলেমেয়েদের এরূপ হীন অবস্থার কারণগুলি দেখা যাক্।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

(ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী)

বিদ্যালয়ই জাতিয় ভবিষ্যৎ জন্মদাতা। এই নিমিত্তই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর অপরাপর বিষয়ের মধ্যে যাহাতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান করে এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা সবিশেষ প্রয়োজন।

বাংলা দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য অতীব নিরাশাপ্রদ। যে সময়ে স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে অগ্রগামী সেই সময়েই উহা সম্যক্ প্রসার পায় না; ছাত্রদের খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল মাংসপেশী, অনুন্নত গঠন দেখিলে যথার্থই দয়ার উদ্রেক হয়; অনেকের শরীরের মধ্যে সন্দেহজনক রোগের চিহ্ন বর্ত্তমান আর তা ছাড়া কয়েকজন সত্যই রোগে ভুগিতেছে। এই কারণেই ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যেহেতু এই কালই শরীর বর্দ্ধনের উপযুক্ত কাল। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনেও খুব কমই রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারিবে। আরও এক কারণ এই যে ছাত্রদের তরুণ অবস্থার ব্যাধিসমূহ নিবার্য্য এবং সহজেই আরোগ্য।

অতএব প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য যে তিনি যেন তিনি ব্যাধির সূচনা হইলেই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করান। কিন্তু এরূপ অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যে সন্তানকে স্বাস্থ্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে তাহার ভিতরে সত্যকার রোগ বর্ত্তমান এবং যে পর্য্যন্ত না সে শয্যাশায়া হয় ততক্ষণ বুঝা যায় না যে পূর্ব্বে তাঁহার রোগ ছিল কারণ, তা ছাড়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে যে পুত্রকে বাহ্যতঃ নীরোগ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে তাহাকে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই হেতুই ছাত্রদের রোগ যাহাতে সর্ব্বপ্রথমে ধরা যাইতে পারে তাহার প্রণালী উদ্ভাবন করা উচিত। অল্পবয়স্ক ছাত্রদের রোগ নির্ণয়ের উপযুক্ত স্থান বিদ্যালয়। মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের নিয়মিত ভাবে চিকিৎসার দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাদের মধ্যে কে কে রুগ্ন টের পাওয়া যাইবে। এইজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটী করিয়া চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন তিনি বৎসরের মধ্যে একবার বা দুইবার বৎসরে সমস্ত ছাত্রগণের শরীর পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষান্তে তিনি রুগ্ন ছাত্রকে তাঁহার পরীক্ষার ফল প্রদান করিবেন এবং বলিয়া দিবেন যেন

তাহার অভিভাবক সত্বরই ঐ রোগ দূরীকরণের উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা ব্যবস্থা করান্। নিঃস্ব হইলে তিনি যেন হাঁসপাতাল অথবা দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া যান।

বহু বিদ্যালয়ে বালকদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষার এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির ভার অভিভাবকদের উপর পড়ে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বা চিকিৎসক ছাত্র সম্বন্ধে যে রোগ বলিয়া দিবেন যেন অভিভাবকগণ সত্বরই তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, অবহেলায় আরোগ্যের সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই পরীক্ষার ফল অনেকটা সীমাবদ্ধ, ইহা হইতে বহু আশা করা যায় না ; ইহা ঠিক চিকিৎসা নয় তবে রোগ প্রতিষেধক। তবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই কার্য্যে আনুকূল্য করিতে পারেন ; তিনি অসুস্থ ছাত্রদিগের একটী তালিকা করিয়া রাখিবেন এবং তাহাদের রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে কিনা সেই বিষয়ে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি রাখিবেন। যদি অভিভাবকগণ উপযুক্ত চিকিৎসা না করান তাহা হইলে তিনি যেন পুনঃ পুনঃ তাগাদা দিয়া শীঘ্রই যাহাতে চিকিৎসা হয় সেরূপ কার্য্য করেন। এটা ঠিক যে সমস্ত অভিভাবকই প্রথমবার বলিলেই সে অনুযায়ী কাজ করিবেন না। সাধারণতঃ তাঁহারা বিদ্যালয়ের এই চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা উপলব্ধি করেন না বা করিতেও ইচ্ছা করেন না বরং এ বিষয়ে একটা বিতৃষ্ণা ভাবই পোষণ করেন। যদি এই পদ্ধতি হইতে কিছু উপকারের প্রত্যাশা করা যায় তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে অভিভাবকদিগের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা একজন চিকিৎসক নির্ব্বাচন। তাঁহার কাজ হইবে তিনি রুগ্ন ছাত্রদিগের বাটীতে গিয়া অভিভাবকগণকে পরামর্শ দেওয়া যেন শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসা হয়।

তরুণ বয়স্ক ছাত্রদিগের মধ্যে সচরাচর অসুস্থতার যে সমুদায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া এবং ভবিষ্যতে যাহা হইতে দুরারোগ্য ব্যাধি আনয়ন করে তাহার কয়েকটা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) যক্ষ্মা। এই রোগ যুবকদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। School বা কলেজ পরিত্যাগের পর যাহারা অধ্যাপক আইনজীবী বা ব্যবসায়ী এমন কি কেরাণী হিসাবে জীবন যাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। এই রোগের কারণ যাহাই হউক না কেন এটা ধ্রুবনিশ্চিত যে যদি তাহাদের পাঠ্যাবস্থায় School বা Collegeএ চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে অনেকের মধ্যে এই রোগ ধরা পড়িত বা অন্ততঃ অনুমান করা যাইত এবং চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে অন্ততঃ কয়েকজনের সম্পূর্ণ আরোগ্য হইত। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত স্ফীত গলনালী বা পুরাতন ধরণের সর্দ্দি বা কাশি অথবা দু একবার আক্রমণ অথবা নিয়মিত ভাবে দেহের ওজন ক্ষয় অথবা রক্ত বমন ইহার প্রত্যেকটীই সন্দেহের কারণ এবং বিদ্যালয়ের চিকিৎসক যেন সেই ছাত্রের অভিভাবককে ইহার বিষয় জানান এবং অভিভাবক ও যেন অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।

(২) বহুদিন ধরিয়া স্ফীত গলার বিচি থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা নিশ্চয়ই রোগের নিদর্শন এবং উহা হইতে বাতিক জ্বর বা প্রভৃতি

ভবিষ্যতে বিশেষতঃ দুর্ব্বল বালকদিগের হইতে পারে। অতএব এবিষয়েও দৃষ্টি রাখা দরকার।

(৩) অপরিচ্ছন্ন দাঁত বা দুর্ব্বল মাড়ি ও তৎসঙ্গে দাঁতের গোঁড়ায় পূঁজ এই সমস্তই অজীর্ণ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ এবং সেই কারণে উহার প্রতি বিধান নিতান্তই আবশ্যক।

(৪) অজীর্ণতা—এই রোগে বহু লোক ভুগিয়া থাকে। এই রোগের চরম অবস্থায় উদরাময় থাকিলে প্রায়ই দেখা যায় যে যক্ষ্মায় পরিণত হয় এবং বহু যুবকই ইহার কবলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুনঃ পুনঃ অগ্নিমান্দ্যের আক্রমণ ও পাকস্থলীতে অম্বল ও ব্যথার উদ্রেক হইলে প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে উহারা দুরারোগ্য ও যাবজ্জীবন অজীর্ণতার পূর্ব্ব লক্ষণ; উহাতে পেটের মধ্যে ঘা অথবা Appendicitis অথবা Intestinal tub. জন্মে ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই কারণেই হজমের গোলমাল থাকিলে অভিভাবকগণ যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

(৫) বাতিক জ্বর—ইহাতে বুকের পীড়া আসিবার খুবই সম্ভাবনা এই জন্য এবিষয়েও মনোযোগ দরকার।

লেখাপড়া না করিয়াও যদি ছাত্রের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজন হয় তাহাও করিতে হইবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাহার লেখাপড়ার কাল নিরূপিত করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বেশীক্ষণ পড়ায় অতিবাহিত করা অন্যায়। যক্ষ্মার সন্দেহ হইলেই তরুণ অবস্থা হইতে অভিভাবকের কর্ত্তব্য ছাত্রকে কিছুকালের জন্য বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া এবং অবস্থা চরমে পরিণত হইল তাহাকে একেবারেই বিদ্যালয় ত্যাগ করান; এরূপ করিলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার ইচ্ছামত যে কোন সহজসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সুযোগ পাইবে। ব্যায়াম চর্চ্চা ও অভ্যাস করান দরকার। ময়দান ও Parkএ উন্মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করা প্রত্যেক ছাত্রেরই প্রয়োজন, সুস্থ অবস্থায় প্রত্যহ তিন ঘণ্টা এবং রুগ্ন অবস্থায় অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিমিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের অনুকূল এইজন্য প্রত্যেক অভিভাবকের দৃষ্টি রাখা উচিত যে তাহার পুত্র প্রত্যহ বাটিতে অথবা বাহিরে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেছে কি না। কিন্তু কয়েক প্রকারের রোগ, যেমন বুকের অসুখ ইত্যাদিতে খুব অল্প পরিমাণে ব্যায়ামই উপকারী, মাত্রা বাড়াইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। নিয়মিত ভোজন অন্ততঃ যাহারা পেটের অসুখে ভোগে তাহাদের সর্ব্বদাই উচিত। ভ্রমণ ও নদীতে স্নান এই রোগে অনেক উপকার করে; তবে রোগ পুরাতন হইলে স্থান পরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে উপকার দর্শে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার এরূপ পদ্ধতি প্রচলিত হইলে তবেই মহোপকার সাধিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসর যাবৎ Collegeএ এই প্রথার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সংবাদ প্রচার করেন তাহাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, গোড়ায় গলদ রহিয়াছে; প্রথম Schoolই বাদ গিয়াছে, কারণ, এটাই বরং স্বাভাবিক যে প্রথমে Schoolএ তারপর Collegeএ এই প্রথার অনুষ্ঠান করা উচিত ছিল, যেহেতু School শেষ করিয়া তবে Collegeএ যোগদান করিতে পারা যায়; আর তাহা ছাড়া Schoolএর বয়সে

যদি গোড়া হইতে দোষ সকল সংশোধন করা যায় তাহা শীঘ্রে ও সহজেই নির্ম্মূল হয়। যাহা হউক Bengal Govt.এর Public Health Depth কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতার Govt. ও Govt.-Aided School সমূহে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সম্প্রতি Public Instruction Deptt. (Bengal) সমস্ত District ও Sub-divisional Schoolএ এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত এক আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। দেখাদেখি Calcutta Corporationএর কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন। বহু Private Schoolও ইতিমধ্যে আপনা হইতেই এ কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। জাতিকে শারীরিক সুগঠিত করিতে হইলে এখন হইতে যাহাতে এই প্রথার সুপ্রচার হয় তাহা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

কলিকাতা স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

(শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম্. এ. বি. এল্.)

কলিকাতা সহরে চৌরঙ্গীতে অবস্থিত ভারতীয় মিউজিয়াম (যাদুঘর) সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত। সহরের সকল পল্লী হইতে ট্রাম বা বাস-যোগে এই স্থানে আসা যাইতে পারে। আগামী ২৭এ ফেব্রুয়ারি হইতে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা 'স্বাস্থ-প্রদর্শনী" এইখানে খোলা থাকিবে যাদুঘরের মহানুভব ট্রাষ্টীদিগকে সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। "স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী"র উপযুক্ত স্থান—যাদুঘর। ইহাতে স্বাস্থ্য ও ব্যাধি বিষয়ক অনেক চিত্রাদি আছে। যাদুঘরের প্রশস্ত বারান্দা "স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী"র চিত্রপট ও মডেল প্রভৃতি রাখিবার অতি উপযোগী হইবে। আশা করা যায় যে, Zoological Survey of Indiaর ডিরেক্টার বাহাদুর, কর্ণেল Sewell যাদুঘরে রক্ষিত কতকগুলি মডেল দিয়া প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবেন। প্রদর্শনী যতদিন থাকিবে প্রত্যেক দিনই উপরের বক্তৃতা-কক্ষে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দেওয়া ও চলচ্চিত্র দেখানো চলিবে! প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টার সময় যাদুঘরের প্রাঙ্গণে চলচ্চিত্রে দেখানো হইবে।

যাদুঘরে মানবজাতির কার্য্যাবলীর ধারা রক্ষিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর প্রতি সাধারণের হৃদয়ে সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগাইয়া তুলিতেছে। সুতরাং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা যাদুঘরের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নয়। প্রকৃতির অভিলাষ যে, প্রত্যেক নর-নারী ও শিশু সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হয়; কিন্তু তিনি চান যে তাহারা জীবন-পথের পাথেয় তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করে। নর-নারী ও বালক-বালিকাগণ যাহাতে প্রকৃতির বিস্ময়কর

নিয়মাবলী শিখিয়া সেই জ্ঞান প্রয়োগে নিজেদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিতে পারে ও জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে—"স্বাস্থ্য প্রদর্শনী"র তাহাই উদ্দেশ্য।

আগামী ২৭এ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৩৷টায় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুরের উপস্থিতিতে অনারেবল্ লেডী জ্যাক্‌সন কর্ত্তৃক "স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী" খোলা হইবে। শীঘ্রই দ্রষ্টব্য-তালিকা ও বক্তৃতাদির বিষয় ও সময় সাধারণে প্রচারিত হইবে।

Mrs. A. D. Stewart, 10, Middleton Street, প্রদর্শনীর অবৈতনিক সম্পাদিকা রূপে কাজ করিতেছেন। তিনি প্রদর্শনী-সংক্রান্ত যে-কোনোরূপ সাহায্য সাদরে গ্রহণ করিবেন ও সানন্দে যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

বিবিধ

হর্লিকের ক্যালেণ্ডার ঃ—

১৯৩১ সালের ক্যালেণ্ডারগুলির মধ্যে Horlick's Malted Milk Company Ltd.এর ক্যালেণ্ডারখানি নিশ্চয়ই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহাতে সম্রাট আকবরের ফতেপুর সিক্রি প্রাসাদের রজনী-দৃশ্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। রামধনু-রঙা আলোর ছটা রাজসভাকে ইন্দ্রপুরীর শোভা দিয়াছে। এইরূপ সভায় আসীন হইয়া সম্রাট আকবর বিবিধ জাতি ও ধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিনিধিদের কাছে রাজনীতি ব্যাখ্যা করিতেন। সম্রাট আকবরের Magna Charta নামে অভিহিত—"কুত্‌বা" এই রঙীন্ চিত্রের নাম। ছবির নীচের বর্ণনা বর্ত্তমান সালে ভারতীয় রাজনীতি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৩০ সালের গোলযোগ হইতে শিল্পী আমাদিগের দৃষ্টি ১৫৭৯ সালে ফতেপুরে সিক্রির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। সে যুগের যে মহানুভবতা ও সহন-নীতি তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত শিল্পী এই চিত্রে দিয়াছেন। আধুনিক যুগের ভারতবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, ফতেপুর সিক্রি সহর ভীষণ উত্তাপের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এখনও এখানে খুব বেশী লোকের বাস নাই। ভারতে Diarchyর কথা এই সংস্পর্শে মনে পড়া আশ্চর্য্য নয়। পরে আগ্রায় আকবরের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই "আগ্রা" নামটির অর্থ 'সুলক্ষণ' ও 'অগ্রগামী' এই অর্থও ইহার হইতে পারে। আগ্রার গৌরব অস্তে রাজধানী দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও যেমন আকবরের সময়ে ও তেমনি পাঞ্জাব ভারতবর্ষকে সৈন্যবল দ্বারা রক্ষা করিতেছিল তাহার কিন্তু "দিল্লীর" অর্থাৎ 'পৃথিবীর নাভিদেশ' ছিল "চৌযুগি।' বরাবর তাহাই হউক!

সার ভিক্টর সেসুনের দান ঃ—

সার ভিক্টর সেসুন নিম্নলিখিত কার্য্য সমূহের জন্য লেডী আরউইনের হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(১) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কলেজের জন্য ৫০ হাজার।

(২) নূতন দিল্লী খৃষ্টীয় নারী সমিতির জন্য ৩০ হাজার।

(৩) লেডী মিণ্টোর ইণ্ডিয়ান নার্সিং এসোসিয়েশনের জন্য ১০ হাজার।

(৪) লেডী আরউইন টিউবারকুলোসিস স্যানাটোরিয়ামের জন্য ১০ হাজার।

পরলোকে পণ্ডিত মতিলাল ঃ—

আজ ভারতবর্ষের গগন হইতে আর একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ইহজগতে নাই। ভারতের এই দুর্দ্দিনে যখন চারিদিক গভীর মেঘাচ্ছন্ন এবং সকলেই শান্তি প্রয়াসী মতিলালও অশান্ত হৃদয়ে আমাদের কঠিন সমস্যার ভিতর ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র জওয়াহির লাল নেহেরু আশা করা যায় পরলোকগত পিতার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া সকলের কল্যাণ ভাজন হইবেন। তিনি জন্মিয়াছেন ৬ই মে ১৮৬১ সালে ও ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একাধারে ভোগী ও ত্যাগী ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁহার পরিবার বর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

যাদবপুর টিউবারকুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম—কলিকাতা চিকিৎসা সাহায্য এবং গবেষণা সমিতি জনসাধারণের জ্ঞাপনার্থে জানাইতেছেন যে যাদবপুর যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার্থ যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ৫০ জন রোগী আসিয়া চিকিৎসা করাতে পারে এতদনুপাতে স্থান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুপানীয় জল ও বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থা সুন্দরভাবে করা হইয়াছে। চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত করা হইতেছে। যাদবপুর কলিকাতা হইতে মাত্র ছয় মাইল। যাঁহারা যাদবপুরে চিকিৎসা করাইতে চাহেন তাঁহারা সেক্রেটারী ৬।এ কর্পোরেশন ষ্ট্রীটএ আবেদন করিলে সব জানিতে পারিবেন।

শোকাবহ দুর্ঘটনা—আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক সিটি কলেজের একটি ছাত্রের দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর সংবাদ সাধারণের নিকট জানাইতেছি। গত মঙ্গলবার ৩রা ফেব্রুয়ারী যখন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত, তাঁহা স্ত্রী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলিকাতা আসিয়া পৌঁছান। তখন হাওড়া ষ্টেষনে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে বহু লোকের সমাগম হয়। সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলিয়া যেমন রেলগাড়ীতে উঠিতে যাইবে দুর্ভাগ্যবশতঃ রেলগাড়ী ও প্লাটফরমের মধ্যে পড়িয়া আহত হন। তখনও রেলগাড়ী আসে নাই; সেন গুপ্তকে দেখিবার অত্যধিক আগ্রহবশতঃ সে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ভিতর পড়ে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাওড়া হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় ও মৃত্যু ঘটে। ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য ও তাহার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন যেন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া শান্তি পান ও শোকে অভিভূত হইয়া না পড়েন তজ্জন্য প্রার্থনা করি।

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি,
(সত্বাধিকারী)

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtallah Street, Calcutta.

HEALTH.

(Bengali)

৩য় সংখ্যা বৈশাখ—April

স্বাস্থ্য

প্রতি সংখ্যা ।৵০

বার্ষিক

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল ও

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল্. এ. এম্. এম্

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PLASMO
ΠΛΑΣΜΟΝ

সূচী

নবম বর্ষ] বৈশাখ—১৩৩৮। [৩য় সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা

ডাঃ শ্রীসুন্দরী মোহন দাস, M. B.
প্রিন্সিপাল, জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়

এই যুগে শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না ছাত্র কি ছাত্রীর মুখ দেখবার, কিম্বা তাদের সুখ অসুখ আহার বিহারের খবর নেবার। ক্লাসে এসেই ডাক "নম্বর ১?"; "হাজির মশাই"। "নম্বর ২?"; "হাজির মশাই"। বোর্ডিং ছাড়া ক্লাসে, নাম ধামের সঙ্গে সম্পর্ক অতি স্বল্প শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী রেখে থাকেন। ব্যক্তিগত ভাবে তার শারীরিক বা মানসিক অভাব অভিযোগের সংবাদ রাখার সময় নাই। মাস শেষ করে হবে; মাসের প্রথমে বেতন আদায় ক'রে কেমন ক'রে বিল বা ঋণ পরিশোধ হবে; বৎসরান্তে পরীক্ষার ঘোঁড় দৌড়ে ছাত্র ছাত্রীরা অন্য স্কুলকে কি ক'রে হারাবে, পোনর আনা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সেই ভাবনা। ঘোঁড় দৌড়ের মাঠে ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে মরুক বা হাত পা ভাঙ্গুক, তাহাতে ক্ষতি কি?

সে কালে গুরুশিষ্যের মধ্যে একটা প্রাণের যোগ ছিল। মাসে মাসে আর্থিক লেনা-দেনার সম্পর্ক ছিল না। শিষ্যের শরীর ও মনের কথা গুরুকে ভাবিতে হইত। পাঠ শেষ হলে শিষ্যের নিকট গুরুদক্ষিণা নেওয়া হত। ভক্তি পরীক্ষার জন্য অনেক সময় কোন একটা অসমসাহসিক কাজ করিতে বলা হত।

কৃষ্ণ বলরামের পাঠ সমাপ্ত হ'লে গুরুকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তাঁর কি চাই। গুরু বলিলেন: "তোমাদের গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর।" গুরুপত্নী চাহিলেন না ধনসম্পদ বা রাজৈশ্বর্য্য। তিনি বলিলেন "আমার পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়েছে। তাকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।"

কৃষ্ণ বলরাম চলিলেন ধনুর্ব্বাণ হস্তে।

সমুদ্রের তলায় যমালয়। কৃষ্ণ বলরাম তীরে গিয়ে ধনুকে টঙ্কার দিবামাত্র জলে বাস করিত যে অসুর, যে গুরুপুত্রকে গ্রাস করেছিল, সে তেড়ে মেরে এসে উপস্থিত। তাকে বধ করে, যখন তাঁরা যমালয়ে প্রবেশ করিলেন, "কৃতার্থ হলাম, কৃতার্থ হলাম" বলে যম তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন এবং প্রার্থনা অনুসারে গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই আখ্যায়িকার মর্ম্ম কি? প্রত্যেক নারীকে ঐ গুরুপত্নী হতে হবে। "চাই না ঐশ্বর্য্য, চাই না ধন; বৎসর বৎসর এই বাংলা দেশে যে ২॥ লক্ষ শিশু জন্মের এক বৎসরের মধ্যে মারা যাচ্চে তাদের ফিরিয়ে আনা চাই।" "না থাকতে পারে তার ভিতর আমার শিশুটী; আমার ভাই বোন প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর ছেলে ত আছে। এই প্রকারে প্রতি বৎসরে কি তারা মায়ের কোল আঁধার করে চলে যাবে? হে শিক্ষিত ও শিক্ষিতা মণ্ডলী! তোমাদের নিকটে এই কর্ত্তব্য দাবি করিতেছি। প্রয়োজন হবে না ধনুর্ব্বাণের। প্রয়োজন শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানের।" এই কথা পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বলা চাই। যতক্ষণ না কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগ্রত হয়েছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্য গৃহস্থকে বলা এই বিষয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য। নিউজিলণ্ড দ্বীপে পূর্ব্বে শিশু মড়ক ছিল। জনৈক ডাক্তারের স্ত্রীর উৎসাহে একটী সমিতি গঠিত হয়েছিল। তাঁরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পোয়াতি ও নবজাত শিশুদের তত্ত্বাবধান করতেন। গর্ভের সময়, প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর এইরূপ তত্ত্বাবধানের ফলে তাঁদের দেশে শিশু মড়ক কমে গিয়ে এখন হাজারে ৫০এর নীচে নেমেছে। আমেরিকায় ৬৫রও কম। তার কারণ কি? তার কারণ সকলের মিলিত চেষ্টা। ঘর কন্নার কথা? সে দেশের মেয়েরাও ঘর কন্না করেন—তবে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের কাজ সেরে দেশের কাজ করেন। বত্রিশ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করবার জন্য সারাদিন হাঁড়ি কুঁড়ির ভিতর কাল যাপন করেন না। নানাস্থানে সমিতি গঠন করে তাঁরা শিশু ও প্রসূতির অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেন।

কলিকাতার স্বাস্থ্য বিবরণী পাঠ করিলে জানা যায়, শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ:—

জন্মগত দুর্ব্বলতা	...	শতকরা	২০
অপূরন্ত দোষ	...	"	১১
কাস রোগ	...	"	২০
ধনুষ্টঙ্কার	...	"	১০
পেটের অসুখ	...	"	৫
এক মাসের কম বয়স্ক শিশুর মৃত্যু		"	৫০
১-২ মাসের শিশুর কাস রোগে মৃত্যু		"	৫০

আর জানা যায় পূর্ব্বে শিশুমৃত্যু সংখ্যা ছিল বছরে ৭০০০; মৃত্যুহার ছিল হাজারে প্রায় ৩৫০। স্বাস্থ্য বিভাগের চেষ্টার দরুণ, ধাত্রীকেন্দ্র ও পোয়াতি হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দরুণ এবং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতির স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের দরুণ মৃত্যু সংখ্যা ও মৃত্যুহার কমে গিয়েছে।

আদত কলিকাতায় শিশু মৃত্যু সংখ্যা ছিল—

১৯২৬ সালে—৫॥ হাজার

১৯২৯ " —৪॥ হাজারের কিছু বেশী

মৃত্যুহার ছিল—

১৯২৬ সাল	হাজারে ৩৪৭
১৯২৯ "	" ২৪৫

চেষ্টায় কি না হয়। হাজারে ১০০ ছেলে বাঁচান কি কম কথা?

জন্মগত দুর্ব্বলতা এবং অপূরন্ত দোষে শতকরা ৩১টী ছেলে মারা যায়। তা ছাড়া বাংলা দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪ লক্ষ গর্ভ নষ্ট হয়। কেন? পোয়াতির রোগ ও দুর্ব্বলতা তার কারণ। প্রধান রোগ ম্যালেরিয়া ও গরমি। সময় মত চিকিৎসা ক'রে পোয়াতি ও গর্ভস্থ শিশুকে বাঁচান গিয়েছে গর্ভাবস্থায় কোন ঔষধ খেতে নাই, এসব মূর্খের কথা; কোন শাস্ত্রে নাই।

দুর্ব্বলতার কারণ ভাল খাওয়া ও হাওয়ার অভাব। দারিদ্রের দোহাই দিলে চলে না। একটু বুঝে সুজে চললে আর খেলে খাওয়ার জন্য বেশী খরচ করতে হয় না। বাজে খরচ কমাতে হয়।

প্রতিদিন ফেন না ফেলে ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত ৩ ছটাক; জাঁতায় ভাঙ্গা আটা (রুটি) ৫ ছটাক দাল ১॥ ছটাক, মাছ ২॥ ছটাক, আলু বা মানকচু ২ ছটাক, কিছু তেল নুন; পালং প্রভৃতি শাকের সূপ; টাটকা ফল, অঙ্কুরিত ছোলা ও গুড় নারিকেল, মুড়ী, চিড়ে; এই সব বোধ হয় গৃহস্থ মাত্রই পোয়াতির জন্য যোগাতে পারেন। দুধ ঘি দিলে আরও ভাল হয়।

শাক সব্জী, ইলিস প্রভৃতি মাছের তেল ও মেটে, ঘি, মাখন, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর মুগ, সীম আর ঢেঁকি ছাঁটা (লাল) চাল, জাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা, ফল কমলালেবু ও সব রকম লেবু, বিলাতি বেগুণ, দাল, বাঁধা কপি, কপি, মুলো, বেগুণ, শালগম, মাছ, প্রভৃতি খেলে রিকেট (হাঁড়বাঁকা), বেরিবেরি, স্কার্ভি (দাঁতে নাকে মুখে রক্ত পড়া) প্রভৃতি রোগ হয় না। এই সকলের মধ্যে ভাইটামীন নামক পুষ্টিকর দ্রব্য থাকে। চিনির মধ্যে তা থাকেনা, গুড়ে থাকে। আমেরিকায় চিনির পরিবর্ত্তে গুড় দিয়ে দেখা গিয়েছে, স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে। চায়ের ভিতর পোষ্টাই কিছুই নাই। গম কড়া ভেজে গুঁড়ো করে চায়ের মতন গুড় ও দুধ দিয়ে খেলে বরং উপকার হয়। বিস্কুট পুষ্টিকর নয়, বরং অনিষ্টকর। নারিকেল মুড়ী চিঁড়ে ভাজা প্রভৃতি পুষ্টিকর ও শক্ত জিনিস খেয়ে দাঁত চোয়াল শক্ত হত; বিস্কুট এসে সে সব জিনিস ভুলিয়ে দিয়েছে। এই সব জিনিস খেয়ে প্রতিদিন খানিক সূর্য্যের আলো ভোগ করলে রোগ সহজে আক্রমণ করিতে পারেনা।

ভগবানের বাতাস ও আলো ইচ্ছা ক'রে বন্ধ না রাখলেই পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে রান্নার ধুঁয়া বেরুবার জন্য যদি পথ রাখা যায় (লম্বা চোং) অন্ধি সন্ধি বন্ধ না ক'রে যদি থাকা কি শোওয়া যায়, এক সঙ্গে মেলাই লোক যদি না শোয়, তা হ'লে কি ভাল বাতাস পাওয়া যায় না? প্রতিদিন পোয়াতিকে কি খোলা বাতাসে বেড়াতে দিতে পারা যায় না? হিন্দু কি মুসলমানের কোন শাস্ত্রে অবরোধ প্রথার ব্যবস্থা নাই!

ধনুষ্টঙ্কারে এত লোক মারা যায় কেন? এখনও মূর্খ দাইয়েরা নাড়ী কাটার কাঁচি জলে সিদ্ধ না করে ব্যবহার করে এবং টিংচার আইওডিনে হাত শোধন না ক'রে নাড়ীতে হাত দেয়, তাই এই রোগ হয়। ডাক্তারও শিক্ষিত দাইয়ের হাতে এবং পোয়াতি হাঁসপাতালে প্রায় ১০,০০০ ছেলে প্রসব হয় তাদের একটীরও ঐ রোগ হয় না। বাকী ৯,০০০ ছেলে মূর্খ দাইদের হাতে হয়, তাদের ভিতর ৯০০এর (অর্থাৎ শতকরা ১০টী) উপর ছেলে ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়। তবু কি চৈতন্য হবে না?

পেটের অসুখে এ দেশে শিশু-মৃত্যু কম, কারণ মা লক্ষ্মীরা জানেন তাঁদের স্তনে ছেলেদের **অমৃত**। কিন্তু এই অমৃত হলাহল হয় যদি মায়েদের আহার বিহারে সংযম না থাকে। যা তা খেয়ে, যেখানে সেখানে আমোদ প্রমোদে রাত কাটিয়ে, কিম্বা কথায় কথায় রাগে জ্বলে, যে স্তন্যদুগ্ধ দেওয়া যায়, শিশুর পক্ষে তা বিষের মত কাজ করে। সদা সুপ্রসন্ন ও সুসংযত মায়ের স্তনে যে অমৃত থাকে তারই গুণে শিশু রোগ ও মৃত্যুকে পরাজয় করে। পেটের অসুখ হয় সেই সব শিশুর যাদের মা মারা যায়, কি রুগ্ন হয়। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর সূতিকা সংক্রান্ত রোগে প্রায় ৩০,০০০ পোয়াতি মারা যায়। তাদের ছেলেরা অনিয়মে ঢোকা দুধ খেয়ে মারা যায়, অথবা এলেনবারী, মেলিন্স ফুড্ প্রভৃতি টিনে ভরা বিলাতি দুধ খেয়ে রিকেট্ বা হাড়-বাঁকা রোগে ভুগে আজন্ম অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকে।

খারাপ খাবার বা জল খাওয়ার দরুণ ও শিশুদের রোগ ও মৃত্যু হয়। বিস্কুটের মতন নরম ও অপুষ্টিকর জিনিস খেয়ে ছেলেদের চোয়াল নরম হয় এবং দাঁত নষ্ট হয়। দাঁত ও মাড়ী নষ্ট হইলে স্বাস্থ্য-হীন হয়। এই প্রকার স্বাস্থ্য-হানির জন্য বোয়ার যুদ্ধের সময় বিলাতে বহু সৈন্যপদ-প্রার্থীকে অনাবশ্যক মনে করা হয়েছিল। এ কথা আগেই বলেছি, মাছি খাবারে বসিলে ঐ খাবার বিষাক্ত হয়। ছোট ছেলেকে ফোটান জল ঠাণ্ডা ক'রে খেতে দেওয়া উচিত। গুরু-দক্ষিণা আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে কৃষ্ণ বলরাম জলের অসুরকে মেরে গুরুপুত্রকে যমালয় থেকে উদ্ধার করেছিলেন। জলে বাস্তবিক অসুর থাকে; কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজাণু এই মারাত্মক অসুর। জল ফোটালে তারা মারা যায়।

পোয়াতি ও শিশুদের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এই প্রকার সাবধান হ'তে বলবার জন্য স্থানে স্থানে সমিতি ও ধাত্রীকেন্দ্র গঠন করা আবশ্যক। আর আবশ্যক প্রত্যেক মায়ের এই কথা ছেলেদের বলা: "শ্রীকৃষ্ণের গুরু-পত্নীর মতন আমরাও চাই তোমরা বৎসরে বৎসরে ঐ আড়াই লক্ষ শিশুকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আন। পুরাকালের গুরুদের মতন আমরাও তোমাদিগকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেছি এবং প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছি। চাইনা টাকা কড়ি। চাই এই গুরুদক্ষিণা—শিশুহত্যা ও মাতৃহত্যা নিবারণ করা।"

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার ঘরে ঘরে জাগরণ হ'লে আবার জন্মাবে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সেই প্রতাপাদিত্য, সেই কেদার রায়, সেই সোনামণি, সেই সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ বাঙ্গালী বীর, ইতিহাস এখনও যাদের গুণগান করে।

মেয়েদের মধ্যে জাগরণ এসেছে। এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব সমাধানের জন্য তাঁহাদের শক্তি নিয়োজিত হোক। রোগ-শোক-দারিদ্র-ক্লিষ্টা বঙ্গমাতার গৃহ আবার সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম সন্তানদের আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হউক। ভগবান সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

মশা ও মাছি

মানবের শত্রুর সংখ্যা নাই। আকাশে বজ্র, ভূমিতলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু। জলে হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি নানাবিধ ভয়ানক জন্তু সুবিধা পাইলেই মানবের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র প্রাণীগণও মানবের প্রাণনাশ করিতে সক্ষম। সাক্ষাৎভাবে হয়ত তাহারা আমাদের প্রাণনাশ করেনা, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাহাদের কার্য্যদ্বারা মানব ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক ব্যাধি সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। মশক ও মক্ষিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু ইহারা মানবের যে কত অনিষ্টকারী তাহা চিন্তা করিলে মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। প্রথম মাছির কথা লইয়া আলোচনা করা যাউক। মাছির উৎপত্তি-স্থান আবর্জ্জনা ও ময়লা। সহরের যে সব স্থানে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা রাশি সঞ্চিত থাকে এবং পল্লীগ্রামের যে সব স্থানে গলিত গোময় প্রভৃতি দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে তাহাই মানবের এই প্রবল শত্রুর জন্মস্থান। এই সব দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মক্ষিকা শাবক সমূহ ঐ সব স্বাস্থ্যকারজনক খাদ্য খাইয়া বর্দ্ধিত হয়। যেস্থানে দুর্গন্ধময় পচা জিনিষ আশ্রয় পায়, মক্ষিকাও দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়া থাকে। মক্ষিকার উদরের অভ্যন্তরে একটী থলি থাকে, এই থলি মানবের প্রাণনাশকারী বিষময় ও পচা সঞ্চিত খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকে; মক্ষিকা অবসর মত তাহা বহির্গত করিয়া ভক্ষণ করে। মক্ষিকার ছয়টী পদ আছে ঐ পদসমূহের ধারে ধারে অতি সুক্ষ্ম লোমরাশি বর্ত্তমান আছে। যখন মক্ষিকা কোনও গলিত, বা দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনারাশির উপর অবতরণ করিয়া ঐ প্রিয় খাদ্য ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকে, তখন ঐ খাদ্যের বা আবর্জ্জনার কতকাংশ উহার পদসমূহের সুক্ষ্মলোম রাশিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মক্ষিকা কেবল আবর্জ্জনার উপরেই অবতরণ করেনা। মনুষ্যগণ যে সমস্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে, সে সমস্তই মক্ষিকার প্রিয়খাদ্য। আবর্জ্জনা হইতে মক্ষিকাসমূহ উড়িয়া আসিয়া মানবের খাদ্যের উপর বসিয়া থাকে; অবশ্য তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিবে বলিয়া এরূপ কার্য্য করেনা; কিন্তু তাহাদের এই অভ্যাস জন্য কতলোক যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। পদের চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ বিষময় পদার্থ আমাদের খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়; ঐরূপ গলিত ও দুর্গন্ধময় খাদ্যাংশে মানবের প্রাণহন্তারক কোটী কোটী জীবাণু বর্ত্তমান থাকে। খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইলে তাহারা নানাবিধ সাংঘাতিক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। মক্ষিকা যদি বিসূচিকা বা কলেরা রোগগ্রস্থ ব্যক্তির বমনের বা বিষ্ঠার উপর উপবেশন করে, তবে তাহার পদে ঐ দূষিত পদার্থ লাগিয়া যায়; পরে যখন

কোন মানবের খাদ্যের উপর উপবেশন করে, তখন ঐ ভীষণ জীবাণু-সম্বলিত বমন বা বিষ্ঠা মানবের খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশিয়া যায়। অজ্ঞ মানব নিশ্চিন্তমনে ভক্ষণ করিলে ঐ ভীষণ প্রাণনাশকারী জীবাণুসমূহ তাহার উদরস্থ হয়। পাকস্থলীতে তাহারা অতি-সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য জীবাণুতে পরিণত হয়। বিসূচিকা বা কলেরা রোগীর জীবাণু উদরস্থ করিলে তাহরা এত শীঘ্র অসংখ্য পরমাণুতে পরিণত হয় যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। রক্তামাশায় রোগের বিষ্ঠার উপর মক্ষিকা বিচরণ করিয়া যখন মানুষের খাদ্যের উপর উপবেশন করে, তখন আমাশায়ের জীবাণু উদরস্থ করিয়া মানব ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। পদসমূহে নানারূপ বিষাক্ত ও দূষিত পদার্থ বহন করিয়া মক্ষিকা একস্থান হইতে অন্যস্থানে এবং একব্যক্তির খাদ্য হইতে অন্যব্যক্তির খাদ্যে বিচরণ করিয়া সংক্রামক রোগের বিস্তার করিয়া থাকে। বিউবনিক প্লেগ অতি সাংঘাতিক ব্যাধি একথা সকলেই অবগত আছেন। মূষিক এই রোগগ্রস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে একজাতীয় মক্ষিকা ঐ মৃত ইন্দুরের উপর কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া থাকে এবং তাহার দেহ হইতে রোগের বীজ সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যকে দংশন করিবার সময় তাহার দেহে ঐ রোগের বীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলেই এই ভীষণ রোগ দেখা দিয়া থাকে। মক্ষিকা যে মানবকুলের প্রধান শত্রু সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। খাদ্যে মাছি বসিলে তাহা কিছুতেই ভক্ষণ করা উচিত নয়; এরূপ খাদ্য খাইলে নানাবিধ কঠিন রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। বালক বালিকা-গণকে এবিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোথায় বিপদ লুক্কাইত আছে তাহা জানিতে পারিলে তাহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারে। বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে যাহাতে আবর্জ্জনা জমিতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ দুর্গন্ধযুক্ত ও গলিত আবর্জ্জনা হইতেই মক্ষিকার উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এসব আবর্জ্জনা-পূর্ণ স্থানে মক্ষিকা ডিম্ব প্রসব করে এবং ডিম্বসমূহ হইতে মক্ষিকাশাবক উদ্গত হইয়া ঐ গলিত আবর্জ্জনা রাশিই খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। মক্ষিকাকুল তোমার শত্রু তুমি তাহাদিগকে সংহারের ব্যবস্থা না করিলে তাহারা তোমাকে সংহার করিবে।

এই কলিকাতা সহরে একসময় মক্ষিকাকুলের বড়ই উপদ্রপ ছিল। সে সময়ে (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) সহরের স্বাস্থ্য এত আশঙ্কাজনক ছিল যে লোক একপ্রকার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতা সহরে আগমন করিত। মশা ও মাছির উপদ্রবে সহরে বাস করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যখন একজন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর, কলিকাতায় আসিয়া কেমন আছ?" বালক কবি উত্তর দিয়াছিলেন, "রাতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি।" পরীক্ষা করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, যেবৎসর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মক্ষিকাকুলের বিশেষ উপদ্রব লক্ষিত হয়, সে বৎসর সহরে সংক্রামক রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

মশক বা মশা যে আমাদের কিরূপ প্রবল শত্রু তাহা অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন। আজ যে ম্যালেরিয়া জ্বরে বাঙ্গলা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে সে ম্যালেরিয়া জনয়িতা এক প্রকার মশা। এই মশার নাম এনোফিলিস (Anopheles) এই মশা জল

পাইলেই তাহাতে ডিম পাড়িয়া থাকে। যে সকল পুকুরের জলে অপরিষ্কার বস্তু বর্ত্তমান থাকে সেই সব জলে দুর্গন্ধময় খানা ডোবায় এই এনোফিলিস মশা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বাটীর চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনারাশির মধ্যে যে সমস্ত টিনের কৌটা, ডিসভাঙ্গা, বাটীভাঙ্গা পড়িয়া থাকে বর্ষার জল তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ জমিলেই মশককুল তাহাতে ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম হইতে ছানা বাহির হইয়া কিছুদিন পরে লম্বা কীটের আকার ধারণ করে; ঐ সমস্ত মশকশিশু অনবরত জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না; নিশ্বাস লইবার জন্য উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জলের উপরিভাগে আসিতে হয়। অতএব যে সমস্ত ডোবায় বা পুকুরে এইরূপ মশকশাবক জন্মগ্রহণ করে, তাহার উপরে লাল বা অপরিষ্কৃত কেরোসিন ঢালিয়া দিলে ঐসব মশকশাবক বিনষ্ট হয়। তৈল জলের উপর ভাসমান থাকিয়া একটা পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে; মশকশাবক নিঃশ্বাস লইবার জন্য উপরে উঠিলে উহার মুখে কেরোসিন তৈল লাগিবামাত্র জলে ডুবিয়া যায়; নিঃশ্বাস লইতে পারে না। এইরূপে দুই চারিবার নিঃশ্বাস লইতে না পারিলে মশকশাবক সমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে পুষ্করিণীতে মাছ থাকিলে ঐরূপ করিলে মাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এনোফিলিস মশা চিনিবার সহজ উপায় আছে। উহারা দেওয়ালের গাত্রে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং উহাদের পুচ্ছদেশ একটু উর্দ্ধদিকে উঠাইয়া থাকে। কিউলেক্স জাতীয় মশা পৃষ্ঠদেশ উঁচু করিয়া কুব্জভাবে অবস্থান করে। পীতজ্বর, ম্যালেরিয়াজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর এবং Filariasi—এই চতুর্বিবধ ব্যাধির বিস্তারের জন্য মশককুল দায়ী। Stegomyia নামক মশা পীতজ্বর বিস্তার করিয়া থাকে। এই মশা প্রায় গৃহে বা বাটীর চতুর্দ্দিকে কোন পাত্রে বেশীদিন ধরিয়া জল জমিয়া থাকিলে তাহাতে ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু এনোফিলিস অধিকাংশস্থলে বিস্তৃত জলভূমিতে (Swamps) ডিম্ব প্রসব করে এবং নিজ বাসস্থান হইতে বহুদূরে উড়িয়া যাইতে পারে। Stegomyia মশক গৃহের অভ্যন্তরে বা গৃহের চতুর্দ্দিকে বসবাস করে বলিয়া উহাদিগকে বিনষ্ট করা সহজ; কিন্তু Anopheles মশককে তত সহজে বিনাশ করা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজবহনকারী মশক নিঃশব্দে আগমন করিয়া প্রাণীসমূহকে আক্রমণ করে, উহাদের পক্ষ হইতে গুণ গুণ শব্দ বহির্গত হয় না। এই মশককুল সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রে শীকার করিতে বহির্গত হয়; উজ্জ্বল দিবালোকে প্রায় শীকার অন্বেষণে বাহির হয় না। রাত্রে মশারীর ভিতর নিদ্রাগমন ব্যতীত ইহাদের দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার বিশেষ উপায় নাই। একটা মৃৎ-পাত্রে আলকাতরা লইয়া উহাতে জল মিশাইয়া গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার বন্ধ করিয়া, সামান্য একটু জানালা খুলিয়া রাখিয়া ঐ আলকাতরাযুক্ত পাত্র গৃহের অভ্যন্তরে ফুটাইলে সমস্ত মশককুল পলাইয়া যায়। তিন চারিদিন পর্য্যন্ত গৃহের ভিতর মশার কোনও উপদ্রব থাকে না। মধ্যে মাঝে এইরূপ করিলে মশার হস্ত হইতে প্রায় পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। যখন গৃহের অভ্যন্তরে আলকাতরা ফুটিতে থাকিবে, তখন যেন কেহ সেই গৃহের অভ্যন্তরে না থাকেন। বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকাগণকে সে স্থান হইতে সরাইয়া আনা বিধেয়। অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে ফুটিবার পর ঘরের দ্বার কিছুক্ষণের জন্য খুলিয়া রাখিয়া তবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করা উচিত।

কেবল মশক কেন, এরূপ করিলে ঐ গৃহে বৃশ্চিক, আরসুলা ও মাকড়সা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের উপদ্রব থাকেনা। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই—যদি সুস্থ দেহে জীবণ ধারণ করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে মাছি ও মশককুলকে যথাসাধ্য বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মাছি ও মশা তোমায় বিনাশ করিবে।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতার একটী কারণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক কথায় ছেলেমেয়েদের এরূপ হীনস্বাস্থ্যের জন্য পিতামাতা বা অভিভাবকগণই দোষী ইহা জোর গলায় বলা যাইতে পারে। আমি ক্রমশঃ তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

আজকাল সকলেই নিজেদের পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া ২৫।৩০ টাকা মাহিনার জন্য সহরের বুকে আস্তানা গাড়িতেছেন। ইহাতে একদিকে যেমন মফঃস্বলের দুর্দ্দশা বাড়িতেছে, অন্যদিকে আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতিও বহুল পরিমাণে ঘটিতেছে। সহরে আসিয়া আমরা স্বাস্থ্য হারাইতেছি এবং যে সমস্ত পুত্র কন্যা জন্মিতেছে তাহারাও সুস্থ ও সবল হইতে পারিতেছে না। বিশুদ্ধ বায়ু, খোলা আলো এবং খাঁটি খাদ্যদ্রব্যই আমাদের সবল ও নীরোগ রাখে। বলা বাহুল্য এই তিনটি অত্যাবশ্যক জিনিষই সহরে পাওয়া দুষ্কর। এজন্য সহরবাসী ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য অনেকাংশে উত্তম। সহরের শিশুমৃত্যুর হার দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিশেষতঃ কলিকাতার অবস্থা বিশেষ ভয়াবহ।

যে সমস্ত ছেলেরা পল্লীগ্রাম হইতে লেখাপড়া শিখিবার জন্য সহরে আগমন করে, তাহাদের অবস্থা একটু আলোচনা করিব। অধিকাংশ ছেলেই সহরে আসিয়া সহরের মোহতে ডুবিয়া থাকে। সহর নানাপ্রকার বিলাসিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ডিপো। আজন্ম পল্লীগ্রামে বা মফঃস্বলে বৰ্দ্ধিত ছেলেরা সহরে আসিয়া নানাপ্রকার বিলাসিতায় এবং কু-অভ্যাসে লিপ্ত হয়। পান বিড়ি চায়ের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় হোটেলে খানা খাইতে অভ্যস্ত হয় এবং ক্রমশঃ প্রমোশন পাইয়া নানা অসভ্য কুসভ্য স্থানে তাহাদের অবাধগতি হইতে থাকে। এইরূপে তাহারা যেমন বাজে অর্থ ব্যয় করে, তেমনি নানা প্রকার মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রমিত হয় অথবা চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যটীকে হারাইয়া বসে। ছেলেরা সহরে আসিয়া এরূপ অধঃপাতে যায় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে অভিভাবকদের দোষ—বিশেষ করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষার দোষ। অনেক সময় অভিভাবকদের অমনোযোগের জন্য অনেক ভাল ছেলেও চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়।

পল্লীগ্রামের ছেলেদের স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণই হইতেছে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি। জন্মের পর হইতেই এই সমস্ত ব্যাধির কবলে পড়িয়া তাহারা স্বাস্থ্য হারাইয়া বসে। প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টাতে এ সমস্ত ব্যাধি দূর করা অনায়াসেই যাইতে পারে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পল্লীবাসীদের শিক্ষা-হীনতা, আলস্যতা এবং দরিদ্রতার জন্য প্রতিকারের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। তারপর আজকাল পল্লীর ধনী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সহরে বাস করিতেছেন; এজন্য পল্লীর উদ্ধারের কোন উপায়ও হইতেছে না। আজ যদি আমরা প্রত্যেকেই এই সমস্ত ব্যাধির প্রতিকার কল্পে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে ভাবী বংশধরেরা আর প্লীহা লীভার প্রভৃতি লইয়া ভুগিতে ভুগিতে অকালে মরিবে না। পল্লী আবার সোনার পল্লীতে পরিণত হইবে। অবশ্য এ কথাগুলি আমরা সকলেই জানি; কিন্তু প্রাণের সহিত বুঝি কি?

পিতামাতা বা অভিভাবকদের দোষ এখন বিশদ-ভাবে বলিব। আজকাল যাঁহারা ছেলেমেয়েদের অভিভাবক বা সন্তানের মাতাপিতা, তাঁহারা নিজেরাই স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা বুঝেন না বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। তাহারা নিজেরাই "তালপাতার সিপাহী"। সুতরাং তাহাদের পুত্রকন্যারাও ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য ইহার অন্য কারণও আছে। গর্ভাবস্থায় মাতার পুষ্টিকর আহারের অভাবেও আমাদের দেশের শিশুরা দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সন্তান মায়ের গর্ভে অবস্থান কালীন মাতার স্বাস্থ্যের এবং আহা-রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত এ জ্ঞান আমাদের দেশে খুব অল্প লোকেরই আছে। আরও দেখা যায় জন্মের পর শিশু উপযুক্ত যত্ন পায় না, খাদ্য পায় না। যেখানে পায় সেখানে মাতাপিতার দোষে মাত্রা অতিক্রম করিয়া শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান পালনে অজ্ঞতা হেতু শিশুকে উপযুক্ত ভাবে লালন পালন করিবার সঙ্গতি থাকিলেও মাতা-পিতারা পুত্রকন্যাদের প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম হন না। তারপর শৈশবকাল হইতে ছেলে-মেয়েরা এরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকে, যাহাতে স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা তাহারা আদৌ বুঝিতে পারে না। স্বাস্থ্যই যে সম্পদ—সংসারে জীবিত থাকিয়া প্রকৃত মনুষ্যপদ-বাচ্য হইতে হইলে—জীবনকে সুখী, উন্নত করিতে হইলে সুস্থ সবল দেহের প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশের পুত্রকন্যারা শিক্ষা পায় না। ছেলেমেয়েরা জন্ম গ্রহণ করে হীনস্বাস্থ্য লইয়া মাতাপিতাকে চিররুগ্ন দেখিতে পায় আর তাহারও ভাবে জীবনের উৎপত্তি এবং পরিসমাপ্তি বুঝি এই ভাবেই হয়। সুস্থ, সবল দেহের আলো তাহারা দেখিতে পায় না; তাহার সন্ধানও কেহ তাহাদের বলিয়া দেয় না। পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই তাহাদের হাতে-খড়ি হইয়া থাকে পরের গোলাম সাজিবার জন্য। শিশুকাল হইতেই পরের গোলাম হইবার জন্য শিশুরা যুবাকাল পর্য্যন্ত যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে না। আজকাল মাতাপিতা পুত্রের শিক্ষা দেন—"বাবা মন দিয়ে পড়। ও পাড়ার তোমার সুরেন দাদাকে দেখেছ ত? সে চাকরী ক'রে ২০০৲ টাকা মাইনে পাচ্ছে, সে তোমার মত বয়স থেকেই মন দিয়ে লেখা পড়া করত; খেলে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করত না। এখন থেকে মন দিয়ে পড়লে তুমিও অত টাকা মাইনের চাকরী পাবে। যাও

পড়গে লক্ষীটী"। পুত্রটী জানিল লেখাপড়া করিয়া চাকরী করাই তাহার জীবনের ব্রত। সেও তাহাতে আপ্রাণ খাটিতে লাগিল। ফল যাহা দাঁড়ায়, তাহা ত' আজ সকলেই চাক্ষুষ দেখিতেছেন। স্বাস্থ্যই যে আমাদের প্রাণ, ধন ; সর্ব্ব প্রথমে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন না লইলে জীবনের সমস্ত জিনিষই বিফলে যায় এরূপ শিক্ষা কোন পিতামাতা পুত্রগণকে দান করেন কি ? অল্প লোকই এরূপ উপদেশ দেন। এইরূপ শিক্ষার অভাবেই পুত্রগণ অসংযমী, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে অথবা অকালে মায়া কাটাইয়া চলিয়া যায়। অনেকে বলেন শৈশবকাল হইতেই ছেলেমেয়েদের পাঠে আসক্তি আনিয়া না দিলে, তাহারা ভবিষ্যতে লেখা-পড়ায় উন্নতি করিতে পারে না। ইহা একটী সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে ছেলেমেয়েদের ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া তাহাদের স্কুলে প্রেরণ করা হয় না। মৌখিক গল্প দ্বারা বস্তু সদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া হয়। সে সমস্ত দেশের মাতাপিতাগণ শিশুকাল হইতেই পুত্রকন্যাদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইয়া দেন এবং স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পরিণাম বুঝাইয়া দেন, ফলে পুত্রকন্যারা শৈশবকাল হইতেই সুস্থ, সবল হইবার চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হয়।

(ক্রমশঃ)

খেলায় স্বাস্থ্য

(শ্রী কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, M.A. B.L.—সৎসঙ্গ আশ্রম)

খেলা সকলেরই প্রিয়। ছেলেমেয়েদের খেলাটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন "বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ, বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।"

খেলা প্রিয়, কারণ ইহাতে Interest আছে রস আছে, আনন্দ আছে। আনন্দময়ের রাজ্যে, আনন্দ সবাই চায়, এবং তাহা সহজভাবে অল্পায়াসে ও আরামে যাহাতে পাওয়া যায় তাই খোঁজে।

সব খেলাতেই অল্পবিস্তর স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ আছে। যে খেলায় মনোযোগ বা Concentration যত বেশী সে খেলায় আনন্দ তত বেশী। খেলার মনোযোগ সব কাজেই লাগান যায়; খেলা একটি যোগ বিশেষ। এই খেলা হইতেই শরীর ও চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় দেহ মনের সমতা ও স্বাস্থ্য লাভ হয়। এই খেলাই ভবিষ্যতে আমাদের চিত্তবৃত্তিনিরোধে সাহায্য করে, মনকে বিষণ্ণতা ও অবসন্নতা হইতে রক্ষা করে। খেলা করা বা খেলা দেখা দুইই ভাল। যাহারা খেলা করার সুবিধা পায়না কিন্তু খেলা দেখে তারাও বেশ Enjoy করে। আমাদের কাজকেও খেলার মত প্রিয়, আনন্দদায়ক ক'রে নেওয়া যেতে পারে। কাজকে খেলার মত সুখের, আরামের কর্ত্তে পাল্লে, আমাদের কার্য্যকরী শক্তি অনেক বেড়ে যায়। কাজে শ্রান্তি বোধ হয় না এবং দেহে কোন ব্যাধির বীজ প্রবেশ ক'রে অনিষ্ট কর্ত্তে পারে না। কাজও খেলায় অভিন্ন জ্ঞান হলে—Work while you work, Play while you play একথা বলা চলেনা, তখন Work is play and play is work হয়ে দাঁড়ায়। কাজের সময় ও লেখাপড়ার সময় মনে অন্য চিন্তা উঁকি ঝুকি মারে, কিন্তু খেলার সময় মন আপন হারা হ'য়ে যায়। তাই খেলাচ্ছলে কাজ খুব ভাল। খেলা খেলিতে আসা এ ভবে—ভগবান লীলাময়—এ সৃষ্টি তাঁর একটি খেলা,

—তিনি নিজে খেলা কর্ত্তে ভালবাসেন তাই তাঁর সৃষ্ট জীব এত খেলা প্রিয়। আমাদের সঙ্গে আদিকাল থেকেই তিনি লুকোচুরি খেল্‌ছেন, খেলার ছলে তাঁর বাঁশীর স্বর আমরা কতই না শুন্‌ছি—শুনে কতই না মোহিত হচ্ছি—এ চোরকে ধরেও ধর্ত্তে পাচ্ছি না। ধল্লেই তো খেলার নেশা ছুটে যায়! খেলা-ঘর ভেঙ্গে যায়!

খেলা চলুক্ রে ভাই চলুক্—খেলা ভাঙ্‌লে আর আমরা কি নিয়ে থাকবো! খেল্‌তে খেল্‌তে যতদিন না সচ্চিদানন্দ পূর্ণানন্দ লাভ হয় ততদিন এ খেলা যেন না ছাড়ি। খেল্‌তে খেল্‌তে একদিন সত্যিকারের খেলা খেলে আমরা Goalএ পৌঁছাব। তখন বুঝ্‌বো মানুষের জন্ম হ'তে প্রিয় খেলাই সত্য—খেলাই মঙ্গল খেলাই নেশা—খেলাই আশা—খেলাই ভালবাসা। খেলার পিয়াসা যেন কখনও মেটে না ভাই!

Education, Duty, Service, Industry, Profession ইত্যাদি খেলার মতন Interesting কর্ত্তে পাল্লে এ সবে আর কোন কষ্ট হয় না। আনন্দের সঙ্গে উপার্জ্জন, Production এর সাথে Recreation হয় Health ও Wealth দুই একত্রে যুগলরূপে দেখা দেয়।

খেলাটা খুব ভাল ও স্বভাবিক Exercise. এতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা হয়, শরীর সবল, সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে। মনে হঠাৎ Depression আসতে পারে না। mind idle ও vacant থাকার অবসর পায় না বলিয়া—খেলা দ্বারা আয়ু, আরোগ্য, পুষ্টি, তুষ্টি ও বল লাভ হয়।

প্রত্যেক খেলা, প্রত্যেক Exercise ও Labour যদি আমরা Productive এবং Creative করে তুল্‌তে পারি—তাহ'লে আমাদের সকল কষ্ট দূর হয়। ইহা দ্বারা জাতি মৃত্যু, ব্যাধি ও ধ্বংস হ'তে রক্ষা পায়। খেলা Organise করা এবং কৌশল দ্বারা খেলার উৎপাদিকা শক্তি বাড়ান, দুইই আবশ্যক। Charity Matchএর খেলার দ্বারা অনেক Charitable Works করা যায়। দেশের অনেক কল্যাণ করা যায়।

খেলা দ্বারা Co-operation এবং Sporting Spirit বৃদ্ধি হইয়া মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। এই সঙ্কীর্ণতা হইতেই যত ব্যাধির সৃষ্টি—সঙ্কীর্ণতা বা সঙ্কোচই দুঃখ—সম্প্রসারণ বা উদারতাই সুখ। খেলা দ্বারা হৃদয় প্রশস্ত হয়—সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। Playersদের Nervous strength বাড়িয়া যায়। সকল বয়সেই Juvenile spirit ঠিক্ থাকে বলিয়া Glandular Operationএর দরকার হয় না। দেশে অন্নের প্রচুর অভাব হইলেও খেলা ও খেলার প্রবৃত্তির অভাব নাই। Substantial nourishing diet না পাইলে শুধু খেলায় শরীরের অপচয়ই হয়। Over feeding ও Over-exerciseএ শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয়। Under-feedingএ ও Under-exerciseএ Want of Play and Exerciseএ ও শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খেলার সময় আমরা সব ভুলে যাই ব'লে শরীর হাল্‌কা ও Energy যুক্ত হয়। We are in best of our Health when we forget ourselves. দেশের উপযোগী খেলাই ভাল। যে খেলায় অল্প সময়ে অত্যাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা ঘটে—তাহা ক্ষতিকর। কিছুকাল খুব খেলিবার পর খেলা ছাড়িয়া দিলে ইহার re-actionএ শরীরের জড়তা

সিরাম, ভ্যাক্সিন্, ইনজেক্সন ও অন্যান্য ঔষধের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ কারখানা

বেঙ্গল ইমিউনিটি সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের উক্তি :—

১৯২৭ সালে কলিকাতাতে যখন ট্রপিকাল ঔষধের ফার ইষ্টার্ণ এসোসিয়েসনের সপ্তম অধিবেশন হয়, তখন এই অধিবেশনের অনেক খ্যাতনামা সভ্য বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর কারখানাটী পরিদর্শন করিতে আসেন, এবং নিম্নলিখিতরূপে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন :—

"পূর্ব্বে ভারতবর্ষের চিকিৎসকগণকে বিদেশ হইতে আনীত ভ্যাক্সিন এবং সিরামের উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু এক্ষণে সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এই কোম্পানীর কারখানাটী পরিদর্শন করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে এই বিষয়ে তাঁহারা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন।" এই অধিবেশন সমাপ্তির পর এই কোম্পানী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারল মেজর জেনারেল জি, টেট এম, ডি, কে, এচ্, এস্, আই এম্, এস মহোদয়ের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র লাভ করেন। সভার উপস্থিত অন্যান্য সভ্যগণ উক্ত ল্যাবরেটারিতে ঔষধ প্রস্তুতের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ডাক্তার জি, ভি, দেশমুখ এম্, ডি, (লণ্ডন) এফ্, আর, সি, এস নিখিল ভারত মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণের সহিত বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর লেবরেটরী পরিদর্শন করিতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আধুনিক নিয়মানুসারে সিরাম, ভ্যাক্সিন এবং অন্যান্য ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী পরিদর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। লেবরেটরীর কার্য্য প্রণালী দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"এই কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ ও অন্যান্য ডাক্তার মহোদয়গণের সৌজন্যে ও সাহায্যে আমি তাহাদের কার্য্যালয়টী পরিদর্শন করিতে পারিয়াছি! অদ্যকার ন্যায় উপদেশ ও শিক্ষাপূর্ণ দিবস আমার জীবনে কমই আসিয়াছে। এইখানে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিরাম এবং ভ্যাকসিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, এবং তাহাদের এই সমস্ত প্রণালীগুলি বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল। এই কোম্পানীর কারখানাটী অতি উত্তম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্থাপিত, ইঁহাদের স্বতন্ত্র অশ্ব ও পশুশালা আছে। আমি এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। ইঁহারা একটী বিরাট, বৈজ্ঞানিক ও দেশহিতকর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।"

——

ও অকর্ম্মণ্যতা বাড়ে—বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদিতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

খেলাটা Regular Suiting; Climate ও Constitutionএর উপযোগী হইলে, এই খেলা দ্বারাই নির্ব্যাধি হওয়া যায় ও পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ ঘটে। স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকের প্রকৃতি অনুযায়ী খেলা বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। খেলায় মাতৃ-জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যে খেলায় প্রাণের বিকাশ হয় সেই খেলাই ভাল। যে খেলায় প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় যে খেলায় বিলাস-বাসনা বর্দ্ধিত হয়, সেই খেলায় অধোগতি হয়। এরূপ খেলা না খেলাই মঙ্গল। খেলায় প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ যুবা হয়, খেলার অভাবে বালক ও যুবা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষ খেলায় খাঁটি ও ভাল হ'তে পাল্লেই মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মন মুখ এক ক'রে খেলা চাই। মন মুখ এক হ'লে ভেতরে শক্তি এসে জমে—তখন 'Manly Game' দেখান যেতে পারে। Thought (চিন্তা) Utterance (উক্তি) Deed (কার্য্য) যেখানে United হয়েছে, এক হ'য়েছে সেখানেই মানুষ মহামহিমময় হ'য়ে উঠে—**স্বাধীনতার খেলায়** জয়লাভ ক'রেছে। Independent হ'তে হলে ভেতরে ও বাইরে ঐক্য হয়ে খেলা চাই। খেলায় জীবন আরম্ভ, খেলায় পরিণতি ও খেলাতেই জীবন শেষ হ'চ্ছে। প্রত্যেকেরই ভাল খেলোয়াড় হ'তে চেষ্টা করা উচিৎ। ভাল খেলোয়াড় হ'লে শরীরে কোন দুর্ব্বলতা ও ব্যাধি থাক্‌তেই পারে না। একটু চেষ্টা কল্লেই খেলাটাকে Lucrative ও আত্মোন্নতিকর ক'রে তোলা যেতে পারে। খেলা থেকেই National Hero তৈরী হ'তে পারে, খেলা দ্বারাই প্রতি দেহের ব্যাধির বীজ সমূলে নির্ম্মূল হ'তে পারে। চিকিৎসক ও ঔষধের বিনা সাহায্যে একমাত্র খেলা দ্বারাই জীবনকে নিরাময় করা যায়। সারাদিন পড়ার চেয়েও খেলা করা ভাল। খেলার মত খেলা চাই। খেলায় শুধু উন্নতি না করে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যাতে হয় সেই খেলার প্রতিষ্ঠা করাই কর্ত্তব্য। "উন্নতি" বল্লে বুঝি আংশিক উন্নতি নয়—পূর্ণ উন্নতি সকল দিকের উন্নতি—সকল ভাবের উন্নতি—সকল বিষয়ে উন্নতি। Indoor এবং Out-door gameএ, স্বদেশের ও বিদেশের খেলায়, অন্তরের ও বাহিরের খেলায় সর্ব্বত্র জয়ী হ'তে হ'লে চাই এমন খেলা যাতে Harmonious and all-sided development হয়; একত্রে Physical, Mental, Moral, Intellectual, Social, Political ও Spiritual Culture যে খেলায় হয়, সেই খেলাই আদর্শ খেলা এবং যে খেলোয়াড়ের কাছে তার উপায় শেখা যায় সেই "আদর্শ খেলোয়াড়।"

এস, ভাই! অবিলম্বে এই খেলোয়াড়ের স্মরণ নিয়ে ঐ খেলা শিখে শুধু খেলাদ্বারাই জাতির নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করে খেল্‌তে খেল্‌তে স্বস্থানে চ'লে যাই।

দেশের ডাক

(শ্রীসুশান্তকুমার সিংহ)

বাক্যবীর বলিয়া যে অযাচিত উপাধিটি বাঙ্গালী জাতি তাহার পশ্চাতে জুড়িয়া জগতের বিদ্রূপ সহ্য করিতেছে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা বিধুভূষণের মনে বাল্যকাল হইতেই ছিল এবং সেই-জন্য যখন অসহযোগের প্রবল আন্দোলন বাংলার সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিকে দলিত মথিত করিবার সঙ্কল্পে ছাত্রদিগকে স্বাধীনতা জয়যাত্রায় আহ্বান করিয়া-ছিল তখন সকলের আগে বিধুভূষণ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া দেশের ডাক মাথায় পাতিয়া বড়বাজারে পিকেটিং করিয়া এক বৎসরের জন্য জেলে গেল।

কারামুক্তির পর সে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, আন্দোলনের তীব্রতা অনেক কম হইয়াছে, যে জাগ-রণের চঞ্চলতায় প্রাণের অস্থিরতায় জনসাধারণ রাজার শাসন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তির ধ্বজা উড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল তাহা স্থায়ী হয় নাই, খরস্রোতা নদীতে অনাদৃত তৃণের মতই ভাসিয়া গিয়াছে। সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রাষ্ট্রীয় সংসদে ফিরিয়া আসিয়া চরকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিল কিন্তু ইহাতেও তাহার অন্তর তৃপ্ত হইল না, দেশের জন্য সত্য সত্যই কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সে স্বাবলম্বী হইবার জন্য কলিকাতার রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করিতে লাগিল।

কিছুদিন এইরূপ ভাবে গড্ডলিকা প্রবাহে চলিবার পর হঠাৎ সে একদিন "আহ্বান" কাগজে দেখিল বড় বড় অক্ষরে ছাপা রহিয়াছে—

দেশের ডাক

পল্লী জননীর সেবাই দেশের ডাক

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার পল্লীশ্রীতে হে বাংলার তরুণ, তোমার রূপ শতদল প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। হে নবীন! পল্লী জননীর সেবা করিয়া দারিদ্রজর্জ্জরিত বক্ষোপরে হোমকুণ্ড জ্বালিয়া দিয়া আত্মবিস্মৃত জাতির কর্ণে চেতনার সিদ্ধমন্ত্রের ঝঙ্কার তুলিয়া এই পল্লীশ্মশান হইতে নবোত্থিত বালারুণ রঞ্জিত নব জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা প্রস্তুত করিবার ভার তোমায় লইতে হইবে। দ্বিধা নয় বিলম্ব নয় একটা বিপুল জাতির উৎসন্নের পথ রোধ করিয়া তাহাকে বিশ্বের সাম্রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিবার ভার হে ব্রতী নীরব কর্ম্মী, তোমারই উপর। উঠ, জাগ্রত হও।

এইরূপ এক কলম ব্যাপী সুললিত সুচিন্তিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া পল্লীর দুর্দ্দশার স্বরূপ চিত্র প্রকাশ করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য 'আহ্বান' সম্পাদক সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

বিধুভূষণ ভাবিল সত্যই কি বাংলার যে চিরশ্যামল, অপরূপ পল্লীশ্রী কি লুপ্ত হইয়াছে। বাংলার পল্লীর পথে প্রকৃতির অফুরন্ত দানে যে

মুক্ত শ্রী ফুটিয়া উঠিবার বর্ণনা সে নানা কাগজে পড়িয়াছে, নানা গানে শুনিয়াছে সত্য তবে কি তাহা কবি কল্পনা? বাংলার কবি যে দেশের বর্ণনা করিতে গিয়া গাহিয়াছেন।

কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই দল্‌তে হয়রে দুর্ব্বাকোমল?
কোথায় ফলে সোণার ফসল সোণার কমল ফুটে রে!
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরই বাংলা রে?
(সত্যেন্দ্রনাথ)

তবে কি তাহা মিথ্যা, না আমাদেরই অনাদরে অযত্নে মায়ের সে শ্যামলশ্রী অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সে আবার কাগজে মনোনিবেশ করিল। আর এক-স্থানে লেখা রহিয়াছে, হে বাংলার দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার উপাসক একবার বুকে হাত দিয়া বলত দেশ কোথায়? জননী জন্মভূমির উদ্ধার সাধনে কৃতসংলগ্ন হে বাংলার নির্ভীক কর্ম্মী, জননী জন্ম-ভূমিকে কাহার কাছে রাখিয়া আসিয়াছ। যাহাদের আমরা ছোট লোক বলি, সেই অশিক্ষিত চাষী, যাহারা দুইবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, মাথা-গুঁজে থাকবার স্থান পায়না সেই সব নিরক্ষর হতভাগ্যদের হাতে মাকে সঁপিয়া নগরের কর্ম্ম-কোলাহলে বিলাসব্যসনে মত্ত থাকিয়া বক্তৃতা করিলে কি দেশ উদ্ধার হইবে? যদি সত্য সত্যই দেশকে ভালবাস, ভক্তি কর তবে পল্লীতে ফিরিয়া যাও, সেই সব অশিক্ষিতের হাতে হাত দিয়া বল

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে　　(রবীন্দ্রনাথ)

বিধুভূষণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার প্রাণ সেই অনাদৃতা লক্ষ্মীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল সে ভাবিল সত্যই দেশের সেবা করিবার একমাত্র স্থান বাংলার পল্লী, তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল কবির সেই সর্ব্বজন পরিচিত কথা কয়টী

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহিত মেষ
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

তাহার আর কাগজ বিক্রয় করা হইল না, রাষ্ট্রীয় সংসদে ফিরিয়া আসিয়া সম্পাদককে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিল, তিনিও তাহাকে খুব উৎসাহ দিলেন। বিধুভূষণ সেই রাত্রেই প্রায় পাচ বৎসর পরে তাহার দেশে ফিরিবার জন্য ট্রেণে উঠিল।

বিধুভূষণ দেশে ফিরিয়া দেখিল এই পাচ বৎসরে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে ধাত্রী ঘোষালের বিরাট বপু দেখিয়া ছেলে মেয়েরা ভয় পাইত তিনি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া বিছানায় শুইয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যে ঘনশ্যাম বসুর ফিস ফিস করিয়া গোপন পরামর্শ দূর হইতে গোলদীঘির বক্তৃতা বলিয়া মনে হইত তিনি আর নাই। গ্রামের পোষ্টমাষ্টার কালীপদ মিত্র একগণ্ডা মেয়ে দুইটী অপোগণ্ড পুত্রসহ স্ত্রীকে ভগবানের ভরসায় রাখিয়া ইহলোকের সম্বন্ধ শেষ করিয়াছেন। দত্তদের বিরাট বাড়ীর বিরাট গোষ্ঠির সকলে কার্য্যোপলক্ষে ভারতের নানা প্রদেশে অবস্থান করায় শূন্যবাটীটা গ্রামের গোশালায় পরিণত হইয়াছে। মুখার্জ্জীদের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের আশার স্থল হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। গ্রামের একমাত্র দীঘিটীর জল শৈবাল দ্বারা এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে তৃণসমাচ্ছন্ন প্রান্তর বলিয়া মনে হয়। যে কয়েক-

খানি গৃহেতে এখনও সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে তাহারা যেন নিতান্ত অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! অধিবাসীদের অবস্থাও গৃহের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নয়। দেহের মধ্যে উদরই একমাত্র উল্লেখযোগ্য যেন সমস্ত গ্রাম বদ্ধপরিকর হইয়া মৃত্যুপণ করিয়া কালান্তরে আরাধনা করিতেছে। তাহাদের নিজের বাড়ী এখনও দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার দরজা জানালার কাঠগুলির চিহ্ন নাই বোধ হয় প্রতিবাসী-দের কাজে লাগিয়াছে।

গ্রামের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল অথচ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও ইহার শ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইত। আজ যে পুষ্করিণীতে জল আছে কিনা তাহার সন্ধান লইবার জন্য ডুবরীর প্রয়োজন সেই পুষ্করিণী অথৈ কাকচক্ষু জলে সে কত সাঁতার না কাটিয়াছে অথচ মাত্র পাঁচ বৎসরে কি পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। তাহার এক একবার মনে হইত যদি তাহারা দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় বাড়ী না করিত তবে বোধ হয় আজ এ দুর্দ্দশা হইত না। সে ধাত্রী ঘোষালের বাড়ীতে যাইয়া শয্যাশায়ী বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া বলিল, কাকা গাঁয়ের একি অবস্থা? কাকা কাঁদিয়া বলিলেন "বাবা গাঁয়ে কি আর সেদিন আছে? যারা একটু লেখা পড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে, দু'পয়সা রোজগার করতে শিখেছে তারা গাঁ ছেড়ে চলে গেছে, গাঁয়ের অবস্থা এর চেয়ে ভাল কি করে হবে—লোকে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তার উপর ম্যালেরিয়ায় বছর বছর ভুগে সারা; ম্যালেরিয়ার কবল থেকে যারা উদ্ধার হয়, মা ওলাদেবী তাদের উপর কৃপা করেন, কলেরা ত এখানে মৌরুসী পাট্টা করেছেন, প্রতি বছরে একবার করে খাজনা নিয়ে গাঁটাকে ওলোট পালট করে দিয়ে যায়—কি আর বল বাবা!"

বিধুভূষণ শিহরিয়া উঠিল। সত্যইত যে গ্রামের একমাত্র জলাশয়টী যে অবস্থা দেখিয়াছে তাহাতে কেন যে বারমাস কলেরা হয় না ইহাই গবেষণার বিষয়। সে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা কাকা, এর কি কোনও উপায় হয় না? ঘোষাল মহাশয় হতাশা ব্যঞ্জকভাবে কপালে হাত দিয়া বলিলেন "উপায় নারায়ণ।"

ঘোষালদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে এই দেশের মধ্যে সে আবার পল্লীর লুপ্তশ্রী ফিরাইয়া আনিবে। সেই দিনই সে গ্রামের সকল বাড়ী গিয়া ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ কি, কি উপায় করিলে ম্যালেরিয়া নিবারণ হয় তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়া সকলকে গ্রামের বন ঝাড় পরিষ্কার করিতে অনুরোধ করিল। সে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বলিল, এই ঝোপ ঝাড় কেটে গাঁকে আবার গাঁ করে তুলতে পয়সা খরচের দরকার· হয় না, দরকার হয় ইচ্ছা আর পরিশ্রম। এই কাজটা করতে হয়ত তোমাদের তিন চার দিন বৃথা যাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হবে কিন্তু একবার ভাব দেখি জ্বরে পড়ে কতদিন রোজগার বন্ধ করে শুয়ে থাকতে হয় যদি তিন চারি দিনের পরিশ্রমে বৎসরের যন্ত্রণা দূর হয় তবে তাই করা কি উচিত নয়? সকলে বিষয়টা ঠিক না বুঝিলেও সম্মতি দিল। পরের দিন বিধুভূষণ অগ্রণী হইয়া গ্রামের জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিল।

জঙ্গল কাটবার পর ছোট ছোট ডোবাগুলি পূর্ণ করিয়া ও অপেক্ষাকৃত বড় গুলিতে কেরাসিন তৈল ছড়াইয়া দিয়া, ঘরে ঘরে ধূনা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া মশারীর মধ্যে যাহাদের মশারী নাই, চার পাঁচখানা কাপড় বাঁধিয়া অস্থায়ী মশারীর মধ্যে শয়ন করিবার

বন্দোবস্ত করিয়া দিল। ব্যবস্থার পর ব্যবস্থায় লোকে অস্থির হইয়া উঠিলেও অপেক্ষাকৃত আরামে শয়ন করিতে পারিয়া সত্যই তৃপ্ত হইল। ঝোপ ঝাড়ের পর সে পুষ্করিণীটী লইয়া পড়িল, দিনের পর দিন পরিশ্রম করিয়া সেই বিরাট পুষ্করিণীর একদংশ শৈবাল মুক্ত করিল। এমন সময় খবর আসিল যে দক্ষিণ পাড়ায় মুচীদের ঘরে কলেরা দেখা দিয়াছে।

বিধূভূষণ তৎক্ষণাৎ সকলকে বুঝাইয়া দিল যে কলেরার একমাত্র প্রতিষেধক জল পরিশ্রুত করিয়া ব্যবহার করা, আর জল পরিষ্কার করিবার সহজতম উপায় হইতেছে জল গরম করিয়া ব্যবহার করা। দৈনিক ব্যবহারীয় পানীয় প্রত্যহ গরম করিয়া লইলে সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত হইয় যায়—যদি কলেরা হইতে উদ্ধার পাইতে চাও তবে জল গরম করিয়া ব্যবহার করিও এবং জলে কর্পূর ব্যবহার করিবার জন্য প্রতি বাড়ীতে কর্পূর বিতরণ করিয়া দিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমরে একটী করিয়া পয়সা ঘুন্সীর সহিত বাঁধিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিল কারণ তাম্র কলেরার একটী উৎকৃষ্ট প্রতিশোধক।

তারপর সে পুষ্করিণীর ধারে একজন লোককে পালাক্রমে মোতায়েন করিয়া দিল যেন সেই কলেরা-ক্রান্ত বাড়ীর কেহ পুষ্করিণীতে না আসিতে পারে। তারপর দক্ষিণ পাড়ার মুচীদের ঘরে যাইয়া রোগীর সেবার বন্দোবস্ত করিল তাহাদের বাড়ীর বাহির হইতে নিষেধ করিয়া সে নিজে এবং লোক দিয়া জল আনাইয়া তাহাদের গরম করিয়া দিল। ঘণ্টা কয়েক পরে লোকটী মারা যাইল। তখন বিধূভূষণ তাহার সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার কাপড় চোপড় তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া ঘরটী ফিনাইল ও ক্লোরিন দিয়া সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিয়া দিল। পুষ্করিণীতে লোকের স্নান করা নিষিদ্ধ হইল কি এমন কেহ মলমূত্র পর্য্যন্ত পাড়ে ত্যাগ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করিল। একটীমাত্র বালতী দিয়া পুকুর হইতে জল লইয়া সকলকে সে জল বিতরণের ব্যবস্থা করিল কাহারও নিজের বালতী বা ঘড়া ডুবাইয়া জল লইবার উপায় রহিল না। কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া জাতি গেল বলিয়া চীৎকার করিলেও বিধুভূষণ তাহাতে কাণ দিল না। বিধূভূষণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামের ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের বাড়ী যাইয়া সকলকে কলেরা ও তাহার প্রতীকারের উপায় বুঝাইয়া দিয়া আসিল। বলিল যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই মহামারী হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তবে তাহা করা কি উচিত নয়? আশ্চর্য্যের বিষয় বিধুভূষণের এই সাবধানতার ফলে সেবার কলেরা দেবীকে মাত্র একটী জীবন উপঢৌকন লইয়া বিদায় হইতে হইল।

একমাস সমবেত চেষ্টার ফলে পুষ্করিণীটী শৈবাল মুক্ত হইয়া পুনরায় জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ায় বাতাসও যেন এক অপূর্ব্বভাবে বহিতেছে। বিধূভূষণ গ্রামে একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ছাত্রদের বুঝাইতে লাগিল যে বায়ু মানুষের প্রাণ হইলেও বিষাক্ত বায়ু মানবের পরম শত্রু, এই সমস্ত জলা, ঝোপ ঝাড় হইতে যে বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা মানবের জীবনীশক্তি হ্রাস করে—মুক্তবায়ু ও বিশুদ্ধ পানীয় একমাত্র জীবন এই দুইটীর কোনটীই কিনিতে হয় না, পয়সা খরচ করিতে হয় না একটুখানি পরিশ্রম মাত্র দরকার—যদি সামান্য পরিশ্রম করিয়া সুস্থদেহ লাভ করা যায় তবে কি তাহা করা উচিত নয়। স্মরণ রাখিও, প্রতিজ্ঞা কর—জল গরম না করিয়া পান

করিবে না, বাড়ীর পাশে জঙ্গল রাখিয়া স্বেচ্ছায় অসুখ ও মৃত্যুকে আহ্বান করিবে না।

বিধুভূষণ পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া যেমন অবাক হইয়া গিয়াছিল তদ্রূপ আরও পাঁচ বৎসর পরে যাহারা দেশে আসিল তাহারাও অবাক হইয়া গেল। যেন কোন যাদুকর মায়া কাঠির স্পর্শে সেই শশ্মানের সমস্ত বিভীষিকা দূর করিয়া দিয়া শ্যামলশ্রী মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেই শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলের উপর সান্ধ্য কিরণের হিল্লোল চারিদিকে স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। বাতাস স্বর্ণরশ্মি লইয়া সন্ধ্যার সুনীল ছায়ার সহিত খেলা করিয়াছে। অধিবাসীদের মধ্যেও জীবনের সাড়া মিলিয়াছে।

ভারতের রাজনৈতিক গগণে আবার উন্মাদনা দেখা দিয়াছে, আইন অমান্য করিবার জন্য আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে—রাষ্ট্রীয় সংসদ বিধুভূষণকে এই দেশের ডাকে সাড়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে বিধুভূষণ উত্তরে লিখিল দেশের ডাক আমি মাথায় পাতিয়া লইয়াছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হউক ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রার্থনা কিন্তু আজ দেশের যে ডাক আমি মাথায় পাতিয়া লইয়াছি তাহা ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আজ সোণার বাংলা আমায় ডাক দিয়াছে তাহাকে অমান্য করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই।

সেইদিন বিধুভূষণের নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমবেত কণ্ঠে গাহিতেছিল।

"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। (রবীন্দ্রনাথ)

মাছি

(শ্রীভোলনাথ চট্টোপাধ্যায়)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ইহার পরবর্ত্তী অবস্থার নাম "Pupa" এই সময়ে তাহারা স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শাবকের (larva) আকার ছোট হইয়া আসে রং কাল হয় এবং তাহাদের অবয়ব পুষ্ট হইয়া তাহাতে পাখা গজাইতে থাকে। এইরূপে তাহারা মাছির আকার প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় শাবকেরা প্রায় তিনচারি দিন থাকে। পরে বাহিরে যাওয়ায় তাহাদের শরীর শক্ত হইয়া আসে, পাখা শুষ্ক হয় এবং উড়িতে সক্ষম হয়।

সাধারণতঃ ডিম হইতে মাছি জন্মাইতে ৮দিন হইতে ১০দিন সময় লাগে। কিন্তু নিয়মিত তাপ ও খাদ্য না পাইলে এই ১০দিন কিম্বা তাহার উপর

লাগে। যদি মাছি কোন nonfermenting (যাহা পচে না) জিনিষের উপর ডিম পাড়ে তাহা হইলে তাহাতে ডিম ফুটিতে কিছু বেশী দিন সময় নেয় কিন্তু মাছি তাহাদের ডিম ফুটিবার উপযোগী স্থানেই ডিম পাড়ে। পচা গোবর, জঞ্জাল যদি এক সপ্তাহের উপর কোথায়ও গাদা করা থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে নিশ্চয়ই মাছি জন্মাইবে। সুতরাং ময়লা প্রভৃতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া পরিষ্কার করা উচিত। এইরূপ পরিষ্কার করিলে মাছির বংশবৃদ্ধির হাত হইতে আমরা কিছু রক্ষা পাইব।

Habits

মাছির বদ্‌অভ্যাস আমাদের বড়ই অপকারী। ইহারা কেবল পচা ময়লায় ডিম পাড়ে না অধিকন্তু সেই সব দূষিত জিনিষ হইতে বীজাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের বাটিতে প্রবেশ করে এবং আমাদের খাবারের উপর বসিয়া আমাদের খাদ্য দূষিত করে। এইরূপে তাহারা প্রায়ই রোগ ছড়িয়ে দেয়।

House fly মাছিরা খুব স্থিরভাবে আহার করে এবং আহার করিতে কিছু বেশী সময় নেয়। মাছি আহার যোগাড় করিতে বেশ কষ্ট সহ্য করে, যদিও কোন খাদ্য তাহারা সম্মুখে পায় তথাপি তাহারা শুঁড়ের দ্বারা আরও কিছু ভাল খাদ্যের জন্য খুঁজিতে থাকে। যখন তাহারা এইরূপ খাদ্যের জন্য ঘোরে তখন রোগের বীজাণু ও অন্যান্য দূষিত দ্রব্য তাহাদের সঙ্গে বিশেষতঃ তাহাদের পায়ে সরু সরু লোমের সঙ্গে চলিয়া আসে। পরেই তাহারা আমাদের খাবারের উপর আসিয়া বসে, তাহাদের সঙ্গের সেই দূষিত দ্রব্যাদি আমাদের খাবারে মিশিয়া যাইয়া আমাদের খাবার দূষিত হইয়া যায়। যখন আমরা এই খাবার গ্রহণ করি তখনই আমরা রোগে পড়ি।

মাছির আর একটি বড়ই বদ্‌অভ্যাস আছে। তাহারা যখন তখন তাহাদের ভুক্ত দ্রব্য বমন করিয়া বাহির করিয়া আনে। তাহারা, পচামাংস, বিষ্ঠা, জঞ্জাল প্রভৃতি আহার করিয়া আসিয়াই আমাদের খাবারের উপর বসিয়া তাহা বমন করিয়া দেয়, আমরাও তাহা খাবারের সঙ্গে আহার করিয়া ফেলি, ইহাতে শুধুই রোগের সঞ্চার হয় তাহা নয় অধিকন্তু ইহা বড়ই অপ্রীতিকর ব্যাপার। আবার ঘরে দেওয়ালে ও ছাদে যে ছোট ছোট কাল কাল ছিটা দাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মাছির বিষ্ঠার ও বমনের দাগ। ইহা বড়ই বিষাক্ত জিনিষ। ঘরের অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করিবার অপেক্ষা এই দাগগুলি পরিষ্কার করা অধিক প্রয়োজন। এই দাগের সংখ্যা প্রত্যেক বাড়িতে প্রতিদিনে প্রায় এক শতেরও উপর হয়।

House fly বেশীদূর উড়িয়া যাইতে পারে না। যদিও পরীক্ষায় জন্মস্থানের ১৩ মাইল দূরেও তাহাদের দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের জন্মস্থান হইতে আধ মাইলের উপর যায় না, যদি না তাহারা ঝড়ে উড়িয়া যায় এবং প্রায় ২০০।৩০০ শত গজের ভিতরই থাকে। সুতরাং যদি কোন স্থানে মাছি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহারা সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যে জন্মিয়াছে, সেই বিষয় কোন সন্দেহ নাই। একটি খুব সহজ পরীক্ষার দ্বারা মাছি সাধারণতঃ কতদূর উড়িয়া যায়, জানা যায়। কতকগুলি মাছি ধরিয়া analine রংয়ে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিয়া এবং খানিক খানিক অন্তর দূরে তাহাদের জালে কিম্বা fly paperএর দ্বারা পুনরায় ধরিলে, তাহারা কতদূর উড়িয়াছে বুঝা যায়। বাড়িতে মাছি খাবারের

গন্ধে আসে। গরমকালেই তাহারা আসে। শীত-কালে মাছি ঢাকা যায়গায় ঢুকিয়া আধঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। গরম পড়িতেই তাহারা বাহির হইয়া আসে এবং ডিম পাড়িতে থাকে।

Carriers of disease.

মাছি দুই প্রকারে রোগ বহন করে।

প্রথম।—

মাছি নানারূপ রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যে ঢালিয়া দেয়। ময়লা জঞ্জাল প্রভৃতিতে নানারূপ রোগের বীজাণু আছে, মাছি তাহাতে ঘুরিয়া বেড়ায়. ফলে তাহারা রোগের বীজাণুর দ্বারা দূষিত হইয়া আসিয়া আমাদের পানীয় জলে কিম্বা খাদ্যে আসিয়া বসে। সকল জাতীয় মাছিই এই প্রকারে রোগ বহন করে কিন্তু এই দোষে house flyই সব চেয়ে বেশী দোষী কারণ তাহারাই ময়লা জঞ্জালে বেশী ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মাছি শরীরের ও পায়ের লোমের দ্বারাই দূষিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়।—

মাছির কামড়েও রোগের সঞ্চার হয়। মাছি কামড়াইয়া নানারূপ রোগের বিজাণু আমাদের শরীরে ঢুকাইয়া দেয়। সুখের বিষয়, যে মাছি কামড়ায় না, সেই মাছির দ্বারা এই প্রকারে রোগের সৃষ্টি হয় না, নচেৎ আমাদের আরও বিপদে পড়িতে হইত। কেবল মাত্র কামুড়ে মাছিই এই প্রকারে রোগ বহন করে। আমাদের দেশে এই প্রকার মাছি খুবই কম। যে প্রকারে ম্যালেরিয়া মশার দ্বারা Typhus উকুনের দ্বারা প্লেগ পিসুর দ্বারা সংক্রামিত হয় সেইরূপ কামুড়ে মাছিও ঠিক সেইরূপে রোগ বহন করে। মাছি রোগীকে কামড়াইয়া তাহার দূষিত রক্ত আহার করে এবং পুনরায় কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়াইয়া তাহার রক্তে সেই দূষিত রক্ত মিশাইয়া দেয়।

মাছির দ্বারা যে কয় প্রকার রোগ সংক্রামিত হয়; তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান:—

Typhoid fever, diarrhœa and enteritis, cholera, dysentry, parathyphoid fever, intestinal bacili infections, Sleeping sickness, tularamia, sura nagana.

সাধারণতঃ typhoid feverই মাছির দ্বারা বেশী সংক্রামিত হয়। এই রোগ বীজাণু হইতেই উৎপন্ন হয়। কোন রোগীর পরিত্যক্ত মলমূত্রের ভিতর এই রোগের বীজাণু থাকে, তাহা যদি কোন রকমে সুস্থ লোকের ভিতরে প্রবেশ করে তাহা হইলেই এই রোগ আক্রমণ করিবে। ড্রেনের ময়লায় দূষিত জল পান, দূষিত মৎস্যাহার প্রভৃতি এই রোগের কারণ। যদি আমাদের পানীয়ে কিম্বা খাদ্যে এই রোগের বেসিলি (bacili) থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই রোগ আক্রমণ করিবে। ময়লা, জঞ্জাল হইতেই এই রোগ বেশী সংক্রামিত। যদি তাহা হইতে দূষিত দ্রব্যাদি আমাদের শরীরে প্রবেশ না করে তাহা হইলে এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে না। মাছি তাহা হইতে এই রোগের বীজাণু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়।

পায়খানা খুলিয়া রাখা অতিশয় অন্যায়। ইহাতে যদি টায়ফয়েড রোগী মলমূত্র থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে মাছির দ্বারা সেই রোগ অতি শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িবে।

মাছির টাইফয়েড বেসিলি উৎপন্ন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। তাহারা ইহা কোন রোগীর মলমূত্র কিম্বা অন্য কোন পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতেই বহন করিয়া আনে। রোগের বীজাণু কেবল রোগীর মুখ হইতে বাহির হয় না। রোগীর মলমূত্র থুতু গয়ার প্রভৃতিতেও যথেষ্ট পরিমাণে বীজাণু থাকে। যদি রোগীর পরিত্যক্ত মলমূত্র বীজাণু প্রতিশেধক ঔষধে নষ্ট করা যায় তাহা হইলে বীজাণু ছড়াইয়া পড়িতে পারে না। এমন কি টাইফয়েড রোগী আরাম হইয়া যাইলেও বহুদিন পর্যান্ত তাহাদের শরীরে টাইফয়েড বীজাণু বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদের হইতে অনেক সুস্থলোকের শরীরে সেই বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে। শতকরা দুইজন সুস্থ টাইফয়েড রোগীর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে টাইফয়েড রোগের বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। টাইফয়েড রোগী সুস্থ হইয়া যাইলে অনেকে তাহাকে নিরাপদ মনে করেন কিন্তু তাহাদেরই মলমূত্র হইতে টাইফয়েড বীজাণু মাছির দ্বারা সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভিতর টাইফয়েড সংক্রামিত হয়।

বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া না রাঁধিয়া খাওয়া নিরাপদ নহে; কারণ বাজারে খাদ্য-দ্রব্য সুরক্ষিত না থাকিলে খাদ্যে মাছি বসিয়া সেই সব খাবার দূষিত করিয়া দেয়। যে কোন প্রকার খাবারই হউক না কেন প্রায়ই মাছির দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যতই সাবধান হই না কেন, টাইফয়েড রোগের বীজাণু মাছির দ্বারা আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। আমরা যদিও মাছি বিনাশ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করি তথাপি অন্য লোকের দোষে আমরা বিপদে পড়ি।

টাইফয়েড রোগের ন্যায় আর একটি রোগও মাছি দ্বারা সংক্রামিত হয়। তাহার নাম Summer diarrhœa," ইহা প্রায় শিশুদেরই হইয়া থাকে কিন্তু বয়স্থদেরও হইতে পারে এই রোগের উৎপত্তির কারণ নানা রকম বীজাণু। এই রোগ টাইফয়েড রোগের ন্যায়ই সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই রোগের বীজাণু, দূষিত দ্রব্য হইতে, অপরিস্কৃত হস্ত কিম্বা মাছির দ্বারা দূষিত খাদ্য হইতে শরীরে প্রবেশ করে।

গ্রীষ্মকালে যখন মাছি খুব বেশী হয় সেই সময়েই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। মাছি যতই বাড়িতে থাকে এই রোগ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মাছিই যে এই রোগের কারণ সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে মাছি বীজাণু ছড়াইয়া দেয়, যে সকল স্থানে এই রোগের বীজাণু বর্ত্তমান থাকে মাছি সেই সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যদি মাছি নষ্ট করা যায় তাহা হইলে এই রকম রোগও কমিতে থাকে। সুতরাং মাছি যে রোগ সংক্রামণ করে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং শিশুদের প্রাণ বাঁচাইতে হইলে মাছি নষ্ট করাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

কলেরা ও আমাশা রোগ ও টাইফয়েড রোগের ন্যায় সংক্রামিত হয়। রোগীর মলমূত্র হইতে মাছির দ্বারা আমাদের পানীয় জল, খাদ্য দূষিত হইয়া এই রোগের বিস্তার হয়।

ইহা ছাড়া আরও নানা রকম এইরূপ রোগ মাছির দ্বারা সংক্রামিত হয়।

মাছি যে রোগের একটি প্রধান বাহক তাহা আফ্রিকান দেশীয় ঘুমন্ত রোগের (Sleepered sickness) বিস্তার হইতে বেশ বুঝা যায়।

কামুড়ে মাছি (biting flies) হুল ফুটাইয়া এই রোগ বিস্তার করে। শরীরের রক্তে ও অন্যান্য

জলীয় পদার্থে "Trypansome" নামক এক রকম বীজাণুর আক্রমণে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই বীজাণু একবার শরীরে ঢুকিলে উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর শরীরেও ঠিক এইরূপ বীজাণু দেখা যায়। ইঁদুরের শরীরে এক জাতীয় "Trypansome" বীজাণু দেখা যায়, কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ দেখা যায় না। এই স্থলে ইঁদুরের গায়ের পোকা এই রোগের বাহক। আর এক জাতীয় "Trypansome" বীজাণু ঘোড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর শরীরে দেখা যায় ইহাতে "Surra" নামক রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগ Asia, The Philipines ও অন্যান্য Tropical দেশে খুব বেশী দেখা যায়। বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে এক রকম রোগের উল্লেখ আছে এই রোগ পোকা মাকড়ের কামড় হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বোধ হয়, কোন জাতীয় কামুড়ে মাছি এই রোগের প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া আর এক জাতীয় "Trypansome" বীজাণু আফ্রিকা দেশে ঘোড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর শরীরে দেখা যায়। এই বীজাণু হইতে ঘোড়ার "Nagana" নামক রোগ হয়, এবং ঘোড়া এই রোগে পড়িলে হঠাৎ কিম্বা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মারা যায়।

"Nagana" রোগ নানা জাতীয় কামুড়ে মাছির দ্বারা সংক্রামিত হয়।

(ক্রমশঃ)

নারীধর্ম্ম

(শ্রীসুখদাসুন্দরী দেবী মজুমদার)

বর্ত্তমান কালে সরল বঙ্গভাষায় লিখিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সমন্বিত হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসাগ্রন্থ সর্ব্বত্র অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য। নারীদের এই সমস্ত গ্রন্থ সাহায্যে স্ব স্ব পরিবারস্থ সকলের চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের নারীগণ চিরকালই পতিব্রতা; তাঁহারা পূর্ব্বকালে পতির সহিত যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এবং কোন কোন বিদূষী নারী যজ্ঞের মন্ত্রও রচনা করিতেন। বিশ্ববারা নাম্নী একজন বিদূষী নারী, এইরূপ অনেক মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশী বিদ্যাবতী এবং জ্ঞানবতী নারীরাও স্বহস্তে রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

বিবাহের সময় কন্যাকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার একাংশ ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল। "সুলক্ষণা ও সৌভাগ্যবতী হইয়া পতিগৃহে বাস কর, দাসদাসী এবং গৃহপালিত পশুর মঙ্গলকারিণী হও। তোমার নয়ন ক্রোধশূন্য হউক, পতি-শুশ্রূষা পরায়ণা হও, পশুদিগের মঙ্গলবিধান কর। তোমার নয়ন সর্ব্বদা প্রফুল্ল হউক, তোমার সৌন্দর্য্য মঙ্গলকারিণী হউক। বীরপ্রসবিনী হও; দেব, অতিথি, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ভাসুর, দেবর প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের সেবাপরায়ণা হও।"

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্ত্তিকা খনা, অঙ্কবিদ্যার উদ্ভাবিকা লীলাবতী প্রভৃতি প্রাচীন ভারত মহিলারা গৃহকার্য্য করিতেন।

ভারতসম্রাট দাশরথি রামের মহিষী সীতাদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবারস্থ সমস্ত পোষ্যবর্গকে আহার করাইতেন এবং নিজে অবশিষ্ট অন্ন আহার করিতেন। ঈদৃশী বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও পুণ্যবতী নারীরা যখন স্বহস্তে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তখন ইহা ধ্রুব সত্য যে, রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য নারীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত আছে, বিদেহ প্রদেশে করাল নামক জনক-বংশীয় রাজার যজ্ঞীয় সভায় পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রবিষয়ক এক বিচার হইয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এতৎসমস্তই আলোচিত হইয়াছিল। এই পণ্ডিত সভায় গর্গবংশ সমুদ্ভূতা একজন ব্রাহ্মণ কুমারী এই-রূপ কঠিন বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়াছিলেন, যাহা পাঠ করিয়া অবাক হইতে হয়। এই ব্রাহ্মণ কুমারীও সমুদয় গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। প্রাচীন ভারত রমণীরা ধর্ম্মনীতিসম্পন্না, তপশ্চরণে অনুরক্তা, আলস্য বর্জ্জিতা, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা এবং স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

প্রাচীন ভারত মহিলার মধ্যে অনেকেই কি জগৎ-তত্ত্ব, কি জীবতত্ত্ব, কি ব্রহ্মতত্ত্ব, কি রাজনীতি, কি শিল্পবিদ্যা, কি সঙ্গীতবিদ্যা কি যুদ্ধবিদ্যা সর্ব্ববিষয়ে প্রভূত জ্ঞান সম্পন্না ছিলেন এবং এইরূপ উচ্চ জ্ঞানালোচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াও তাঁহারা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা মহাখণ্ডের এক ধর্ম্ম মহাসভায় দাঁড়াইয়া বেদান্ত-দর্শন বিষয়ক বক্তৃ-তাকালে বলিয়াছিলেন,—জগতের নারীজাতির আদর্শ স্থানীয় ভারতের সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যবতী রমণীরা উচ্চ জ্ঞানবতী হইয়াও গৃহকর্ম্ম করিতেন।

বিবি আনিবেশান্তও তাঁহার অভিভাষণে বলিয়া-ছিলেন, প্রাচীন ভারতের মহিলারাই জগতের আদর্শ; তাঁহারা উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় ও রাজ্যপরি-চালনায় স্বামীর আনুকুল্য করিয়াও গৃহকার্য্য সম্পা-দন করিতেন। তিনি স্বয়ং প্রাচীন-ভারত মহিলা-দিগকে আদর্শ করিয়া নিজ জীবন যাপন করিতে বাসনা করিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোকা, প্রাতঃস্মরণীয়া পরলোকগতা রাণী ভবানী বিপুল ভূসম্পত্তির অধিশ্বরী ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিশাল জমিদারী পরিচালনা করিয়াও গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন মহর্ষি কপিলদেবের মাতা দেবহুতি সাংখ্যবিদ্যা লাভ করিয়াও গৃহকর্ম্ম করিতেন।

যীশু এক দিবস ভজনালয়ে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় কতিপয় নারী তাঁহার নিকটে ধর্ম্মোপদেশ চাহিল, তখন তিনি বলিলেন, "নারীগণ, পাতিব্রত্য ও সেবাব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন কর!"

কোরাণের বঙ্গানুবাদে উল্লিখিত আছে, সাম্যমন্ত্র-প্রচারক মহাত্মা মহম্মদ নারীদিগকে উপদেশ ছলে, "পাতিব্রত্য এবং সেবাব্রতই". নারীদের পরম ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন।

জগতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ, ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, পণ্ডিত, নীতিবিদ এবং ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা-দের মতে পাতিব্রত্য, সেবাব্রত, তত্ত্বজ্ঞানের আলো-চনা এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করা নারীদের পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল নারীগণ প্রায় সকলেই কর্ত্তব্য বিমূঢ়া।

বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ নারীগণই প্রাচীন ভারত মহিলাদের মত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো-চনাও করেন না এবং গৃহকর্ম্মও করেন না; তাঁহারা অনর্থক দেহভার বহন করিতেছেন।

সামান্য বেতনভোগী কেরানী, স্কুলমাষ্টার প্রভৃতির পত্নীরাও রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করা অপমান মনে করেন, আর যাঁহারা অধিক উপার্জ্জনশীল এবং বৈভবশালী, তাঁহাদের গৃহিণীগণ তো ধরাকে সরার মত জ্ঞান করিয়া মাটিতে পা দিতেই অসম্মান বোধ করেন।

প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই আজকাল বেতনভোগী পাচক পাক করে; গৃহিণীরা আলস্যের সজীব মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া বসিয়া দিন কাটান। তাঁহারা পরিবারস্থ পীড়িত ব্যক্তিকেও সাগু বার্লি সিদ্ধ করিয়া পথ্য প্রদান করিতেও মহাক্লেশ বোধ করেন। পাচক উপস্থিত না থাকিলে বালক-বালিকারা যথাসময় খাদ্য পায় না। এইরূপ অসু-বিধা সর্ব্বদা প্রায় সকল পরিবারেই সংঘটিত হয়।

পাচকের হাতে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্মের ভার থাকায় গৃহকার্য্যাদি সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সহকারে পরিচালিত হয় না। তাহারা খাদ্যসামগ্রীর যথেচ্ছ অপচয় করে, এক সের বস্তুর জায়গায় পাঁচ সের লাগায়। পাক ভাল হউক বা মন্দ হউক, খাইয়া লোকে পরিতৃপ্তি বোধ করুক আর না করুক, সেজন্য তাহার কোন ভয় ভাবনা নাই, সে কেবল দিন গণনা করে, কবে মাসকাবার হবে মাহিনা পাব।

পাচক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র যে জাতিই হউক যদি সে দুষ্টস্বভাব, নৈতিক-চরিত্রহীন, পাপমতি ও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্কান্ন, ভোজন-কারীদের দেহে সেই সমস্ত দোষ ও ব্যাধি সংক্রামিত করিতে পারে, ইহা সত্য। পাচকের পক্কান্ন এবং বাজারের হোটেলায় উভয়ই সমান দূষিত।

মনুষ্য দেহ একটি তড়িদ্‌যন্ত্র বিশেষ। স্পর্শাদি দ্বারা এক শরীরের দোষগুণ অন্য শরীরে বৈদ্যুতিক বেগে সংক্রমিত হইতে পারে। এইজন্য পাপমতি ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সহিত একাসনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন এবং তাহার পক্কান্ন আহার করা স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

পাচকের বেতন ও খোরাকী বাবত মাসে মাসে কতগুলি টাকা অপব্যয়িত হয়। যদি নারীগণ আলস্য বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব রন্ধনাদি গৃহকার্য্য সম্পা-দন করেন তাহা হইলে অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে, পাকও ভাল হইতে পারে, পরিবারস্থ পোষ্য-বর্গেরা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়া সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

আজ কাল দেশে দৈন্যরূপ দানবের যাদৃশ দৌরাত্ম্য, এই অবস্থায় অর্থের অপব্যয় করা মহা অন্যায়।

দেশে কোটি কোটি লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় না, কাপড় পরিতে পায় না, অভাবের তাড়নায় পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়। এই ভীষণ দুঃসময়ে প্রিয় ভগিনীগণ! আপ-নারা আলস্য ও বিলাসিতার মোহমদিরায় কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া থাকিবেন না। আপনারা নিজেদের কর্ত্তব্য রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম নিজ নিজ হস্তে সম্পাদন করুন, আর পাচকের পক্কান্ন খাইয়া স্বাস্থ্যহানি করিবেন না। যে টাকা মাসে মাসে পাচকের জন্য অপচয় করেন, নিজেরা রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করিয়া সেই টাকা বাঁচাইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় করুন, ইহাতে ঐহিক্ পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন।

পল্লী-চিত্র

(শ্রীমতী সরোজবাসিনী বসু)

পাড়াগাঁয়ে যাও যদি বরষা কালে,
দেখিবে ভরেছে জল পুকুরে খালে।
শুয়া পোকা শামুকের দেখি ছড়াছড়ি—
ঘরে দোরে এসে তারা দেয় গড়াগড়ি।
ডিম মুখে পিপীলিকা আসে সারি সারি
গৃহে এসে স্থান লয় নিজ গৃহ ছাড়ি।
চারিদিক হ'তে আসে ময়লায় বাস
মনে হয় নাক টিপে চেপে রাখি শ্বাস।
ছোট বড় মশাগুলি দিবানিশি উড়ে—
দিতে ম্যালেরিয়া বিষ শরীরেতে ফুড়ে।
তাই বলি হিত কথা শুন দিয়া মন
বরষায় পাড়াগাঁয় থেকোনা কখন।
পল্লী-জননীরে যদি বাস কেহ ভালো
ভালবেসে তার কোলে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালো।

পুকুরের পানাগুলি তুলিয়া ফেলিবে—
জল নিকাশের পথ সুগম রাখিবে।
জঞ্জাল ধুলা ময়লা যা কিছু জমিবে—
বাড়ী হ'তে বহুদূর ফেলিয়া আসিবে।
আম জাম কাঁঠালের মায়া না করিবে—
বাড়ীর নিকটে গাছ কাটিয়া ফেলিবে।
বাস গৃহে চারিদিকে থাকে যদি আলো
তা হ'লে শরীর মন দুইই থাকে ভালো।
পুকুরের জলে কেহ করিওনা স্নান
মাটীতে বসায়ে নল ক'রো জলপান।
ধুপ ধুনা গন্ধক সতত জ্বালিয়া—
সযতনে মশা মাছি দিবে তাড়াইয়া।
এ সব নিয়মগুলি করিয়া পালন
পল্লী জননীর কোলে কাটাও জীবন।

কলিকাতায় দুগ্ধ সমস্যা

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, M.B. (কর্ত্তৃক লিখিত Municipal Gazetteএ লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে)

শ্রীঅমলকুমার গাঙ্গুলী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এক হাজার গাভী এককালে আসে না অতএব প্রথমে আমরা ২টি লাঙ্গল ও ৮ জন কুলির সাহায্যে জমি চাষ করিতে পারি। এই কয়জন অনায়াসেই ১০০ শত গাভী পোষণ করিতে পারে। জমি চষিলে জমি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইবে। ২০০ শত গাভী রাখিবার চালা ও পরিদর্শকের বাসা এবং কুলিদিগের বাসা, কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই করা আবশ্যক। ক্রমশঃ গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চালা এবং কুলির সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে। এইরূপে এককালীন খরচ হইবে —

এককালীন খরচ।

১০০ গাভী বাসের উপযুক্ত চালা (৩,০০০০ স্কোঃ ফুঃ)

	টাকা।
।।৶০ আনা স্কোঃ ফুঃ হিঃ	২০,০০০৲
কুলি এবং কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান	৫,০০০৲
২টি লাঙ্গলে এবং অপরাপর যন্ত্রাদি	১,০০০৲
মোট	২৬,০০০৲

এই টাকা সমস্তই এককালে প্রয়োজন হইবে না। প্রথমে আমাদের ১০,০০০৲ টাকা হইলেই চলিবে। এই টাকা কর্ম্মচারিদিগের ও কুলিদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ক্রয় ও গাভীর চালা নির্ম্মাণের পক্ষে যথেষ্ট। তাহা ছাড়া কয়েক মাসের খরচ চালাইবার জন্য ৩,০০০৲ টাকা অধিক পাওয়া যাইবে।

উপযুক্ত সময় আরম্ভ করিলে ৮৫০ বিঘা জমিই এককালে চাষ করা যাইতে পারে। ৫০০ শত বিঘা কেবল মাত্র ভাল ঘাসের জন্য, ইহাতে একবার লাঙ্গল দিলেই চলিবে। জোয়ার ও অন্যান্য শস্যের জন্য ৩০০ শত বিঘার প্রয়োজন। আবার এক শস্য শেষ হইলে মটর, কলাই, খেসারী প্রভৃতির চাষ করা যাইবে। ইহাতে গরুর নাইট্রোজেন জাতীয় শস্য খাওয়া হইবে। ৫০ বিঘা শাক সবজী ও ধানের জন্য থাকিবে। এইরূপে এই প্রতিষ্ঠান প্রথম হইতেই নিজ উৎপন্ন দ্রব্যেই চলিতে পারে। ইহাতে এককালীন টাকা কম লাগিবে।

তৃতীয় বৎসরের পর হইতেই কর্পোরেশন ক্ষেত্র-জাত শিশু হইতেও কিছু অর্থাগম হইবে। প্রথমে বৎসরে এই শিশু যে সকল ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে তাঁহারাই ইহার খাওয়ার খরচ দিবেন। পরবর্ত্তী দুই বৎসর তাহাদের খাওয়ানর বিশেষ খরচ হইবে না কেননা সমস্ত প্রকার জিনিষই কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবে। মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে খরচ ধরিলেও সর্ব্বসমেত ৫০৲ টাকার অধিক হইবে না। সব শিশুই যদি সবল হয় তাহা হইলে ইহাদের দুগ্ধ, মাতা অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হইবে তাহা ছাড়া বলদ ও বেশ বলিষ্ঠ হইবে। ইহাদের প্রত্যেকের মূল্য ১০০৲ টাকা ধার্য্য হইতে পারে। প্রথম বৎসর কর্পোরেশনে যে ৬০০ শত বাছুর হইবে তাহা হইতে

৫০,০০০৲ টাকা লাভ হইবে এবং প্রত্যেক বৎসরই এই আয় বৃদ্ধি পাইবে।

এইরূপে গোপালনের ব্যবস্থা করিলে খরচ বিশেষ হইবে না। কেননা প্রথমে যে ২৬,০০০৲ টাকা খরচ হইবে তাহা প্রায় প্রথম বৎসরেই উঠিয়া আসিবে; প্রথম বৎসরেই গাভী হইতে আয় হইবে ৫২,৫০০৲ টাকা কিন্তু খরচ হইবে উহার অর্দ্ধেক। পরবর্ত্তী বৎসরে আরও অধিক গাভী পাওয়া যাইবে ইহাতে কার্য্যের উন্নতিই হইবে। প্রথম বৎসরে গাভীনের সংখ্যা শতকরা ৬০ টি ধরা হইয়াছে পরবর্ত্তী বৎসরে উহা শতকরা ৯৫টিতে দাঁড়াইবে। গোময় মাটীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে অধিকন্তু ইহা বিক্রয় করিয়াও যথেষ্ট আয় বাড়িবে। শস্যাদি যাহা অধিক হইবে তাহাতেও আয় বৃদ্ধি হইবে। এই উপায় অনেক ভদ্র গৃহস্থও যাঁহারা সময় ও স্থানাভাবে, গোপালন করিতে পারেন না, তাঁহাদের উৎসাহ দান করিবে। এই উপায়ে গৃহস্থ লাভবানও হইতে পারেন যদি লোকালয়ের মধ্যে ভাল দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহা হইলে বিক্রয়ের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না। আমার এক বন্ধু বলিতেছিলেন যে তাঁহাদের পল্লীতে তিনি প্রতিদিন ৪০ মণ দুগ্ধ বিক্রয় করিতে পারেন। আমি জানি পিঁজরা পোল সমিতি মাড়োয়ারী মহলে দৈনিক ৩৩ মণ করিয়া দুগ্ধ বিক্রয় করে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ যদি অল্পমূল্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে সকলেই কিনিবে।

যাহাতে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোপালন সমিতি কর্পোরেশনের সাহায্য পায় তাহার জন্য আমি অনুরোধ করিব। প্রত্যেক কর্পোরেশনের মাঠে দুপুরে ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত গোচারণ করিতে দেওয়া কর্পোরেশনের উচিত। ইহাতে যে গরুর আহার জুটে তাহা নহে প্রত্যেক প্রাণীরই শরীর সঞ্চালন প্রয়োজন। এইরূপ শরীর সঞ্চালন করিলে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িবে এবং বিশুদ্ধও হইবে। কর্পোরেশন প্রতি গরুর জন্য মাসিক ৷৷০ আনা করিয়া লইলেই মাঠ পরিষ্কার রাখার জন্য কুলি ও অন্যান্য খরচ চালাইতে পারিবে। ইহা ছাড়া কর্পোরেশনের স্থানে স্থানে ছোট আদর্শ গোশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। ইহাতে ১০ হইতে ২০টি গরু রক্ষার স্থান থাকিবে। অল্প ভাড়ায় অথবা বিনা মূল্যে ভদ্রযুবকগণকে প্রথম ৫।৬ মাসের জন্য ধার দেওয়া হইবে। এই সময়ের মধ্যে এই যুবকগণ কাজ শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ গোশালা নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। ইহাদিগের পর কর্পোরেশন সেই গোশালা আবার অপর লোককে দিবে। এই উপায় অল্প হইতে আরম্ভ করিলে প্রত্যেক যুবকের ৪,০০০৲ হাজার টাকার অধিক লাগিবে না। নিম্নে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইল। ২০টি প্রাণী রক্ষার উপযুক্ত গোশালার খরচ :—

১০টি গাভী ১০টি মহিষ।		টাকা।
১০টি গাভী ১২০৲ টাকা হিঃ মূল্য	...	১,২০০৲
১০টি মহিষ ১৮৲ টাকা হিঃ মূল্য	...	১,৮০০৲
স্থায়ী খরচ	... ...	১,০০০৲
	মোট	৪,০০০৲

দৈনিক দুগ্ধের আয়।

১০টি গরু ৬ সের হিঃ	...	৬০ সের
১০টি মহিষ ১০ সের হিঃ	...	১০০ সের
	মোট	১৬০ সের

টাকায় /৩ সের হিঃ দৈনিক আয় ৫৩।০

দৈনিক খরচ।

১০টি গরুর খাওয়ার খরচ ।৶০ হিঃ...৬৷০
১০টি মহিষের খাওয়ার খরচ ১৲ হিঃ...১০৲
৪টি চাকর মাসিক ৯০৲ হিঃ দৈনিক...৩৲

মোট ১৯৷০

এইরূপে দৈনিক ৩৪৲ লাভ হইলে মাসিক ১,০০০৲ টাকা। যদি গড়ে প্রতি গরু ৯ মাস করিয়া দুধ দেয় তাহা হইলেও এই আয়ই যথেষ্ঠ। ইহা হইতে গরু ক্রয় করার ৩,০০০৲ টাকা ফিরৎ আসিবে ও আবার নূতন গরু ক্রয় করা যাইবে। উহা ছাড়া আরও ৩,০০০৲ টাকা থাকিবে তাহা হইতে গরুর বাসের উপযুক্ত চালা করা হইবে আর কিছু লাভ থাকিবে। গরু দুগ্ধহীন হইলে কর্পোরেশনে সেই গরু দেওয়া হইবে এবং অতি অল্পমূল্যে আবার ফিরৎ পাইবেন। সবিশেষ যত্ন করিলে এইরূপ ক্ষুদ্র গোশালার উন্নতি হইতে পারে। কেবল মাত্র উড়িয়া বেহারার উপর নির্ভর না করিলে এই উপায় অনেক যুবকই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন। দুগ্ধ বিশুদ্ধ হইলে তাহা বিক্রয় করিবার অসুবিধা হইবে না। লোকে আপনি আসিয়া দুগ্ধ লইয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে কর্পোরেশন হইতে এই দুগ্ধ পরীক্ষা করা হইবে যাহাতে সাধারণে মূল্যের উপযুক্ত দুগ্ধ পায়।

এইরূপে প্রথম বৎসরে লাভের সংখ্যা দেখিয়া পর বৎসর যদি কলিকাতায় আরও ১০০ শত গোশালা নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে কলিকাতার দুগ্ধ দৈনিক ৪০০ শত মণ বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে দুগ্ধ সরবরাহ অধিক হইলে ও গাভী রাখিবার খরচের অল্পতা হেতু গাভীর দাম কমিলে এই সকল সমিতির লাভের পরিমাণও অধিক হইবে। ক্রমশঃ যদি দুগ্ধের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দুগ্ধের মূল্যও কিঞ্চিৎ হইবে অথচ পূর্ব্বের ন্যায় লাভও হইবে।

আমার আরও একটী বিষয় বলিবার আছে। কলিকাতায় "ফুকা" দেওয়া প্রভৃতি অত্যাচার করিয়া গাভী হত্যা করা হয়। যদি কর্পোরেশন হইতে ফুকা দেওয়া প্রভৃতি ভীষণ অত্যাচার আইনতঃ বন্ধ করিতে পারে তাহা হইলেই গাভী হত্যা বন্ধ হইবে। এইরূপ গাভী কশাই কিনিবেনা সেইজন্য গাভী দুগ্ধহীন হইলেই গোয়ালার লোকসান হইবে। তখন গোয়ালা কর্পোরেশনের গোশালায় খরচ দিয়া এই গরু রাখিতে বাধ্য হইবে অথবা অল্প মূল্যে কর্পোরেশনকে উহা বিক্রয় করিবে। উহারা ক্ষতি স্বীকার করিবে না।

এই প্রস্তাবটি চারিটী বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) কর্পোরেশনে কিম্বা সাধারণের উৎসাহে দুগ্ধহীন গাভী রাখিবার ও তাহাদের সুস্থ শিশু প্রসবের নিমিত্ত একটি গোশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

(২) মধ্যবিত্ত যুবকগণকে ক্ষুদ্র গোশালা নির্ম্মাণে সাহায্য করা এবং উৎসাহ দেওয়া কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য। কলিকাতার সকল মাঠ দ্বিপ্রহরে ২।৩ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকিবে।

(৩) কর্পোরেশনের গোশালা ও মাঠে ভাল বলদ রাখিতে হইবে। সাধারণ ব্যক্তির নিকটও বলদ রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল বলদ কর্পোরেশনের সম্পত্তি থাকিবে কর্পোরেশনের পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(৪) ফুকা দেওয়া প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে।

ইহা হইতে দেখা যায় প্রত্যেক অংশেই অপর অংশের উপর নির্ভর করে।

পাঠকগণকে নিবেদন করিতেছি যে অনুগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধের উন্নতিকর ও কার্য্যকরী সমালোচনা করিয়া কর্পোরেশনকে কলিকাতা সহরে দুগ্ধ সরবরাহের উন্নত উপায় করিতে বাধ্য করুন।

বিবিধ

পঞ্চচত্বারিংশত্তম জাতীয় মহাসমিতি।

করাচী নগরের সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপে মুক্তাকাশ নিম্নে সায়াহ্নে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির পঞ্চচত্বারিংশতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রায় ষাট হাজার দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিন হাজার মহিলা ছিলেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে চারি হাজার প্রতিনিধি মহাসমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দও ছিলেন। অনেক রাজনৈতিক বন্দী পাশ পাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত সদস্য এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বক্তৃতা শুনিতে পান তজ্জন্য মণ্ডপের নানাস্থানে লাউড স্পীকার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। মণ্ডপ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্ববরেণ্য কবিবর রবীন্দ্রনাথের অমর সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৬টার পরই সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল শোভাযাত্রা সহকারে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করেন। তাঁহার পুরোভাগে স্বেচ্ছাসেবকগণ তুইটী সুবৃহৎ পতাকা সহ অগ্রসর হইয়াছিল এবং লাল কোর্ত্তার দল বাদ্য বাজাইয়া তাহাদের অনুগমন করিয়াছিল। এই শোভাযাত্রায় মহাত্মা গান্ধী, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সীমান্ত-নেতা আবতুল গফুর খাঁ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী সমাগত সদস্যদিগের প্রতি সম্বর্দ্ধনা জানাইলে সকলে কিছুক্ষণের জন্য নীরব থাকেন। ৭টা বাজিবার কিছু পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ গিদোয়ানী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণ-পাঠ শেষ হইলে ডাঃ গিদোয়ানী সদস্যদিগের মঞ্চোপরি আরোহণ করেন এবং তথা হইতে তিনি সভাপতি সর্দ্দার বল্লভ ভাই পেটেলের হস্তে সভার কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন। অতঃপর সভাপতি সর্দ্দারজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অবিশ্রান্ত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির ভিতর বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করেন।

এই বিরাট অধিবেশনে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আজমীঢ় —২০১, বোম্বাই—২১, আসাম ৩০, বেরার ৪৭, ব্রহ্ম—১৯০, বঙ্গ ২০৫, বিহার—২১৬, মধ্যপ্রদেশ—৯১, দিল্লী ৮৩, গুজরাট—১৭৪, কর্ণাটক—২০২, কেরল—৬২, মধ্যপ্রদেশ (মারাঠি) ৪২, তামিল নাড়ু —১৮৬, মহারাষ্ট্র—২০৭, পাঞ্জাব—৩৩০, সিন্ধু— ৬৭, যুক্তপ্রদেশ—৫৪৬, অন্ধ্র—২৪৯, উৎকল—১৫, সীমান্তপ্রদেশ —৩০।

দিবসত্রয় মহাসমারোহে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশ হইয়া গিয়াছে।

ভগবৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী।

গত ২৩এ মার্চ্চ সন্ধ্যা পৌণে সাতটার সময় লাহোর সেনট্রাল জেলে লাহোর স্যাণ্ডার্শ হত্যা মামলার আসামী সর্দ্দার ভগবৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

মহিলার কৃতিত্ব।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি-এস-সি পরীক্ষায় স্বর্গীয় জননায়ক আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী শ্রীমতী উমা বসু সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য স্বর্ণপদক এবং শান্তিমণি রৌপ্যপদক পাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারসিপ এবং এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজির জন্য অপর স্বতন্ত্র পদক পাইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই এইরূপ সম্মান প্রথম লাভ করিলেন।

খদ্দরের কাটতি—

নিখিল ভারত কাটুনি সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ—১৯২৮-২৯ সনে সমগ্র ভারতে ১২ লক্ষ ৩৩৭৮৬ গজ এবং ১৯২৯-৩০ সনে ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৭ গজ খদ্দর তৈরী হইয়াছে। উহার বিক্রয়ও অনুপাত অনুযায়ী বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ সনে বিক্রয় হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার ১২৭ টাকা এবং ১৯২৯-৩০ সনে হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬৮২ টাকা। ১৯৩০ সনে খদ্দরের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে খদ্দরের বুনন বৃদ্ধি না পাওয়ায় মূল্য হ্রাস না হইয়া বরং অনেক স্থানে বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

* * * *

প্যারি সহরে মটরবাসের আজকাল কণ্ডক্টর থাকেনা। গাড়ীতে উঠিবার পাদানির সামনে একটী কলে গন্তব্য স্থানের টিকিটের মূল্য দিলে টিকেটখানা বাহির হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলিয়া যায়। যাত্রী আসন গ্রহণ করিলে পর দরজাটী আপনা হইতেই বন্ধ হয়। নামিবার সময় বেল টানিয়া দিলে দরজা খুলিয়া যায় এবং যাত্রী নামা মাত্রই আবার উহা বন্ধ হয়। এই দরজা দিয়া একজনের বেশী লোক প্রবেশ করিতে পারেনা।

* * *

আমেরিকায় কালিফর্ণিয়ায় এবং ইউরোপের ইটালী, স্পেন ও অষ্ট্রীয়া দেশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইতেছে। ইটালীর উত্তর প্রান্তে জলা প্রদেশে প্রতি বৎসর ১,০৭,৪৩,০৫০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থানে গমভোজী লোকেরা ক্রমশঃ ভাত খাইতে অভ্যস্ত হইতেছে। ইটালীর কৃষকেরা বিদেশে প্রচুর চাউল রপ্তানি করিয়া থাকে। তাহারা চাউলে একপ্রকার উদ্ভিজ্জাত তৈল মাখাইয়া থাকে। ইহাতে চাউল অতি চাকচিক্যময় হয় এবং ভাতও খুব সুন্দর দেখায়।

* * *

মধুমক্ষিকার হুলে যে বিষ থাকে উহা র‍্যাটল্ সর্প বিষের অনুরূপ বলিয়া সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

* * *

সম্প্রতি কানাডার নূতন এক কলের সাহায্যে একজন লোকে প্রত্যহ ৪০ একর জমির শস্য কাটিতে বীজ ছাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে।

* * *

মার্কিনে গত বৎসর সিনেমার কারবারে খরচ হইয়াছে ৩,৬১,৭২,৮৬৫ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে লোকজনের বেতন দিতে হইয়াছে ১,১৭,৮৪,০০৩ পাউণ্ড।

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাব পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে [illegible]লাইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর [illegible] অসমর্থ

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি

(সত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, কলিকা।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtallah Street, Calcutta.

সম্পাদক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল ও

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল্. এ. এম্. এম্

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বেশ্বর রস

দেশীয় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত বটিকা

এপর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের এমন আশ্চর্য্য মহৌষধ আর কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। প্লীহা ও লিভারের এমন মহৌষধ আর নাই।

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি বলেনঃ—

অনুবাদ—"আমার দুইটী সন্তান ক্রমাগত পাঁচ সপ্তাহ ও তিন সপ্তাহ ধরিয়া কষ্ট পাইতেছিল। অধিক পরিমাণে কুইনাইন ও এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা ব্যবহারে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রথম দিন সেবন করাতেই জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। সেই অবধি যখনই আবশ্যক হয়, আমার নিজ পরিবারের ও আমার বন্ধুবান্ধবের পরিবার মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইতেছি।" মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা। তিন কৌটা ২৸০ ভিঃ পিঃ তে লইলে আরও ।৵০ আনা বেশী লাগে।

ডাক্তার কুণ্ডু এণ্ড চ্যাটার্জ্জি (Febrona Ltd)
২৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাতি মার্কা

বেঙ্গল রিলিফ বাম

বাতবেদনা, শিরঃপীড়া, ও ক্ষতরোগের মহৌষধ

প্রতি শিশি ।০ ও ।।০

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

হেড অফিস—১৮ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

হিন্দু বিবাহ সমিতি। পণপ্রথা নিবারণী সভা

ঘটক দ্বারা বিবাহ স্থির করিয়া তবে পারিশ্রমিক লওয়া হয়। রেজিষ্ট্রী ফী ১৲ টাকা।

এস্‌ গোস্বামী—২৫নং ছুতারপাড়া লেন বৌবাজার পোঃ কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

৯০।৭এ নং হ্যারিসন রোড,—৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট—
হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি পুস্তক বিক্রেতা।

সাধারণ ঔষধের মূল্য—অরিষ্ট ।৵০ প্রতি ড্রাম ১ হইতে ১২ ক্রম ।০ প্রতি ড্রাম ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ।৵০ প্রতি ড্রাম ২০০ ক্রম ১৲ প্রতি ড্রাম।

সরল গৃহ চিকিৎসা—গৃহস্থ ও ভ্রমণকারীর উপযোগী, কাপড়ে বাঁধান ৪৪০ পৃঃ মূল্য ২৲ টাকা ২য় সংস্করণ।

ইনফ্যান্টাইল লিভার—ডাঃ ডি, এন, রায়, এম, ডি, কৃত ইংরাজী পুস্তক—মূল্য ১৮১ পৃঃ কাপড়ে বাঁধান মূল্য ২।।০ টাকা।

পুনঃরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে।

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

ইহা ধারণে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্য গুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন। তান্ত্রিকসহকারে মন্ত্রঃপূত কবচ ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত করা, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ চোর ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ, ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। মহারাজা ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিয়াছেন।

কর্ম্মকর্ত্তা—**রামময় আশ্রম**, কুণ্ডা পোঃ
বৈদ্যনাথ ধাম, (এস, পি)

ভারতীয় পোলট্রী সমাচার

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদক শ্রীফণীভূষণ ভট্টাচার্য্য

৮৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি
(সত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকা।

নবম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮। [৪র্থ সংখ্যা

ওলাউঠা

(বিসূচিকা কলেরা)

(ডাঃ বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী, D. P. H, Deputy Director of Public Health)

ওলাউঠা বঙ্গদেশের একটী স্থায়ী রোগ। ইদানীং এই রোগে প্রতিবৎসর গড়ে সমগ্র বঙ্গে ৫০,০০০, ও এই কলিকাতা নগরীতেই, ১,৪০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রতি বৎসরই কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে ইহার মোউসুম আরম্ভ হয়, ইহা দেশের নানা স্থানে মড়কের আকার ধারণ করে, ও মাঘ মাসের প্রবল শীতে মন্দীভূত থাকিয়া, বসন্তকালের শেষ পর্য্যন্ত সতেজে চলিতে থাকে। তাহার পর গ্রীষ্মে ও বিশেষতঃ বর্ষার আবির্ভাবে, প্রচ্ছন্ন হইয়া বৎসরের বাকী কয় মাস অতিবাহিত করে। মোউসুমে ইহা যেমন ব্যাপক হয়, তেমনই সাংঘাতিক হইয়া উঠে শতকরা ৫০টী রোগীও অনেক সময় রক্ষা পায় না। কখন কখন শতকরা ২০ জন মাত্র বাঁচিয়া যায়। কিন্তু ইহার চিকিৎসার সমধিক উন্নতি হইয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান উন্নত প্রণালীতে চিকিৎসিত হয়, তাহাদিগের মৃত্যুহার শতকরা ৩০এরও অধিক উঠে না; প্রচ্ছন্ন অবস্থায়, কখন এগ্রামে কখন ওগ্রামে, দুই এক জনের রোগ হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহা প্রায় ছড়ায় না ও তত মারাত্মকও হয় না।

সকল ব্যাপারেরই কারণ থাকে; কারণ না থাকলে সেই ব্যাপারও থাকিতে পারে না। ওলাউঠার কারণ কি? অধিকাংশ সভ্যদেশে ইহা বাহিত হইলেও ছড়াইতে পায় না, আমাদিগের দেশে ইহা ছড়ায় কেন? এই সকল দেশে ইহা স্থানীয় নহে, আগন্তুক মাত্র, আমাদিগের দেশে ইহা স্থায়ী কেন? কি করিয়াই বা এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অল্পাধিক কাল অদৃশ্য থাকিয়া পুনরায় দেখা দেয়? আমাদিগের দেশের

ন্যায় জাভাদ্বীপে ও চোসেন (কোরিয়া) দেশেও ইহা স্থায়ী ছিল, কতকাল ধরিয়া এই দুই দেশেও আমাদিগের দেশেরই ন্যায় লোক সংহার করিয়াছিল, এই উভয় দেশ হইতেই ইহা সম্পূর্ণরূপে তাড়িত হইয়াছে ; কি কারণে ইহা দেশ দুইটিতে লুপ্ত হইল ? আমাদিগের দেশই বা কেন এই কলঙ্ক হইতে মুক্তি-লাভ করিবে না ?

ওলাউঠার কারণ কি ?

ওলাউঠা একটি সংক্রামক রোগ। তাড়ি হইতে গাদ প্রয়োগে তাজা রস গাঁজিয়া উঠে, রোগী হইতে সুস্থদেহ তেমনই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় ; যেমন রস গাঁজিয়া তাড়ি হইবার কারণকে ঐ তাড়ির বীজ বলে, তেমনই যাবতীয় সংক্রামক রোগের কারণকে সেই সেই রোগের বীজ বলে। ওলাউঠার কারণ বা বীজ এক প্রকার বীজাণু—অতিক্ষুদ্র জীব, এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিকাংশ সংক্রামক রোগের বীজই অতিক্ষুদ্র, এই সকল রোগের বীজকে সেইজন্য স্তত্ৎ রোগের বীজাণুও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই প্রাণিগুলিকে কীটাণু বলিতে চাহেন, কিন্তু ইহারা কীট বা কীটাণু ত নহেই, ইহারা জন্তুও নহে, ইহারা উদ্ভিদ্ জন্তুই হউক, উদ্ভিদই হউক, প্রাণি মাত্রেরই দেহ জীবন্ত জিনিস বা প্রোটো-প্লাস্‌ম্ দিয়া নির্ম্মিত। পাকা গৃহের প্রাচীরের উপাদান, যেমন পৃথক্ পৃথক্ ইষ্টকরূপে থাকে, দেহও তেমনই অসংখ্য আনুবীক্ষণিক জীবন্ত জিনিষের পিণ্ডের সমষ্টি। কিন্তু সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর প্রাণিদিগের শরীর এক একটি পিণ্ডমাত্র, এইরূপ জন্তুকে প্রোটোজু বা প্রাথমিক জন্তু ও এইরূপ উদ্ভিদকে প্রোটোফাইট বা প্রাথমিক উদ্ভিদ্ বলে। ওলাউঠার জীবাণু এক প্রকার প্রাথমিক উদ্ভিদ্। প্রাথমিক উদ্ভিদ-দিগেরও নানা জাতি ও উপজাতি আছে, ওলাউঠার জীবাণু ব্যাক্টেরিয়া জাতির অন্তর্গত ব্যাসিলাস জাতীয়, ইহাদের আকৃতি কতকটা কমা বা প্রথমচ্ছেদের মত, সেইজন্য ইহাকে কমা ব্যাসিলাসও বলা হয়। উদ্ভিদ্ হইলেও ইহারা গতিশীল ও অত্যন্ত চঞ্চল। ব্যাক্টে-রিয়া তত্ত্ববিশারদ জার্ম্মাণি দেশীয় মহামান্য কক্ ১৮৮৩ অব্দে ইহাকে প্রথম আবিষ্কার করেন, তদবধি আমরা দেখিতেছি যে ওলাউঠা রোগ ককের আবিষ্কৃত এই কমা ব্যাসিলাস কর্ত্তৃক আমাদিগের দেহের আক্রমণের ফল, কমা ব্যাসিলাস শরীরে প্রবেশ না করিলে ওলাউঠা কিছুতেই হইতে পারে না।

ওলাউঠার জীবাণু বা কমা ব্যাসিলাস্ কোথায় থাকে ?

মানুষের শরীরই ইহাদিগের একমাত্র বাসস্থান। ওলাউঠা রোগীর মল খালি ওলাউঠা জীবাণুর মিশ্রণ মাত্র, ইহাতে অপর জীবাণু অতি অল্পই থাকে ; এই মলের প্রতিবিন্দুতে অসংখ্য অসংখ্য ওলাউঠার জীবাণু দ্রুতগতিতে দলে দলে ইতস্ততঃ সাঁতার দিতে থাকে। কোন কোন সুস্থলোকের মলেও কখন কখন কমা ব্যাসিলাস্ পাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর খালি একাকী থাকে না, আমাদিগের অন্ত্রে স্বভাবতঃ বিস্তর ব্যাক্টেরীয়া বাস করে, অধিকাংশই ব্যাসিলাস জাতীয় ; আমাদিগের স্বাভাবিক মলের বার আনার অধিক জল, জমাট ভাগ ।০ চারি আনার ও কম, এই ।০ আনার মধ্যে নূন্যাধিক /০ আনা কেবল ব্যাক্‌টেরিয়া, সুস্থলোকের মল যে কমা ব্যাসিলাস পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের অন্ত্রের এই সকল স্বাভাবিক অধিবাসী ব্যাক্‌টেরিয়াদিগের সহিত মিশ্রিত ভাবে অতি অল্পসংখ্যায় থাকে ; এই প্রকার কমা ব্যাসিলাসবাহী সুস্থলোকদিগের ওলাউঠা রোগের

বাহক বলে। ওলাউঠা রোগী সুস্থ হইয়া যাইবার পর, অল্পাধিক কাল, কেহ কেহ দীর্ঘকাল, এই জীবাণুকে বহন ও মলের সহিত নির্গত করিতে থাকে, ইহারা রোগমুক্ত বাহক। ওলাউঠা রোগে কখন ভোগে নাই, এমনও কোন কোন লোকের মলে কখন কখন কমা ব্যাসিলাস পাওয়া যায়, ইহারা রোগহীন বাহক।

ওলাউঠার জীবাণু কেমন করিয়া আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে? জল। (১) আমাদিগের দেশে লোকেরা সাধারণতঃ নদীর বা পুষ্করিণীর জল পান করেন; ও যে ঘাটের জল পান করেন সেই ঘাটেই শৌচ করেন, মলদূষিত বস্ত্রাদি কাচেন, ও স্নান করেন, কখন কখন রোগীর মলপূর্ণ সরাবাদিও ঐ জলে বা উহার নিকটেই ফেলিয়া থাকেন। মলে কমা ব্যাসিলাস থাকিলে উহারা জলে মিশিয়া যায়। নদীর ঘাট হইলে, স্রোতে ক্রমশঃ উহারা স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে; (অনেকে জানেন গঙ্গার জলে কমা ব্যাসিলাস বেশী দিন বাঁচেনা; কিন্তু ইহা গঙ্গা-জলের বিশেষ ধর্ম্ম নহে, কি নদী কি পুষ্করিণী,) প্রাকৃত জলমাত্রেই কমা ব্যাসিলাস ২।১ দিনেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও ২।৩ সপ্তাহেই সচরাচর মরিয়া যায়। (কিন্তু যখন জল রোগীর মলে দূষিত হইতে থাকে, তখনই বা অনতিবিলম্বেই গ্রামের লোকে ঐ জল বাটী লইয়া আইসে)।

(ক) এইরূপ দূষিত জল পান করিলে, উহার সহিত কমা ব্যাসিলাস পানকারীর শরীরে প্রবেশ করে। কলিকাতার লোকে কলের জল পান করিয়া থাকেন; এই কলের জল পরীক্ষা করিবার আমার অনেকবার সুযোগ হইয়াছে, আমি প্রতিবারই দেখিয়াছি উহা নিতান্ত নিষ্ফল, উহার শুদ্ধতায় সন্দেহ অমূলক।

কিন্তু এখনও এমন অধিবাসী, বিশেষতঃ অধি-বাসিনী, কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা, গঙ্গা হইতে আনিত জলই পান করিয়া থাকেন। একবার অর্দ্ধোদয় যোগের পর কলিকাতা কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরীর তাৎকালিক ভূতপূর্ব্ব ব্যাক্টেরিয়া তত্ত্ব-বিদ পরীক্ষকের বাটীতে তাঁহার এক আত্মীয়া ওলাউঠায় মারা যান। ইঁহার পানীয় জলের কলসীতে কিছু জল ছিল, ব্যাক্টেরিয়া তত্ত্ববিদ্ মহাশয় তাহা পরীক্ষা করিয়া কমা ব্যাসিলাস পাইয়াছিলেন।

পর্ব্বোপলক্ষে দেশের নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগমে গঙ্গার জলে কমা ব্যাসিলাসের মেশার বিশেষ সুযোগ হইয়া পড়ে; উপরোক্ত মহিলাটীর শরীরে কমা ব্যাসিলাস প্রবেশ করে অর্দ্ধোদয় যোগের যাত্রী-দিগের স্নানে দূষিত গঙ্গা জলে। কালীঘাটের আদি গঙ্গার জল পর্ব্বাদিতে অতীব দূষিত হয়; ডাঃ সিম্‌সন্ কলিকাতা হেল্‌থ অফিসার থাকিতে একবার কালী-মন্দির হইতে চরণামৃত আনাইয়া দেখেন উহা কমা ব্যাসিলাস পূর্ণ। (টালা প্রভৃতি উপকণ্ঠ গ্রামগুলি হইতে কখন কখন বিশেষতঃ পৌষ মাসে, নারীগণ দল বাঁধিয়া কালীঘাটে যান, আমি কতবার দেখিয়াছি তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগের পল্লীতে ওলাউঠা আরম্ভ হয়।)

(খ) এইরূপ জলে আচমন ও কুলকুচা করাতেও কমা ব্যাসিলাস শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। (গঙ্গার জল পান না করিলেও কলিকাতার অনেক হিন্দু উহা আচমন করেন; অনেকে গঙ্গা স্নান করেন, স্নানের সময়ে ঐ জলে কুলকুচা করেন)।

(গ) ঐরূপ দূষিত জলে আর্দ্র থালা, বাটী,

গেলাসে, খাদ্য, দুগ্ধ, জল রাখাতে ও আহারকারী ও পানকারীর শরীরে কমা ব্যাসিলাস প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। পাইখানা ও নর্দ্দমা ধোয়ার জন্য ময়লা জলের যে ট্যাঙ্ক থাকে, কোন কোন বাটীতে কর্পোরেশনের অগোচরে ঐ জলে খাদ্য পানীয়ের পাত্র ধোয়া হয় ও আর্দ্র অবস্থাতেই উহাতে খাদ্যাদি রাখা হয়।

(ঘ) এইরূপে জল দুগ্ধে মিশ্রিত হইলে, ঐ দুগ্ধে কমা ব্যাসিলাস সত্বর সংখ্যায় রাশি রাশি হইয়া পড়ে। আমাদিগের দেশে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাওয়া হয়, তাহা না হইলে সর্ব্বনাশ হইত। কিন্তু কখন কখন দুগ্ধ কতকগুলি বাটীতে লওয়া হয়, পরে উহা হইতে কটাহে ঢালিয়া জ্বাল দেওয়া হয়, বাটীগুলিকে একটু জলে ধুইয়া রাখা হয়। কেবল জল দিয়া ধুইলে, সমস্ত ব্যাসিলাস উঠিয়া যায় না ; পরে দুগ্ধ শীতল হইয়া আসিলে ঐ সকল বাটীতে পুনরায় ঢালা হয়, তখন উহাদিগের গাত্রে লগ্ন কমা ব্যাসিলাস পুনর্ব্বার দুগ্ধে সংখ্যায় বাড়িতে আরম্ভ করে, ও দুগ্ধের সহিত পানকারীর শরীরে প্রবেশ লাভ করে।

(২) কোন কোন গ্রামে লোকেরা কূপের জল পান করেন। কূপগুলি সাধারণতঃ মুখ খোলা, মৃন্ময় পাটে বেষ্টিত পাতকূয়া, অথবা ইষ্টক নির্ম্মিত ইন্দারা। কূপে ওলাউঠার জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা নদী বা পুষ্করিণীর মত এত নহে। তথাপি :—

(ক) কূপের ধারে বা নিকটে স্নান করিলে, বস্ত্রাদি কাচিলে, মল থাকিলে, দূষিত জল মাটির ভিতর দিয়া নামিতে থাকে, ও যদি কূপটি পাতকূয়া হয়, তাহা হইলে পাটগুলির ব্যবধান দিয়া সহজেই উহা ঐ কূপের জলে পতিত হয় ; যদি উহাতে ওলাউঠার জীবাণু থাকে, তাহা হইলে তাহাও ঐ জলে মিলিত হয়। ইন্দারার গাত্র পাকা, উহার ভিতর দিয়া উপরের দূষিত জল প্রবেশ করিতে পারে না ; মাটির ভিতর দিয়া কূপের জলে নামিতে পারে বটে, কিন্তু অতদূর মাটির ভিতর দিয়া নামিলে উহার সহিত কমা ব্যাসিলাসের নামা সম্ভব হয় না।

(খ) যদি কূপের পাড় ভাঙ্গা থাকে, অথবা যদি কূপের পাড়ের উপর বসিয়া স্নান করা হয় বা উহাতে কাপড় কাচা হয়, তাহা হইলে দূষিত জল সত্ত্বঃ কূপের ভিতরে গিয়া পড়ে।

(গ) লোকেরা নিজ নিজ বাটীর ঘড়া, ঘটী, বাল্‌তি অনেক সময় কূপে নামাইয়া থাকে ; যদি কোনও ওলাউঠা রোগীর মলদূষিত অঙ্গন বা মেঝে হইতে আনীত ঐরূপ পাত্র কূপে নামান হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত ওলাউঠার জীবাণুও কূপের জলে গিয়া পড়ে।

(ঘ) উত্তরবঙ্গে কতকগুলি ফকির আছে যাহারা ওলাউঠাকে আক্রান্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চালাইয়া দিয়া গ্রামবাসিদিগের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহারা আক্রান্ত গ্রামের কোনও রোগীর মল, লোকদিগের অজ্ঞাতসারে অপর গ্রামের কোনও কূপে নিক্ষেপ করে, গ্রামবাসিরা না জানিয়া সেই জল পান করিতে থাকে, ফলে তথায় ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব ও প্রসার হয় ; এদিকে পূর্ব্ব আক্রান্ত গ্রামে রোগ স্বভাবতঃই থামিয়া আইসে, আর অজ্ঞ গ্রামবাসীরা উহা ফকিরের কৃতিত্ব মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হয়।

২। মক্ষিকা। মক্ষিকার পদ ও গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম আছে, ঐ লোমগুলি থাকায়, উহারা তুলির কার্য্য করে ; যখন কোনও মলে বইসে, তখন উহাদিগকে লোমশ গাত্র ও পাদ ঐ মল লিপ্ত হইয়া

যায়, তাহার পর যদি কোনও খাদ্যে বইসে, তাহা হইলে তুলির মত হইয়া ঐ মল খাদ্যে বুলাইয়া দেয় ; এই মলে কমা ব্যাসিলাস থাকিলে, উহাও ঐ খাদ্যে লাগিয়া যায় কমা ব্যাসিলাস সূর্য্যকিরণে সত্বর মরিয়া যায়। ইহারা শুষ্ক হইলেও জীবিত থাকে না। সুতরাং ইহাদিগের শরীরে লগ্ন মল হইতে কমা ব্যাসিলাসের আমাদিগের খাদ্যাদিতে আসিবার অবকাশ অল্পকালস্থায়ী।

কিন্তু রোমন্থনকারী পশুদিগের ন্যায়, ইহাদিগেরও উদরে আমাশয়ে লগ্ন একটি থলি আছে, উহারা মলাদিতে বসিলে, প্রথমতঃ ঐ থলিটিকে পূর্ণ করে, পরে কোথাও বসিয়া, থলি হইতে ঐ সকল দ্রব্য শুঁড়ের ভিতর দিয়া একবার বাহির করে, উহা বিন্দুর আকারে শুণ্ড হইতে ঝুলিতে থাকে, এবং যাহাতে বসে, তাহাতে লাগিয়া যায়, আবার উহাকে শুণ্ডদিয়া শুষিয়া লয়, এইরূপে ক্রমশঃ উহাকে প্রকৃত আমাশয়ে চালিত ও জীর্ণ করে। দুগ্ধের সরে বা অন্য কোন খাদ্যে বসিয়া এইরূপ করিলে ঐ মল পরিপাটিরূপে ঐ দুগ্ধে বা খাদ্যে মাখিয়া যায়, উহাতে কমা ব্যাসিলাস থাকিলে, উহাও ঐ খাদ্য বা দুগ্ধে চালিত হয়। মাছির গাত্রের উপরের কমা ব্যাসিলাস সহজেই মরিয়া যায়, কিন্তু উহাদিগের উদরের থলির মধ্যে নিরাপদে কিছুদিন থাকিতে পারে।

কখন কখন ওলাউঠা-মল-দূষিত মক্ষিকা পানীয় জলে পড়িয়া গিয়া ঐ জলে কমা ব্যাসিলাস চালিত করে।

৩। হাত। ওলাউঠা রোগীর পরিচর্য্যা করিলে, তাহার মল, মললিপ্ত শরীরে ও বস্ত্রাদির সংস্রবে শুশ্রূষাকারির হস্তে কমা ব্যাসিলাস লাগিয়া যায়। সামান্য জল দিয়া ধুইলে উহা উঠিয়া যায় না। হাতে অনেক ব্যাসিলাস পড়িয়া থাকে ; এইরূপে হস্তে খাদ্য, দুগ্ধ, বা জল স্পৃষ্ট হইলে, ঐ সকল খাদ্য ও পানীয় কমা ব্যাসিলাসযুক্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বকথিত ওলাউঠা বাহকগণের হস্তে শৌচাদি ক্রিয়ার ফলে কখন কখন কমা ব্যাসিলাস লাগিয়া থাকে, ও তাহা খাদ্যে বা পানীয় জলে চালিত হইয়া সুস্থলোকের শরীরে সংক্রামিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শিশুকে কিরূপে খাওয়ান উচিত

শিশুগণকে বিবেচনা পূর্ব্বক খাইতে না দিলে তাহাদের পীড়া হইয়া থাকে। শিশুগণের ব্যাধির ইহা একটী প্রধান কারণ। পরিপাক শক্তি কোনও-রূপে বাধা প্রাপ্ত হইলেই শিশুগণ পীড়িত হইয়া পড়ে এবং বহুশিশুর অকাল মৃত্যু এই কারণের জন্য দায়ী। খর্ব্বকায়, ক্ষীণাঙ্গ ও অপরিপুষ্ট শিশুকে তাহার আবশ্যক মত খাইতে দিলে সে অচিরে সুস্থ-কায় ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। খাদ্যের প্রায় অভাব হয় না, কারণ মাতা ভ্রান্ত স্নেহবশে প্রায়ই শিশুর মুখে যখন তখন খাদ্য গুঁজিয়া দিয়া থাকেন। যে খাদ্য তাহারা ভক্ষণ করে তাহার উচিত মত পরি-পাকের অভাব হেতু তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই শিশু ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেই মাতা তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য কিছু না কিছু তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাতে শিশুর অমঙ্গল সাধন করা হইয়া থাকে। শিশুকে খাইতে দেওয়া সম্বন্ধে নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য এবং বয়স, স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠন অনুসারে কতক্ষণ অন্তর তাহাকে খাইতে দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার জন্য খুব অল্প শিশুই ক্রন্দন করিয়া থাকে। অনেক স্থলে অতি ভোজনের জন্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে শিশু ক্রন্দন করে। সে সব স্থলে একটু গরম জল পান করাইয়া দিলে বা সহ্য করিতে পারে এরূপ গরম জলের সাহায্যে foment করিলে শীঘ্র যন্ত্রণার উপশম বা লাঘব হইয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন থামাইবার জন্য কদাচ তাহার মুখে খাদ্য প্রবেশ করাইয়া দিবেনা—কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন হয়ত শিশু অন্য কোনও কারণে ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ ভাবে ক্রন্দন থামাইবার চেষ্টা করিলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়া শিশু অকালে ধরাধাম ত্যাগ করিতে পারে।

শিশুর পক্ষে মাতৃ দুগ্ধই উৎকৃষ্ট খাদ্য; সম্ভব হইলে ১০।১২ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে স্তন্য দান করা উচিত। যে সকল বালক বালিকা সুস্থ এবং যাহাদের দৈহিক গঠনে কোনরূপ ত্রুটী লক্ষিত হয় না, তাহাদের পক্ষে পাঁচবার ভক্ষণই যথেষ্ট, রাত্রে একবার ও দিবসে চারিবার। প্রথম দুই মাস এ নিয়মে খাওয়াইবার প্রয়োজন নাই। চারি হইতে

আট মাস বয়স্ক শিশুকে চারি বা পাঁচ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত। প্রথম বৎসরের পর দিবসে তিন-বার খাইতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। দুইবার খাওয়া-ইবার মধ্যে একবার কোনও পুষ্টিকর পানীয় দান করা আবশ্যক হইতে পারে। রাত্রে শিশুর যাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুর যাহাতে রাত্রে স্তন্য পানের অভ্যাস না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইলে নিদ্রার পূর্ব্বে feed bottleএর সাহায্যে তাহাকে দুগ্ধ পান না করাইয়া কিছু গরম জল পান করান কর্ত্তব্য। দুই চারি দিন এরূপ করিলে শিশুর গরম জল পান করা অভ্যাস হইবে এবং এইরূপ অভ্যাস হইলে শিশু গরম জল পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িবে। যে সকল শিশু দুর্ব্বল দেহ, যাহারা অকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ক্ষীণকায় আবশ্যক মত তাহাদিগকে সুস্থকায় শিশু অপেক্ষা অনেকবার বেশী খাওয়াইতে হইবে।

স্তন্য পান করিতে ২ কিম্বা feeding bottle মুখে দিয়া শিশুকে নিদ্রা যাইতে দেওয়া উচিত নয়। যাহারা শিশুকে আরাম দিবার অভিপ্রায়ে এরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের জানা উচিত যে ইহা বিজ্ঞানসম্মত কার্য্য নহে; উহাতে শিশুর মুখামৃত অযথা নষ্ট করিয়া থাকে। শিশু ক্রন্দন করিলেই তাহাকে শর্করা, রবারের স্তন বা মিষ্টান্ন প্রদান করা উচিত নয়। অনেক মাতা শিশুর জন্মের কয়েক দিবস পর্য্যন্ত তাহাকে জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দেন, সেরূপ করিলে শিশুর পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। শিশুকে চা পান করিতে দিবেনা; নির্ম্মল জল পানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

মাতার স্তনে যদি প্রচুর দুগ্ধ না থাকে, এবং যে দুগ্ধ থাকে তাহা শিশুর জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে তাহাকে মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। Feeding bottle এবং কৃত্রিম স্তন প্রায় অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে, সুতরাং তাহা হইতে না খাওয়াইয়া চামচের সাহায্যে খাওয়ান অভ্যাস করা উচিত। ইহাতে হয়ত মাতার সময় কিছু নষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যে সুফল ফলিয়া থাকে তাহার তুলনায় এই সময় নষ্ট বিশেষ ক্ষতিকারক হয় না।

অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু দুরারোগ্য উদরাময় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে। দুগ্ধ সম্বন্ধে অসাবধান হইলে প্রায়ই এরূপ উদরাময় হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে শিশুর দুগ্ধ যাহাতে বিকৃত না হয় তাহার সুব্যবস্থা করা উচিত। দুগ্ধকে গ্রীষ্মকালে যদি খুব শীতল করিয়া রাখিতে পারা যায় তবে তাহা সহজে বিকৃত হয় না। দুগ্ধকে ফুটাইয়া না পান করিলে অনেকরূপ বিপদের সম্ভাবনা থাকে; দুগ্ধকে উত্তপ্ত করিলে উপরে একপ্রকার কোমল পাতলা পরদাপড়ে; উহাকে চলিত ভাষায় 'সর' বলে; ঐরূপ সরযুক্ত দুগ্ধ কাঁচাদুগ্ধ অপেক্ষা সহজে পরিপাক হয়। মানবশিশুর পক্ষে ঐরূপ প্রস্তুত গোদুগ্ধ বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। দুগ্ধ ফুটাইলে অবশ্য তাহার অভ্যন্তস্থ জীবনীশক্তি অর্থাৎ ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়; এই ত্রুটী পূরণ করিবার জন্য সুবিধা হইলে দুগ্ধ পান করাইবার কিছুক্ষণ পরে কিছু কমলা-লেবুর রস পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অষ্টম হইতে দশম মাস শিশুকে স্তন্যপান ছাড়াইবার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় ধীরে ধীরে শিশুর খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নবম মাস

হইতে শিশুকে কিছু কিছু ঝোল, দুইবার সেকা পাউরুটী (Twieback), পক্ক ফল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। শিশু এক বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে এবং উল্লিখিত খাদ্য দ্রব্য সমূহ ভক্ষণে কিছু অভ্যস্ত হইলে, তাহার স্তন্য পান বন্ধ করা যাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও খাইতে দিতে হইবে; তবে শিশুকে যেন মাংস, পনির, চা, কফি, মসলাযুক্ত খাদ্য এবং পিষ্টকাদি দুষ্পাচ্য খাদ্য কদাচ খাইতে দেওয়া না হয়। শিশুরা সচরাচর ফল খাইতে ভাল-বাসে। উহাদিগকে সুপক্ক ফল ও ফলের রস খাইতে দেওয়া ভাল। ফলের রস সহজে শিশুর উদরে পরিপাক হইয়া যায়। আপেল ফলের শাঁস, পাকা নাসপতির শাঁস, সুপক্ক পিচ ফলের শাঁস শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশে যে সমস্ত ফল পরিপক্ক হয় শিশুদের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। গোলগাল দেহ গঠণের পক্ষে সুপক্ক ফল ও তাহার রস শিশুগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে ক্ষুধা নিবারণ হয় এরূপ খাদ্য খাইবার অব্যবহিত পরে শিশুকে আর অন্য খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। শিশুকে যদি এসব বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া যায় তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিয়া থাকে। অল্প বয়স হইতে শিশুকে সুশিক্ষা প্রদান করিলে, সে বড় হইয়া ঐ সমস্ত শিক্ষামত কার্য্য করিবে।

সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

নূতন যুগে নূতন মানুষ আমরা সবাই চাই কিন্তু যুগোপযোগী ব্যক্তিত্ব কেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয় কেমন করিয়া নূতন মানুষ গড়িতে হয় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে রুগ্ন দেহমন হইতে ব্যাধির বীজ দূর করিয়া কর্ম্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, তাহা কি আমাদের জানিবার ইচ্ছা হয়না? এই জানিবার প্রবৃত্তিই আমাদিগকে জানার পথে আগাইয়া দেয়।

সত্যিকারের মানুষ একটিও গ'ড়ে ওঠে যেদেশে, সেদেশে রোগ শোক জরা অকালমৃত্যু Epidemic ইত্যাদি অচিরে দূর হয়। তাই প্রথমে খাঁটি মানুষ তৈরী হ'লে অন্য সব Constructive works আপনি গ'ড়ে উঠে।

সৎসঙ্গ আজ খাঁটি মানুষ তৈরী ক'রে খাঁটি ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়ে—genuine medicines নিয়ে দেশবাসীর দ্বারে উপস্থিত। সে ব্যবসায় বুদ্ধি দ্বারা চালিত না হয়ে, শুধু প্রাণে প্রাণে চায় দেশের প্রকৃত কল্যাণ, জাতিকে নীরোগ

সুস্থ ও সবল ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে। শুধু যেমন তেমন করে বেঁচে থাক্‌লে চল্‌বে না, যাতে আমরা বাঁচবার মত বাঁচ্‌তে পারি মানুষের মত মানুষ হ'তে পারি সে চেষ্টা করা কি আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নয় ?

এই সৎ ও শুভ উদ্দেশ্য লইয়া বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে শস্যশ্যামলা মায়ের অঞ্চলতলে সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও প্রতীচ্য এলোপ্যাথিশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়া ভৈষজ্যসমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠিবে, তাহা বর্ত্তমানে ভারতে একমাত্র বাংলার পল্লীতেই সম্ভব। আজ আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া নূতন উন্নততর প্রণালীতে জাতীয় জীবনের অবসাদকারী ও মারাত্মক ব্যাধিগুলির মূল কারণ, বীজাণু তাহার ব্যাপ্তি ও প্রতিকার সম্বন্ধে প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে উপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্যে রীতিমত গবেষণা করিতে হইবে। Medical Society, Chemical Works, Life-Research Society প্রভৃতি স্থাপিত করিতে হইবে।

কোন এক পল্লীতে যদি আমাদের দেহের প্রধান প্রধান ব্যাধি, তাহার কারণ উৎপত্তি ও প্রতিকার সম্বন্ধে উপায় নির্ণয় হয় তবে তাহার ফলে বাংলার সকল পল্লীই উপকৃত হইতে পারে।

স্বচ্ছন্দ বনজাত লতাগুল্মাদি হইতে যে কিরূপ মৃত সঞ্জিবনী ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা না জানার দরুণ আমাদিগকে বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে ঔষধ আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে হয়। বিজাতীয় ভাষায় যেমন মাতৃভাষার অভাব পূরণ করিতে পারে না Condensed Milk যেমন Mother's Milkএর কাজ করিতে পারেনা বিদেশজাত ঔষধও সেইরূপ আমাদের স্বাস্থ্যের অভাব পূরণ করিতে পারে না।

যে ব্যাধি যেখানে প্রবল, তার ঔষধও তার কাছাকাছি গাছগাছড়ায় আছে—পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই আমাদের সকল অভাব পূরণ করে। সামান্য সামান্য দ্রব্যের গুণ লতাগুল্মাদির গুণের বিষয়ে অজ্ঞতাই আজ আমাদের স্বাস্থ্য, জীবন ও অর্থ নষ্টের একমাত্র কারণ।

অনেক সময় ভালরূপ পরীক্ষা না করিয়াই আমরা সাধারণ পদার্থ বা দেশীয় গাছগাছড়াকে মূল্যহীন বলিয়া বিদায় দিই।

দেখিতে পাই বাংলার আজ যে সমস্ত রোগ একটু চেষ্টা করিলেই নিরাকরণ করিতে পারা যায়, একটু সময়মত সাবধান হইলেই প্রতিকার করিতে পারা যায়, তাহাতেই লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে জীর্ণ শীর্ণ ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছে, সহস্র সহস্র ফুলের ন্যায় সুন্দর শিশুগুলি প্রস্ফুটিত হইয়াই আমাদের অজ্ঞতায় অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে, অথচ পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিজ্ঞান ও উদ্যমের বলে সমস্ত রোগ দূর হইতে চলিল। স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, উন্নত দেহধারী বাঙ্গালী আজ কয়জন দেখিতে পাই ? এ সম্বন্ধে কি আজ আমাদের কোনই প্রশ্ন নাই—জাতির এ সমস্যার কি কোনই সমাধান নাই—রোগ, জরা, দারিদ্র্য, মৃত্যু সমস্তই কি বিধির বিধান ?

স্বাস্থ্যহীনতাও রোগ হইতে আসে জাতির উদ্যম ও জন সংখ্যার হ্রাস। বাংলার হিন্দুজাতি আজ মরণোন্মুখে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও অর্দ্ধমৃত ও বীর্যহীন। আমাদের আজ উদ্যম নাই, উৎসাহ নাই, একতা নাই, ইহার প্রধান কারণ কি আমাদের স্বাস্থ্য-হীনতা নয় ?

মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইবার জন্য আজ যদি আমরা পল্লীগ্রাম ভেষজ যন্ত্রাগার না খুলি তবে বিদেশী ঔষধ, পেটেন্ট ইত্যাদির আমদানীতে আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও নষ্ট হইবে এবং দেশের রক্ত, দেশের অর্থ বিদেশে বৃথায় চলিয়া যাইবে—ফলে দেশ আরও দরিদ্র, হীনবল, স্বাস্থ্যহীন হইয়া মরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিবে।

যাহা সত্য ও কল্যাণকর তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জাতীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই স্বাস্থ্য সাধনায় ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ভুলিয়া জনসঙ্ঘের শ্রী, আরোগ্য, বল ও তুষ্টি-বৃদ্ধিই যেন হয় আমাদের বাণিজ্যের সাধনা। এই সাধন-লব্ধ অর্থই সৎসঙ্গের কল্যাণময় কর্ম্মক্ষেত্রকে সমগ্র বাংলায় প্রসারিত করিবার সহায়।

সৎসঙ্গ—বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রে দেশীয় ভেষজ, গাছ গাছড়া ইত্যাদি সহজজাত দ্রব্য সম্বন্ধে নিত্য নূতন অপূর্ব্ব ঔষধাদি আবিষ্কৃত হইয়া পরীক্ষিত হইতেছে। এখানকার স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীগণ, চিকিৎসকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই বিনা বেতনে দেশকল্যাণ যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

জগতে যত দুরারোগ্য ব্যাধি আছে তাহার নিরাকরণই সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের মুখ্য ও প্রথম করণীয়। যে সমস্ত রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহার বিষয় বারান্তরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

ঔষধ বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই দেশের কল্যাণ-কার্য্যে ও নূতন নূতন ঔষধ উদ্ভাবনে ব্যয়িত হইতেছে আশা করি বাংলার পল্লীর এই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানটীর পরিচয় লইবার ও দুরারোগ্য ব্যাধিগুলির আরোগ্য-কারী ঔষধাদি সম্বন্ধে সম্যক জানিবার চেষ্টা করিবেন।

জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি, শুভেচ্ছা পরীক্ষা ও সাহায্যের উপরই ইহার ক্রমোন্নতি নির্ভর করিতেছে। (ক্রমশঃ)

"বিচর্চ্চিকা"

"অনাগত রোগ ও তাহার প্রতিষেধ"

কবিরাজ শ্রীশম্ভু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও ইহার আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। আজ বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, নর-নারী-নির্ব্বিশেষে বিচর্চ্চিকায় আক্রান্ত হইতে জনসমাজে দেখা যাইতেছে। এই ব্যাধি-মারাত্মক না হইলেও কদর্য্য এবং অসাধ্য না হইলেও কষ্ট সাধ্য। ইহার প্রতিকার করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই রোগগ্রস্ত হয়েন তাঁহাদের কষ্টও অশেষ প্রকার।

বিচর্চ্চিকা একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠেরই অন্যতম। ইহার চলিত নাম 'কাউর ঘা'। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত

ব্যক্তির যদি রোগ আরোগ্য করিয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার পুণ্যও যথেষ্ট। আমি হিন্দু, হিন্দুর সকল ধারণা আমি বিশ্বাস করি। উক্ত হইয়াছে ঃ—

"কন্যা কোটী প্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে। বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে। গবাং কোটি প্রদানেন চাশ্বমেধশতেন চ। বৃষোৎসর্গে চ যৎ পুণ্যং তৎপুণ্যং কুষ্ঠ নাশনে।"

—রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা।

ইহার ভাষা কঠিন নহে, সুতরাং অনুবাদের প্রয়োজন নাই। কেবল কুষ্ঠব্যাধি নহে, সকল প্রকার ব্যাধি দূর করিতে পারিলে তাহার পুণ্য আছে। সত্যদর্শী ঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ যদি সুপ্রয়োগ হয় তাহা হইলে প্রায়ই এরূপ ব্যাধি নিবারণ কল্পে বেগ পাইতে হয় না। এজন্য প্রথমে চাই রোগ পরীক্ষা, পরে বিবেচনা সহকারে নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা তথা যাহা খুসী প্রয়োগ করিলে ফল হয় না। যেমন শূল দেখিয়াই 'শূলবজ্রিনী' দেওয়া গেল ফল হইল না। দোষ কাহার ? চিন্তার অভাব বলিয়াই ফল হয় নাই। যদিও বা ফল হয় তাহাতে প্রয়োগকারীর গৌরবের কিছুই নাই। এ গৌরব প্রাপ্তি তাঁহার যিনি ঔষধ কল্পনা করিয়াছেন। সেইজন্য চিকিৎসার যাবতীয় বিষয় আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আবশ্যক।

যে দেশে শৌচাচার প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা আছে, সে দেশে এই প্রকার চর্ম্মরোগ কমই হয়। আমাদের দেবভূমি ভারতবর্ষে এই প্রকার চর্ম্মরোগ কমই দেখা যাইত। আজ জাতি ক্রমেই শৌচাচার ত্যাগ করিয়া অহিত আহার-বিহার করিয়া বেড়াইয়া স্বেচ্ছায় কতকগুলি রোগ ডাকিয়া আনিতেছে ফলে স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

বিচর্চ্চিকা ত্বম্মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া মানব শরীরে প্রকাশিত হয়। মানব শরীরে যে সাতটী ত্বক আছে তন্মধ্যে পঞ্চম ত্বক যাহাকে বেদিনী নামে অভিহিত করা হয় সেই ত্বকেই কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধির অধিষ্ঠান। (এই সাতটী ত্বক মাংসল স্থলেই দৃষ্ট হয়) প্রথমে স্ফোটকরূপে নর-নারীর শরীরে বিচর্চ্চিকা প্রকাশ পায় এবং হস্ত পদাদির গরম অনুভব হয়। পরে সেই স্ফোটক গলিয়া গেলে চুলকাইতে থাকে এবং সাথে সাথে আরো স্ফোটক বাহির হইতে থাকে। এইরূপে ক্ষতস্থান বাড়িয়া যায় এবং ক্ষতস্থান পুরু হইয়া উঠিয়া গোলাকার ধারণ করে।

বিচর্চ্চিকা জঙ্ঘাদেশকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। হস্তপদাদি লোমবিহীন স্থলেও দৃষ্ট হয়। এই রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকারের : এক স্রাবযুক্ত, অপর স্রাববিহীন। যখন চুলকাইতে আরম্ভ করে রোগী তখন অস্থির হইয়া পড়ে এবং চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া বেদনা অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত চুলকানির নিবৃত্তি হয় না। এই অবস্থাটা সর্ব্বপ্রকার বিচর্চ্চিকায় ঘটিয়া থাকে। এই চুলকানিটা কীটানুর কাজ। যখন চুলকাইতে আরম্ভ করে তখন রোগী বেশ উপলব্ধি করিতে পারে যে কীটানু-গুলি মানব চক্ষুর অন্তরালে কি খেলাই না খেলিতেছে। এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ব্যাধি কদর্য্য। যে স্থানটীকে আশ্রয় করিয়া এই পীড়া উৎপন্ন হয়, সারিয়া গেলেও পরে যদি পীড়া উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ঠিক সেই স্থানেই দেখা যায়, কদাচিৎ অন্যত্রও প্রকাশিত হয়। বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া যে কোন স্থলেই বর্দ্ধিত হইতে পারে।

চিকিৎসা ক্রম

এই ব্যাধিটীর চিকিৎসা সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। চিকিৎসা করিতে গেলে একটা ক্রম অবলম্বন করা উচিত। ইচ্ছামত আজ একটা কাল একটা ঔষধ দিয়া চিকিৎসা বিভ্রাট করা উচিত নহে। তাহাতে ব্যাধি আরোগ্যের পথে না গিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়। এস্থলে যে চিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে তাহার ঔষধগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষিত। পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার সুফলতা অনুভব করিলে নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব। ঔষধগুলি প্রসিদ্ধ এবং কবিরাজগণের নিকট সহজে প্রাপ্তব্য বলিয়া ঔষধের প্রস্তুতি কৌশল বলা হইল না। প্রয়োজন হইলে বলা যাইবে।

বিচর্চ্চিকা ব্যাধিটী চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত অমৃতাদি কষায়, মাণিক্যরস, পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও বিড়ঙ্গ তৈল এই চারিটী ঔষধ নির্ব্বাচন করা গেল।

(১)

অমৃতাদি কষায়

প্রাতঃকালে অমৃতাদি কষায় (বিসর্প অধিকার) অর্দ্ধসের জল দ্বারা পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিতে হইবে। এই পাঁচনের উপাদান যথা ঃ—

গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, পলতা, মুতা, ছাতিম ছাল, খয়ের (খদির কাষ্ঠ নহে), কৃষ্ণবেত (অপ্রাপ্তি ঘটিলে পরিবর্ত্তে অনন্তমূল), নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা। পরিষ্কার করিয়া ১৮ রতি পরিমাণে প্রতিদ্রব্য ওজন করিয়া লইতে হইবে।

বিচর্চ্চিকার ইহাই মূল ঔষধ। এই পাঁচনটী বিচর্চ্চিকা রোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। দীর্ঘকাল এই কষায় সেবন করিলে ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই পাঁচনের সুফলতা বহুস্থলে উপলব্ধি করা গিয়াছে এবং প্রায়শঃ ব্যর্থ হইতে হয় নাই। পূর্ব্বে কীটানুর কথা উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলে পুনরায় বলি, রক্তজ-ক্রিমি দ্বারাই এই সকল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল ক্রিমি ধ্বংস করিবার নিমিত্ত এই পাঁচনটীর প্রয়োগ এবং এই পাঁচনের ক্রিমি ধ্বংস করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। অমৃতাদির ক্রিয়া কেবল মাত্র বিচর্চ্চিকায় নহে পরন্তু ইহা রক্ত দুষ্টির একটি মহৌষধ। বিসর্প, বসন্ত প্রভৃতিতেও ইহার সুফলতা যথেষ্ট।

(২)

মাণিক্যরস

বলা নিষ্প্রয়োজন যে সকালে পাঁচন চলিবে। যদি বিচর্চ্চিকা অতিশয় স্রাবযুক্ত হয় এবং রোগীর শরীর যদি রুক্ষ না হয় তাহা হইতে বৈকালে মাণিক্য-রস ২ রতি পরিমাণে ঘৃত $\frac{১}{২}$ তোলা ও মধু $\frac{১}{৪}$ তোলা সহ সেবন করিতে দিতে হইবে। দুই এক সপ্তাহ মাণিক্য-রস সেবন করাইয়া স্রাব কিঞ্চিৎ কমিলে মাণিক্য-রস বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। রুক্ষ শরীরে মাণিক্য-রস কদাচ প্রয়োগ করিতে নাই। রুক্ষ শরীরে মাণিক্য-রস প্রয়োগ করিলে শরীর গরম হইয়া যায়। এই মাণিক্যরস সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ রোগের একটি মহৌষধ বিশেষ।

(৩)

পঞ্চতিক্ত ঘৃত

পঞ্চতিক্ত ঘৃত যাবতীয় রক্ত দুষ্টি, পাঁচড়া, চুলকনা প্রভৃতির একটি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ। বিচর্চ্চিকায়ও এই ঘৃতটী প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। এই ঘৃত প্রয়োগের মাত্রা চায়ের চামচের এক চামচ। এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত

গুলিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঘৃতটী সন্ধ্যার সময় রোগীকে সেবন করিতে দিতে হইবে, কারণ অমৃতাদি কষায়টীকে ছাড়িতে পারা যাইবে না। প্রয়োজন না থাকা সত্বেও যুগপৎ বহু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর অনর্থ সাধন করার পক্ষপাতী আমরা নহি। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মাণিক্যরস প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি দেখা যায় রোগীর শরীর রুক্ষ এবং যদি পেটের অবস্থা ভাল থাকে অথচ কেবল পাঁচনে কাজ হইতেছে না তাহা হইলে উল্লিখিত মাত্রায় এই ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইতে। ব্যাধি যদি প্রবল হয় তাহা হইলে অবশ্য পাঁচন, মাণিক্যরস, পঞ্চতিক্ত ঘৃত এক সঙ্গেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৪)

বিড়ঙ্গ তৈল

একটি ছোট ব্যাধির কথা বলিতে গিয়া বহু ঔষধের উল্লেখ করিবার প্রয়াশ নাই। প্রবন্ধান্তরে একথা বহুবার বলিয়াছি আয়ুর্বেবদীয় ঔষধের অভাব নাই।

এখন একটি তৈলের কথা বলা যাউক। বিড়ঙ্গ তৈল (চক্রদত্ত, ক্রিমি রোগ চিকিৎসা) ব্যাধিত স্থলে সর্ব্বদা লাগাইয়া রাখিতে হইবে। এমন ভাবে লাগাইতে হইবে যেন সর্ব্বদা ব্যাধিতস্থল তৈল দ্বারা সিক্ত থাকে এবং যদি ব্যাধিতস্থল চুলকায় তাহা হইলে এই তৈল ঘষিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে তৈল লাগাইলে এবং নিয়মিত ভাবে ঔষধাদি সেবন করিলে উক্ত ব্যাধি হইতে নিস্তার লাভ করিবার আশা করা যায়।

পথ্যাপথ্য বিচার

সর্ব্বদা ব্যাধিত স্থল পরিস্কার রাখা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। নিমপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারা ব্যাধিত স্থল সুধৌত করা কর্ত্তব্য। সাবান বা তজ্জাতীয় কোন দ্রব্যাদির দ্বারা ধৌত করিলে ক্ষারধর্ম্মী দ্রব্য লাগিয়া ব্যাধি প্রবল হইবে। এমন কি নিম বা চালমুগরা সাবানও এই ব্যাধির জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। নিম, চালমুগরা প্রভৃতির সাবান অবশ্য অন্য নানা প্রকার চর্ম্মরোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট বস্তু। ব্যাধিতস্থল আবৃত রাখিলেও ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য সর্ব্বদা ব্যাধিতস্থল খুলিয়া রাখা উচিত। খাদ্যাখাদ্যের পক্ষেও একটু দৃষ্টি রাখা উচিত। মৎস্য সেবন করা অভ্যাস থাকিলে কিছুকালের জন্য তাহা ত্যাগ করাই সঙ্গতঃ। দুই বেলা ভাত খাওয়াই হিতকর। মধ্যাহ্ন আহার কালে ঘৃত ও তিক্ত দ্রব্যাদি সেবন করা উচিত। দুগ্ধ সেবন করাও কর্ত্তব্য। রাত্রে তিক্ত দ্রব্যাদি সেবন করার প্রয়োজন নাই তৎপরিবর্ত্তে দুগ্ধ সেবন করিতে হইবে।

পথ্যের কথা যে ভাবে বলা হইল সেইরূপ প্রতিপালিত হইলে ব্যাধি উত্তরোত্তর আরোগ্যের পথে যায়। অহিত আহার বিহার করিলে শত ঔষধেও ব্যাধির কিছুই করিতে পারে না। এই জন্যই পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অনাগত রোগ ও তাহার প্রতিষেধ

রোগ মানব শরীরে প্রবেশ লাভ করিলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হয় এবং হয়ত' বা কোন কোন স্থলে রোগ মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু যাহাতে ব্যাধি মানব শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য বিবেচক জনগণের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

আত্ম-হিত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যদি একটু শরীরের যত্ন ও চেষ্টা করেন তাহা হইলে বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি কদর্য্য ব্যাধি শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শরীরের যত্ন লইয়া স্বাস্থ্য বিধি পালন করিলে কেবল বিচর্চ্চিকা কেন বহু ব্যাধিই মানব শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যাহাতে মানব শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদের চেষ্টাও নিতান্ত কম নহে। আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন দুই বিষয়ের জন্য, এক সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা, অপর ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চিকিৎসা করা। ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত কত অনুশাসন, কত নিয়ম, কত প্রক্রিয়া যে আয়ুর্ব্বেদে আছে তাহা বলা কঠিন। আমাদের যদি বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি কদর্য্য ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার লাভ করিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে সর্ব্বদা শৌচাচার পালন করিয়া চলিতে হইবে। শৌচাচার পালন না করিলে এই সকল ব্যাধি সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। যথা তথা যাহা খুসী সেবন করা কখনও উচিত নহে। শোণিত দূষিত হয়, এরূপ খাদ্য গ্রহণ করাও কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিরুদ্ধ ভোজনও সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিচর্চ্চিকা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন দ্রব্য ব্যবহার করা অনুচিত একসাথে বসবাস করাও নিষেধ। এইরূপভাবে চলিলে বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না। তবে একটা কথা রহিয়া গেল। স্বাস্থ্য রক্ষা সকল সময় নিজের দ্বারা সম্ভব হয় না। পরের দ্বারাও রক্ষিত হইয়া থাকে। পরের দ্বারা কি ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়? বায়ু দূষিত করা এবং পুস্করিণী প্রভৃতি সংস্কার না করার ফলে যে ব্যাপকভাবে মহামারী দ্বারা মানবের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তাহার কথা ছাড়িয়া দেই। আবর্জ্জনা রাশি নষ্ট না করার ফলে বায়ু দুষ্ট হইয়া কি করিয়া মারাত্মক সান্নিপাতিক ব্যাধিগুলি মানব শরীরে উৎপন্ন হয় তাহার কথাও ছাড়িয়া দেই। ব্যবসায়ী-রাও ভেজাল চালাইয়া মানব সমাজের মহাঅহিত সাধন করিতেছে। এখানে একের পাপে অন্যে কি ভাবে কষ্ট পায় তাহারই কিঞ্চিৎ অভ্যাস দেওয়া যাইতেছে ধরুণ, যদি কেহ আম খাইয়া রাস্তায় তাহার খোসাটী ফেলেন এবং অন্যমনস্কভাবে যদি কেহ তাহার উপর পা দেন তাহা হইলে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আরো দেখুন, যদি কেহ ভাঙ্গা কাঁচ রাস্তায় ফেলিয়া রাখেন তাহা হইলে তাহাতে পথিকের পা কাটিয়া স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা আছে। এখানেও এইরূপ যদি বিচর্চ্চিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার বস্ত্রাদি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেন তাহা হইলে যিনি উল্লিখিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন তিনিও উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারেন। অতএব সকলেরই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পরের স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় সে বিষয় সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যরক্ষা প্রাক্তন

প্রাক্তন কর্ম্মের নামই দৈব। এই দৈব ক্রমে যদি পিতা, মাতা প্রভৃতির নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে বিচর্চ্চিকাটী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্যাধি হইতে নিস্তার লাভ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। যদি কাহারও প্রাক্তন কর্ম্মের জন্য বিচর্চ্চিকা-গ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে তাহা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকা উচিত এবং যাহাতে বিচর্চ্চিকা প্রশমিত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাই সংক্ষিপ্ত অনাগত বিচর্চ্চিকার প্রতিষেধ।

আমাদের দেশের গাছপালা

[বৈদ্যরঞ্জন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এল. এ. এম. এস]

১। বাবলা

ইহার সংস্কৃত নাম—বব্বূল। ইহার গাছ বেশ বড় হইয়া থাকে। নিম্নে বাবলার কয়েকটী রোগ নাশিনী শক্তির কথা লিখিত হইল।

অতিসারে। বাবলার কচিপাতা আধ-তোলা, একটু জলের সহিত বাটিয়া খাইলে আমযুক্ত অতিসার ভাল হইয়া থাকে। ইহা সেবনে **মেহ রোগ** ও ভাল হইয়া থাকে।

প্রমেহে। বাবলার গাছ হইতে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায় তাহাকে গঁদ বলে। এই গঁদ চারি আনা হইতে আধ তোলা মাত্রায় আধ ছটাক জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পর-দিন প্রাতে সেই জল একটু মধু সহ সেবনে প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে। ইহাতে মূত্র বেশ পরিষ্কার হইয়া থাকে ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহা আমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষিত।

উপদংশে। বাবলা পাতা শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। ঐ পাতার গুঁড়া উপদংশের ক্ষতে পূরণ করিলে শীঘ্র উপদংশের ক্ষত ভাল হইয়া থাকে। উপদংশের ক্ষত প্রতিদিন নিমপাতা সিদ্ধ জলে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া তাহার পর বাবলার পাতার গুঁড়া ক্ষতে পূরণ করিতে হইবে।

গলক্ষতে। গলার মধ্যে ক্ষত হইলে দুই তোলা বাবলার ছাল আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ দ্বারা কবল (কুলকুচা) করিলে গলক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। **দাঁতের গোড়া** ফুলিয়া যন্ত্রণা হইলে এই ক্বাথ দিয়া কুলকুচা করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহা পরীক্ষিত।

২। কুকসিমা

ইহার বাংলা নাম কুকুর শোঁকা। ইহা বাংলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার পত্র ও মূল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—পাতার রসের ১ তোলা হইতে ২ তোলা। মূল পেষণ করিয়া লইলে মাত্রা—২ আনা হইতে আট আনা। উহার ক্বাথের মাত্রা ৫ হইতে ১০ তোলা।

আমরক্তাতিসারে। আমযুক্ত অতিসারে ও রক্তাতিসারে ইহার স্বরস চিনির সহিত সেবন করাইলে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়। আয়ু-র্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ঐ দুইটী রোগে অনুপানার্থ ইহা ব্যবস্থা করেন।

রক্তস্রাবে। শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ইহার পত্রের স্বরস ১ তোলা এবং একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়।

রক্তার্শে। রক্তপিত্তে উল্লিখিত ব্যবহারে রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

পালাজ্বরে ঃ পালাজ্বরে যেদিন জ্বর আসিবার কথা. সেদিন প্রাতঃকাল হইতে ইহার পাতার রসের নস্য লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলে অথবা একটি নেকড়ার পুঁটুলিতে কতকগুলি কুক-সিমার পাতা থেঁত করিয়া উহা সর্ব্বদা টানিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে অনেক সময় পালাজ্বরের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৩ঃ কালমেঘ

শিশুশরীরে ঃ শিশুদিগের পক্ষে কালমেঘের তুল্য ঔষধ নাই। শিশুরযকৃতে ইহা অমোঘ শক্তি সম্পন্ন।

আলুইয়ের বড়ি ঃ সে কালের গৃহিণীরা এই কালমেঘ হইতে "আলুইয়ের বড়ি" প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। উহা মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক শিশুকেই খাওয়ান হইত এবং তাহার ফলে সেকালের লোক সবল, সুস্থ ও কর্ম্মঠ হইত। এই অলুইয়ের বড়ি প্রস্তুতের নিয়ম ;—জীরা, রাঁধুনী, যৌরী, জায়ফল এবং বড় এলাইচের খোসা প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া কালমেঘের পাতার রসে বেশ করিয়া মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট মুসুরির মত বটী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতে হয়। স্তন দুগ্ধের সহিত এই বটী শিশুদিগকে সেবন করাইতে হয়। এই আলুইয়ের বটী সেবনের ফলে শিশুদিগের পেট কামড়ানি, ক্ষুধামান্দ্য এবং উদরাময় অতিশীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। স্তন দুগ্ধের অভাবে মধু দিয়াও এই বড়ি খাওয়া চলে।

জ্বরে ঃ জ্বরেও কালমেঘ বিশেষ হিতকর। আমরা আমাদের দেশের প্রতি অযত্ন সম্ভূত মহৌষধের আদর ভুলিয়াছি কিন্তু ইংলণ্ডে এই আলুইয়ের বড়ি "হালভিভা" নামে কুইনাইনের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।

শিশুযকৃতে ঃ কালমেঘ হইতে প্রস্তুত আলুইয়ের বড়ি অপূর্ব্ব ঔষধ। ইহা ভিন্ন প্রয়োজন মত অন্য ঔষধের আনুপানরূপেও ইহার স্বরস ব্যবহার করা চলে। মাত্রা ১০ হইতে ২০ ফোঁটা। কেবল মাত্র কালমেঘের পাতা যদি বাটিয়া সেবন করান যায়, তাহা হইলে মাত্রা এক হইতে ৪ আনা। ইহাতেও বিশেষ উপকার হইবে।

পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ঃ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি দিগের পক্ষেও কালমেঘ বিশেষ হিতকর। শিশু-দিগের জন্য যে সকল রোগের কথা লিখিত হইল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও সেই সকলরোগে ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। যদি কাঁচা কালমেঘের অভাব হয়। তাহা হইলে পূর্ণবয়স্কের পক্ষে কালমেঘের শুষ্ক পাতা ১০ গ্রেণ ও ২০ গ্রেণ গোলমরিচ চূর্ণ করিয়া সেবনে জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

৪ঃ পুনর্ণবা

ইহা দুই প্রকার শ্বেত পুনর্ণবা ও রক্ত পুনর্ণবা। শ্বেত পুনর্ণবাকে চলিত কথায় শ্বেপুর্ণে ও রক্ত পুনর্ণবাকে গাধাপুর্ণে বলে। উভয় পুনর্ণবাই বহু রোগনাশক গুণযুক্ত। শ্বেতপুনর্ণবাই ঔষধস্বরূপ বেশী কার্য্যকরী।

নিম্নে পুনর্ণবার কয়েটি রোগনাশিনী শক্তির কথা লিখিত হইল।

শোথে ঃ সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগে শ্বেতপুন-র্ণবা অমোঘ ঔষধ। শোথ রোগীকে শাকের মত শ্বেত পুনর্ণবার পাতা ভাজিয়া খাইতে দিলে উপকার হইয়া থাকে।

(১) প্রত্যহ সকালে ও বিকালে শ্বেত পুনর্ণবার পাতার রস ১ তোলা মাত্রায় একটু মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহার

বেরিবেরি রোগেও বিশেষ হিতকর।

(২) নিম্নলিখিত পাঁচনটি শোথ রোগের বিখ্যাত ঔষধ। ইহার নাম পুনর্ণবাষ্টক পাচন।

শ্বেত পুনর্ণবা
নিমছাল
পলতা
শুঁট
কটকী
গুলঞ্চ (গাঁটবাদ)
দারুহরিদ্রা
হরীতকী (আঁটীবাদ)

প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় লইয়া বেশ করিয়া থেঁত করিয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সকালে অর্দ্ধেকটাও বিকালে অর্দ্ধেকটা সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ইহা সেবনে শোথ ভিন্ন **পাণ্ডুরোগ ও বেরিবেরি** আরোগ্য হইয়া থাকে। বেরিবেরি রোগে এই পাঁচনটি প্রত্যহ সেবনে উপকার হইয়া থাকে। ইহা আমাদের বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত।

আমাবতের রোগীর পক্ষে পুনর্ণবার শাক ভাজিয়া খাওয়া হিতকর।

কুষ্ঠে। পুনর্ণবার মূল দধির সরের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠের ঘায়ে উপকার হইয়া থাকে।

যকৃত বিবৃদ্ধিতে। যকৃত বিবৃদ্ধি বা লিভার হইলে ও পুনর্ণবায় উপকার হয়। এরূপ রোগীদিগের পক্ষেও শ্বেত পুনর্ণবার শাক প্রত্যহ ভাজিয়া খাওয়া হিতকর।

৮। শিমুল

ইহার সংস্কৃত নাম—শাল্মলী। ইহার গাছ বেশ বড় হইয়া থাকে, ঔষধার্থে ইহার ছোট গাছের মূল, পুষ্পদল, ছালের রস ও কাঁটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত রোগে—শিমুল বিশেষ কার্য্যকরী।

শুক্রবৃদ্ধিতে। শুক্রবৃদ্ধি করিতেও তরল শুক্র গাঢ় করিতে ইহা মহোপকারী।

(১) ছোট শিমুল গাছের মূল আধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় একটু মধু বা চিনিসহ বাটিয়া খাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা এক-মাস নিয়মিত সেবনে আশ্চর্য ফল হইয়া থাকে।

যাঁহাদের **ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইয়াছে** বা **নিস্তেজ হইয়াছে** তাঁহাদের পক্ষেও উহা সেবনে উপকার হইয়া থাকে।

(২) প্রত্যহ সকালে চারি আনার মাত্রায় শিমুল মূল চূর্ণ একটু মধুসহ সেবনেও উপরিলিখিত রোগ সমূহ বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তে। শিমুলের ফুল চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় একটু মধুসহ সেবনে রক্তপিত্তে উপকার পাওয়া যায়।

মুখের মেচেতায়। শিমুলের কাঁটা দুধের সরের সহিত বাটিয়া মলমের মত হইলে পর উহা মুখে মাখিলে মুখের মেচেতা সারিয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় শ্রীমদনানন্দ মোদক নামক ঔষধের অন্যতম উপাদান শিমুলের মূলচূর্ণ। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ধাতু পুষ্টি ও বল বৃদ্ধির জন্য শিমুল মূলের রস এবং শিমুল মূল চূর্ণ ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল করিতে শিমুলের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা।

৬। শতমূলী

ইহার সংস্কৃত নাম—শতাবরী।

ইহা অত্যন্ত বানাশক।

বায়ু প্রশমনার্থে। (১) যদি অত্যন্ত বায়ু বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এবং প্রমেহের জন্য মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় এবং উন্মাদে ১ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় শতমূলীর রস একটু মধু অথবা চিনিসহ সেবনে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

(২) ২ তোলা শতমূলীর রস আধপোয়া গব্য দুগ্ধ ও জল দেড়পোয়া একত্র সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবনে বায়ুশান্তি হয়। ইহাতে মস্তিষ্কের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইবে—এবং দুর্ব্বল রোগীর বল বৃদ্ধি হইবে।

মূত্রদ্বারদিয়া রক্তস্রাবে। শতমূলীর রস ১ তোলা ও গোক্ষুর ১ তোলা, দুগ্ধ আধপোয়া ও জল দেড়পোয়া একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে পর সেবন করিলে রক্ত প্রস্রাব নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে। শতমূলীর চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রশমিত হইয়া থাকে।

রাত্র্যান্ধ্যে। শতমূলীর পাতা গব্য ঘৃতসহ ভাজিয়া খাওয়া রাতকানা রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

শাস্ত্রীয় মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতি বহু বায়ু-নাশক তৈলের উপাদান শতমূলীর রস।

৭। ব্রাহ্মী

ইহাকে চলিত কথায় বিমি শাক বলিয়া থাকে। ইহার পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক, মেধাজনক ও অপস্মার রোগ নিবারক।

ব্রাহ্মীশাকের পাতার রস এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় একটু মধুর সহিত সেবন করিলে **স্মৃতিশক্তি ও মেধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অপস্মার রোগ** নিবারিত হয় এবং কণ্ঠের স্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ ভাবে আমাদের পরীক্ষিত।

স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনার্থে ও কণ্ঠ পরিষ্কারার্থে। ব্রাহ্মী শাক ভাজিয়া খাওয়া হিতকর।

আয়ুর্বেদীয় ষড়গুণবলিজারিতমকরধ্বজের সহিত ব্রাহ্মী শাকের রস সেবন করিলে অতি শীঘ্র উপকার হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মীঘৃত ও ব্রাহ্মীরসায়নের প্রধান উপাদান ব্রাহ্মীশাকের রস।

ব্রাহ্মীশাকের রসের মত ব্রাহ্মীশাক ভাজিয়া খাওয়া ও হিতকর।

দ্রষ্টব্য ঃ "আমাদের দেশের গাছপালা" সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে লেখকের সহিত "আরোগ্য নিকেতন", ১৯১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক আনার ডাক টিকিটসহ বা রিপ্লাই কার্ডসহ পত্রব্যবহার করিবেন। —স্বাঃ সঃ।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার গূঢ় মর্ম্ম।

(শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী)

দেহধারী মাত্রেরই রোগ আছে, যে পঞ্চভুত হইতে এই জীবদেহের উদ্ভব হইয়া থাকে সেই পঞ্চভুত পরিণামশীল কেন না এক অনন্ত অব্যক্ত শক্তিই মহাপ্রকৃতির সনাতন ইহার পঞ্চধায় বিভক্ত হইয়া সৃষ্টির উপকরণের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পঞ্চভুত ত্রিগুণ বিশিষ্ট। ঐ ত্রিগুণ জীবদেহের প্রাণ শক্তিকে চেতনময়ী করায়। ঋষিগণ ঐ ত্রিগুণ হইতে জগৎ উৎপত্তির কারণ বাহির করিয়াছেন। যে পঞ্চভুত জীবদেহের কারণ সেই ত্রিগুণান্বিত। ঋষিগণ বলেন এই ত্রিগুণই জগতের মুল তত্ব এবং সৃষ্টির আদি কারণ। ঐ ত্রিগুণ সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কর্ত্তা।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাকার জীবের রোগ উৎপত্তির মুলেও উক্ত ত্রিগুণকে যেমন স্থান দিয়াছেন, আবার তেমনি ঐ ত্রিগুণই রোগ নাশের হেতু বলিয়াও তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন।

সমগ্র জীবদেহ ত্রিগুণান্বিত। আয়ুর্ব্বেদ বেদান্ত। এই বেদান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

ঋষিদের চিন্তাধারা মুল তত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। তাঁহারা সৃষ্টির মুলতত্ব যেমন অনুসন্ধান করিতেন, তেমনি জীবোৎপত্তির মুল উপাদানগুলিও তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন।

সৃষ্টির মুলে একটা অব্যক্ত শক্তি ছিল, সেই শক্তি যখন আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত কারণ তখন এই পঞ্চ বিভক্ত উপাদান হইতে তিনটী গুণের সৃষ্টি হয়। উহাই স্বত্ব, রজ, তম, বায়ু পিত্ত কফ, বায়ু-স্বত্ব, পিত্ত-রজ, এবং তম-কফ। বায়ু সৃষ্টিকে প্রবহমান্ করে অর্থাৎ সৃজন করে। পিত্ত বা রজ সৃষ্টিকে স্থিত করেন অর্থাৎ পালন করে এবং তম বা কফ, সৃষ্টির প্রাণীকে নাশ করিয়া স্থিতিকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়া নাশ করে। বায়ু ব্রহ্মশক্তি, রজঃ বিষ্ণু শক্তি এবং কফ শিব শক্তি।

সৃষ্ট জীব মাত্রই পঞ্চভুতময় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেথানে পঞ্চভুত বিদ্যমান আছে, যেখানে তিনটী গুণ ও বিদ্যমান আছে।

ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। এই পঞ্চ ভুত। ক্ষিতি ও অপের মিশ্রণে তমের উৎপত্তি অর্থাৎ উহার পরিণাম ক্লেদ বা কফ, অপ ও তেজের মিশ্রণে রজের উৎপত্তি উহার পরিণাম অগ্নি বা পিত্ত, তেজ ও মরুতের মিশ্রণে স্বত্বের উৎপত্তি, এই স্বত্ব হইতে অনন্তের সৃষ্টি। অনন্তই ব্যোম।

জীবদেহে এই ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম রহিয়াছে। এই পঞ্চ পদার্থের জন্যই জীবদেহে ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। আর এই ত্রিগুণই বিপর্য্যস্ত হইতে জীবদেহে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়। আয়ু-

বেদাকার এই উপসর্গকেই রোগ বলেন। অতএব এই তিনগুণই রোগের মূলকারণ। বাহ্য প্রকৃতিতে এই তিনটী গুণ রহিয়াছে। কেননা বাহ্য প্রকৃতিও পঞ্চভুতময়। অতএব বাহ্য প্রকৃতির সহিত সৃষ্ট জীব মাত্রেরই সম্বন্ধ আছে। বাহ্য প্রকৃতি যদি কখনও নিয়মানুন স্থান্ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়। সেই উপসর্গই রোগ, আর্য্য ঋষিগণ ভূয়ো দর্শন গুণে জীব দেহ স্পর্শ মাত্রই বলিয়া দিতে পারিতেন জীবদেহে এই ত্রিগুণ কখন কি ভাবে আছে।

জীব দেহের মাংস ভাগ ক্ষিতি, রক্ত ভাগ অপ্। জীবদেহের উত্তাপ তেজ, যেখানে তেজ সেখানেই মরুৎ থাকে। এবং যেখানে মরুৎ সেইখানেই শূন্যকে বা ব্যোমকে পাওয়া যায়।

এখন আমি এখানে দেখাইতে চেষ্টা করব এই ত্রিগুণ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফই সমস্ত রোগের কারণ। জীবের বিশেষতঃ মানুষের দেহে এই তিনটী গুণবাহী তিনটী নাড়ী রহিয়াছে, ঋষিগণ উক্ত নাড়ীগুলি স্পর্শমাত্র বলিয়া দিতে পারিতেন কোথায় কোন নাড়ীর গতি কিরূপ এবং কি করিলে দেহে সাময়িক উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। বায়ু পিত্ত কফ এই তিনটী জিনিষেরই গুণ সম্পূর্ণ পৃথক। একই গুণ বিশিষ্ট হইলে উহাতে একই উপসর্গ দেখা যাইত কিন্তু জীবদেহে একই উপসর্গ দেখা যায় না কেন তাহার একমাত্র কারণ উক্ত তিনটী গুণই পরস্পরের যোগসাধন নানারূপ বিভিন্ন উপসর্গের সৃষ্টি করে। আর উহাই নানা রোগরূপে কথিত হয়।

মানুষের দেহে সর্ব্বপ্রকার রোগ দেখা যায়। অথচ উহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সব রোগই উক্ত তিন পদার্থের বিপর্য্যয়ে উদ্ভব হইয়াছে।

সুধু বায়ু দেহকে শুষ্ক করিয়া দেয়, দেহস্থ জলীয়ভাগ শুকাইয়া দেয়। দেহস্থ জলীয়ভাগ শুকাইয়া গেলে রসহীন দেহ লালিত্যহীন হয় এবং শুষ্কজল যেমন চঞ্চল হয় তেমনি চঞ্চল হয়। এই অবস্থা উন্মাদের। উন্মাদও বহু প্রকারের আছে। বায়ু যেমন আপন খেয়ালবলে দিক্ বিদিক যথেচ্ছা গমন করে, বায়ুগ্রস্ত বা পাগলও তেমনি যাহা ইচ্ছা তাহা করে।

পিত্ত দেহকে উত্তাপময় করিয়া তোলে। পিত্ত কুপিত হইলে মানুষের দেহ শীর্ণ করিয়া দেয়। কফকে শুষ্ক করে এবং বায়ুর সাহায্যে অগ্নি বা তেজ সর্ব্ব দেহে বিকীর্ণ হইয়া মানুষের প্রবল জ্বরাদি উৎপন্ন করে এবং দেখা যায় দুষিত পিত্ত কফ কর্ত্তৃক সন্ধিস্থলে রুদ্ধ হইলে এবং বায়ু তাহাকে যথাস্থানে চালনা করিতে না পারিলে পিত্ত জীব দেহকে ভস্মীভুত করিয়া দেয়। পিত্তাগ্নিতে এই জন্য অনেক সময় জীব দেহের মাংসদি দগ্ধ হইয়া যায়।

কফ্ দেহকে স্নিগ্ধ রাখে। আপ হইতেই উহার উৎপত্তি, নানা দেহে রক্ত সঞ্চার হইলে সেই রক্ত রাশি পিত্ত কর্ত্তৃক বিশোধিত হইয়া বায়ু দ্বারা সমগ্র দেহের প্রণালী গুলিতে চালিত হইলে দেহের সৌন্দর্য্য বাড়ে। মাংসকে সতেজ করে। উজ্জ্বল করে কিন্তু কর্দ্দম বা কফ রক্তের মল। সেই মল যদি সন্ধিস্থলে আটকাইয়া যায় তাহা হইলে পিত্ত সংস্পর্শে তাহা দুষিত হয়। তাই দেখা যায় স্ফোটকাদির ভিতরে যে রস জমায়, সেই রস পিত্ত ও কফের দ্বারা দুষিত হইয়া বিবর্ণ হইলে যে অবস্থা হয় ঠিক সেই অবস্থা।

এখন বিচার করিয়া দেখিতে পাইলাম, বায়ু পিত্ত কফ্ই প্রকৃত পক্ষে বিকৃত না হইয়া দেহকে

সজীব, সতেজ ও চেতনময়ী রাখে আর এই তিন পদার্থই বিকৃত হইয়া মানুষকে নির্জীব, তেজহীন ও চেতনহীন করে।

আয়ুর্ব্বেদের ঋষিগণ তাই জীবের রোগ নির্ণয়ে যেমন এই তিনটী পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তেমনি রোগ নিরাশনেরও এই তিনটী পদার্থের আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জীব দেহের এই তিন ধাতুর বিপর্য্যয়ই রোগ ও সমতাই সুস্থাবস্থা।

এখানেই তাঁহারা ক্ষান্ত হন্ নাই, তাই তাঁহারা মানব দেহে এই তিন ধাতুর বিপর্য্যয়ে যত রকমের উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহারও সংখ্যা দিয়াছেন। এবং এই ত্রিধাতুদ্বারা সৃষ্টি ঔষধী-মণ্ডলীকেও ত্রিধাতুর পরিপোষক ও ত্রিধাতুর বিপর্য্যয়ে যে দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার প্রতিষেধক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে আমি কয়েকটী উদাহরণ দিব।

বায়ুর প্রকোপ দ্বারা শরীরের উগ্রতা ও শুষ্কতার সঞ্চার করে। এই জন্য বায়ু দমন করিতে স্নিগ্ধ গুণ বিশিষ্ট ঔষধীর দরকার।

পিত্তের প্রকোপ দ্বারা শরীরে যে গ্লানি উপস্থিত করে সেই গ্লানি দূর করিবার জন্য তাই পিত্তদমন-কারী ঔষধের দরকার।

কফের প্রকোপ দ্বারা শরীরে যে গ্লানি উপস্থিতি করে সেই গ্লানি দূর করিবার জন্য তাই কফ নাশক ঔষধীর দরকার।

দেখা যায়, এই ঔষধীমণ্ডলও আমরা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে পাইয়া থাকি। আমাদিগের চারি-দিকে যে ঔষধীমণ্ডল রহিয়াছে, ঐ ঔষধীমণ্ডলই কোন না কোন গুণ বিশিষ্ট।

ঔষধীমণ্ডলের মধ্যে বায়ু পিত্ত ও কফ্ কারক এবং নাশক যে সকল ঔষধী আছে উপসর্গ উপশমে ঋষিগণ সেই সকল ঔষধীরই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই তিনটীর বাহিরে যখন অন্য কোন ধাতু নাই, তখন উপসর্গ নিবারণের জন্য ও এই তিনধাতুর বাহিরের কোন জিনিষের সন্ধানের আবশ্যক হয় না।

(ক্রমশঃ)

আয়ুস্কল্যাণ

এস্কেবি লিখিত

ক্রিমি

ক্রিমি নানা আকারের হয়। পোস্ত-দানার মত অতি ক্ষুদ্রাকার হইতে ৫০ হাত দীর্ঘ আকার বিশিষ্ট পর্য্যন্ত হয়। সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকারের ক্রিমির জন্য মলদ্বার অত্যন্ত চুলকায় এবং ঐ কীটের সংখ্যা-বহুল্য হইলে প্লীহা-রোগীর মত পেট ফুলিয়া উঠে। বড় ক্রমির আক্রমণে বমনের উদ্বেগ হয়। কোনও কোনও রোগীর মাথা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, রোগ নিরূপণ করা কঠিন হয়। প্রকাণ্ড মস্তক-বিশিষ্ট বালককে ক্রিমি রোগী বলিয়া ধারণা করিবার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে।

ক্রিমি-রোগের লক্ষণ :—কোষ্ঠ-বদ্ধতা অথবা

কোষ্ঠ-শৈথিল্য, অরুচি, পেটে বেদনা, গা বমি-বমি করা, মুখ দিয়া জল উঠা, অবসন্নতা, শীর্ণতা, দেহের বিবর্ণতা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, সর্দ্দি, কাসি, হাঁচি বুক ধড়্ফড়্ করা, দেহের রুক্ষতা, জ্বর-ভাব বা স্পষ্ট জ্বর এবং পুরাতন হইলে, অবিচ্ছেদ জ্বর, ভ্রম, মুর্চ্ছা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, নিদ্রাবস্থায় দাঁত কড়্ কড়্ করা প্রভৃতি। কৃমি-রোগ পুরাতন হইলে অনেক সময় তাহা যক্ষ্মা-রোগের সন্দেহ জাগাইয়া দিয়া থাকে এবং অবশেষে সত্যই তাহা যক্ষ্মাতে পরিণত হইতে পারে।

প্রতিষেধক :—

১। সুপারী গাছের নরম সিকড়ের রস কাশীর চিনি সহ এক ঝিনুক মাত্রায় এক সপ্তাহ প্রাতে সেব্য।

২। কাঁচা হরিদ্রার রস বিট্‌লবণ সহ এক ঝিনুক মাত্রায় ৫ দিন প্রাতে সেব্য।

৩। সম পরিমাণ চাঁপাফুল-গাছের পাতার রস ও আনারসের কচি পাতার গোড়ার দিকের শ্বেতাংশ ছেঁচিয়া সংগৃহীত রস, মোট এক কাঁচ্চা, কিঞ্চিৎ চূণের জল সহ সেবনে সকল প্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

৪। শিউলীফুল-গাছের পাতা, কালমেঘের পাতা ভাঁট-পাতা (ঘেঁটুফুল-গাছ), কদম্বফুল-গাছের পাতা, চাঁপাফুল গাছের পাতা, আনারসের কচি পাতার শ্বেতাংশ, পালিধা-মাদারের পাতা—ইহাদের যে কোনওটী বা ২।৩ টীর রস একত্র মিশ্রিত করিয়া মধু সহ ৪।৫ দিন প্রাতে সেব্য।

৫। ডালিম শিকড়ের ছাল — ২।০ তোলা
বিড়ঙ্গ (নিস্তুষ)— ২।০ „
শুঁঠ— ৸০ „
চাঁপাফুল (শুষ্ক)— ৸০ „
সোমরাজী— ।৵০ „
সোণামুখী পাতা— ।৵০ „

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া লও। ঐ মিশ্রণের ৷৵০ তোলা পরিমাণ ৴।০ জলে সিদ্ধ করিয়া ১ কাঁচ্চা থাকিতে নামাও। চারিবারে ঐ কাথ ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। সেবনের পূর্ব্বে প্রতিবার ঔষধ উত্তপ্ত করিয়া লওয়া উচিত। চমৎকার ঔষধ।

৬। বিড়ঙ্গ (নিস্তুষ)— ২ ভাগ
ডালিমের শিকড়— ২ „
আপাং গাছের পাতা— ২ „
কট্‌কী— ১ „
দারুচিনি— ১ „

পূর্ণমাত্রা ২ তোলা ৴।।০ জলে নরম আঁচে সিদ্ধ করিয়া ৴০ এক ছটাক অবশিষ্টে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হয়। উহাতে ৪।৫ ফোটা তার্পিন তৈল সহ প্রাতে ৩ দিন সেবনে সকল প্রকার ক্রিমি ধ্বংশ হয়। কিশোরদের মাত্রা অর্দ্ধেক, শিশুদের সিকি বা বয়স অনুযায়ী তাহা অপেক্ষাও কম।

৭। কমলাগুঁড়ি— ১ ভাগ
সোমরাজী— ২ „
বিট্‌লবণ— ২ „

আনারসের কচি পাতার রসে মাড়িয়া শুকাইবার পর চূর্ণ করিতে হয়। এই চূর্ণ ৵০ হইতে ।০ মাত্রায় চূণের জল সহ সেব্য। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে চূণের জলের পরিবর্ত্তে এক ঝিনুক চাঁপা-পাতার রস কিম্বা বিড়ঙ্গ ভিজান জল সহ সেব্য। ৩ দিন প্রাতঃকালে সেবন ব্যবস্থা। অমোঘ ঔষধ।

৮। কমলাগুঁড়ি — ১ ভাগ
পলাশবীজ— „
সোমরাজী— „
ইন্দ্রযব— „
বিড়ঙ্গ— „
যোয়ান— „

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ কর্ত্তব্য। এই মিশ্রণ ৵০ হইতে।০ পরিমাণ, কচি আনারস পাতার শ্বেতাংশের রস এক ঝিনুক ও ১৫।২০ ফোঁটা মধু সহ সেব্য। অব্যর্থ মহৌষধ।

৯। কমলাগুঁড়ি— ১ ভাগ
হরিতকী— ,,
বিড়ঙ্গ— ,,
সৈন্ধব ,,
যবক্ষার— ,,

প্রত্যেক দ্রব্যটী গুঁড়াইয়া ছাঁকিবার পর মিশ্রিত করিবে। রোগীর বয়স অনুসারে ৵০ হইতে ॥০ পরিমাণ ঐ চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণ ঘোলের সহিত সরবৎ প্রস্তুত করিয়া প্রাতে পান করিতে হয়। সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

১০। ডালিমের শিকড়ের ছালা—৸০ তোলা
বিড়ঙ্গ (নিস্তুষ)— ৸০ ,,
পালিধা মাদারের ছাল— ॥০ ,,
চাঁপাফুল (শুষ্ক)— ।৵০ ,,
শুঁঠ— ।৵০ তোলা
সোণামুখী পাতা— ।৵০ ,,
পলাস-বীজ— ।৵০ ,,
সোমরাজী— ।০ ,,
নিম্বমূলের ছাল— ।০ ,,
কিস্‌মিস্— ২ ,,

প্রত্যেক জিনিষটী চূর্ণ করিবার পর একত্র পিষ্ট করিবে। উহার ॥০ পরিমাণ লইয়া ⁄।০ জলে মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ১ কাঁচ্চা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ছাঁকিয়া, ক্কাথটুকু এক ঝিনুক মাত্রায় বিটলবণ সহযোগে ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। কৃমি রোগের হতাশ অবস্থায়ও ইহা ব্যর্থ হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—প্রত্যেক উপকরণটী যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। কীট-দষ্ট, বিবর্ণ, অতি পুরাতন, রসভ্রষ্ট দ্রব্যে ফল হয় না।

ঔষধ সেবন কালে শাক, অম্ল, মিষ্ট দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাছ ও মাংস ত্যাগ কর্ত্তব্য; সেবনের কাল উত্তীর্ণ ঐ সকল খাদ্য বিষয়ে পরিমিতাহারী হইতে হয়।

সিগারেট না মৃত্যু ভেট্

(শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ)

আজ কাল এ দেশের সভ্যতার যুগে,
পেট ভোরে ভাত কেহ খেতে নাহি পায়।
সিগারেট চাই তবু, দুঃখে দৈন্যে ভুগে ;
রাখিতে হইবে মান সভ্যতা বজায়।

নানাবিধ পাতা ফুল তামাকে মিশায়ে,
ভেজাল হইয়া ইহা বাজারে প্রকাশ।
নেশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে জীবন বিকায়ে,
পুরস্কার পায় লোকে ব্যাধি হাঁপ্ কাশ্।

সহজে নিস্তার নহি, আরো ভয় এতে ;
গলার ভিতরে ব্যথা ফোলে টনসিল্।
তারপর কিছুদিন ধোঁয়া খেতে খেতে,
ফুস্‌ফুস্ বলহীন পীড়ায় শিথিল।

সিগারেট খেলে হয় স্বাস্থ্য অর্থ নাশ,
ঠোঁটের সৌন্দর্য্য গিয়ে কালো রং ধরে।
মুখে বদ্ গন্ধ থেকে যায় বারোমাস,
আত্মা কি ওঠেনা কারো এখনো শিহরে।

হুকা ব্যবহারে তত' হয়নাকো ক্ষতি,
সিগারেট্ ধূমপানে অশেষ দুর্গতি।

স্বাস্থ্য হানি ও হিন্দু সমাজ

(শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী)

আমার মনে হয় বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যতটা নষ্ট করিতেছে, ততটা অন্য কিছুতে নহে। কলিকাতার অপর পাড়ে যত মিল আছে সেই সমস্ত মিলের লক্ষ লক্ষ কুলী মজুরের বিষ্ঠা মূত্র গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হয় এবং তাহার ফলে গঙ্গা সলিল কলেরা ও টাইফয়েড জীবাণুতে পরিপূর্ণ হইতেছে, অথচ এ দেশের বিধবাদের সেই গঙ্গাবারি বহন করিয়া আনিয়া বৎসরাধিক কাল ঘরে রাখিয়া প্রত্যহ বাড়ীর শিশু হইতে বৃদ্ধের মুখে একটু একটু করিয়া দেওয়া চাই। সুদূর পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি কলিকাতায় পল্লী অঞ্চল হইতে যে সমস্ত ধীবর মাছ ধরিতে আইসে, তাহারা ঘড়ায় করিয়া যে গঙ্গোদক লইয়া যায় তাহা পল্লীগ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে ভাগ

করিয়া অতি সযতনে ভাণ্ডে করিয়া রাখা হয় এবং সময়ে সময়ে তাহারই একটু আধটু পান করিয়া দেহ পবিত্র করা হয়। আমি এক গৃহস্থের ঘরে ৫।৭ বৎসরের পুরাতন গঙ্গাজল দেখিয়াছি। কলেরা—শুধু কলেরা কেন শূন্য উদরে থাকিলে সকল ব্যাধিই মানবের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু দারুণ সমাজের এমনই বিধান যে ব্রাহ্মণের ছেলেদের প্রাতঃকালে অস্নাত অবস্থায় এক মুষ্টি মুড়ি পর্য্যন্ত খাইতে নাই। ইহার ফলে কত শাস্ত্র বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-তনয় যে কলেরায় আক্রান্ত হন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পর্দ্দা প্রথার জন্য যক্ষ্মার ব্যারাম বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বাহ্ন ও সায়াহ্নের প্রকৃতি দত্ত সুশীতল সমীরণ অথবা তরুণ তপনের স্নিগ্ধ কোমল কিরণ রাশি সম্ভোগ করিবার অধিকার হিন্দুমহিলাদের নাই। যে ভাবে হৌক এই নিদারুণ গ্রীষ্মেও আবক্ষ অবগুণ্ঠন দিয়া অন্ধকারময়, গবাক্ষবিহীন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম দেহে রন্ধন করিতে হইবে। কলিকাতার অলি গলির একতলার বদ্ধ ঘর ভাড়া লইয়া যে সমস্ত অফিসার বাবুরা অবস্থান করেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের অবস্থা আরও শোচনীয়।

সূতিকা ঘর হিন্দু জীবনের একটা মস্ত বড় কুপ্রথা। বাটীর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা তমসাচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত, অব্যবহার্য্য ঘর অথবা রান্না ঘর কি ঢেঁকি শালের বারান্দা নির্দ্দিষ্ট হয় সংসারের ভাবী বংশধর প্রসব করিবার জন্য। অশিক্ষিতা ধাত্রীর নাড়ী কাটার দোষে কল্পিত "পেঁচোয় পাওয়া" ব্যারামে বাঙ্গালার কত শত স্নেহের দুলাল যে অকালে মাতৃ ক্রোড় হইতে বৃন্তচ্যুত মুকুলের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত এই "পেঁচোয় পাওয়া" কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে না পারিয়া অশিক্ষিত লোকের প্ররোচনায় লাল সূতা ও মাদুলীর ভারে শিশুটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন। অনেক লোককে দেখিয়াছি ১০৩°—৪° ডিগ্রী জ্বরের মধ্যেও তারকেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ স্থানে গিয়া পচা পুকুরের জলে অবগাহন করে। ফলে জ্বর "ত্যাগ পাওয়া" ত দূরের কথা উত্তরোত্তর নিউমোনিয়ায় পরিণত হওয়ায় অন্ধবিশ্বাসী রোগী ইহকাল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আমি একবার যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার কাশীপুর নামক গ্রামে কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়া দেখি যে তথাকার এক বারুজীবি তাহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্রটিকে নদীর ধারে বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং প্রত্যহ তাহাকে পান্তা ভাত খাওয়ায় ও মেটে কলসীর জল দ্বারা স্নান করায়। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, যদি পরমায়ু থাকে তবে নিশ্চয়ই বাঁচিবে। কিন্তু এই অশিক্ষিত বর্ব্বরের অন্ধবিশ্বাসে পদাঘাত করিয়া এক দিন যমরাজ যখন তাহার শিশুপুত্রকে লইয়া গেল, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। এইরূপ অন্ধবিশ্বাসের জন্য পল্লীগ্রামে কত শত লোক যে প্রতিনিয়ত মারা যাইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যখন আমি স্বেচ্ছা অন্তরীণ অবস্থায় স্বগ্রামে অবস্থান করিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতেছিলাম, তখন দেখিতাম পাঁড়াগায়ের লোকেরা কলেরা হইলেই তাহা "বাতাস" লাগিয়াছে বলিয়া উপেক্ষা করে এবং ওঝা আনিয়া ঝাড়াপুছা করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে শতকরা ৯৯টী লোক মারা যায় বলিলেওঅতু্যক্তি হয় না। আমার মনে

হয়, সরকার যদি হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, ফকীর, গুণীন এসমস্ত তুলিয়া দিবার জন্য আইন প্রনয়ন করেন, তাহা হইলে বহু বাঙ্গালীর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।

"পৈতৃক ভিটায় প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য" অনেক হিন্দু ৩।৪ পুরুষের ভিটায় ভগ্ন জীর্ণ, চর্ম্মচটিকাপূর্ণ অট্টালিকার মধ্যে ম্যালেরিয়ার আগ্নেয় গিরির মধ্যে বাস করেন। মুসলমানদের কিন্তু এসব জ্বালা নাই। তাহারা যেখানেই নদীর চড়া অথবা মাঠের উন্মুক্ত স্থান পায় সেই খানেই ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে থাকে। সেই জন্য তাহাদের স্বাস্থ্য ও ভাল থাকে। কিন্তু হিন্দু ভায়ারা সেরূপ করিলে নাকি পিতৃপিতামহের ভিটা নিষ্প্রদীপ হয়, তাহার ফলে কত হিন্দু পরিবার যে নিষ্প্রদীপ হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পেঁয়াজ, রশুন, এসব বলকারী, চক্ষুর দীপ্তি বর্দ্ধক তরকারী, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের এমনই অদ্ভুত বিধান যে সাত্ত্বিকতা বজায় রাখিবার জন্য ইহা হিন্দুর বাড়ীর ধারে পর্য্যন্ত আনিবার উপায় নাই। উপবাস হিন্দু সমাজের কুসংস্কার গুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কার। উপবাস যদি মাসের মধ্যে তুই এক দিন হয় তাহা হইলে আপত্তি নাই। কিন্তু অম্বুবাচি প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে দেখা গিয়াছে যে বিধবাদিগকে একাদিক্রমে তিন দিন যাবত উপবাস করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য যে কিরূপ ক্ষুণ্ণ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। একাদশীর দিন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও একবিন্দু জল পান না করায় স্বাস্থ্যের যে কত হানি হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনেক বিধবা কোন মতে ডাক্তারী ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে রাজি না হওয়ায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। আমার মনে হয় "পরমায়ু না থাকিলে কাহারও সাধ্য নাই যে জীবন রক্ষা করে" এই যে ভ্রান্ত মত আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অতি গর্হিত। ইহাতে কেহ মারা গেলে সান্ত্বনালাভ হয় বটে কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কতজনে যে বিনা চিকিৎসায় আত্মীয় স্বজনকে চিতার উপর তুলিয়া দিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

ইহা ছাড়া সামাজিক কুপ্রথার জন্য কত লোক যে ভুগিয়া ভুগিয়া বিনা চিকিৎসায় বিনা আহার্য্যে, রোগে, শোকে, স্বাস্থ্যহীনতায় মারা যাইতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

বেঙ্গল ইমিউনিটি সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের উক্তি ঃ—

সিরাম, ভ্যাক্সিন্, ইনজেক্‌টিউল ও অন্যান্য ঔষধের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ কারখানা

১৯২৭ সালে কলিকাতাতে যখন ট্রপিকাল ঔষধের ফার ইষ্টার্ণ এসোসিয়েসনের সপ্তদশ অধিবেশন হয়, তখন এই অধিবেশনের অনেক খ্যাতনামা সভ্য বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর কারখানাটী পরিদর্শন করিতে আসেন, এবং নিম্ন-লিখিতরূপে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন :—

"পূর্ব্বে ভারতবর্ষের চিকিৎসকগণকে বিদেশ হইতে আনীত ভ্যাক্সিন এবং সিরামের উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু এক্ষণে সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এই কোম্পানীর কারখানাটী পরিদর্শন করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে এই বিষয়ে তাঁহারা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন।" এই অধিবেশন সমাপ্তির পর এই কোম্পানী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারল মেজর জেনারেল জি, টেট এম, ডি, কে, এচ্, এস্, আই এম্, এস ডাক্তার মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র লাভ করেন। সভার উপস্থিত অন্যান্য সভ্যগণ উক্ত লেবরেটরিতে ঔষধ প্রস্তুতের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ডাক্তার জি, ভি, দেশমুখ এম্, ডি, (লণ্ডন) এফ্, আর, সি, এস অন্যান্য নিখিল ভারত মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণের সহিত বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর লেবরেটরী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই আধুনিক নিয়মানুসারে সিরাম, ভ্যাক্সিন এবং অন্যান্য ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী পরিদর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। লেবরেটরীর কার্য্য প্রণালী দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"এই কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ ও অন্যান্য ডাক্তার মহোদয়গণের সৌজন্যে ও সাহায্যে আমি তাহাদের কার্য্যালয়টী পরিদর্শন করিতে পারিয়াছিলাম। অদ্যকার ন্যায় উপদেশ ও শিক্ষাপূর্ণ দিবস আমার জীবনে কমই আসিয়াছে। এইখানে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিরাম এবং ভ্যাকসিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, এবং এই সমস্ত প্রণালীগুলি বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল। এই কোম্পানীর কারখানাটী অতি উত্তম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্থাপিত এবং ইঁহাদের স্বতন্ত্র অশ্ব ও পশুশালা আছে। আমি এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।"

"ইঁহারা একটী বিরাট, বৈজ্ঞানিক ও দেশহিতকর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।"

কলিকাতার প্রথম চিকিৎসক মেয়র

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

আমরা কলিকাতার প্রথম চিকিৎসক মেয়র ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মহাশয়কে অভিবাদন জানাইতেছি—কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ এবার শ্রেষ্ঠ ও নির্ভীক কর্ম্মী, কঠোর পরিশ্রমী, দেশপ্রিয়, কলিকাতার প্রধান চিকিৎসক অল্ডারম্যান ডাঃ রায়কে তাঁহাদের মেয়র (Mayor) পদে নির্ব্বাচন করিয়া নিজেদের সম্মানিত করিয়াছেন। ভারতে ও ইংলণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্রে উর্দ্ধতম পরীক্ষা সকল পাশ করিয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেন—L. M. S. পরীক্ষার দুই বৎসর পরেই M. D. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ডাঃ রায় লণ্ডনে যান ও তথায় F. R. C. S. ও M. R. C. P. পরীক্ষা অপর সকলের মধ্যেই সম্মানের সহিত পাশ করেন—শেষোক্ত পরীক্ষায় তিনি তাঁহার একজন শিক্ষক ও অন্য দুইজন খ্যাতনামা আই, এম, এস (I. M. S.) অফিসারদের সহিত প্রতি-যোগিতা সত্ত্বেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দেন। বিধান বাবু ডাক্তারি পাশ করার পরই মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে সরকারি চাকরি পান—বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি সরকারি এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে ক্যাম্পবেল হাঁস-পাতালে এনাটমি পড়াইতেন। কলিকাতার কার্ম্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ গঠন হইবার সময় ডাঃ রায় গভর্ণমেণ্টের চাকরি ছাড়িয়া উক্ত কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র (Medicine) পড়াইবার ও তৎসংলগ্ন হাঁসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। উক্ত কলেজের শ্রেষ্ঠতা ও সুনাম ডাঃ রায়ের জন্যই যে অনেকটা তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

স্বদেশী অনুষ্ঠান গঠনে বিধান বাবুর চেষ্টা অনেকেই জানেন। আধুনিক প্রসিদ্ধ ক্লিনিক্যাল রিশার্চ্চ এসোসিয়েসন, বেঙ্গল ইমুনিটি কোম্পানী, শিলং হাইড্রো ইলেকৃট্রিক কোম্পানী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় ও আগ্রহে আরম্ভ হয়—তাঁহাদের এখনকার সুনাম ও সাফল্য বিধান বাবুরই অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ফল।

যাদবপুর টুবারকুলোসিস হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি বাঙ্গালার থাইসিস রোগীদের যাহা করিয়াছেন, ও করিতেছেন—তাহা অনেকেরই জানা আছে—চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের গঠনে তিনি দাস মহাশয়ের মহৎ দানকে কিরূপে দেশের নারীদের উপযোগী প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিয়াছেন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির (Finance) আয় ব্যায় কমিটির সভাপতি হইয়া কার্য্য করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম হইয়াছে। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে কলিকাতাবাসীগণ তাঁহার মেয়রত্বের সময় তাঁহার দ্বারা অনেক উপকার পাইবেন।

ডাঃ রায়কে আমরা গুরুরূপেই জ্ঞান করি—এই স্বাস্থ্য পত্রিকার আরম্ভ করার সময় আমাদের তিনি অনেক উপদেশ ও সাহায্য করিয়াছিলেন—আমরা তাঁহাকে জানাইতেছি যে কলিকাতাবাসীরা প্রথম মেয়র দেশবন্ধু দাসএর নিকট "দরিদ্র নারায়ণের সেবা" কর্পোরেসনে আদর্শ জানিয়াছে—তিনি দরিদ্র নারায়ণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন—এখন প্রায় ২৫,০০০ ছাত্র কলিকাতা কর্পোরেসন প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী স্কুলে বিনাবেতনে পড়ে, তিনি হাঁসপাতালগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত বৎসর কর্পোরেসন ছয় লক্ষ টাকার অধিক এজন্য ব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতাবাসীগণ পুর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বেশী জল পাইতেছেন। কিন্তু তাহারা আপনার ন্যায় চিকিৎসক প্রধান কর্ম্মী, যিনি দরিদ্রদের দুঃখ, অসুবিধা ও কষ্টের কারণ বহুদিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার নিকট চায় স্বাস্থ্য ও নব জীবন লাভের উপায় নির্দ্ধারণ, কলিকাতার দরিদ্রদের আলকাতরার রাস্তার দরকার নাই তাহারা চায়—আবর্জ্জনাহীন বাসস্থান, পরিষ্কার বায়ু ও সূর্য্যের আলোক যেখানে যাইতে পারে—মশার উৎপাত হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা—তাহারা চায় ভেজাল হীন খাদ্য ও শিশুদের বাঁচাইবার একমাত্র উপায়, সস্তা ও প্রচুর উৎকৃষ্ট দুগ্ধ—আপনার ন্যায় কর্ম্মীর নিকট তাহারা এসকল আশা করিতে পারে।

আপনাকে বলা বাহুল্য যে পুরাতন কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না যতক্ষণ বরাহনগর, কাশীপুর, মানিকতলা মেটেবুরুজ টালীগঞ্জ, প্রভৃতি কলিকাতার চারিদিকের পথগুলি উন্নত ও পরিস্কৃত হয়। এই সকল (added area) পল্লীগুলির জল (drain) নিকাশের ব্যবস্থা আবর্জ্জনা ও পচা পুকুর পরিষ্কার করার ব্যবস্থা যত দিন না হইবে—কলিকাতাবাসীরা নিরাপদে থাকিতে পারিবে না। কলিকাতার ও আশপাশের বস্তিগুলিকে আবর্জ্জনাহীন করিতে না পারিলে কলিকাতাবাসীরা সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাইবেন না—ভাল জল ও নিয়মিত ঝাটার ব্যবস্থা না করিলে—পল্লিবাসীগণ পরিষ্কার হইবে না।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে সুস্থ ও কর্ম্মঠ রাখিয়া এই দরিদ্র নারায়ণ সেবার সফল করুন ও কলিকাতাবাসীরা আপনার চেষ্টা ও যত্নে স্থায়ীভাবে উপকৃত হউন।

বিবিধ

১৯২৯ সনে যক্ষ্মা রোগে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ৩৭, ৯৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৫ সনের এই রোগে তথায় ৫৪,২৯৫ জন মারা গিয়াছে।

* * *

দক্ষিণ আমেরিকার বইন্‌স এরেশ সহর হইতে মাদ্রিদ ৬,৭৫০ মাইল দূরবর্ত্তী। বেতার যোগে মাদ্রিদ হইতে এক ডাক্তার এরেশবাসী একটী রোগীর হৃদ্‌-কম্পন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং যথারীতি চিকিৎসা করিয়া রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

* * * *

কানাডায় যে আদমসুমারী হইয়াছে তাহাতে সহরবাসীদের ৪০ এবং মফস্বলের কৃষকদের ৬ শত প্রশ্নের জবাব দিতে হইয়াছে। এই দেশে মানুষ গণনার সঙ্গে গৃহপালিত পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি মৌচাকের পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়াছে।

* * * *

ট্রান্সভালে উৎপন্ন একশ্রেণীর সব্জি গাছ হইতে এক প্রকার মারাত্মক বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাঃ এইচ, এইচ গ্রীণ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বিষ প্রসিদ্ধ ষ্ট্রীকনিন্‌ বিষ হইতে প্রায় ৫ হাজার গুণ বেশী শক্তি সম্পন্ন। এক গ্রেণের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র সেবন করিলে পূর্ণবয়স্ক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন লোকের মৃত্যু হইতে পারে। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই বিষ পান করিলে মৃত ব্যক্তির শরীরে বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও বিষাক্ত জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই বিষের নাম "এভিনিয়া"।

* * * *

গত বৎসর মার্কিণ যুক্তরাজ্যে মটর গাড়ীর তলায় পড়িয়া ৩২,৫০০ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে। এখানকার মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৪২ কোটী। গ্রেট-বৃটেনে ৪৪ কোটী ৫০ লক্ষ লোক বাস করে। কিন্তু গত বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ঐ জন্য ৬,৬৯৬ জন।

১৯৩০ সনের শেষে যে সোনার হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে সমগ্র পৃথিবীতে ২৫০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সোনা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার ছয় ভাগের এক অংশের মালিক ছিল ফ্রেঞ্চ এবং ৯১ কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালিক ছিল মার্কিণ যুক্ত রাজ্য। এই উভয় দেশের স্বর্ণের সমষ্টি পৃথিবীর সমগ্র স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ ছিল।

* * * *

মশা ও কচুরী পানা।—মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয় গত ১১ই এপ্রিল সিউড়ীতে যাইয়া কচুরী পানার অপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যে সকল পুকুর বা ডোবায় কচুরী পানা থাকে, সেই সকল জলাশয়-উৎপন্ন মশার মধ্যে ম্যালেরিয়ার বিষ অত্যধিক পরিমাণে দেখা যায়। তিনি এবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

* * *

বৈঠকে কে কে যাইবেন।—ইহা এক প্রকার বিশ্বস্ত সূত্রেই জানা গিয়াছে যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ডাঃ এম, এ, আন্সারী এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মহাত্মার সহিত লণ্ডন গমন করিবেন এবং আলোচনায় মহাত্মাকে সাহায্য করিবেন।

* * *

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে কলিকাতার নাগরিকগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি।—গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মনীষী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন টাউন হলটি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং উহা লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

Sally Dun নামে মার্কিণের এক বিখ্যাত দৌড়ের ঘোড়ার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়ায় উহাকে উপযুক্ত চশমা পরাইয়া দেওয়ায় ঘোড়াটি সম্প্রতি একটি বিখ্যাত দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

* * *

পুরুনের গায়ের একটি ওভারকোটের দাম সম্প্রতি লণ্ডনের বাজারে ৩ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছে। ইহার হাতের অগ্রভাগ এবং চারিধারে রাশিয়ান নকুল জাতীয় জন্তুর চর্ম্ম এবং কলার Sea-otter (দুষ্প্রাপ্য সমুদ্রিক জন্তু বিশেষ) এর লোম দিয়া তৈরী হইয়াছে। Sea-otterএর লোম অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ইহার কলারের কোটগুলি প্রায়ই ১ হাজার পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হয়।

* * *

জার্ম্মানির এক যুবক বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি সূর্য্যালোক হইতে বৈদ্যুতিকশক্তি সংগ্রহ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ইতি মধ্যে বার্লিনের সরকারী বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রাদির সাহায্যে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন। সমুদ্র তরঙ্গ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহের জন্য মার্কিণে যে খুব প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা এখনও দেখাইবার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার জলপ্রপাত, স্রোতস্বিনী নদী বা সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি হইতে উহা সংগ্রহ করার চেয়ে যে অতি স্বল্প ব্যয়ও সর্ব্বত্র সংগ্রহ করার সুবিধা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

* * *

ভারতীয় মহিলাদের প্রশংসা। কমন ওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে সম্প্রতি লণ্ডনে এক মহিলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে বৃটিশ মহিলাবৃন্দ সমবেত হইয়া ভারতীয় মহিলাদের সৎসাহস এবং দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়াছেন।

পাঁচ ও সাত বছরের খুকীর বিবাহ।—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দুইটি বাল্য বিবাহ মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। একটি কনের বয়স ৫ বৎসর, আর একটির ৭ বৎসর। বাল্য বিবাহ নিবারণ আইন অনুসারে পুরোহিত এবং বর কনের পিতা-মাতার প্রত্যেকের ১০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে। এক জন বরের পিতা মারা গিয়াছে, কাজেই আর জরিমানা দিতে হয় নাই। এই সব কারণেই সম্প্রতি মহীশূর কাউন্সিলে বাল্য বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব উঠিতেছে।

* * *

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর পরলোকে

রায় বাহাদুর রসময় মিত্র চোর বাগান লেনে তাঁহার নিজ ভবনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৫৯ খৃঃ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চালক গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরভূম জিলা স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলী কলেজে এফ, এ, বি, এ, এম, এ. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আমরা তাহাকে হুগলী কলেজ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেও দেখিয়াছি। অতঃপর কলিকাতার হেয়ার স্কুলে আগমন করেন। শেষে তিনি হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ শিক্ষক অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি লর্ড সিংহের সতীর্থ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় লর্ড সিংহ ১০৲ বৃত্তি পান, রসময় বাবু ১৫৲ পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, লেখা পড়া শিখিতে এক পয়সাও তাঁহার বাটী হইতে খরচ হয় নাই তিনি বরাবর বৃত্তি পাইতেন।

রসময় বাবু সুমধুর কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন, এবং একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ রায় বাহাদুর উপাধি পান এবং ১৯১৫ খৃঃ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সূচী

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

HEALTH.

(Bengali)

৫ম সংখ্যা আষাঢ়—June ৯ম বর্ষ

সম্পাদক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

নবম বর্ষ] আষাঢ়—১৩৩৮। [৫ম সংখ্যা

বহুমূত্র রোগ ও খাদ্য দ্বারা তাহার চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, M. B.

রোগীর অত্যধিক পরিমাণ প্রস্রাব ও তাহার সঙ্গে তৃষ্ণা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে বহুমূত্র (diabetes) রোগ বলা হয়। এই রোগে প্রস্রাবে অল্প মিষ্টতা থাকে ও ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। প্রস্রাবে চিনি (sugar) পাওয়া গেলে নিশ্চয় বহুমূত্র রোগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অনেক সময়েই এই রোগের আরম্ভ বুঝা যায় না ও প্রথম অবস্থায় বহুকাল চিকিৎসা করা হয় না।

অত্যধিক ক্ষুধা, অনিবারণীয় তৃষ্ণা, কড়া চামড়া, ভিজা জীব, কোমরে বেদনা ও ভার বোধ হওয়া, ও শরীর হইতে সুকনা ঘাসের সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইতে, এই রোগে দেখা যায়। মুত্রকোষ হইতে অধিক পরিমাণ, হালকা হলুদ বর্ণের প্রস্রাব বাহির হয়—কখনও কখনও প্রস্রাব নীল আভাযুক্ত হয়। নাড়ীর বেগ সাধারণ অপেক্ষা দ্রুত হয়। মাংস পেশীর শীঘ্র ক্ষয় হয়। বেশী বয়সে, হাত ও পা ফুলা দেখায়, দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ও সেই জন্য অর্শ ভগন্দর রোগ দেখা যায়—ফুস ফুসের রোগ ও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বালককালে এই রোগ খুবই বিরল. যুবক ও প্রৌঢ়দের ভিতরে এই রোগ অধিক হয়—যাঁহারা মদ্য পান করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন—তাঁহারা প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

বহুমূত্র রোগ দুই প্রকার—(১) Diabetes Insipidus—এই রোগে বহু পরিমাণ প্রস্রাব হয় কিন্তু এই প্রস্রাবে কোনও দোষ দেখা যায় না। (২) Diabetes Mellitus বা চিনি মিশ্রিত বহুমূত্র—এই রোগে প্রস্রাবের সহিত চিনি নির্গত হয়।

কেবল প্রস্রাবে চিনি থাকিলেই Diabetes বলা চলে না, ইহাকে Glycosuria বলে। Diabetes

(বহুমূত্র রোগের) কারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয় নাই। স্নায়ু রোগ হইতে ইহার সম্পর্ক যে আছে তাহা নিশ্চয় বলা যায়—দুশ্চিন্তা বা হঠাৎ মনের আবেগ (Shock) হইতে ইহার উৎপত্তি প্রায়ই দেখা যায়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের এই রোগ বেশী আক্রমণ করিতে দেখা যায়—অধিক বয়সে আক্রান্ত রোগীদের অপেক্ষা কম বয়সে আক্রান্তদের এই রোগ বেশী বিপদ জনক হয়।

বহু মূত্র রোগের সঠিক কারণ এখন সম্যকরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই ফরাসী দেশীয় বিশেষজ্ঞ ক্লড বারনার্ড (Claude Bernard) তাঁহার পরীক্ষাগারে একটি জন্তুর মস্তিস্কের বিশেষ স্থানে (4th Ventricle of Brain) ছুঁচ ফুটাইয়া তাহার প্রস্রাবে চিনি পাইয়াছিলেন। কখনও কখনও বহুমূত্র বংশানুক্রমে দেখা যায়—ও তাহা হইলে যেকোনও বয়সে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই ইহা হইতে পারে ইহাদের ভিতর অধিকাংশস্থলে ২৫ হইতে ৬০ বৎসর বয়সের ভিতর এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ—(১) বহুদিন অবধি প্রস্রাবে অধিক পরিমাণ চিনি থাকা—ও ক্রমশঃ এই চিনি পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া।

(২) অত্যধিক তৃষ্ণা

(৩) অত্যধিক ক্ষুধা

(৪) চামড়া ক্রমশঃ শক্ত ও কর্কশ (harsh) ভাব হওয়া।

(৫) ক্রমশঃ শক্তি কমা ও মাংসপেশী গুলির ক্ষয় হওয়া—এই সকল লক্ষণগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে

এই রোগে প্রস্রাব পাণ্ডুবর্ণ ও একটু মিষ্টগন্ধ যুক্ত—পরিমাণে ৮ হইতে ২০ বা ৩০ আউন্স অবধি দেখা যায়। ইহার (Specific gravity) আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০ হইতে ১০৪০ হয়—অনেক সময় প্রস্রাবে চিনির অস্তিত্ব এসব বুঝা যায়—প্রস্রাবে পিপিলিকা বা মাছি লাগিতে দেখিলে। প্রস্রাব গরম যায়গায় থাকিলে শীঘ্রই পচিয়া যায়। পরীক্ষা করিলেই প্রস্রাবে চিনির অস্তিত্ব টের পাওয়াযায়। প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক হওয়ার দরুণ রোগীকে বহুবার প্রস্রাব করিতে হয়। রোগীর তৃষ্ণা অধিক হয় ও গলা, মুখ ইত্যাদি শুকাইয়া থাকে ক্ষুধা অত্যধিক হয় যদিও পরে ক্ষুধা কমিয়া যাইতে দেখা যায়। জিহ্বা লাল ও irretable থাকে দাতের মাড়ি ফুলা থাকে ও দাঁতগুলি শীঘ্রই নষ্ট হইতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা সাধারণতঃ দেখা যায়, শরীর রোগা, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—অবসাদ ও ক্লান্তির দরুণ কাজ করিতে আর ইচ্ছা থাকে না। চামড়া ক্রমশঃ কর্কশ মনে হয়, প্রায় ফোড়া হইতে দেখা যায়—এই ফোড়াগুলি সহজে সারিতে চাহেনা। চক্ষে আশু ছানি পড়ে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি যদিও সাধারণতঃ দেখা যায়—অনেক সময় প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয়ের পূর্ব্বে রোগীর কোনও লক্ষণই টের পাওয়া যায় না। মোটা প্রৌঢ় লোকেদের অনেক সময় সামান্য পরিপাক শক্তির হ্রাস ও দুর্ব্বলতা ব্যতিত আর কিছুই দেখা যায় না। এই সকল স্থলে রোগীর আশু উপকার হইতে দেখা যায়।

বহুমূত্র (Diabetes) বহুকাল স্থায়ী রোগ—যদিও কখনও কখনও অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইতে দেখা যায়। রোগীর বয়স যত কম হয় রোগ ততই কঠিন হইতে দেখা যায়। ৬ মাস হইতে ৩।৪ বৎসর

বা ততোধিক কাল রোগীকে ভুগিতে দেখা যায়। রোগী প্রায়ই ক্ষয়ের দরুণ বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। অনেক ডাইবিটিস রোগীকে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, অনেকে আবার হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও মারা যান।

চিকিৎসাঃ—পথ্যই বহুমূত্র রোগের প্রধান চিকিৎসা। চিনি বা শ্বেতসার প্রধান খাদ্য যাহা শরীরে গিয়া চিনিতে পরিণত হয় সেগুলিকে একেবারে ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোগীর কোনও মতেই চিনি খাওয়া উচিৎ নয়। ভাত, রুটী বিস্কুট, আলু ও মিষ্ট তরিতরকারি তাহার খাদ্য তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে। যদি কষ্ট হয় প্রথম প্রথম সামান্য লাল আটার রুটী ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ সকল জিনিষগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে। রোগীর নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করা, স্নান করা, গায়ে গরম জামা ব্যবহার করা উচিৎ।

ইনসুলীনের আবিষ্কারের দরুণ এই বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর আসিয়াছে—অনেকস্থলে ইহা আশ্চর্য্য ফল দেখায়।

পথ্যই যে আরোগ্য হইবার একমাত্র উপায় ইহা মনে রাখা দরকার। খাবারের ধরাকাট না মানিয়া চলাতে রোগের পুনঃ আক্রমণ খুবই দেখা যায়। রোগ এইবার ভীষণতর রূপে দেখা দেয়। খাদ্যের তালিকা এমন করা দরকার যাহাতে রোগীর সব রকম আহার্য্য না পাওয়ার দরুণ কোনও অসুবিধা না ভোগ করিতে হয়।

রোগীরা খাইতে পারেন—

মাংস—সব রকম (লিভার বা মেটে বাদ দিয়া) Ham, Bacon বা পাখীর মাস, অন্য প্রকারে রাঁধা শুকর মাংস চিংড়ি মাছ—সামুকের মাংস।

আমন্ড গ্লুটেন (Gluten) ও চোকর (Bran) এর রুটী আটার রুটীর বদলে।

ডিম—সব রকম রাঁধিয়া।

মাখন, ননী, পনীর, ছানা ইত্যাদি দুগ্ধজাত খাদ্য।

পালং, বীন, ফরাসবীন, কপি, বাঁধাকপি, এস-পারাগাস, Turnips, বাঁসের কোড়, পাতাল থোড়, পানিফল, শশা, কাঁকুড় লেটুস, স্পাইনাক, মুলা, সেলেটী শাক, ফলের জেলী (মিষ্ট না দেওয়া)।

ভারতে ম্যালেরিয়া নিবারণের ইতিহাস

(শ্রীঅমলকুমার গাঙ্গুলী)

ভারতে নানা প্রদেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময় ম্যালেরিয়া নিবারণের যে বিবিধ প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার কতকগুলি নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

শারানপুর, নগিনা এবং কোশী—

১৯১০ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কর্ণেল রবার্টসন, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত শারানপুর ও নগিনা নামক ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত সহরের পরিদর্শন সম্পূর্ণ করেন। ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্যে যুক্ত-প্রদেশের এই তিনটি সহরে কৃষিবিভাগ ম্যালেরিয়া নিবারণের বহু উপায় স্থির করেন। এই সকলের অবস্থা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেহাম সাহেব ও পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ সাহেব কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আলোচিত হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্থানেই রোগের কারণ চাষের জমিতে অতিরিক্ত জল সঞ্চয়। ১৯১৮ সালে শারানপুরে কার্য্য শেষ হয়। ১৯২২ সালে সরকার ৮০,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং পরে এই সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয়। রবার্টসনের পরিদর্শন কালে তিনি দেখেন শতকরা ৭৮·৮ জন লোকের প্লীহা বর্দ্ধিত। আবার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ফিলিপস সাহেবের বিবরণীতে দেখা যায় শতকরা ৭·৩ জন লোকের প্লীহা বর্দ্ধিত আছে। ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ গননার একটি ভুল ধার্য্য করা যাইতে পারে যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের কতক অংশে ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একবার এইরূপ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির ৫।৬ বৎসর পরেই সকলেরই প্লীহা দোষহীন দেখা যায়। কিন্তু চারিদিকের গ্রামগুলিতে তখনও বহু প্লীহা রোগী দৃষ্ট হয়।

শারানপুরের ন্যায় নগিনাতেই পরবর্ত্তী গণনাতে প্লীহা রোগীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইতে দেখা যায়। দেশের মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইতে দেখা যায় এবং জন্ম সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন।

কোশীতে যদিও কার্য্য তেমন ভাল করিয়া চালান হয় নাই তথাপি রোগীর সংখ্যা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অর্দ্ধেক লক্ষিত হয়।

তাহা হইলে দেখা যায় যে উপরোক্ত সহরসমূহে ম্যালেরিয়ার অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ কৃষিতে জল ব্যবহারে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন।

মাদ্রাজ—(১৯১২-১৯১৬)

মাদ্রাজে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। হজসন ও রাসেল সাহেবের চেষ্টায় বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিয়া ডিসপেন্-সারী স্থাপন করিয়া পুকুর প্রভৃতি জলাশয় ভরাট,

করিয়া কিম্বা মৎস্য ছাড়িয়া এবং আরও অন্যান্য উপায় ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্য পরিচালিত হয়।

ভারতের মধ্যে আসাম একটি ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধ স্থান। আসামের ভিন্ন ভিন্ন সহরে পাকা নর্দ্দামা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্য চালান হয়। ১৯১৫ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা দেশের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গারান, তপসীখনি, জঙ্গীপুর প্রভৃতি স্থান নানারূপে ক্ষেতের জল বাহির করিয়া, পুকুর ভরাট করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণ চেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের নিশ্চেষ্টতায় কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

বোম্বাই—১৯০৮—২৯ খৃষ্টাব্দ। বোম্বাই সহরে ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রশ্ন প্রথম হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। সহরে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। পরিদর্শনের ফলে জানা যায় সহরের বিভিন্ন জেলায় কূয়ার জলে মশকের জন্ম হইতেছে। এই পরিদর্শনের পর ১৯০৯ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেণ্টলি সাহেব সহরের প্রত্যেক অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া একটি মন্তব্য বাহির করেন। তিনি ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য স্বয়ং সচেষ্ট থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আবার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। এই প্রাদুর্ভাবের কারণ ভাল করিয়া জানা যায় নাই। তবে মনে হয় সেই সময় যে সকল নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছিল তাহারই আবর্জ্জনা হইতে মশকের উৎপত্তি হইয়াছে।

আজকাল বোম্বাই সহরে ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই চলে। বোম্বাই সহরে যে রকম ম্যালেরিয়া নিবারণ করা হইয়াছে ভারতের আর কোনও দেশে প্রচেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই।

ভারতবর্ষের আরও বহু গ্রামে এবং সহরে ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা হইয়াছে। কোথাও পুষ্করিণী ভরাট করিয়া, কোথাও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং বড় বড় সহরে নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় যাহাতে মশক জন্মাইতে না পারে তাহার জন্য একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, ম্যালেরিয়ার প্রতিবিধান করা হইয়াছে। অনেকাংশে এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

আলেয়া

(শ্রীসুশান্তকুমার সিংহ)

'চৈত্র রাতের উদাস হাওয়া' আর কাহাকেও পাগল না করিলেও মলয়কে পাগল করিল। মলয় কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া কলেজে আই-এ পড়ে। ভাল ছেলে বলিয়া তাহার একটু সুখ্যাতি ও 'বইয়ের পোকা' বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে।

বইয়ের পোকা বলিয়া উপাধিটা মলয়ের বন্ধুরা দিলেও সে যে সমস্ত পুস্তক পড়িত তাহার মধ্যে অধিকাংশই পাঠ্য পুস্তক নহে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক তরুণ সাহিত্যরস সে পান করিয়াছে। নিজেও একখানি খাতায় অনেকগুলি কবিতা কথিকা লিখিয়াছে, তাহার মধ্যে নির্ব্বাচিত কয়েকটী কবিতা ও কথিকা সে অনেকগুলি পত্রিকার সম্পাদককে রেজেষ্টী ডাকযোগে পাঠাইয়াছিল এবং মনোনীত সংবাদ দিবার জন্য তাহার সহিত ষ্ট্যাম্প দিয়া দিয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ষ্ট্যাম্পগুলি মনোনীত সংবাদ না আনিয়া অমনোনীত কবিতাগুলি ফেরত আনিয়া দিত।

সৎসাহিত্যে সম্পাদকের এইরূপ বিরাগের জন্য চৈত্রের গরমে মলয়ের মন পাগল হইয়া উঠে নাই। কবিতা অমনোনীত হওয়ার জন্য সে 'থোড়াই কেয়ার' করে একদিন আসিবে যেদিন তাহার কবিতা কাব্য-জগতে এক বিপ্লব আনিবে। তাহার এই সমস্ত অদূরদর্শী সম্পাদকদিগের জন্য দুঃখ হইত।

তাহার মন পাগল হইয়াছে অন্য কারণে—আজ কয়দিন হইতে তাহার সমস্ত মনপ্রাণ মানসীর জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার তনুমন এক অজ্ঞাত; অপরূপ লাবণ্যসম্পন্না অদৃশ্যা তরুণীর পায়ের তলায় লুটাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কবিতার খাতায় অন্তঃচারিনী, পায়ের আলতা, বুকের বেদনা, প্রভৃতি কাব্য-সাহিত্যের উজ্জলরত্নে পূর্ণ হইয়া উঠিলেও তাহার মানসী কল্প-লোকের মানস প্রতিমা হইয়া রহিল।

কলিকাতার রাস্তায় রোমান্স ছড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপন আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকরা দিলেও সে কোনও রোমান্সের সন্ধান পাইল না। সাইকেল করিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বাড়ীর পিছনে দৌড়াইয়াও সকাল সন্ধ্যায় এখানে সেখানে হানা দিয়াও সে তাহার মানস প্রিয়ার সন্ধান পাইল না। তাহার কবিতার খাতা বেদনার রক্ত-রাগে ভরিয়া উঠিল।

কবিতায় মনের ক্ষুধা মিটিলেও দেহের ক্ষুধা মিটে না। তাহার তরুণ হৃদয় পরিপূর্ণ যৌবনশ্রীমণ্ডিত পুষ্পবতী লতিকার মত একখানি দেহ লতাকে আপনার বলিয়া পাইবার জন্য অভিপ্সিত হইত। সে আর থাকিতে না পারিয়া হৃদয়ের গুপ্ত কথা তাহার জনৈক বন্ধুকে ব্যক্ত করিল।

সকৌতুকে তাহার মুখের দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বন্ধু বলিল, "সে কি হে! কলিকাতায় তুমি মানসীর সন্ধান পাচ্ছ না—চলো আজ আমি তোমায় নিয়ে যাব।

দিনের পর দিন ধরিয়া যাহার সন্ধানে সে কলিকাতার রাস্তায় উন্মাদের মত ঘুরিয়াছে, যাহার জন্য তাহার হৃদয়ের অশ্রু-অর্ঘ্য ভার কবিতার খাতার পাতায় পাতায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে সেই মানসীর সন্ধান কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বন্ধু দিবে? সে আগ্রহান্বিত হৃদয়ে বলিল সত্যি হেমন্ত, সত্যি, তুমি জান সন্ধান—কোথায় সে থাকে?

হেমন্ত নামীয় যুবকটী গম্ভীরভাবে বলিল, আরে পয়সা থাকলে কলকাতায় বাঘের দুধ মিলে, আর মানসী পাবে না! কত চাও—হাজার-হাজার চাও ত বল তাও এনে দিতে পারি? হাজার মানসীতে তাহার যে প্রয়োজন নাই তাহা জানাইয়া কোথায় যাইলে মানসী পাওয়া যাইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হেমন্ত এক পল্লী বিশেষের নাম করিল।

ঘৃণায় মলয়ের মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, সে বলিল, "বেশ্যা বাড়ী—ছিঃ—"

উচ্চহাস্য করিয়া তাহার কথাকে অর্দ্ধপথে থামাইয়া দিয়া হেমন্ত বলিল, বেশ্যা—ছিঃ কেন বেশ্যারা কি মানুষ নয়—তাদের বুকে কি রক্ত মাংস নাই—তবে—আর বেশ্যা বলে লাফিয়ে উঠছ কিনা তুমি? বিংশ শতাব্দীর তরুণ সাহিত্যের উপাসক ছিঃ—"তারপর মলয়ের টেবিল হইতে একখানি পুস্তক লইয়া বলিল," এই দেখ নিত্যানন্দ বাবু কি বলেছেনঃ—

"নীহার তাহার জ্যোৎস্না-পরিস্নাত স্ফুটনোন্মুখ কমলকলি সদৃশ দেহলতাকে ঈষৎ উন্নত করিয়া বলিল, হ্যাঁ, বেশ্যা আমি স্বীকার করি জন্ম নক্ষত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা আমার নিষ্ঠুর ললাটে যে কলঙ্কের জয়টীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু জন্ম ত আমার হাত ধরা নয়—তাহার স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল অশ্রুহীন চক্ষু দুইটী রক্তরবির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে আবার বলিল, "কিন্তু বেশ্যা হলেও আমরা মানুষ। আপনার মত—দশজনের মত আমাদের বুকেও সুখ দুঃখ আছে—বেশ্যা বলে নারীত্ব আমাদের ত্যাগ করে না, ভালবাসা আমাদের অবহেলা করে না আমাদের যৌবনের অতিথির অভ্যর্থনার জন্য কোমল বক্ষ মেলিয়া অপেক্ষা করে। আমাদের প্রাণও চায় যে সকল ব্যথা হরণ করিবার জন্য দুইটী বাহু, উষ্ণ কপোলের উপর অমৃতের প্রলেপ দিবার জন্য দুইটী ক্লান্তি হরণ ওষ্ঠ,—আমাদের বক্ষও দয়িতের জন্য উন্মাদ হয় কিন্তু উপায় নাই আমরা বেশ্যা, আমরা ঘৃণ্যা—আমরা অস্পৃশ্যা, আমরা সমাজের আবর্জ্জনা, তাই আমাদের বুক দীর্ঘশ্বাসের মর্ম্মর ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে, তাই আমাদের দিন এই পথের ধূলার দিকে চেয়ে কাটে—কারণ আমরা বেশ্যা। সে আর কথা বলিতে পারিল না—তাহার বক্ষ সমুদ্রের মত ফুলিয়া উঠিল, সমাজকে দগ্ধ করিবার জন্য সাপের নিঃশ্বাসের মত জলন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল।

পড়া শেষ হইয়া যাইলে কয়েক মিনিট স্তব্ধ নিবদ্ধতা ক্ষুদ্র কথার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে হেমন্ত বলিল, দেখলে ত' নিত্যানন্দ বাবু কি বলেছেন—এখনও কি বেশ্যা বলবে? ঘৃণা করবে ছিঃ—।

মলয় চুপ করিয়া রহিল—বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করা যে উচিত নয় তাহা স্বীকার করিলেও মন প্রবোধ মানে না—আজন্ম যে সংস্কারে প্রতিপালিত; কয়েকটী কথার মোহে সে সংস্কার দূর করা যে কত শক্ত তাহা বুঝিতেও দেরী লাগে না। একটা অপরিচিতের আতঙ্ক যেমন তাহাকে পিছন দিকে টানিতে লাগিল তেমন একটা কৌতুহলও তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তাহার মন সন্দেহ দোলায় দুলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হেমন্ত বলিল, কিহে বোকার মত ভাবছ কি ? ভয় নেই—'বাঘ নই যে গিলবো তোমায় খপ করে' তারাও মানুষ—চল—দেখ যদি তোমার মানসীর সঙ্গে না মিলে তবে আর যাবে না—এমন ত নয় যে একদিন গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—তারপর একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ওহে পঙ্কের মধ্যেই পঙ্কজিনীই থাকে—বুঝলে তৈরী হয়ে থেক সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব—"হেমন্ত মলয়ের কাঁধে একটু ঈষৎ ধাক্কা দিয়া প্রস্থান করিল।

বিরাট অট্টালিকার কোন এক ফাঁকে বাতাস সামান্য এক বীজ প্রোথিত করিয়া দেয়, তাহা লক্ষ্য করিলেও কেহ গ্রাহ্য করে না কিন্তু সেই বীজ হইতেই যে একদিন সবুজের জয় পতাকা অঙ্কুরিত হইয়া অট্টালিকাকে ধ্বংশস্তূপে পরিণত করিবে তাহা কেহই কল্পনা করিবে না। মলয় আজ হেমন্তর কথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মানসপ্রিয়ার সন্ধানে যেখানে যাইতেছে তাহার পরিণাম যে কি তাহাও যদি সে কল্পনা করিতে পারিত।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় হেমন্ত আসিয়া মলয়কে লইয়া সরোজ নাম্নী এক রূপোপজীবিনীর কাছে লইয়া যাইল। অনভ্যস্ত চরণে, ব্যকুলিত হৃদয়ে মলয় যখন প্রসাধনরতা এই বারবিলাসিনীকে দেখিল তখন সে মুগ্ধ হইয়া গেল, মনে হইল জ্যোৎস্না পরিস্নাত রজনীগন্ধার মত তাহার লাবণ্য। চূর্ণকুন্তল গুলি ললাটের উপর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যেন পূর্ণচন্দ্রের উপর লঘুমেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের দেখিয়া সে প্রশান্ত নীলজ আবেগপূর্ণ আয়ত চক্ষু দুইটী তুলিয়া বলিল 'আসুন বসুন।'

মলয়ের প্রাণে কে যেন সহস্র সেতারে একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বেশ্যাদের নানাবিধ বীভৎস বর্ণনা সে প্রাচীন সাহিত্যিকদের লেখায় পড়িয়াছে কিন্তু আজ সম্মুখে এই প্রফুল্ল কুন্দকলিকাকে দেখিয়া সেই সব বর্ণনার মধ্যে সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। নিত্যানন্দ বাবুর লেখার কথা মনে পড়িল—"বেশ্যা হলেও আমরা মানুষ।" হেমন্তের কথা মনে পড়িল, "পঙ্কের মধ্যেই পঙ্কজিনী থাকে।" সে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল দীর্ঘ দিন ধরিয়া কল্পনা পুষ্পদ্বারা সে যে মানস প্রতিমাকে হৃদয় মন্দিরে গড়িয়া তুলিয়াছিল আজ তাহাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়াছে। এই নারীর কুসুম প্রনব দেহের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত মণিমুক্তাকে যেন উজাড় করিয়া দিয়াছে। তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, রঙ্গীন কল্পলোক আর তার অসীম আনন্দ। হায়রে সে বুঝিতে পারিল না, যে তৃষাতুরের মত মরুভূমির ভিতর দিয়া যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে সে মরীচিকা অমৃত বলিয়া যাহা আকণ্ঠ পান করিতেছে, তাহা তীব্র হলাহল।

তারপর ধীরে ধীরে কেমন করিয়া যে অধঃপতনের শেষ সীমানায় আসিল মলয় তাহা নিজেই জানে না। যে সুখের কল্পনায় মানস প্রতিমাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা একদিন তাসের ঘরের মতই ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। প্রকৃতির অবমাননার ভান তাহার সমস্ত শরীরে দেখা দিল। সমস্ত দেহ কঠিন ব্যাধিতে পূর্ণ হইল। শরীর দুর্বল হইল, মাথা ঘুরিয়া যাইতে লাগিল, প্রস্রাব করিবার সময় অসহ্য যন্ত্রণা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

কিন্তু উপায় নাই, যে পূজার যে মন্ত্র, একদিন আনন্দ করিয়া স্বেচ্ছায় যাহাকে আবাহন করিয়া নিজের দেহের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে বিদায় করিবার

ক্ষমতা তাহার নাই—লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তাহার লজ্জা হইতে লাগিল, তাহার চোখের কোণে কালসিরা যেন তাহার দুষ্কৃতির কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্যই অত্যন্ত অধিক ভাবেই প্রকট হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়। দূরে দিকচক্রবানে ধীরে ধীরে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিতেছে। তাহার রাগ রঞ্জিত রেখায় খণ্ড মেঘগুলি বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতার রাজপথ আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যারাণীকে বরণ করিয়া তুলিতেছে। হোষ্টেলের মাঠে ছেলেরা খেলা শেষ করিয়া জটলা পাকাইতেছে, 'কমনরুম' হইতে একটা অবিশ্রান্ত হাস্য পরিহাসের কলরব ভাসিয়া আসিতেছে।

"মলয় তাহার রুমটীতে অন্ধকারে বসিয়া নিজের কথাই ভাবিতেছিল—মনে হইল সেই একদিনের কথা যেদিন সে প্রথম সরোজের বাড়ী গিয়াছিল—আর আজ অনুতাপের তীব্র শিখা নিশিদিন তাহার অন্তর-দেশকে দাহ করিতেছে। তাহার কান্না আসিল। আজ যদি একবার হেমন্তর সাক্ষাৎ পায়—আবার ভাবিল, তাহারই বা দোষ কি—সেই ত উদভ্রান্তের মত লালসায় অস্থির হইয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে হত্যা করিয়াছে। আগুনে হাত দিলে যে হাত পোড়ে এই সহজ সরল সত্যকথাটী সে কেন ভুলিয়া গিয়াছিল? মনে পড়িল প্রাচীন সাহিত্যিকদের সাবধান বাণী। হায় কেন সে তাহা অমান্য করিল—নইলে আজ এই বেদনার, রুদ্ধযাতনার অগ্নিস্রাবী দহনে তাহাকে দগ্ধ হইতে হইত না।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। কোন এক তিথির খণ্ডচন্দ্র বহু উর্দ্ধ হইতে ম্লান কৌমুদীর ধারায় ধরাতল প্লাবিত করিয়াছে। সুশীতল, সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। মলয় উঠিয়া সুইচ টানিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন উপায় সমস্ত দেহের উপর যে ব্যধির বিস্তার হইয়াছে তাহার কি উপায় করিবে—কোন ডাক্তারের কাছে যাইতে তাহার লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন করিয়া কোন লজ্জায় তাহাদের কাছে নিজের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ করিবে—তবে উপায়—সে একমনে নিরুপায়ের উপায় ভগবানকে ভাবিতে লাগিল।

আহারাদির পর কমন রুম হইতে সেদিনকার খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল, হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে :—

মলয় একবার দুইবার তিনবার বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিল; তাহার আর অন্য সংবাদ পাঠ করা হইল না। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিজের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া সে 'যৌবন বটিকা'র অর্ডার দিল। কয়েকদিন পরে ৭৮/০ ভিঃ পিঃ আসিল। মলয় ঔষধ লইয়া দেখিল যে যৌবন বটিকা ব্যতীত আরও কয়েকটী ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র রহিয়াছে। সে ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিল।

কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহারে সে বেশ ফল পাইল কিন্তু পাঁচ ছয় দিন পরেই সে দেখিতে পাইল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ চাকা চাকা দাগে পূর্ণ হইয়াছে এই কয়দিন যে একটু উপশম হইয়াছিল তাহা আবার পুনরুদ্যমে আক্রমণ করিয়াছে। যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়া উঠিল।

"যৌবন বটিকা" বন্ধ করিয়া মলয় বিজ্ঞাপন দেখিয়া আরও কয়েকটী জগদ্বিখ্যাত ধন্বন্তরী মহৌষধ (?) পেটেণ্ট ঔষধ খাইল! কিন্তু কোনটাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং অপকারই হইল। ক্রমে তাহার দেহে নানা প্রকার ক্ষত দেখা দিল, সে উপায়ান্তর না দেখিয়া পাড়ার একজন ডাক্তারের কাছে যাইল।

ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "আপনি করেছেন কি?" সমস্ত শরীর যে আপনার পারায় পূর্ণ হয়ে গেছে—আপনার নিজের অত্যাচার আপনার দেহের যত অপকার না করেছে তার চেয়ে বেশী অপকার করেছে এই সব পেটেণ্ট ঔষধ। ছিঃ আপনারা শিক্ষিত হয়ে এই সব যা তা পেটেণ্ট ঔষধ বিজ্ঞাপনের কুহকে পড়ে কেনেন ব্যবহার করেন—আমাদের কাছে আসেন নাই কেন?

এ 'কেন'র উত্তর মলয় কি দিবে? কেমন করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া নিজের কলঙ্ক প্রচার করিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, আমাদের দেশে রোগে যত না ক্ষতি করছে তার চেয়ে ক্ষতি করছে এই সব পেটেণ্ট ঔষধ আর আপনারা লেখা পড়া শিখে যে এই সব ঔষধ কিনে অর্থ ও স্বাস্থ্য দুইই নষ্ট করেন এইটেই আশ্চর্য্য।

এইবার মলয় মুখ খুলিল, সে বলিল, আমি না হয় শিক্ষিত হয়ে বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে এই ঔষধ ব্যবহার করছি কিন্তু বাংলা দেশ শিক্ষিতের দেশ নয় এখানে অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশী এখানে না হয় ডাক্তার আছে তাই আমি ডাক্তারে কাছে আসি নাই বলে তিরস্কার করছেন কিন্তু এমন অনেক জায়গায় অভাব এই বাংলা দেশে নাই যেখানে ডাক্তার বলতে ঐ বিজ্ঞাপন আর এইসব পেটেণ্ট ঔষধ তাদের উপায়!

ডাক্তার বাবু বলিলেন, দোষ ত' তাদের যা তা ঔষধ তারা কেন ব্যবহার করে—বিলাতী সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধে ফরমুলা লেখা থাকে—তেমনি যে সব দেশী ঔষধে ফরমুলা লেখা থাকে তাই ব্যবহার কেন করে না।

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া মলয় বলিল, ডাক্তার বাবু এটা বাংলা দেশ, যেখানে শতকরা ৯৩ জন লোক অশিক্ষিত তাদের কাছে ফরমুলা থাকা বা না থাকা উভয়েই সমান আর যারা পড়তে জানে তারা জানে না এমন কি আমিও জানি না যে ডাক্তারী শাস্ত্রমতে কোন্ ঔষধের কতটা ডোজ উপকারী আর কোনটা অপকারী—ডাক্তার বাবু এটা বিলেত নয়!"

মলয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল সে আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার উপর যে অদৃষ্ট নিষ্ঠুর কৃষ্ণ যবনিকা উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে তাহা সে জানে আর জানে বলিয়াই আজ তাহার মন বাংলার যে সমস্ত তরুণ তরুণীরা মায়ামুগ্ধের মত আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে, তাহাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিজের জন্য চিন্তা আজ আর তাহার মনে আসিল না। মৃত্যুর তুষার শীতল স্পর্শ ব্যতীত তাহাকে শান্তি দিবার যে আর কিছুই নাই। চকিতের মত মনে পড়িল সেই প্রথম যেদিন সরোজের গৃহে গিয়াছিল, সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল তাহার অন্ধকার গৃহে সোণার দেউটি জ্বলিয়া উঠিয়াছে আর আজ— সে ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাস করিল, "তবে ডাক্তার বাবু কিছু কি উপায় নাই— ?"

সান্ত্বনার স্বরে ডাক্তার বাবু বলিলেন, উপায় আছে বৈ কি! 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই প্রবাদবাক্য আমাদের দেশেই চলিত রয়েছে—ভয় কি—তবে হাঁ। দিনের পর দিন ধরিয়া যাকে নষ্ট করেছ তাকে কি একদিনে ফিরে পাবে—তিনি তাহাকে ঔষধ দিয়া বিদায় করিলেন।

কয়েকদিন পরে ডাক্তার বাবু তাহার কক্ষে বসিয়া মলয়ের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সত্যইত বাংলার অসংখ্য অশিক্ষিত মুক নরনারী নির্ব্বিকারে অমৃত বলিয়া যে বিষ পান করিতেছে তাহার উপায় কি? চঞ্চল প্রকৃতি তরুণ যৌবনের অরুণ আলোয় উন্মত্ত হইয়া মানব প্রেমের বিচিত্র ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই ইহাই সৃষ্টির চিরন্তন সত্য, বিধাতার বিধান কিন্তু এই যৌবন মোহে কুসংসর্গে মিশিয়া নিজের যে সর্ব্বনাশ করে তাহার উপায়? সংসারে প্রলোভনের অভাব নাই বিশেষতঃ এই সহরে রূপোপজীবিনীরা রূপের পসরা সাজাইয়া তরুণদের স্বভাব চঞ্চল চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাকে রোধ করিবে কে?

টেবিলের উপর হইতে সেইদিনকার কাগজ লইয়া অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলাইতেই তাঁহার নজরে পড়িল অসংখ্য পেটেণ্ট ঔষধের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। ইহার অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা।

ডাক্তার বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই আর একটা জিনিষ সমাজের পৃষ্ঠে দুষ্টব্রণের মত রহিয়াছে। উপায় নাই। অর্থনৈতিক সরকার পয়সা পাইলে কলার পাতা রেজিষ্ট্রী করিতে ইতস্ততঃ করিবে না আর সেই রেজেষ্ট্রীকে অমোঘতার শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে জনসাধারণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না আর তাহাদের সেই সরল বিশ্বাসের বিনিময়ে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের পরিবর্ত্তে অসঙ্কোচে বিষপান করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়া লইতেছে তাহার উপায়।

তাঁহার মনে হইল, ইহা রোধ করিবার একমাত্র উপায় মেডিকেল বোর্ড হইতে সরকারে আন্দোলন করিয়া যদি আইন প্রচলন করা যায় যে সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ বাজারে বিক্রয়ার্থে বাহির করিবার পূর্ব্বে সরকারী বিশ্লেষণ আগারে প্রস্তুতের বিবরণ সহ পাঠাইতে হইবে এবং সেখানকার বিশেষজ্ঞ তাহা উপকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে তবে তাহা সাধারণে ব্যবহার করিতে পারিবে তাহা হইলে ইহার প্রতিকার হইবে নচেৎ নহে। তিনি স্থির করিলেন যে মেডিকেল বোর্ডের আগামী অধিবেশনে তিনি এই বিষয়ে প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু জনমত

অবহেলাকারী সরকার তাহা গ্রহণ করিবেন কি না কে জানে ?

সংবাদপত্র ইতঃস্ততঃ দেখিতে যাইয়া ডাক্তার বাবুর নজরে পড়িল, একস্থানে লেখা রহিয়াছে—

কলেজের ছাত্রের আত্মহত্যা

আলেকজাণ্ডার কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র মলয়কুমার রায় কলেজ সংলগ্ন হোষ্টেলে নিজ কক্ষে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নাকি সে এই কার্য্য করিয়াছে। মেধাবী ছাত্র বলিয়া কলেজে তাহার নাম ছিল। তাহার দেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠান হইয়াছে।

অলক্ষিতে ডাক্তার বাবুর চক্ষুর কোণে অশ্রু-কণা দেখা দিল—আপনার হইতেই একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইল।

ওলাউঠা

(বিসূচিকা—কলেরা)

(ডাঃ বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী, D. P. H., Deputy Director of Public Health)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদিগের শরীরে ওলাউঠার জীবাণু প্রবেশ করিলেই কি ওলাউঠা হয় ? গ্রামে যখন ওলাউঠার মড়ক হয়, তখন পানীয় জলের পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটের জলে, রোগীদিগের মলদূষিত বস্ত্রাদি কাচায়, রাশি রাশি কমা ব্যাসিলাস মিশিতে থাকে ও তাহার সহিত গ্রামের অনেকেরই শরীরে প্রবেশ করে, অথচ রোগ কয় জনের হয়! দূষিত জল-পায়ী অবিশিষ্ট লোকদিগের হয় না কেন ?

কমা ব্যাসিলাস অম্ল রস সহ্য করিতে পারে না; আমাদিগের আমাশয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় অম্লরস নির্গত হয়; সুতরাং কমা ব্যাসিলাসের আমাশয় অতিক্রম করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাশয় রোগ গ্রস্ত হইলে, বা সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হইলে, আমাশয়ের রস অম্ল না হইতেও পারে, এইরূপ অবস্থায় কমাব্যাসিলাস, জল, দুগ্ধ বা অন্য কোনও খাদ্যের সহিত প্রবেশ করিলে, উহা পার হইয়া, সহজেই অন্ত্রে পৌঁছাইতে পারে।

(আমরা ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগারে, কমা ব্যাসিলাসের জন্য, পেপ্টোন নামক প্রোটীন্ জাতীয় নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য ও লবণ জলে গুলিয়া উহাতে সোডা দিয়া উহাকে ঈষৎ ক্ষার করি; ঐ লবণ ক্ষার খাদ্যে, কমা ব্যাসিলাসকে প্রবেশ করাইলে উহা সত্বর বাড়িয়া অসংখ্য হইয়া পড়ে।) আমাদিগের অন্ত্রের মধ্য স্থিত পদার্থ জীর্ণ ও জীর্ণাবশেষ ঐরূপ খাদ্য, উহাও অন্ত্রের রস পিত্ত ও শ্লেমরস এই সকল ক্ষার রস মিশ্রিত, সুতরাং কমা ব্যাসিলাসের পক্ষে বড়ই উপযোগী। কিন্তু—

(২) আমাদিগের অন্ত্রের মধ্যে স্বভাবতঃ যে সকল জীবাণু বাস করে তাহাদিগের অধিকাংশই,

ল্যাকটিক এসিড নামক অম্ল উৎপাদন করে; তাহার ফলে কমা ব্যাসিলাস আমাদিগের অন্ত্রে গিয়া পড়িলেও সব সময়ে সুবিধা করিতে পারে না। কিন্তু যে সকল ব্যাক্‌টেরিয়ায় মাংসাদি পচায়, যদি তাহারা অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি লাভ করে, অথবা যদি অন্য কোনও কারণে আমাদিগের অনুকূল স্বাভাবিক অম্লোৎপাদক ব্যাক্‌টেরিয়াগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহা হইলে তাহারা আক্রমণকারী কমা ব্যাসিলাস-গণকে পরাস্ত করিতে পারে না, সুতরাং পেটের অসুখ থাকিলে কমা ব্যাসিলাসের সুবিধা হয়।

(৩) এই সকল জীবাণু ব্যতীত আমাদিগের অন্ত্রে কখন কখন **এক প্রকার** অতি ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণেরও অগোচর ব্যাক্‌টেরিয়াভুক্‌ প্রাণী থাকে, তাহারা কমা ব্যাসিলাসের শত্রু।

(৪) আমাদিগের শরীরে **কমা ব্যাসিলাস দমনকারী পদার্থ** আছে। কমা ব্যাসিলাস অন্ত্রের গাত্র আক্রমণ করিলে এই সকল পদার্থ থাকায় উহারা (ক) মরিয়া যায়, অথবা (খ) রোগোৎপাদনে অক্ষম হইয়া, উহাতে বিশেষতঃ পিত্তকোষের গাত্রে, কিছুকাল বাস করিতে থাকে। লোকটি নিজে সুস্থ থাকে, কিন্তু রোগবাহন হইয়া কমা ব্যাসিলাসকে মলের সহিত বাহির করিতে থাকায় উহাদিগকে সুস্থ শরীরে প্রবেশের অবসর দিতে থাকে।

যদি ওলাউঠা জীবাণু আমাদিগের আমাশয়কে জীবিত অবস্থায় অতিক্রম করিয়া অন্ত্রে পৌঁছিতে পারে, যদি অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ পদার্থের অবস্থা উহার পুষ্টির ও সংখ্যা-বৃদ্ধির উপযোগী হয়, যদি শরীরের স্বাভাবিক প্রতিষেধক পদার্থ সকল যথেষ্ট না থাকে, যদি অন্ত্রের মধ্যে ওলাউঠার জীবাণুভুক অত্যানুবীক্ষণিক প্রাণী যথেষ্ট না থাকে বা আক্রমণকারী ওলাউঠা জীবাণুগণকে দমন করিতে না পারে, তাহা হইলেই উহারা তেজ করে, সংখ্যায় বাড়িয়া যায় ও রোগ উৎপাদন করে।

যেমন ধান্যাদি উদ্ভিদের মৌউসুম আছে, ঐ সময়ে ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে বা উহাতে থাকিলে যথেষ্ট ফসল হয়, অন্য সময়ে ক্ষেত্রে বপন করিলে বা উহাতে পড়িয়া থাকিলে, অতি অল্পই গাছ হয় এবং যাহা হয় তাহাও তেজ করে না, সেইরূপ উদ্ভিদ্‌ জীবাণু কমা ব্যাসিলাসেরও মৌউসুম আছে; পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, উহার মৌউসুম হেমন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ হয়, মাঘ মাসের দারুণ শীতে মন্দীভূত হইলেও গ্রীষ্ম আরম্ভ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে; এই সময়ে উহারা অন্ত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে বা উহাতে থাকিলেই বিশেষতঃ রোগ উৎপাদন করিতে পারে ও বিষম হইয়া পড়ে।

ওলাউঠা রোগ নিবারণ করিবার উপায়?

আমাদিগের দেশ হইতে আমরা ওলাউঠা রোগকে লুপ্ত করিতে পারি—

(১) যদি আমাদিগের শরীরে উহার জীবাণুকে প্রবেশ করিতে না দিই;

(২) যদি আমাদিগের শরীরে কমা ব্যাসিলাস প্রতিষেধক শক্তিকে প্রবল রাখি।

(৩) কমা ব্যাসিলাস কিছুতেই আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না—

যদি আমরা বিষ্ঠাকলুষিত জল, দুগ্ধ ও খাদ্য পান বা আহার না করি:—

অতএব **জল**।—

যেখানে কলের জল আছে, সেখানে অন্য জল

পান বা কোনওরূপে গলাধঃকরণ করা ও খাদ্য পানীয় ধারণের থাল, বাটী, গেলাস ধোয়া কিছুতেই উচিত নহে। কলিকাতার মুসলমানেরা কলের ব্যতীত অন্য জল অতি অল্প লোকেই ব্যবহার করে, ওলাউঠাও তাহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত কম, এই সহরে উহা প্রায় হিন্দুদিগরেই হইয়া থাকে।

যেথানে কলের জল নাই, সেখানে—

(ক) সম্ভব হইলে গভীর নলকূপ প্রোথিত করা উচিত, ২।৩ বা ততোধিক কঠিন স্তরের নিম্নে থাকায়, গভীর নলকূপের জল নিতান্ত নির্ম্মল অথচ খুবই প্রচুর। ইহা সুলভ। বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে মাটির নিম্নে জলের গভীর স্তর আছে, যে গ্রামে এইরূপ স্তর পাওয়া যায় সেই গ্রামে লোকেরা এই কূপ বসাইয়া শুদ্ধ জল পান করিতে পারেন।

(খ) অভাবে মুখ ঢাকা পাম্প বসান ইন্দারার জলও অনেকটা নিরাপদ।

(গ) নদী, পুষ্করিণী বা মুখ খোলা কূপের জল পান করিতে হইলে, ঐ জল ফুটাইয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; ঐ জলে রোগের বীজাণু থাকিলে, ফুটাইলে তাহারা মরিয়া যায়। পরে ঐ জলকে শীতল করিয়া পানের জন্য রাখা যাইতে পারে ; একটি বালুকাবহুল মৃণ্ময় কলস বা সোরাইয়ে ঢালিয়া, উহার মুখে পাতলা বস্ত্রখণ্ডে ঢাকিয়া, ঐ পাত্র বাতাসে রাখিয়া দিলে, জল বেশ শীতল ও স্বাদু হইয়া পড়ে। এরূপ জল পানের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মাছি ঃ—

গোময়, বিষ্ঠা, মাছের শল্ক প্রভৃতি পদার্থে বাটিতে মাছি আকৃষ্ট হয় ; গোময় ও বিষ্ঠায় উহারা ডিম পাড়ে ও ঐ ডিম হইতে ক্রমশঃ মাছির সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এই সব জান্তব পদার্থ সত্বর কোনও পাত্রে ফেলিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ও সুবিধামত পরে মাটিতে পুতিয়া ফেলিলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়, অথচ মাছি হইতে পারে না।

যাবতীয় খাদ্য ও পানীয় ঢাকা দিয়া রাখিলে উহাতে মাছি বসিতে পারে না।

হস্ত ঃ—অন্নাদি খাদ্য অগ্নি হইতে নামাইবার পর অন্নাদি খাদ্যে আর পাচক বা পরিবেশকের হাত লাগান উচিত নহে। একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিশারদ ইংরাজ ভদ্রলোকের পুত্র ও স্ত্রী ও পরে তাঁহার নিজের উদরাময় হয়, ওলাউঠা সন্দেহ করিয়া আমি তাঁহার স্ত্রীর ও তাঁহার নিজের মল পরীক্ষা করি, উভয়ের মলেই কমা ব্যাসিলাস পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের ঘরে ও পাকশালায় মক্ষিকার প্রবেশ একেবারেই অসম্ভব, যে সকল ফলমূল সব্জী না রন্ধন করিয়া খান সেগুলি ইহাঁরা জীবাণুনাশক দ্রব্যমিশ্রিত জলে উত্তম রূপে না ধুইয়া আহার করেন না। রোগবাহন কোনও ভৃত্যের দ্বারা খাদ্যে রোগবীজ চালিত হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ইহাঁদিগের ৬ জন ভৃত্যের মল পরীক্ষা করি, একজনের মলে কমা-ব্যাসিলাস পাওয়া গেল, এই ব্যক্তি মসালচি কয়েকদিন মাত্র নিযুক্ত হইয়াছিল, ইহার কাজ ছিল বাসন মাজা ও পরিবেশনে সাহায্য করা।

ওলাউঠা রোগী।—

(ক) কোনও বাটীতে কাহারও ওলাউঠা হইলে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগকে সংবাদ দেওয়া ও উহাদিগের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা উচিত।

(খ) রোগীর মল ও মলদূষিত বস্ত্রাদি কখনও পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে বা তাহার নিকটে ফেলা বা

ধোয়া উচিত নহে। ঐ সকল কমা ব্যাসিলাস বিশিষ্ট জিনিষ ঢাকা দিয়া রাখিলে উহাদিগের উপর মাছি বসিতে পারে না। পরে অবসর মত মল তুষ, খড় কুটা, পাতা প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, ছিন্ন অনাবশ্যকীয় বস্ত্রখণ্ডাদি পুড়াইয়া ফেলিলে ও আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি জলে ফুটাইয়া লইয়া কাচিয়া ফেলিলে ঐ সকল হইতে কমা ব্যাসিলাস ছড়াইতে পারে না।

(গ) ঘরের মেঝে, বাটীর অঙ্গন বা পার্শ্বস্থ জমি রোগীর মলে দূষিত হইলে ঐ সকল স্থান সত্বর পরিষ্কার করতঃ মল উপরোক্ত উপায়ে দগ্ধ, ও দূষিত স্থানগুলিতে মশালের দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে অগ্নির দ্বারা বা ঐ সকল স্থানে ফুটন্ত জল ঢালিয়া বা চুণ ছড়াইয়া দিয়া জীবাণুশূন্য করিয়া ফেলা উচিত।

(ঘ) শুশ্রূষাকারী হাতের নখ কাটিয়া শুশ্রূষা করিবেন, ও অন্য কাজে যাইবার পূর্ব্বে হাত, যতদূর সহ্য হয় তত উত্তপ্ত জলে খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিবেন, তাহা হইলে হস্তে লগ্ন যাবতীয় কমা ব্যাসিলাস মরিয়া যাইবে, অতঃপর সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিলেই উহা রীতিমত পরিষ্কার হইবে। বলাবাহুল্য হাতকে জীবাণুশূন্য না করিয়া ঐ হাত নিজের মুখেও দেওয়া বা ঐ হাতে করিয়া খাদ্য বা পানায় গ্রহণ করা বিপদ্‌জনক।

(২) কমা ব্যাসিলাস আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিলেও আমাদিগের শরীর উহাদিগকে ধ্বংস বা দখল করিতে পারে।

(ক) যদি আমাদিগের আমাশয় সুস্থ থাকে ; অতএব ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময়ে অতিভোজন, দুষ্পাচ্য-দ্রব্য ভোজন ও উপবাস বর্জ্জন ও অজীর্ণতা থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্যে উহা আরোগ্য করা উচিত ;

(খ) যদি অন্ত্রের স্বভাবিক অধিবাসী লাক্‌-টিক এসিড উৎপাদক ব্যাসিলাসগণ সতেজ থাকে ; অতএব মাংস, মৎস্য, ডিম্ব অতিরিক্ত খাওয়া উচিত না, ঐ সকল জিনিষ অতিরিক্ত খাইলে পেটে গিয়া পচে ও আমাদিগের অনুকুল ব্যাসিলাসদিগের অনিষ্ট করে ; প্রত্যহ দধি খাইলে, দধির কারণ লাক্‌টিক এসিড উৎপাদক একপ্রকার জীবাণু আমাদিগের অন্ত্রের অধিবাসীবৎ হইয়া পড়ে, ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের জীবাণু দমনে অন্ত্রের স্বভাবিক ব্যাসিলাস দিগের প্রবল সহায় হয়।

ওলাউঠার ব্যাক্‌টেরিয়াভুক্‌ লইয়া এখনও পরীক্ষা চলিতেছে, ইহা আমাদিগের বশে আসিলে ওলাউঠা রোগ লোপ করা সহজ হইয়া পড়িতে পারে।

(গ) যদি আমরা আমাদিগের শারীরিক রসের ওলাউঠা প্রতিষেধক শক্তিকে প্রবল রাখিতে পারি ; ওলাউঠা রোগের জীবাণুদিগকে মারিয়া শরীরে প্রবেশ করাইলে, ঐ সকল মৃত ব্যাসিলাস সংখ্যায় বাড়িয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে না, অথচ উহাদিগের প্রতিক্রিয়ায় আমাদিগের শারীরিক প্রতিষেধক যন্ত্র উত্তেজিত ও শক্তিশালী হয় এবং অধিকতর প্রতিষেধক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে, ফলে ইহার পর জীবন্ত ওলাউঠা জীবাণু উদরে প্রবেশ করিলেও রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে রোগের জীবাণু শরীরে প্রয়োগ করাকে ভাক্সিনেশন বা টীকা দেওয়া বলে, আর রোগ জীবাণুবিশিষ্ট যে বস্তু শরীরে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে ঐ রোগের ভ্যাক্‌সিন বা "বীজ" বলে। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টীকা লইলে যেমন বসন্ত রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা খুবই কমিয়া যায়, ওলাউঠা প্রতিষেধক টীকা লইলেও সেইরূপ ওলাউঠা হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। অতএব :—

(১) বাটীতে বা পাড়ায় ওলাউঠা দেখা দিলে তৎপর সকলেরই ওলাউঠা প্রতিষেধক টীকা লওয়া উচিত।

(২) মেলায় বা তীর্থস্থানে বিশেষতঃ পর্ব্বে যতই দূরদূরান্তর হইতে নানা গ্রামের লোক সমাগম হয়, ততই ঐ সমাবেশে ওলাউঠা বাহকের আগমনের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়, তাহার পর উপবাস দুষ্পাচ্য খাদ্য আহার, কলুষিত জলপান শীতাতপের ও পথ ও অবস্থানের কষ্টে সমাগত লোকদিগের পেটের অবস্থা খারাপ ও শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হইতে থাকে ; ফলে ওলাউঠা জীবাণুর শরীরে প্রবেশ ও যেমন সহজ হইয়া পড়ে, রোগ উৎপাদন করারও তেমনি সুবিধা হয়। তাহার পর মেলা হইতে যাত্রীগণ যাইবার পথে রোগ ছড়ায় ও নিজ নিজ গ্রামে রোগ লইয়া যায় ; বস্তুতঃ মেলা ও তীর্থস্থানগুলিকে ওলাউঠার বিষম কেন্দ্র ; এইরূপ স্থানে যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকের ওলাউঠার টীকা লইয়া তবে যাওয়া উচিত, অন্যথা কেবল যে নিজেকেই বিপন্ন করা হয় তাহা নহে, নিজ বাটীর আত্মীয় স্বজনদিগকে ও গ্রামবাসিগণের অকাল মৃত্যুর কারণ ইহাতে হয়।

(৩) এই রোগের মৌউসুমের পূর্ব্বে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর যদি সকলে অন্ততঃ অধিকাংশ লোকে উহার টীকা গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহার ক্ষেত্র অর্থাৎ আমাদিগের অন্ত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার অনুপযোগী থাকায় উহা আমাদিগের দেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে পারে।

উপসংহারে। এই রোগ বহুকাল ধরিয়া আমাদিগের দেশে আধিপত্য করিতেছিল ; প্রতি বৎসর কত লোক যে ইহা সংহার করিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। খৃঃ ১৮৭৩ অব্দ পর হইতে জন্ম মৃত্যুর হিসাবের খাতা রাখা হইতেছে ; এই সকল খাতা হইতে দেখা যায় যে খৃঃ ১৯১০ অব্দ পর্য্যন্ত ইহাতে প্রতি সহস্র জনের মধ্যে গড়ে ৩ জন করিয়া প্রতি বৎসর মরিত, এসময়ে বিস্তর মৃত্যু খাতায় উঠিত না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুহার আরও অধিক ছিল। এখন জন্ম লেখানর অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিছু কিছু এখনও খাতায় উঠে না বটে, কিন্তু এরূপ বাদ পড়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম ; তথাপি ১৯১০ অব্দের পর হইতে আমরা দেখিতেছি যে এই রোগ কমিয়া আসিতেছে। ১৯২০ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত এই ৭ বৎসরের কোনও বৎসর ইহার মৃত্যু হার প্রতি সহস্রে দুই জনে উঠে নাই যথা—

১৯২১	অব্দে প্রতি	১০,০০০এর	মধ্যে	১৭ জন
১৯২৬	,,	,,	,,	১৩ ঐ
১৯২০	,,	,,	,,	১২ ঐ
১৯২২	,,	,,	,,	১১ ঐ
১৯২৪	,,	,,	,,	১০ ঐ
১৯২৩	,,	,,	,,	৯ ঐ
১৯২৫	,,	,,	,,	৭ ঐ

১৯২৭ ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রোগ আবার তেজ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার মৃত্যু হার হাজারে তিনে পৌঁছায় নাই। রোগের এই হ্রাসের কারণ প্রাদেশস্থিত প্রতি জেলায় ও সহরের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান গঠন, সাধারণের মধ্যে নানা উপায়ে, রোগবিষয়ক জ্ঞানের প্রচার, রোগনিবারণের উপায় অবলম্বনের প্রসার। রোগ নিবারণের কথঞ্চিত চেষ্টাতেই উহার দৌরাত্ম্য ॥০ আটা কমিয়াছে। এখন আমরা যদি সকলেই ইহার নিরাকরণে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদিগের এই প্রিয় জন্মভূমি সম্পূর্ণভাবে উহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতার একটী কারণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবিমলচন্দ্র রায়

এক্ষণে মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরান যাক্। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্বাস্থ্য অধিকতর হীন, ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিব।

আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করা সঞ্চিত সাত জন্মের পাপের ফল। প্রতি গৃহেই দেখা যায়, পুত্র জন্মিলে বাটীর লোকের আর আনন্দ ধরে না, কিন্তু যত অনর্থ, যত দুঃখ কন্যা জন্মাইলেই হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালী বিশেষতঃ হিন্দুর গৃহে কন্যারত্ন লাভ করা, অর্থাৎ বিধাতার অভিশাপ বরণ করা,—এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। অনেক গৃহেই দেখা যায়, বেচারী কন্যাটী পেট পূরিয়া আহার পায় না—পদে পদে তিরস্কার, লাঞ্ছনা ভোগ করে। কন্যা কোন খাদ্যদ্রব্যের জন্য আব্দার করিলে গৃহিনীরা বলিয়া থাকেন,—"মেয়েমানুষের অত জিভ্ কেন লা? শ্বশুর বাড়ী গেলে দাগ পড়বে।" যাহাতে শ্বশুর বাড়ী যাইলে দাগ না পড়ে, এ জন্য কন্যাটীকে এমন অবস্থাতেই লালিত-পালিত করা হয়, যাহাতে বেচারীর শুধু মৃত্যুই বাকী থাকে। এইরূপ শৈশবকাল হইতেই মেয়েরা নানাপ্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অযত্ন এবং সকলের অভিশাপের মধ্য দিয়া স্বাস্থ্যহীনা হইয়া বর্দ্ধিতা হইতে থাকে। এরূপ ঘটনা যে শুধু অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঘটিতে দেখা যায়, তাহা নহে; পরন্তু খুবই লজ্জার বিষয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এখনও এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়।

পরিশ্রমের সময় দেখা যায় যে, মেয়েরা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করিয়া থাকে। রান্নার এবং পানের জল আনা ও তোলা, মসলা কোটা, বাট্‌না বাটা, উঠান ঝাঁট, ঘর নিকান, রান্নাবান্না প্রভৃতি অনেক শ্রমসাধ্য কাজই মেয়েরা করিয়া থাকে। অবশ্য এগুলি পল্লীগ্রামের মেয়েদের উপরই প্রযোজ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আহারের সময় সকলের উচ্ছিষ্ট এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বাটীর অন্যান্য সকলের ন্যায় চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা উদর পূর্ণ করিলে মেয়েদের পক্ষে ঘোরতর দুর্নাম। কারণ, দুই দিন পরই তাহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইবে, তখন সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় সকলকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া অবশিষ্ট দ্বারা তৃপ্ত থাকিতে হইবে। এগুণে শৈশব হইতেই বিভূষিতা হইয়া উঠা প্রয়োজন জন্য তাহাদের প্রতি এরূপ অন্যায় অত্যাচার করা হইয়া থাকে; ফলে তাহারা ক্ষীণা ও স্বাস্থ্যহীনা হইয়া উঠে।

মেয়ে যখন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠে, তখন

একাধারে মাতাপিতা যেমন চক্ষে সরিষার ফুল দর্শন করেন, অন্য দিকে মেয়েও মাতাপিতার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়া উঠে; এবং নিজেকে মাতাপিতার গলকণ্টক ভাবিয়া উঠিতে বসিতে বিধাতার অভিশাপ প্রার্থনা করে। তখন সে নিজের স্বাস্থ্য, সুখ, আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই কেরোসিন সংযোগে অগ্নিদেবকে নিবেদন করিতে বা মা গঙ্গার চরণে বিসর্জ্জন দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এ সময়ে দেখা যায়, মাতাপিতার যত ক্রোধ যাইয়া পড়ে ঐ হতভাগিনী কন্যাটীর উপর; এবং পিতা অফিসের সাহেব বা বড় বাবুর নিকট হইতে পেট পূরিয়া গালিমন্দ উদরাসাৎ করিয়া আসিলে, তাহা উদ্গীরণ করেন ঐ কন্যাটীর মস্তকের উপর; মাতা পদস্খলনে ভূমিসাৎ হইলে ব্যথার ঔষধ প্রলেপ দেন মেয়েটীর উপর ঝাল ঝাড়িয়া। এ সমস্ত কথা কি মিথ্যা না অতিরঞ্জিত? চন্দ্র সূর্য্য যদি সত্য হয়, তবে আমিও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে এ সমস্ত ব্যাপারও জলজ্যান্ত সত্য। আজকাল ত' দেখিতে পাই লাখে লাখ সভা সমিতি হইতেছে এবং তাহাতে সমস্তই প্রতীকার হইতেছে কিন্তু "ঘরে ছুঁচোর কেত্তন" যে রহিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতীকারের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হইতেছে না কেন? আজও দেখিতে পাই নবপুত্র বধূকে গৃহিণীগণ বাটীর দাসী চাকরের অধিক কিছুই ভাবিতে পারেন না এবং এই সমস্ত অসহায়া মেয়েদের উপর বজ্রাদপি কঠোর গৃহিণীগণ যে অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা পূরাকালের ক্রীতদাসের ন্যায়ই। আজকাল বহু নারীসঙ্ঘ সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারা নিজেদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট কার্য্য করিতেছেন কিন্তু এ দাসী প্রথা উচ্ছেদের নিমিত্ত তাঁহারা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? এ ত' তাঁহাদেরই কাজ! বলা বাহুল্য এই সমস্ত গৃহিণীগণের জন্য দেশে অধিক প্রসূতীমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অশিক্ষিতদের মধ্যে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটিতে দেখা যায়, তবে শিক্ষিতের মধ্যেও যে একেবারে বিরল ইহা বলিলে প্রকাণ্ড মিথ্যা বলা হইবে। যাহা হউক, আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে আবার আর একটী ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় যাহা আরও হীন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক বধূ আছেন, যাঁহাদের পূর্ব্ব লিখিত গৃহিণীগণ বশে আনিতে পারেন না পরন্তু তাঁহারাই বশে আসেন। এই সমস্ত বধূগণ নিজেদের এবং আপন আপন স্বামী ছাড়া কাহারও উপর নজর রাখা আবশ্যক মনে করেন না। ফলে,—বাটীর অন্যান্য সকলের স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি অন্তর্হিত হয়। প্রকৃত শিক্ষার দোষেই এইরূপ হইয়া থাকে। যাক্ এ সমস্ত লিখিয়া আর মা বোনদের আশীর্ব্বাদ (?) বরণ করিতে ইচ্ছা করি না, তবে আমার প্রবন্ধের সহিত এ সমস্ত ঘটনার সংশ্রব আছে বলিয়াই অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম এবং এখনও বোধ করি হইব। সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এক্ষণে সহরবাসী মেয়েদের অবস্থার কথা কিছু বলিব। অবশ্য গঞ্জনা লাঞ্ছনা বাঙ্গালী মাতাপিতার গৃহে কন্যারূপে জন্মাইলে অল্পাধিক সর্ব্বত্রই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু পল্লীগ্রামের ন্যায় অত নীচ ব্যাপার সহরে ঘটিতে বড় বেশী দেখা যায় না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, সহরের মেয়েদের স্বাস্থ্য পল্লীগ্রামের মেয়েদের অপেক্ষাও হীন। তাহার একটী কারণ কঠোর পর্দ্দা প্রথার প্রচলনে মেয়েরা একপ্রকার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আজ অবশ্য পর্দ্দাপ্রথার প্রচলন অনেকটা

হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু এখন ও অনেকেই ইহার উচ্ছেদে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। এই পর্দ্দাপ্রথার আইনে আমাদের কত সহস্র মা, বোন যে অকালে শতশত কঠিন ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ মুক্ত বায়ু এবং সূর্য্যালোকের অভাব নাই এবং মেয়েরা দৈনন্দিন সংসারের যে সমস্ত কাজ করে তাহাতে তাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রম ও যথেষ্ট হয়। তাহারা আলো বাতাসও বিনা চেষ্টাতেই উপভোগ করে কিন্তু সহরে তাহার উপায় নাই। সহরের মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য প্রায় করিতেই হয় না। রান্নাবান্না প্রায় বাড়ীতেই পাচক পাচিকাদ্বারা সম্পন্ন হয়। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে কেহ ভোগেন অম্বলে, কেহ ভোগেন বাতে। তারপর মুক্ত বায়ু, আলো গৃহে আসিবার উপায় নাই, সে জন্য ফুসফুসের রোগে তাহারা অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গৃহের বাহির হইয়া যে কিছু দূর ভ্রমণ করিয়া আলোবায়ু ভোগ করিবে· পর্দ্দাপ্রথার আইনে তাহাও হইবার উপায় নাই। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির গৃহের মেয়েরা সকালে বৈকালে মোটরে করিয়া হয় ত' হাওয়া খাইতে বাহির হয়, কিন্তু এ হাওয়া হজম হয় না; কেন না, মোটরে করিয়া বেড়াইলে শারীরিক পরিশ্রম বিন্দুমাত্র হয় না, কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণ করিলে সুন্দর শারীরিক পরিশ্রম হয়। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে স্বাস্থ্য সুস্থ, সবল হইতে পারে না। এ বিষয়ে প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণীদের চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মনে রাখিবেন, বাটীর কঠোর পর্দ্দাপ্রথার প্রচলনে মেয়েদের উপকারের পরিবর্ত্তে তিলে তিলে তাহাদের রক্ত শোষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপন আপন কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতিকে এমন করিয়া পিঁষিয়া নিজের এবং দেশের কি উন্নতি ঘটিতেছে ?

আজকাল সহরে সকল গৃহেই কঠোর পর্দ্দাপ্রথার প্রচলন নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সহরে আজকাল অনেক মেয়েই অনেকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। স্কুল কলেজে অনেকেই পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহাদের স্বাস্থ্য মোটেই সন্তোষজনক নহে। ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিব। যে সমস্ত মেয়েরা লেখাপড়া করে, তাহারা সেই সঙ্গে যে স্বাস্থ্যর প্রতি যত্নশীলা হয় না। স্কুল, কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে এবং তৎসহিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে, স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের অভিভাবকগণ নিজেরাও স্বাস্থ্যর মর্য্যাদা বুঝেন না এবং ছেলে মেয়েদেরও স্বাস্থ্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন না; সেই জন্য কি ছেলেরা, কি মেয়েরা কেহই আপন আপন স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হয় না। পরন্তু স্কুলের শিক্ষা আবার এমন চমৎকার যে ইহাতে ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যের যে কি গুণ তাহাও শিক্ষা পায় না। আজকালকার শিক্ষার গুণে স্কুলকলেজে পড়ুয়া মেয়েরা বাহিরের চাকচিক্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। কেশ বেশের পারিপাট্যে তাহারা মজবুত, কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে উত্তম স্বাস্থ্য ফুটাইয়া তুলে, তাহা তাহারা জানে না, বোঝে না, কেহ বুঝাইয়াও দেয় না। সৌন্দর্য্য বলিতে কি নানা মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ, নানা প্রকার মূল্যবান অলঙ্কার বিভূষিত পাট কাঠির ন্যায় হস্তপদ, সরু বক্ষ এবং

চোয়াল ভাঙ্গা দেহটীকে বুঝায়? না—হৃষ্টপুষ্ট দৃঢ় দেহটীই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আকর হয়? বলিষ্ঠ দেহটী নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিত না হইলেও, সেই সুন্দর আখ্যা পাইবার উপযুক্ত পাত্র। এ জ্ঞান মেয়েদের বা ছেলেদের কাহারও নাই। বৃথা বাহ্যাড়ম্বরের দ্বারা তাহারা নিজেদের সুন্দর প্রতিপন্ন করিতে অহরহ কঠোর চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ইহাতে শুধু বিলাসিতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই তাহাদের গতি বিধি এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার জন্য দায়ী কাহাদের করিব?

(ক্রমশঃ)

মাছি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের পক্ষে sleeping sickness একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগ হইতে খুব অল্পই বাঁচে। মধ্য-আফ্রিকায় কতকগুলি প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব, ঐ সকল দেশ এই রোগে একেবারে লোকশূন্য হইয়া গিয়াছে। tsetse নামক এক জাতীয় মাছি এই রোগের বীজাণু বহন করে। তাহারা ঐ সকল প্রদেশে নদী কিম্বা হ্রদের তীরে বাস করে। এই মাছি যখন কোন রোগীকে কামড়ায়, ইহা তাহার রক্ত হইতে বীজাণু গ্রহণ করে ঐ বীজাণু মাছির শরীরে নানা রকম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, পুনরায় যখন ঐ মাছি কোন সুস্থ লোককে কামড়ায়, ঐ বীজাণু তাহার রক্তে মিশাইয়া যায়। ইহাতে সেই সুস্থ লোক ঐ রোগে কিছুদিন ভুগিয়া শেষে মারা যায়।

যে সব রোগের কথা বলা হইল ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি রোগ আছে, যাহা মাছির দ্বারা সংক্রামিত হয় কিনা, তাহা প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মাছির দ্বারা সংক্রামিত হয় ইহা অনুমান করা যায়। মাছি খাদ্য দূষিত করিয়া কিম্বা কামড়াইয়া এই সকল রোগ বিস্তার করে। টিউবারক্লুসিস্ (Tuberclusis) ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। টিউবারক্লুসিস্ রোগীর থুতু ও গয়ার হইতে এই রোগের বিস্তার হয়। সময়ে সময়ে একরূপ চক্ষুরোগ মাছি দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই চক্ষুরোগ ঈজিপ্ট দেশে দেখা যায়।

আর এক রকম ঘা tropical sore দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। এই ঘা ও মাছির দ্বারা প্রচার হয়। Anthras রোগ সংক্রামণের প্রধান কারণ মাছি। এই রোগ সময়ে সময়ে মানুষকে আক্রমণ করে কিন্তু পশুদের পক্ষে এই রোগ বড় মারত্মক।

এই রোগের বীজাণু নষ্ট করা খুবই শক্ত। এই বিজাণু মাছির ভিতরে প্রবেশ করে। যদি কোন সুস্থ পশুর গায়ে ঘা থাকে তাহা হইলে এই মাছি সেই ঘায়ে কামড়াইলে সে অবিলম্বে এই রোগে পতিত হইবে। আর একটি রোগ আছে তাহাকে phlebetomous fever কহে। এই রোগ যে স্থলে sand fly দেখা যায় সেই স্থলেই ঐ মাছির কামড় হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়।

মাছির রোগ প্রচারের বিষয় আরও কয়েকটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক।

মাছির শাবকও আমাদের বড় অনিষ্টকারী। আমাদের শরীরে যদি কোন ঘা থাকে তাহা হইলে যদি কোন রকমে এই কীট শাবক তাহাতে প্রবেশ করে তাহা হইলে সেই ঘা বিষাক্ত হইয়া যায়। অপরিস্কৃত নাকে ও কাণেও এই কীট শাবক প্রবেশ করা বিশেষ বিপজ্জনক। যদি আমরা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি তাহা হইলে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাই। আমাদের দেশে যাহারা নোংরায় থাকে তাহারাই এইরূপে নানা রকম উৎকট রোগে পড়ে। খোলা যায়গায় শোয়া উচিৎ নয় তাহা হইলে আমরা নানারূপে মাছির দ্বারা আক্রমিত হইব। যদি আমরা আমাদের ক্ষত অপরিস্কৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখি, সেই ক্ষতে মাছি বসিলে তাহা মাছির ডিম হইতে উৎপন্ন শাবকেরা বিষাক্ত হইয়া যাইতে পারে। যদি কোন রকমে এই কীট শাবক আমাদের গলায় ঢুকিয়া যায় তাহা হইলে সুধু তাহাতে আমাদের অস্বস্তি বোধ হইবে না অধিকন্তু তাহাদের দ্বারা নানা রকম রোগ জন্মাইতে পারে।

একজাতীয় মাছি আছে যাহা পশুর উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পশুর গায়ের লোমের ভিতরে এই মাছি ডিম পাড়ে, যখন এই ডিম হইতে শাবক হয়, তখন পশুর সেই স্থানে চুলকাইতে থাকে; তাহাতে সে ঐ স্থান চাটিতে থাকে এইরূপে কীটশাবক তাহাদের উদরে প্রবেশ করিয়া mucous membrane এ আটকাইয়া থাকে।

মাছির শত্রু

এখন আমাদের দেখা যাউক যে মাছির কি শত্রু আছে ও তাহারা কোন্ রোগে মারা যায়। দুঃখের বিষয় মাছির শত্রু খুবই অল্প এবং তাহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। মাছির শত্রুর মধ্যে এই কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে যথা টিকটিকি, বেঙ, মাকড়সা কতকজাতীয় বোল্‌তা এবং চোর মাছি (Robber flies), ইহারা মাছি ধরিতে পারিলেই তাহাদের খাইয়া ফেলে। টিকটিকি ও বেঙ; যদিও বেশ ভাল মাছি ধরিতে পারে তথাপি মাছির সকল শত্রু যত মাছি খাবে তাহা মাছির সংখ্যার তুলনায় খুবই অল্প। মাছির larva (শাবক) তাহাদের শত্রুর দ্বারা বেশীভাবে নষ্ট হয়। পাখী মাছির শাবকের ঘোর শত্রু তাহারা মাছির শাবক ও মাছি পাইলেই খাইয়া ফেলে। একজাতীয় মোরগ ও পিঁপড়া মাছির ডিম ও শাবক আহার করে। মোটের উপর মাছির যতই শত্রু থাকুক না কেন তাহারা মাছির সংখ্যা কমাইতে পারে না।

কেবল একটি রোগ আছে যাহাতে মাছির সংখ্যা কমিতে পারে। প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন যে গ্রীষ্মকালের শেষভাগে মাছি মরিয়া ঘরের ছাদে কিম্বা আসবাব পত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে। যদি আমরা এইরূপ একটি একটি মাছি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে ঐ মরা

মাছির তলপেট সাদা হইয়া গিয়াছে কিম্বা তাহার গায়ের লোম খসিয়া গিয়াছে। মরা মাছির তলপেটে যে সাদা বস্তুটি দেখিতে পাই উহা একজাতীয় বেঙের ছাতার অংশ। এই জাতীয় বেঙের ছাতার নাম house fly Fungus অথবা Empusa. এই fungus যে সব মাছি বাড়ির মধ্যে থাকে, তাহাদের ভিতরই বেশী দেখা যায়। এই fungus প্রথমে মাছির শ্বাস নালীর ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভিতরকার Organ সকল নষ্ট করিয়া দেয় এবং এই fungus দেখা যাইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই মাছি মারা যায়। মাছি এই রোগ আগস্ট হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যেই বেশী দেখা যায় এবং এই সময়ে লক্ষ লক্ষ মাছি এই রোগে মারা যায়। দুঃখের বিষয় যে এই রোগ বৎসরের প্রথমে দেখা যায় না ও এই রোগ বৃদ্ধির উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই, নচেৎ মাছি বিনাশ করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ হইত।

Eradicative Measures.

মাছি বিনষ্ট করিতে হইলে মাছির বিরুদ্ধে আমাদের ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিতে হইবে। দেশের সকল অধিবাসীকে এবং দেশের স্বাস্থ্যবিভাগকে এক সঙ্গে লাগিতে হইবে। কিন্তু সেজন্য যে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাটি পরিষ্কার রাখিব না তাহা নহে, আমরা যদি সকলেই এক সঙ্গে এবিষয়ে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা মাছির সংখ্যা কমাইতে সক্ষম হইব।

বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে মাছি নিবারণের চেষ্টা করা উচিত; তাহা সর্ব্বাগ্রে ঠিক করা উচিত। এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না মাছির সংখ্যা কমিয়া যায় ততদিন কাজ বন্ধ করিব না। গ্রীষ্ম চলিয়া যাইলে আমরা কাজ বন্ধ করিতে পারি। মাছি নষ্ট করার চেয়েও মাছি বাড়িতে না আসিতে দেওয়াই সহজ কাজ এবং আমাদের ইহাই মনে রাখা উচিৎ যাহাতে মাছির ডিম হইতে শাবক বর্দ্ধিত হইতে না পারে, আমরা প্রথমে তাহাই করিব কারণ মাছি নষ্ট করিবার যতগুলি উপায় আছে তাহার কোনটিতে সুফল পাওয়া যায় না। যে সময়ে মাছি জন্মায় সে সময়ে মাছির জন্ম নিবারণ ছাড়া অন্য কিছু চেষ্টা করা আমাদের ভুল এবং যদি মাছি জন্মাইবার উপযুক্ত স্থানসমূহ বর্ত্তমান থাকিতে আমরা মাছি নষ্ট করিবার চেষ্ট করি তাহা হইলে আমরা সুফল পাইব না। সুতরাং সেই সমস্ত স্থানেই প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

অতএব সকলের ঘরবাড়ি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ময়লা জঞ্জাল কোন স্থানে গাদা করিয়া রাখা উচিৎ নহে প্রত্যেকেরই জানা উচিৎ যে এই সব দ্রব্যের সামান্য অংশ হইতে অসংখ্য মাছির শাবক উৎপন্ন হয়।

গোবর ও ঘোড়ার বিষ্ঠায় মাছির ডিম পাড়িবার সবচেয়ে ভাল যায়গা সুতরাং গোবরে ও ঘোড়ার বিষ্ঠায় মাছি যাহাতে বসিতে না পারে তাহার প্রতিকার করা উচিৎ। আস্তাবলে ও গোয়াল ঘরে গোবর রাখিবার ঢাকা স্থান রাখা উচিৎ। এই স্থান কাঠের কিম্বা সিমেন্টের হওয়া উচিৎ এবং যাহাতে ঐ স্থান হইতে দুর্গন্ধ না বাহির হয় সেই জন্য ঐ স্থান যাহাতে ভালরূপে ধোয়া যায় সেই উপায় রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশে গোবর জমীর সারের জন্য খুব বেশী ব্যবহার হয় সুতরাং সারের জন্য গোবর ব্যবহার করিতে হইলে যাহাতে মাছির বংশ বৃদ্ধি না হয় সেই বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। এমন কি গোবর জমির উপর ছড়ান হইলেও তাহাতে মাছি ডিম পাড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে গোবর ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নহে, যাহাতে মাছির ডিম ও শাবক নষ্ট হয় এমন কোন ঔষধের সাহায্য লইতে হইবে।

বোরাক্স (Borax) জলে গুলিয়া কিম্বা গুঁড়া করিয়া গোবরের গাদার উপর ছড়াইয়া দিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। উহাতে মাছির ডিম ও শাবক বাড়িতে পারে না। কিন্তু সারে Borax বেশী পরিমাণে দিলে কোন কোন মাটি নষ্ট করিয়া দেয়। কৃষি-বিভাগ ঠিক করিয়াছেন—যদি ১৬ Cubit feet গোবরে ১ পাউণ্ডের বেশী বোরাক্স কিম্বা এক এক-বারে ১৫ টনের বেশী বোরাক্স না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাটি নষ্ট হইবে না।

আরও কতকগুলি ঔষধ আছে যাহারা প্রায় একটি কাজ করে। Chloride of lime অথবা Bleaching Powder, যদি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে সারে আর মাছি বসিতে পারিবে না এবং তাহাদের ডিম ফুটিতে পারিবে না। কিন্তু ইহা সারের পক্ষে ক্ষতিকর কারণ ইহা তাহার উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট করে। যদি ইহা ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে শুষ্ক পাউডার সারের গাদার উপর ছড়াইয়া দেওয়া উচিৎ।

নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি

(শ্রীহরেন্দ্রকুমার সিংহ, কবিভূষণ)

প্রভাতে উঠিয়া রোজ ঠাণ্ডা জল খাবে,
কিছুক্ষণ ফুল্লমনে ফাঁকায় বেড়াবে।

ভিজানো ছোলা বা মুগ যাতে ধরে কল্,
গৃহে আসি খাও ভাই ভগিনী সকল।

টোমাটো, লেবুর রস যদি খেতে পারো,
সকলের চেয়ে খুব ভাল হয় আরো।

বলক্ দেওয়া দুধ—আধা-আধি জলে,
চিনি দিয়ে পান কর চা'য়ের বদলে।

সকালে বসিবে খেতে ঠিক্ নিয়মিত,
দুপুর গড়ায়ে গেলে হিতে বিপরীত।

সিদ্ধ ধান কলে ছাঁটা চক্‌চকে চালে,
বেরি বেরি ডেকে আনে মরণ অকালে।

ঢেঁকি ছাঁটা চাল প্রতি ঘরে ঘরে চাই,
ফ্যান্ গেলে ভাত খেয়ে কমিছে প্রমাই।

বাসী মাছ মাংস হ'তে হও সাবধান,
বেরি বেরি এতে আনে রয়েছে প্রমাণ।

পেঁয়াজ লেটুস্ আর পালংএর শাকে,
পুষ্টি খাদ্য ভিটামিন অতিশয় থাকে।

খোসা সুদ্ধ আলু দিয়ে করাও রন্ধন,
বাজারের ঘৃত সদা করিবে বর্জ্জন।

প্রতিদিন দুইবেলা আহারের পরে,
ফল খেলে লিভারের ভাল কাজ করে।

কমলা, পেঁপে ও কলা বড় উপকারী,
আনারসে কত গুণ কহিতে না পারি।

সন্দেশ, মাখন, ডিম বিকাল বেলায়,
জল খাবারের সেরা দেহ পুষ্টতায়।

তারপর কিছুক্ষণ নিরমল বায়ে,
ব্যায়াম করিয়া শেষে ফিরিবে বেড়ায়ে।

আটটা হইতে রাত ন'টার ভিতর,
আহার করিয়া নিলে অতি হিতকর।

গম ভাঙ্গা লাল আটা রুটী রাত্র বেলা,
ডাল দিয়ে খেতে হবে করিওনা হেলা।

ননী আর কিংবা কডলিভারের তেল,
শয়নের আগে খাবে দুধেতে মিশেল।

সপ্তাহে দু'এক দিন মাংসে উপকার,
নিরামিষে নাহি তুল্য ছানা ব্যবহার।

ভেজাল খাদ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখো,
বিশ্বের মানব কেন উদাসীন থাকো।

দেশীয় মল্ট ঘটিত ঔষধ।

মরু মল্ট (Morrhu Malt) : এ যাবত ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র জন্য কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাজারে সাধারণতঃ যে কডলিভার অয়েল বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংই বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নহে। এবং তাহাতে ভাইটামিনের পরিমাণও কম, বিশেষতঃ কডলিভার অয়েল বিস্বাদ বলিয়া ইহা ব্যবহার করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ কডলিভার অয়েলের সহিত "বি" ভাইটামিনযুক্ত মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত করিয়া মরু মল্ট প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে কডলিভার অয়েলের দুর্গন্ধ নাই, খাইতে সুস্বাদু, এবং ভাইটামিন 'এ' 'বি' ও 'ডি' তিনটীই রহিয়াছে বলিয়া বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা ক্ষয় ফুসফুসের রোগ প্রভৃতিতে আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়।

মল্ট লেসিথিন ফস্ফেইট (Malt Lecithin Phosphate) : ইহাতে মল্ট একষ্ট্রাক্টের সহিত কডলিভার অয়েল, লেসিথিন, গ্লিসারো ফসফেইট, ষ্ট্রীকনিন, ইত্যাদি মিশ্রিত আছে। উহা ব্যবহারে শরীরের পরিপুষ্টির অভাব, ফুসফুসের প্রদাহ ও ক্ষয়, স্নায়বিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অতি শীঘ্র নিবারিত হয় এবং অচিরাৎ স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরিয়া আসে।

মল্ট হাইপোফস্ফাইট কোঃ (Malt Hypophosphites Co.) : ইহাতে Malt একষ্ট্রাক্ট এবং কডলিভার অয়েলের সহিত কুইনাইন, ষ্ট্রীকনীন, ক্যালসিয়াম, পটেসিয়াম, আয়রণ এবং ম্যাঙ্গানিজ হাইপোফসফাইট্স্ মিশ্রিত আছে। শেষোক্ত ঔষধগুলি অতি বিস্বাদ কিন্তু মল্ট একষ্ট্রাক্টের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়াশক্তি অক্ষুন্ন রহিয়াছে অথচ উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। যক্ষা, শ্বাসকাশ, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ অতিশয় কার্য্যকরী।

মল্ট ইষ্টন (Malt Easton) : লৌহ ও ষ্ট্রীকনীনঘটিত ইষ্টন সিরাপ স্বভাবতঃই তিক্ত ও বিস্বাদ, মল্ট একষ্ট্রাক মিশ্রিত ইষ্টন সিরাপ সুস্বাদু ও অতিশীঘ্র উপকার দর্শায়, বিশেষতঃ মল্টের পুষ্টিকারক গুণ থাকাতে Malt Easton উৎকৃষ্ট টনিকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, রক্তহীনতা, বাত ইত্যাদিতেও ইহা অশেষ হিতকারী।

ভাইনো মল্ট (Vino Malt) : (মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত ওয়াইন (মদ্য) পেপসিন, গ্লিসারো ফসফেইট্স্ ইত্যাদি) এই উপাদানগুলিই ভাইনো মল্টের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার কার্য্যকারিতা নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। সুস্থ শরীরে অল্পমাত্রায় ব্যবহারে ইহা মন প্রফুল্ল রাখে, শরীরকে শ্রান্ত, ক্লান্ত হওয়ার অবসর দেয় না, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতায় এবং অবসাদগ্রস্ত নিরাশ জীবনেও পরিপূর্ণ সুস্থতা ও শক্তি আনিবার জন্য ইহা আদর্শ আবিষ্কার। যক্ষ্মাগ্রস্থ রোগীতে এবং বার্দ্ধক্যের জরাতে ভাইনো মল্ট অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চালন করে।

রেডিয়েটেড মল্ট (Radiated Malt) : ইহা মল্ট একষ্ট্রাক্ট, ইর‍্যাডিয়েডেট কলেষ্টারিণ, ইষ্ট প্রভৃতি সম্বলিত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত শ্রেষ্ট ভাইটামিন খাদ্য। যাঁহারা ভাইটামিনযুক্ত আহার্য্য গ্রহণে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে রেডিয়েটেড মল্ট একান্ত ব্যবহার্য্য। ইহা শরীরের গ্লানি নিবারণ করে এবং উপরোক্ত কারণে ক্ষয় প্রভৃতি যে সব দুরারোগ্য রোগ জন্মিতে পারে, তাহাদের আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করে। শিশুদিগের ও দুর্ব্বল মাতারও ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ ভাইটামিন শুধু জননীকেই স্বাস্থ্যবতী করে না উপরন্তু জননীর স্তন্য দুগ্ধের সহিত উহা শিশু শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিবে।

ম্যারো মল্ট (Marrow Malt) : অস্থি ও মজ্জার যথাযথ পরিপুষ্টি না হইলে, এবং শিশুদের শরীর গঠনের পক্ষে, ইহার উপকারিতা অসীম। বাল্যাবস্থায় ম্যারো মল্ট ব্যবহারে বার্দ্ধক্যের অবসাদ ও জরা হইতে বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

বিবিধ

ক্যানসার রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

লণ্ডন হাঁসপাতালের ডাঃ টমাস ল্যাম্স্ডেন ক্যান্সার রোগের একটি অব্যর্থ সিরাম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সিরাম শরীরের অন্য টিস্যুর কিছু না করিয়া সমূলে ক্যান্সার টিস্যু নষ্ট করে। আমেরিকায় ক্যান্সার সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রে ডাঃ ল্যাম্স্ডেন লিখিয়াছেন যে, পশুর দেহ হইতে সিরাম লইয়া তাহা দ্বারা তিনি কাঁচের ডিসের উপরের কৃত্রিম ক্যান্সার পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারিয়াছেন। ডাঃ টমাস ল্যাম্স্ডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া স্কটল্যাণ্ডে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন, কিন্তু তথাকার উপার্জ্জন ছাড়িয়া তিনি লিষ্টার ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন এবং ক্যানসার রোগের সিরাম আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি লণ্ডন হাঁসপাতালে ক্যান্সার রিসার্চ লেবরেটরীতে কাজ করিতেছেন।

*　　*　　*

কর্কট রোগের চিকিৎসা

নূতন "সিরাম" আবিষ্কার

লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক ডাঃ টমসন এবং অস্ত্র বিদ্যাসম্পর্কিত রয়াল কলেজের আর এক জন গবেষণাকারী ডাক্তার. এই দুই জনের চেষ্টায় এক প্রকার নূতন "সিরাম" প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কর্কট রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। লণ্ডনের তিনটি হাসপাতালে পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন রোগীকে এই "সিরাম" দ্বারা চিকিৎসা করা হইতেছে। এখনও নিশ্চিত ফলাফল উপলব্ধি করা যায় নাই; তবে কিছুটা ফল পাওয়া গিয়াছে।

*　　*　　*

স্পেনে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

স্পেনের সর্ব্বত্র গণতন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজা আলফান্সো ১৪ই এপ্রিল সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে পদত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার পুত্রকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করা হইবে। গণতান্ত্রিক দলের সদস্যগণ ইহাতেও আপত্তি করেন এবং বলেন যে, রাজার সমস্ত ক্ষমতা বিলোপ করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে অষ্ট্রীয়াসের প্রিন্স এড্মিরাল রিভেরা, মিরাণ্ডার ডিউক এবং কয়েক জন বিশ্বস্ত প্রহরী আছেন। রাজ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ ১৫ই এপ্রিল তারিখে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এদিকে গণতান্ত্রিক দলের সদস্যগণ আনন্দ উল্লাসে মত্ত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই গণতান্ত্রিক দলের

নূতন পতাকা উড়িতেছে। স্পেনের নগরে নগরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অস্থায়ী মন্ত্রী-সভা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

বিমানপোত দুর্ঘটনা।— রুমানিয়ার যুবরাজ ইণ্টারন্যাশনাল এরোনটিক ফেডারেশনের সভাপতি এণ্টোইন বিবেস্কো বিমানপোতে প্যারিস হইতে সাইগন আসিতেছিলেন। তাঁহার বিমানপোতখানি এলাহাবাদ ও গয়ার মধ্যে, গয়া হইতে ৯৫ মাইল দূরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। বিমানপোতের আরোহীদের মধ্যে চারি জনের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, এক জনের অবস্থা ভাল।

* * *

মুসলমান মহিলার তেজস্বিতা।—কলিকাতা-বাসিনী শ্রীমতী আয়েসা আমেদ লক্ষ্ণৌ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মিলনীর নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—ভারতের মুসলমানগণ ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গস্বরূপ। তাঁহারা কোন প্রকার দলগত বা সম্প্রদায়গত ওজুহাত মানিয়া লইবেন না। তাঁহারা নিজেদের যোগ্যতা বলেই কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিবেন।

* * *

কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যে অধিক সংখ্যক মুসলমান লওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অতি উৎকৃষ্ট উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে গত পঁচিশ বৎসরে বাঙ্গলার হিন্দুগণ অন্যূন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমানের দানের পরিমাণ দশ হাজারের অধিক হইবে না। বিভিন্ন কলেজে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয়। অথচ মুসলমানের সংখ্যা আড়াই হাজার। কলেজে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা তিন শত, আর মুসলমানের সংখ্যা মাত্র পাঁচ; তার পর বিভিন্ন কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষায়ও মুসলমানগণের তেমন আগ্রহ নাই। ১৬৬ জন চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দশ জন মুসলমান, বি কম্, বা এম্ এস্সি, পরীক্ষায় এক জন মুসলমান ছাত্রও অগ্রসর হন নাই।

* * *

বেকার সমস্যা

তরল আলতার উপাদান।

খুনখারাপী রং ১ ছটাক, গ্লিসারিন্ ৩ ছটাক, রেক্টিফায়েড স্পিরিট দেড় ছটাক, নিশাদল অর্দ্ধ ছটাক গোলাপ জল দেড় পোয়া, বিশুদ্ধ জল ৩ সের। প্রথমতঃ /৩ সের গরম জলে নিশাদল দ্রব করিয়া তাহাতে খুন খারাপী রং দিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত করিবেন। ইহার পর স্পিরিট ও গ্লিসারিন্ ঢালিয়া দিয়া অবশেষে গোলাপ জল মিশাইলেই উৎকৃষ্ট আলতা প্রস্তুত হয়।

* * *

দিল্লীতে ১১৪ ডিগ্রী উত্তাপ।—উত্তর ভারতে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুভূত হইতেছে এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ ১১০ ডিগ্রী হইতে ১১৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। গরমের ফলে অনেকের পীড়িত হইয়া পড়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং দিল্লীতে অতিরিক্ত গরমের জন্য ৯ জন লোক মারা গিয়াছে। প্রত্যহ সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গরম বাতাস বহিতেছে।

মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী উদাংগুড়ি নামক স্থানে একটি মুসলমান বরযাত্রীদলের এক শোভাযাত্রা যাইতেছিল। এই সময়ে কোন লোক রহস্য করিয়া একটী হাতীর লেজ ধরিয়া টান দেয়। উহাতে পশুটী ক্ষিপ্ত হইয়া শোভাযাত্রা আক্রমণ করে এবং বর ও বরযাত্রীদল প্রাণভয়ে ইতঃস্তত দৌড়াইতে থাকে। মাহুতের একজন সহকর্ম্মী হাতীটাকে সংযত করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পরে অনেক কষ্টে উহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়।

* * *

লণ্ডন হইতে আমেরিকায় বক্তৃতা—মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্ত বেতারযোগে প্রদত্ত হইবে।—"ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকা বলিতেছেন যে, মিঃ গান্ধী আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডন হইতে বক্তৃতা দিবেন এবং তাহা ব্রডকাষ্টিংযোগে আমেরিকায় প্রচার করা হইবে। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধী রবিবার সমূহেই ইংলণ্ড হইতে রেডিওযোগে আমেরিকায় বক্তৃতা দিবেন।

* * *

কনষ্টাণ্টিনোপলের নার্কটিক মাদক দ্রব্যের (ইহা নিদ্রা ও মত্ততাজনক ঔষধ) ৩টি বিরাট কারখানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানাটিকে তুর্কি গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার ডাইরেক্টরকে ১৮ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা) জরিমানা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার কড়া নীতির কারণ হইতেছে এই যে, পুলিশ কারখানায় খানাতল্লাসী করিয়া বিপুল পরিমাণ "মর্ফিয়া" পাইয়াছিল। এই সমস্ত "মর্ফিয়া" বিদেশ হইতে বে-আইনীরূপে বিমান পোতযোগে আমদানি করা হইয়াছিল।

* * *

বৃটিশ জ্যোতির্ব্বিদের মৃত্যু

৮৩ বৎসর বয়সে ব্রিষ্টল নগরে খ্যাতনামা ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ মিঃ উইলিয়াম ফ্রেডারিক ডেনিং মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি ৫টি ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে নভোমণ্ডলের বিচিত্র রহস্য বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতৎবিষয়ে তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি হইয়াছিল।

* * *

লণ্ডনের স্বাস্থ্য ও শক্তি সঙ্ঘের সদস্য মিঃ মামুদ (বয়স ৩০ বৎসর) টোকিয়ো হইতে সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মের মধ্য দিয়া এখানে অসিয়াছেন। হোসেন নামক একজন ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক ও সুরাট হইতে সাইকেল যোগে এখানে আসিয়াছেন। তিনি চীন জাপান ও ইউরোপ হইয়া পুনায় সুরাটে যাইবেন।

* * *

নিখিল বঙ্গ জাতীয় মুসলমান সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ আনসারি ভূপালের আলোচনা সম্পর্কে সিমলা যাইতেছেন বলিয়া তাঁহার সুবিধার্থ সম্মেলনের তারিখ ২০শে ও ২১শে জুন হইতে ২৭শে ও ২৮শে জুন পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলা ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশনও

এই জন্য পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

*　　*　　*

দিল্লীতে বানরের উপদ্রব নিবারণের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি চেষ্টা করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, বানর তাড়াইতে গিয়া কয়েকটি দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু-সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটি বানর নির্ব্বাসন দিবার জন্য ছয় হাজার টাকার একটী কনট্রাক্ট দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ আশা করা যায় যে, সহরবাসী শীঘ্রই এই প্রকার উপদ্রবের হাত হইতে নিস্তার পাইবে।

*　　*　　*

জার্ম্মেণীর চরম আর্থিক দুর্দ্দশা।—বর্ত্তমান বাজেটে জার্ম্মেণীর মোট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৬ কোটী পাউণ্ড। ইহার সহিত ফডারেল ষ্টেট এবং সহরগুলির রাজস্বের ঘাটতি বাবদ ৪ কোটী পাউণ্ড যোগ করিলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড় শত কোটী টাকা।

*　　*　　*　　*

দুই সেকেণ্ডে খবর সরবরাহ।—ডার্ব্বির ঘোড়াগুলির দৌড় যেই শেষ হইল অমনি সে খবর বিদ্যুৎ গতিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এই খবর তারযোগে আলেক্জান্দ্রিয়া পৌছিতে দুই সেকেণ্ড, বোম্বাইয়ে পৌছিতে দুই সেকেণ্ড, হংকংয়ে পৌছিতে চার সেকেণ্ড এবং বিউনেস এয়ারেসে পৌছিতে পাঁচ সেকেণ্ড লাগে।

*　　*　　*

রসুন—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখনই ঐ অমৃত হইতে এক বিন্দু অমৃত ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়। ঐ ভূপতিত অমৃত বিন্দু হইতে রসুনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রসুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরস-যুক্ত, কেবল ইহাতে অম্লরস নাই। ইহার মূলে কটু-রস, পত্রে তিক্ত রস, নালে কষায় রস, নালের অগ্রভাগে লবণ রস, এবং বীজ মধুর রস।

রসুন মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোধক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন এবং হৃদ্‌রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক। রসুন সেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক, কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। রসুন ভোজনকারীর এই সকল দ্রব্য বিশেষ নিষিদ্ধ।

*　　*　　*

গাইবান্ধার দুর্ভিক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদের অর্থসংগ্রহ।—কলিকাতা মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর উদ্যোগে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দেবের নেতৃত্বে গাইবান্ধা

কংগ্রেস যুবা-রিলিফ কমিটীর একদল স্বেচ্ছাসেবক অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, কুমিল্লা হইয়া ভৈরববাজার লাইন দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

* * *

ফরাসী দেশের প্রেসিডেন্টের বিবাহ। সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফরাসী রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ডুমার্গ গত ১লা জুন ম্যাডাম বো গ্রেভসের সহিত ইলাইসি প্রাসাদে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। ডুমার্গের বয়স ৬৮ বৎসর। এই আকস্মিক বিবাহে সমগ্র ফরাসী দেশে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

* * *

কন্যার আত্ম সম্প্রদান।—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ লিলুয়ার "দেবালয়" গৃহে প্রথিতযশা কবি বাল বিধবা শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কন্যা সম্প্রদান কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছে। শাস্ত্রমতে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা নিজেই সম্প্রদান করিতে পারেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই কলিকাতার খ্যাতনামা বনিয়াদি কায়স্থ বংশ-সম্ভূত।

* * *

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল।—ভিয়েনা হইতে লণ্ডন যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি প্যাটেল একখানি পত্রে শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রমণকে লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের সংবাদ অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইতেছে, ভারতের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে অত্যন্ত বুদ্ধি ও কৌশলের দরকার হইবে।

* * *

বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের দর কমিল।—গত ১লা জুন হইতে কলিকাতার বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যয় প্রতি 'ইউনিটে' তিন আনার স্থলে এগার পয়সা করা হইয়াছে—বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কর্ত্তৃপক্ষ এই ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে সহরবাসীর যে অনেক সুবিধা হইল তাহা বলাই বাহুল্য।

* * *

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যায় কাঁথি সরস্বতী-তলায় মহিলাদিগের এক মহতী সভা হয়। এর পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ধরণের মহিলা সভা হয় নাই। পূর্ব্বে পুরুষদিগের সভা হইত, মহিলারা তাহাতে যোগ দিতেন এই সভার বিশেষত্ব এই যে, মহিলারা অগ্রণী হইয়া এই মহিলা সভা আহ্বান করেন। মহিলাদিগের উদ্যোগেই সভার যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। এ সভা কেবল মহিলাদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মহিলারা পুরুষদিগকেও সভায় যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বসিবারও ভাল ব্যবস্থা ছিল।

* * *

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন।—আগামী

৪ঠা ও ৫ই জুলাই, ১৯৩১, বাঙ্গলা ১৯শে এবং ২০শে আষাঢ় ১৩৩৮ তারিখে শনি ও রবিবার বর্দ্ধমানে ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য, ডাক্তার মুঞ্জে ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু প্রথিতনাম্না ভারতের নেতৃবৃন্দ যোগদান করিবেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগদান করিবেন।

* * *

কলিকাতার লোক গরমে ছটফট করিতেছে। কেবল কলিকাতায় নয়, সমগ্র উত্তর ভারতেই গ্রীষ্মের প্রকোপ প্রচণ্ডরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর খবরে প্রকাশ, সেখানে অসহ্য গ্রীষ্মের ফলে ৯ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

* * *

পাব্লিসিটি অফিসার নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রচার করিয়াছেন :—

ভুপালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুসলিম সম্মেলনের যে বৈঠক বসাইবার কথা ছিল, তাহা কয়েকজন প্রতিনিধির যোগদানে অসুবিধা হওয়ার দরুণ স্থগিত রহিল।

বরফ-জল ঠাণ্ডা
কিন্তু ক্ষনস্থায়ী!
কেশরঞ্জন–
বেশী ঠাণ্ডা কারন দীর্ঘস্থায়ী।
কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি

(সত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

HEALTH.

সম্পাদক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক শ্রীভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

নবম বর্ষ] { শ্রাবণ—১৩৩৮। } [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মনের স্বাস্থ্য ও শিশুপালন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু M. B., D.Sc.

মনেরও রোগ হয়

কথায় বলে শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। মানুষের শরীর যে নানা রোগের আধার, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। এ বিষয়ে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ভুক্তভোগী। কিন্তু মানুষের মনেরও যে অসুখ হয়, একথা বিশ্বাস করিতে অনেকেই রাজী হইবেন না। শরীরের যেমন কলেরা, বসন্ত, জ্বর, অজীর্ণ, মাথাধরা, চুলকানি প্রভৃতি রোগ হয়, মনেরও তেমনই নানা বিকার দেখা যায়। শরীর স্থূল বস্তু বলিয়া শরীরের রোগ সকলেরই নজরে পড়ে; কিন্তু মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, এই কারণে মনের অসুখ সহজেই আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে। 'অমুকের মন খারাপ' 'অমুক পুত্রশোকে কাতর' 'অমুকের সহজেই রোগ হয়'—এ-সব ব্যাপার আমাদের নিকট নূতন নহে, এবং মনের অসুখ বলিলে আমরা সচরাচর এইগুলিই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এ-ধরণের মনের অসুখ ছাড়াও আরও কত রকম মনের গোলমাল আছে যাহার খবর আমরা বড়-একটা রাখি না। অবশ্য পাগলামি যে মনের রোগ তাহা সকলেরই জানা আছে। এইজন্য অন্যান্য মনোবিকারকেও আমরা চলিত কথায় পাগলামিরই গণ্ডীভুক্ত করি। রামবাবু আর-সব বিষয়ে হয়ত খুব সাহসী পুরুষ, কিন্তু একা পথে বাহির হইলে তাঁহার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'একলা পথ চলিতে কেমন একটা ভয় হয়, গাড়ী চাপাই পড়ি, না আর কিছু দুর্ঘটনা ঘটে—এই ভাবনাই মনকে বিব্রত করিয়া তোলে।' সাধারণে হয়ত ইহাকে রামবাবুর মনের "দুর্ব্বলতা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবেন। কেহ বা বলিবেন রামবাবুর মাথা খারাপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা যে একটা রোগ

এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করাইলে সারিতে পারে,—একথা আমরা কয়জন জানি ?

মনের রোগ নানাপ্রকার

বিধবা হইবার পর হইতে ভোলার মা'র একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি কাহারও ছোঁয়া কিছু খান না, স্নানের পর কেহ ছুঁইয়া দিলে পুনরায় স্নান করেন, সব জিনিষই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। ক্রমে তাঁহার শুচিতার মাত্রা বাড়িতে লাগিল। দশবার হাত না ধুইলে মন খুঁতখুঁত করে; সদাই শঙ্কিত পাছে কিছু অপবিত্র জিনিষ ছুঁইয়া ফেলেন। রাস্তায় বাহির হইলে অতি সন্তর্পণে বকের মত পা তুলিয়া চলেন। কিন্তু এমনই বরাত, এততেও মনে হয় বুঝি-বা কিছু মাড়াইলেন, এবং সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য পা হইতে জিনিষটা হাতে তুলিয়া লন, শেষে শুঁকিতে গিয়া নাকে লাগান। তখন অন্ততঃ দশ-বারোবার স্নান না করিলে শরীর পবিত্র বোধ হয় না। পাঠক বলিবেন,—এ রকম তাঁহারা অনেক দেখিয়াছেন, এ আবার রোগ কি ? এ ত শুচিবাই, একটা বাতিক মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বাতিকও এক রকম ব্যাধি। শুচিবাই যে কতটা কষ্টকর, ইহা যে গৃহে কত অশান্তি আনয়ন করে, তাহা অনেকের ধারণাই নাই।

শুচিবাই

শুচিবাই যে কেবল আমাদের দেশের বিধবাদের মধ্যেই আছে, তাহা নহে। সকল শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের ভিতরই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে রোগটা স্ত্রীলোকদেরই বেশী হয়। বিলাতেও শুচিবাইগ্রস্ত লোকের অভাব নাই।

নাম-জপ

কলিকাতার কোন আপিসে এক ভদ্রলোক কাজ করেন। তিনি ডেলি প্যাসেঞ্জার। আপিসে যাইবার উপক্রম করিলেই তাঁহার মনে নানা দুশ্চিন্তার উদয় হয়; তিনি অনবরত 'কালী, কালী, কালী, কালী ...' উচ্চারণ করিয়া মন হইতে সেই চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করেন; এরূপ না করিলে তাঁহার পক্ষে পথ চলা অসম্ভব। সময় সময় এমনও হয় যে সকালে আপিসের জন্য বাহির হইয়া মধ্য পথে আটকাইয়া যান এবং অপরাহ্ণে কর্ম্মস্থলে পৌঁছান কেবল কার্য্যদক্ষতার গুণেই তাঁহার চাকরি বজায় আছে। তাঁহার এই আচরণে অনেকেই বিদ্রূপ করেন, কিন্তু তিনিই জানেন ইহাতে তাঁহার কি কষ্ট।

গোনা-বাই

একজন রোগী আছেন, তাঁহাকে কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে ১ হইতে ৫১ পর্য্যন্ত গুণিতে হয়। এই কারণে তিনি যে কিরূপ বিব্রত হন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সহস্র চেষ্টা করিয়াও এবং নিরর্থক জানিয়াও তিনি এই ঝোঁক পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আবার গণনার অবকাশ না দিয়া, জোর করিয়া তাঁহাকে দিয়া কোন কাজ করাইলে তাঁহার অসহ্য মানসিক উদ্বেগ হয় ও তাহার ফলে তিনি মূর্চ্ছা যান।

দেবতার অবমাননা

আর এক রোগিণীর দেবমন্দিরে যাইলেই মনে হইত বুঝি-বা তিনি দেবতার অপমান করিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বার বার পূজা অর্চ্চনা করিয়া মন ঠাণ্ডা করিতে হইত।

অদ্ভুত চিন্তা

কখন কখন এরূপ ঝোঁক রোগীর কাজে না দেখা দিয়া চিন্তায় দেখা দেয়। তখন নানারূপ দুশ্চিন্তা তাহাকে সর্ব্বদা পীড়ন করিতে থাকে। শত বুঝাইলেও রোগীর মন হইতে এরূপ চিন্তা দূর করা যায় না। চিন্তাগুলি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, রোগী অনেক সময়ে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে, কিন্তু মনকে সে-চিন্তা হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাহারও মনে হয়, সে বুঝি কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে; কাহারও বা 'নিজের সন্তানকে মারিয়া ফেলিব' বলিয়া ভয় হয়; কাহারও বা গুরুজন দেখিলেই অসম্মানসূচক কথা মনে আসে; কাহারও মনে সর্ব্বদাই অকথ্য ভাব জাগে।

সন্দেহ

রোগী সময় সময় কোন বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করিতে পারে না; বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া মনে হয় 'বুঝি-বা বন্ধ করি নাই'; চিঠি ডাকে দিয়া মনে হয় বুঝি বা ঠিকানা লিখিতে ভুল হইয়াছে, ইত্যাদি।

ভয়

কোন কোন রোগীর সামান্য কারণেই অতিরিক্ত ভয় হয়; কাহারও রোগের কথা শুনিলেই মনে হয় বুঝি-বা সেই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিল; অসুখ হইলেই মনে করে বুঝি-বা সারিবে না। কেহ-বা বীজাণুর ভয়ে সদাই শঙ্কিত। কেহ অন্ধকারে একেবারেই থাকিতে পারে না। কেহ আকাশে মেঘ উঠিলে বা বিদ্যুৎ চমকাইলে বজ্রাঘাতের ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। কেহ খোলা জায়গায় কেহ বা বন্ধ ঘরে থাকিতে পারে না; কেহ মাকড়সা বা আরসোলা দেখিলে ঘর হইতে পলায়ন করে; কেহ বা কলিকাতা সহরে দোতলার উপর থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ সর্পভয়ে সন্ত্রস্ত। এইরূপ কত প্রকারের অদ্ভুত ভয় যে রোগীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

হিষ্টিরিয়া ও ভূতে পাওয়া

হিষ্টিরিয়া রোগী অনেকেই দেখিয়াছেন। হিষ্টিরিয়াও এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। মনের রোগ হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নানা শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে—পেটে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, হাত-পা অসাড় হইয়া যাওয়া, ফিট, পক্ষাঘাতের ন্যায় লক্ষণ, অন্ধতা, বধিরতা, ইত্যাদি। শারীরিক লক্ষণ ব্যতীত হিষ্টিরিয়ায় অনেক সময় অনেক প্রকার মানসিক লক্ষণও প্রকাশ পায়; রোগী অকারণে বা সামান্য কারণে হাসে বা কাঁদে, এক বিষয়ে অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, অপর বিষয়ে অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব দেখায়, কখন কখন পাগলের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলে, কখন বা বহুদিন যাবৎ জড়ের ন্যায় নিশ্চল থাকে। ভূতে পাওয়াও এক প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগ।

ভ্রান্ত ধারণা

আরও একরূপ মানসিক ব্যাধি আছে, তাহাতে রোগীর মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হয়; রোগী মনে করে তাহার খাদ্যে কেহ বিষ মিশাইয়া দিতেছে; পুলিশ তাহার পিছনে লাগিয়াছে বা অন্য লোক তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে; কেহ তাহাকে বেতার দ্বারা বা হিপনটাইজ্ করিয়া অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে, তাহার স্ত্রীর চরিত্রহানি হইয়াছে, ইত্যাদি। কেহ মনে করে সে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বলবান, রূপবান বা ধনী; কেহ বা নিজেকে

জগদ্গুরু বলিয়া প্রচার করে; কেহ মনে করে তাহার শরীর একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে; কাহারও বা নিজের শরীর কাঁচের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়, সে নড়িতে চড়িতে ভয় পায় পাছে ভাঙিয়া যায়।

বাতিক বৃদ্ধি ও চিকিৎসকের মনের রোগ

কখন কখন মানসিক ব্যাধি ধর্ম্মকর্ম্মে অতিরিক্ত আস্থা, ব্যবসায়ে আগ্রহ, চরকা বা পলিটিক্সে আগ্রহ রূপে দেখা দেয়; কখনও বা আহার, বিহার বা ব্যায়ামে রোগী বাতিকগ্রস্ত হয়। চিকিৎসকদিগের মধ্যেও এরূপ বাতিকগ্রস্ত লোক বিরল নহে। এরূপ চিকিৎসকের হাতে পড়িলে কখনও বা রোগীকে দুই সন্ধ্যা রুটি, অথবা কেবল দুগ্ধ বা ফল খাইয়া থাকিতে হয়; কেহ বা কেবল মাংস খাইতেই পরামর্শ দেন; কেহ বা গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে বলেন; কাহার ও বা ব্যবস্থায় কেবল উপবাস।

সুস্থ শরীরেও মনের রোগ হয়

মানসিক ব্যাধি যে কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারে, উপরের বিবরণ হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সকল ব্যাধির লক্ষণগুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে বলিয়া মনে হয় না। মানসিক ব্যাধির রহস্য চিকিৎসকদিগের নিকটও অনেকদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল; এজন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন ব্যাধি দেখিলে তাঁহারা সাব্যস্ত করিতেন যে, যকৃতের দোষে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা শারীরিক কোন গ্রন্থির (glands) ক্রিয়া বিপর্য্যয়ে তাহার উৎপত্তি। শারীরিক কারণ ভিন্ন কেবলমাত্র মানসিক কারণে যে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, একথা চিকিৎসকমণ্ডলী সহজে বিশ্বাস করেন নাই।

মনের রোগ দুষ্টামি বা ভান নহে

হিষ্টিরিয়ায় যখন কোনই শারীরিক বৈলক্ষণ্য খুঁজিয়া বাহির করা গেল না, অথচ দেখা গেল রোগীর উপদ্রবের অন্ত নাই, তখন অনেক চিকিৎসকই বলিতে লাগিলেন, হিষ্টিরিয়া রোগ নহে—বদমাইসি মাত্র, রোগী অসুখের ভান করে। এরূপ মত পোষণ করেন, এখনও এমন চিকিৎসকের অভাব নাই। রোগী হয়ত দুই বৎসর শয্যাগত, নড়িতে চড়িতে অক্ষম, নানারূপ চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই, এমন সময়ে ঘরে আগুন লাগিল, অমনি রোগী বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। এরূপ অবস্থায় রোগী যে রোগের ভান করিতেছিল, এরূপ মনে করা বিচিত্র নহে।

মনের রোগ বুঝাইলেও যায় না

বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিগুলির লক্ষণ বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সবগুলিতেই একটা যৌক্তিকতার অভাব আছে; কলিকাতার বাড়িতে দোতলার উপর সাপের ভয়ে ভীত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে রোগীর যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়; অতএব এই একটি বিষয়েই অযৌক্তিকতা কেন দেখা দিল, ভাবিবার বিষয়। রোগী দেখিতেছে হাজার হাজার লোক নির্ব্বিঘ্নে চলাফেরা করিতেছে, অথচ তাহার নিজের রাস্তা চলিতে ভয় হয়; এই ভয় যে কতটা অসঙ্গত, তাহা অনেক সময় রোগী বুঝিতে পারে, কিন্তু যেখানে তাহার আত্মাভিমান

অধিক অথবা রোগ প্রবল, সেখানে সে নিজের কাছেও নিজের অস্বাভাবিকতা স্বীকার করিতে চায় না, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "রাস্তায় কি কখনও লোক চাপা পড়ে না? আমি যে গাড়ী চাপা পড়িব না, তাহার কি কিছু নিশ্চয়তা আছে?" এক রোগী খবরের কাগজে গাড়ী চাপার সংবাদ পাঠ করিলে সেটি সযত্নে কাটিয়া খাতায় আঁটিয়া রাখিতেন; কেহ তর্ক করিতে আসিলেই সেই খাতাখানি খুলিয়া দেখাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতেন। ১০ হাজারের মধ্যে হয়ত একটা লোক গাড়ী চাপা পড়িয়া মারা পড়ে; ৯৯৯৯ জন নির্ব্বিঘ্নে চলাফেরা করে মনে রাখিয়া জনসাধারণ সাবধানে পথ চলেন; কিন্তু যে-একটি লোক চাপা পড়িয়া মরে, রোগীর মন তাহার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে; সহস্র তর্কেও তাহার ভুল বুঝান যায় না। অনেকে মনে করেন, বুঝি তর্কের দ্বারা রোগীর মনের দুর্ব্বলতা দূর করা যায়; কিন্তু তাহা একেবারেই ভুল। চিকিৎসকের শাণিত তর্কসমূহ রোগের বর্ম্ম ভেদ করিয়া কিছুতেই প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এক রোগী একবার চিকিৎসককে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি ঋজুপাঠ পড়িয়াছেন?" চিকিৎসক বলিলেন, "হাঁ, কেন?" রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঋজুপাঠে দেখিয়াছেন পূর্ব্বে চৌদ্দ বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি হইত, এখনই বা হয় না কেন?" চিকিৎসক যে তাহার কারণ জানেন না সে কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। তখন রোগী বলিলেন যে, তিনি দিন-রাত জপ-তপ করিতেছেন। এই জপের প্রভাবেই অনাবৃষ্টি বন্ধ আছে। চিকিৎসক বলিলেন, "দিন-কতক জপ-তপ ছাড়িয়া দিয়া দেখুন না—বৃষ্টি হয় কি না।" রোগী বলিলেন, "এ কাজ আমার দ্বারা কখনই হইবে না, ইহাতে পৃথিবীর সমূহ অনিষ্ঠ হইবে।" আর এক রোগী মনে করিতেন, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। তিনি এ সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

যক্ষ্মা সমস্যা

ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, M. B.

বক্ষ ও ফুস্ ফুস্ পরীক্ষার জন্য stethoscope নামক যন্ত্রের আবিষ্কারক বিখ্যাত Leannec বলিয়াছেন, 'শারীরিক গঠণের কোনওরূপ ক্রটী না থাকিলেও যে সকল লোককে আমি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গভীর ও দীর্ঘকালব্যাপী দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগবশতঃ এই বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত চিকিৎসকের মতে যক্ষ্মারোগের একটা নৈতিক কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এই নৈতিক কারণ (moral factor) অর্থে চরিত্রগত কোনওরূপ দোষ বা ক্রটী বুঝায় না, এখানে ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে এমন অনেক বিষয় গোপনে লুক্কাইত থাকে যাহা তাঁহার মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণে পরিণত হয়।

যক্ষ্মারোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়া জার্ম্মানির ডাক্তার বিখ্যাত কক্ সাহেব যে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সুন্দর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বহু প্রাচীনকাল হইতে এই রোগ সম্বন্ধে যে পর্য্যবেক্ষণ চলিয়া আসিতেছিল তাহা কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে লোকে যক্ষ্মা-রোগের টীকা রসায়নাগার ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কতকগুলি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি অন্তর্হিত হইয়াছে। পরে যখন জানা গেল যে যক্ষ্মারোগের বীজাণু অপেক্ষা মানুষের দৈহিক বাধা দিবার শক্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তখন এবিষয়ে রসায়নিক পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অবশ্য এসবদিকে গবেষণার একটা যে মূল্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একথা স্বীকার্য্য যে যক্ষ্মার জীবাণু না থাকিলে যক্ষ্মারোগ পৃথিবীতে থাকিত না! কিন্তু এই বিষম জীবাণুর বর্ত্তমান সত্ত্বেও দেহ সবল ও শক্তিশালী হইলে এইরোগের আক্রমণে বাধা দিতে পারে। আমাদের বক্তব্য এই যে, যেসব স্থলে দৈহিক গঠন ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য মানুষের এইরোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সবস্থলে মনে শোক ও দুশ্চিন্তা থাকিলে দ্রুত আক্রমণের কারণ উপস্থিত হয়।

ফরাসী দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তাগণ একটী বৃহৎ যক্ষ্মারোগের আরোগ্যালয় হইতে মানসিক উদ্বেগ ও শোক এই রোগে কিরূপ কার্য্য করে তাহার কতকটা নিশ্চিত হিসাব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এইসব সম্বন্ধে তাঁহারা যে (facts & figures) সব তথ্য অবিষ্কার ও হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহার উপর বিশেষরূপ নির্ভর করা যায় না। তবে মোটের উপর একথা বলা যাইতে পারে যে উদ্বেগ, শোক ও দুঃখ অনেকস্থলে যক্ষ্মারোগ আনয়নের সাহায্য করিয়া থাকে।

কেহই একথা বলিতে পারেন না যে এই পৃথিবী রোগ, শোক ও দুঃখ বিবর্জ্জিত হইবে। কিন্তু রোগ, শোক ও উদ্বেগে সকল লোক কিছু সমানভাবে অভিভূত হ'ন না। যে সব লোকের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রায়ই দেখা যায় সে সব লোকের ভিতর উত্তেজনার ভাব বেশী। তাঁহাদের আনন্দ ও উদ্বেগ সাধারণ লোকের অপেক্ষা বেশী উত্তেজনা পূর্ণ।

বালকবালিকাগণের পক্ষে এসব কথা বিশেষ ভাবে খাটে। সহজে উত্তেজিত হইলেই যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আসিবে এরূপ কথা অবশ্য বলা যায় না, তবে এসব স্থলে যে বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাহা বলাই বাহুল্য এবং সেজন্য পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। এসব স্থলে শান্তি বিশেষ প্রয়োজন; বিশেষ প্রচুর পরিমাণে যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। যাঁহাদের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে রাত্রি জাগরণ বিষপানের ন্যায় অনিষ্টকর; উত্তেজনা মহা অপকারী। এরূপ লোকের প্রচুর পরিমাণে সুনিদ্রার আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন যে আমোদ প্রমোদে রাত্রিযাপন করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; এসব স্থলে রাত্রি জাগরণই মহা অনিষ্টজনক। আমোদ প্রমোদ বা দুঃখ, সকল রকম উত্তেজনার পরই অবসাদ আসিয়া থাকে। যক্ষ্মা-রোগের যাঁহাদের সম্ভাবনা আছে তাঁহাদের পক্ষে শান্তিময় জীবন, উত্তম খাদ্য ভক্ষণ এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে নিদ্রা পরম শুভফল প্রসব করিয়া থাকে।

সহজে যাঁহারা কাতর হইয়া পড়েন এরূপ লোকের যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, এধারণা ভ্রান্ত। বড়ই আনন্দের কথা যে একজন ফরাসী চিকিৎসক যক্ষ্মারোগে যাহাতে দৈহিক বাধা দিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই ফরাসী চিকিৎসক যদিও কোনও নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি একটী বড় সত্যকথার উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন যক্ষ্মারোগে জীবাণু তত চিন্তার বিষয় নয়—যত রোগকে বাধা দিবার দৈহিক শক্তি। অর্থাৎ দেহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও সবল অবস্থায় থাকিলে যক্ষ্মার জীবাণু বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। জার্ম্মান ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন যে প্রত্যেক মানুষেরই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ মৃত্যুর পর শবব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রায় সকল লোকেই জীবিত কালের কোনও না কোনও সময়ে যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকই এই বিষয়ে দেহ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিল অর্থাৎ মনুষ্যদেহ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে যক্ষ্মারোগের জীবাণুকে বাধা দিতে বিশেষরূপ সক্ষম।

এক্ষণে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক ব্যাধি নহে ; অর্থাৎ পিতামাতার যক্ষ্মা রোগ থাকিলে সন্তানগণের যে যক্ষ্মা হইবে এমন কোনও কথা নাই। এতদিন যে এসম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা লোকে পোষণ করিয়া আসিতেছেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকের এইরূপ ধারণার কারণ এই যে তাঁহারা প্রায়ই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত পিতামাতার পুত্রকন্যাগণকে ঐই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছেন। ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রকন্যাগণ তাঁহাদের দ্বারা সংক্রামিত হইয়া প্রায় এইরূপ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পিতামাতার নিকট হইতে আমরা শারীরিক অবস্থা ও গঠন অর্থাৎ constitution পাইয়া থাকি এবং বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সব লোকের যক্ষ্মাদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা হৃদরোগে বা মূত্রাশয়রোগে যাঁহাদের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেহ যাহাতে সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। এমন লোক অনেক আছেন যাঁহাদের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে ; এরূপ লোক হয়ত কখনও জীবদ্দশায় এই ভীষণ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত না হইতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই রোগের হস্ত হইতে মুক্ত থাকেন কিন্তু তথাপি তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। এরূপ লোকের পরিবার মধ্যে যক্ষ্মারোগের ইতিহাস থাকিলে তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। এরূপ লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আরোগ্যলাভ সুদূর পরাহত হয়। এরূপ লোকের ত্রুটী হইলে হঠাৎ ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে ; তবে যেরূপ সকল বিষয়ের দুই দিক আছে এসব বিষয়েও অসুবিধার সহিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। যাঁহাদের রক্তের চাপ অতিশয় কম, খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের ব্যাঘাত হয় এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের যক্ষ্মারোগে হইবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু এসব লোকের যৌবনই বিপজ্জনক সময় ; যৌবন পার হইলে বিপদের শঙ্কা হ্রাস হইয়া থাকে। তাঁহাদের

দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের অভাব হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ তাঁহাদের বিপদের সূচনা করিয়া থাকে।

অতিরিক্ত ভোজন করিলে এসব লোকের হয়ত একটু পরিপাকের গোলমাল উপস্থিত হয়। কিন্তু সাধারণ সুস্থ ও সবল ব্যক্তির ন্যায় অতিভোজনের জন্য তাঁহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। সকলেই কোনও না কোনও সময় কৃতান্তের অধিগত হইবে; তবে যাঁহাদিগকে আমরা ক্ষীণদেহী বা delicate এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহাদের সাধারণতঃ সবল ও স্থূলকায় ব্যক্তিগণের অপেক্ষা ব্যাধিগ্রস্ত হইবার বেশী ভয় বা সম্ভাবনা থাকে না।

যাঁহাদের যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তাঁহাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। গুরুতর পরিশ্রমজনিত অবসাদ বা শ্রান্তিক্লিষ্ট দেহ তাঁহাদের পক্ষে বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে। মদ্যপান বা যাহাতে মত্ততা আসিতে পারে এরূপ কোনও মাদকদ্রব্য তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা পরিমিত সীমার অতিরিক্ত গমন তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। কোনও সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। শীতের সহিত জ্বর বা ঠাণ্ডা লাগিয়া কম্পন. কিংবা tonsilitis হইলে দেহের স্বাভাবিক নিরাময়শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। এরূপস্থলে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে একটা tonic সেবন বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। আবার সময়ে অসময়ে ঔষধ সেবন করাও অন্যায়, চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। একথা যেন সকলেই স্মরণ রাখেন যে যক্ষ্মা রোগ সহজেই নিবারিত হইতে পারে; সুতরাং এই ভীষণ ব্যাধিকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের অর্থাভাব জনিত দরিদ্রতা নাই, যাঁহাদের সুখাদ্যের অভাব নাই, যাঁহারা আবশ্যক মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারেন, তাঁহারা যদি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হ'ন তবে বড়ই লজ্জার কথা। এসব লোকের কোনওরূপ ওজর দেখাইবার কারণ থাকা উচিত নয়।

রোগীর পথ্য

(কবিরাজ—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি—আবার বলি, রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যেরূপ দুরূহ কার্য্য, সেইরূপ পথ্য নির্ব্বাচন করাও দুরূহ কার্য্য। ব্যাধির ও দোষের প্রতিকুল পথ্য প্রয়োগ করিলে ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের কোনই আশা থাকে না বরং ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পথ্যাদির নিয়ম পালন করিলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাধি নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে ;—

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

অর্থাৎ, বিনা ঔষধেও রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে কিন্তু পথ্যাদির নিয়ম-পালন না করিলে শত ঔষধেও ব্যাধির উপশম হয় না। এই জন্য পথ্যাপথ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।

ব্যাধি অনন্ত—কে বলিবে কত! নিত্য নূতন ব্যাধি মানব শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া শরীর ও মন উভয়কেই নষ্ট করিয়া থাকে। কত মানব নিত্য নূতন ব্যাধির কবলে পড়িয়া ইহধাম হইতে চির বিদায় লইতেছে কে জানে?

ব্যাধি গণনা করা সহজ সাধ্য কার্য্য নহে। যে সকল ব্যাধি প্রায়শঃ বা ক্বচিৎ মানব শরীরকে আশ্রয় করিয়া পীড়া প্রদান করে, সেই সকল ব্যাধি গণনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ নিদানাদি-তত্ত্ব ত্রিদোষ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মনে হয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যদি এই ত্রিদোষ বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নিদানাদি-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা না করিতেন এবং কোন্ দ্রব্যে কোন্ দোষের সমতা রক্ষা হয়, কোন্ দ্রব্যে কোন্ দোষের ক্ষয় হয়, ইত্যাদি অর্থাৎ রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, প্রভাব প্রভৃতির কথা না বলিতেন তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত বৈদ্যকশাস্ত্রের আয়ুষ্কাল থাকিত কিনা সন্দেহ*।

ব্যাধি শরীরে প্রকাশ পাইলেই সুচিকিৎসকের শরন লওয়া বিবেচক জনগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিম্ন লিখিতভাবে পথ্যের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল ব্যাধির পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব, তথাপি মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

জ্বর

আমরা এই প্রবন্ধে প্রথমে জ্বরের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ জ্বর প্রায়ই

* মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত 'ত্রিদোষ তত্ত্ব' নামক বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ ১৩৩৪-৩৫ সনের আয়ুর্ব্বিজ্ঞান নামক মাসিক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

—প্রবন্ধকার

প্রত্যেক নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীর শরীরে আশ্রয় লয়। বিশেষতঃ আমাদের এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই আছে যিনি জ্বর রোগে আক্রান্ত হন নাই।

জ্বরের তরুণাবস্থায় লঙ্ঘনই সুপথ্য। জ্বর যেদিন প্রকাশ পায় সেইদিন একেবারে উপবাস করা উচিৎ। পরে লঘু পথ্য সেবন করিলে বিশেষ সুফল দর্শায়। উপবাসের দিন পিপাসা পাইলে রোগীকে গরম জল পান করিতে দিতে হয়। কিন্তু পিত্তজ্বরে শীতল জল রোগীকে পান করিতে দিতে হইবে। এইরূপ উপবাস অথবা লঘুপথ্য সেবন করিলে শরীর হাল্‌কা হইয়া যায় এবং জ্বর বিরামের পক্ষে সহায়তা করে। এমনভাবে লঙ্ঘন দেওয়াইতে হয় যাহাতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে। এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। কারণ রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে মূল ব্যাধি সারিয়া গেলেও দুর্ব্বলতা বহুকাল ভোগ করিতে হয়।

জ্বরের তরুণাবস্থায় দুগ্ধ পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। তরুণ জ্বরে যদি শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকে এবং সেই অবস্থায় যদি দুগ্ধ পথ্য হিসাবে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে তাহার সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে। উক্ত হইয়াছে ঃ—

"জীর্ণ জ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরংস্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥"

অর্থাৎ, বিষের ন্যায় তরুণ জ্বরে দুগ্ধ অপকারী হইয়া থাকে কিন্তু যদি শ্লেষ্মার সংস্রব না থাকে তাহা হইলে জীর্ণ জ্বরে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

লঙ্ঘন কি ভাবে দেওয়াইতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রোগীর বলাবল ও বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন দেওয়াইয়া লঘু পথ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এখন আপনারা অনেকে হয়ত' প্রশ্ন করিবেন, জ্বরের প্রথমেই লঙ্ঘনের ব্যবস্থা কেন? ইহার শাস্ত্রীয় যুক্তিই বা কি? জ্বরে জঠরাগ্নির বল নষ্ট এবং স্রোত সকলের অবরোধ হয়। প্রশ্নের উত্তরের জন্য এস্থলে লঙ্ঘন দেওয়াইবার কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

উক্ত হইয়াছে ;—

"আমাশয়স্থো-হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥"

ইহার অনুবাদ, দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ আমাশয়স্থ হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট ও মার্গ সকলকে অবরোধ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই কারণেই জ্বরের প্রথমেই লঙ্ঘন দেওয়ান আবশ্যক।

এইবার লঘু পথ্যের কথা আরম্ভ করা যাউক। জল-সাগু অর্থাৎ সাগু জল দ্বারা পাক করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মাপ মত লেবুর রস ও মাপ মত কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া তরুণ জ্বরের রোগীকে দিবসে একবার ও রাত্রে একবার সেবন করিতে দিতে হইবে। অন্য সময় যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহা হইলে ফল সেবন করিতে দিতে হইবে। এজন্য দাড়িম, বেদানা, সামান্য দুই এক টুকরা মিশ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি রোগীর কাশী থাকে তাহা হইলে তাল মিশ্রী দিতে হইবে। রোগীর যদি কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে এবং যদি বুঝা যায় রোগীকে প্রয়োগ করা চলিবে তাহা হইলে কিস্‌মিস্ বা মনেক্কাও দেওয়া যাইতে পারে।

অনেক রোগী আছেন, যাঁহারা সাগু খাইতে অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদিগকে জোর করিয়া সাগু

খাওয়ান উচিৎ নহে। কারণ যে খাদ্য তাঁহার (রোগীর) সাত্ম্য নহে সেইরূপ পথ্য যদি প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। অতএব তাঁহাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। শটীর পালো যথাবিধানে পাক করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সাগু প্রয়োগের বিধানানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে।

লাজ মণ্ডও তরুণ জ্বরে পথ্য হিসাবে প্রয়োগ করিলে তাহাতে অত্যন্ত সুফল লাভ করা যায়। খৈএর ধান বাছিয়া গরম জলে দিয়া পরিস্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে দাড়িমের রস অথবা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মিশ্রী সহযোগে পান করিতে দিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল মণ্ড যেন একটু তরল জাতীয় হয়।

রোগী যখন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইবে তখন পথ্যেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তখন মণ্ড, পেয়া প্রভৃতি না দিয়া টাট্‌কা মুড়ি, খৈ, মুগ বা মসূরের যুষ, দাড়িম, বেদানা প্রভৃতি দিতে হইবে। পরে যখন জ্বর ত্যাগ হইয়া যাইবে তখন একদিন রুটি পথ্য দিয়া অন্য পথ্য প্রদান করিতে হইবে। আরোগ্য লাভের পর স্নানাদি করিয়া স্বাস্থ্য-নীতি সকল পালন করিয়া চলিতে হইবে।

যদি রোগীর পিত্ত প্রকুপিত থাকে অর্থাৎ, রোগীর যদি দাহ প্রভৃতি থাকে তাহা হইলে ধনে ও পল্‌তা একত্র সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া দিবসে দুইবার পান করিতে দিতে হইবে। পূর্ব্ব লিখিত পথ্য সকল যথাবিধানে প্রয়োগ চলিবে। ক্ষেতপাপড়া সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই জলও দেওয়া যাইতে পারে।

অধুনা কি পল্লী, কি নগর জনপদের সকল স্থলেই যে ব্যাপক বা বাত-শ্লৈষ্মিক জ্বর দেখা দিতেছে যাহাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' নামকরণ করিয়াছেন তাহারও পথ্যাপথ্য তরুণ জ্বরের পথ্যাপথ্যের ন্যায় হইবে। এক কথায়, তরুণ জ্বরের সামাবস্থায় উক্ত বিধানানুসারে পথ্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়।

আর এক কথা, তরুণ জ্বরে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগান ভাল নহে। জ্বর লইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া বেড়ান বা গুরু পরিশ্রম করা নিষিদ্ধ। কারণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া বেড়াইলে বা পরিশ্রম করিলে জ্বর প্রবলাকার ধারণ করে। অতএব জ্বর শরীরে প্রকাশ পাইলেই বিশ্রাম করা প্রয়োজন।

অদ্যকার এই প্রবন্ধে সান্নিপাতিক জ্বরের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র যাহাকে 'টাইফয়েড', 'নিউমোনিয়া' প্রভৃতি বলেন, তাহাকে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং এই সকল সান্নিপাতিক ত্রিদোষজ ব্যাধির চিকিৎসা কৌশল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'টাইফয়েড' প্রভৃতি সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই রোগে রোগীর অবস্থা একরূপ থাকে না; সেইজন্য কেবল পথ্য সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্ভব। অবস্থা ভেদে পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়। 'টাইফয়েড' নামক যে সান্নিপাতিক জ্বর তাহার পেটের অবস্থা এমন হয় যে কিছুই জীর্ণ করার সামর্থ থাকে না। সেই সকল ক্ষেত্রে ছানার জল পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কোন দিন এই সকল ব্যাধির চিকিৎসা কৌশল লিখিবার অবসর পাই তাহা হইলে তখন চিকিৎসা কৌশল বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাভেদে পথ্যের কথাও বলিবার বাসনা রাখিলাম। জীর্ণজ্বর প্রভৃতির কথা আগামীবারে আলোচনা করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

দুরূহ ব্যাঘ্র-দংশন "ল্যাক্টিয়োল" ড্রেসিং দ্বারা আরোগ্য

কলিকাতা ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালের হাউস্ সার্জ্জন এস্. কে, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একটী ব্যাঘ্র-দংশনের রোগীকে "ল্যাক্টিয়োল" দিয়া কিরূপে আরোগ্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

পাঁচু সেখ একটী ব্যাঘ্র দ্বারা রীতিমত জখম হইয়া ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩১ সালে ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ ভর্ত্তি হয়। তাহার হাত ও পা এত বেশী জখম হইয়াছিল যে ভিতরকার মাংসপেশীগুলি পর্য্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

ভর্ত্তি হইবার ৩।৪দিন পরে জখমগুলি ব্যাপকভাবে বিষাক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠাতে অস্ত্র করা হয়। অস্ত্র করিবার পর দেখা গেল যে রোগীর অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে ও কাটা ঘা হইতে পুঁজ নির্গত হইতেছে ও পচা মাংস বাহির হইতেছে। বীজাণু আরক ও বীজাণু শোধক আরক দ্বারা ঘা ধোয়াইয়া 'আইওডিন' লাগাইয়া ও 'সিরম' ইঞ্জেক্‌সন দিয়া কিছু উপকার না পাইয়া শেষে "Lacteol" দিয়া ধোয়ান স্থির হইল (ভর্ত্তি হইবার মাসেক খানেক পর)। যে ভাবে ঘা ধোয়ান হইত তাহা এই ঃ—

প্রথমে বিশুদ্ধ বীজাণুরহিত (Sterile) জল দ্বারা ঘাটী ধুইয়া শুষ্ক করিয়া পুঁছিয়া "ল্যাক্টিয়োল" ঘায়ের ভিতর ঢালিয়া পুনরায় 'গজ' ল্যাক্টিয়োল দিয়া ভিজাইয়া ঘাটি আবৃত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যহ এইরূপ করিয়া পুরাতন "ড্রেসিং" বদ্‌লাইয়া নূতন করিয়া ঘা ধোয়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

এইরূপ সাত দিন ধোয়াইয়া ও বাঁধিবার পর ঘা পরিস্কার হইয়া আসিতে লাগিল ও দুই সপ্তাহের মধ্যে বেশ লাল ও সারিবার মুখে যাইতে লাগিল। যখন পচন বন্ধ হইয়া গেল 'ল্যাক্টিয়োল" বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল ও রোগীকে ১২ই মার্চ্চ আরোগ্য করিয়া হাঁসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

তিনি বলেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে "ল্যাক্টিয়োল" দিয়া ঘা ধোয়াইয়াছিলাম বলিয়া এত শীঘ্র ও এরকম আশ্চর্য্যভাবে ঘা সারিয়া গিয়াছে।

শিশুদিগের খাদ্য

শ্রীঅমলকুমার গাঙ্গুলী

পুষ্টিকর খাদ্য

শিশুদিগের **খাওয়া দাওয়া** বিষয়ে মাতারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু সব সময়ই শিশুর খাদ্যে ভিটামিন আছে কি প্রোটীন আছে কিম্বা অন্য কোনও ধাতুজ পদার্থ আছে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় না। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি মনে রাখিলেই চলিবে :—

দুগ্ধ—দিনে ১ কোয়ার্ট। কিশোর বয়স্কদিগের জন্য ১ পাইট (Pint)। চার বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুদিগকে দিনে ১টি করিয়া ডিম্ব দেওয়া যাইতে পারে।

তরকারি প্রতিদিনই খাওয়ান দরকার। আলু ভিন্ন আরও দুই প্রকার তরকারি খাওয়ান প্রয়োজন। খোসা শুদ্ধ রন্ধন করা আলুই উপকারী।

দিনে অন্ততঃ দুইটি করিয়া ফল। একটি টাট্‌কা।

প্রতিদিন চিবাইবার মত কিছু শক্ত খাদ্য।

এক গ্লাসের অধিক জল সকালে উঠার পর এবং প্রতিবার খাইবার পর।

খাওয়ার পর অল্প পরিমাণ মিষ্টান্ন নিয়মিত-সময় অনুযায়ী প্রতিদিন চাবিবার ভোজন করান উচিত।

খাইবার সময় মনের সুখ ও প্রসন্নতা থাকা প্রয়োজন।

শিশুদিগের পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা

দুই বৎসরের শিশু হইতেই পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোনওক্রমে তাহারা বিছানা কিম্বা কাপড় জামা প্রস্রাব করিয়া ভিজায় তাহা হইলে দেখিতে হইবে সে অসুস্থ আছে কি না। সাধারণতঃ শিশুরা অসুস্থতার জন্য কিম্বা স্বভাবতঃ প্রস্রাব করিয়া বিছানা ভিজায়। এই স্বভাব ছাড়াইতে হইবে সাহায্য ছাড়া তাহারা নিজেরা শিখিতে পারে না। এবং প্রত্যেক শিশুকে পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে হইবে।

প্রথমতঃ পরীক্ষা করাইয়া দেখা উচিৎ সে অসুস্থতা নিবন্ধন প্রস্রাব করে কি না। যদি উক্ত কারণ অসম্ভব মনে হয় তাহা হইলে তাহাকে অভ্যাস শিক্ষা দিতে হইবে।

সর্ব্বদা নিজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে যে এই প্রস্রাব করা দোষ ছাড়ান যাইতে পারে।

শিশু যাহাতে কাপড়ে প্রস্রাব করা বন্ধ করে সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

শিশুকে জানান দরকার সে কাপড়ে প্রস্রাব করা অভ্যাস ছেড়েছে। তাহাকে বুঝাইয়া দাও যে এঅভ্যাস শুধরাইতে হইবে, আমি কেবলমাত্র তোমায় সাহায্য করব।

এই উপায়গুলি নিয়মিতরূপে ও যথাযথভাবে পালন করুন। রাত্রিতে নির্দ্ধারিত সময়ে ভোজন করান। রাত্রে ভোজনের পর কিছু খাইতে অথবা পান করিতে দেওয়া উচিত নয়। শয়নের পূর্ব্বে রোজ প্রস্রাব করিয়া শোওয়া অভ্যাস করান। একটু বেশী রাত্রিতে প্রতি দিন তাহাকে জাগাইয়া প্রস্রাব করান।

এই অভ্যাস যে নিবারণ করা যায় না তাহা ভাবিবেন না।

শিশুকে জানাইবেন না যে ইহা ছাড়ান যায় না।

শিশুকে অনুভব করাইবেন না যে সে প্রস্রাব না করিয়া থাকিতে পারে না।

কোনও উপায়ে তাহাকে নিরুৎসাহ করিবেন না।

ছেলেদের ভোজনে শিক্ষা

শিশুদের দেখান দরকার যে, যে কোনও খাবারই হউক খাইতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া খাইতে নাই।

তোমার সম্মুখে যাহা রাখা হয় তাহা তুমি খাও শিশু ইহা দেখুক, মাতা তাঁহার শিশুকে বার বার ভোজন করান যেন তাঁহার কার্য্য সূচির আনন্দ-দায়ক অংশ ছাড়া অন্য কিছু না ভাবেন। অর্থাৎ ৩।৪ বার ভোজন করাইতে যেন বিরক্তিভাব না দেখান।

রুচিকর খাবার খাওয়ান দরকার এবং এককালে অল্প খাওয়ান প্রয়োজন। শিশুর যাহাতে **রুচি হয় তাহাতে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।**

খাওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া প্রয়োজন। যদি না খায় খাবার তুলিয়া লইতে হইবে।

তাহাকে বুঝাইতে হইবে খাওয়াটা তাহার একমাত্র কাজ।

একবারে অল্প করিয়া নূতন খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। নূতন খাবার একবারের বেশী খাওয়াবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ কোনও নূতন খাবার প্রথমতঃ শিশু খাইতে ইচ্ছা করে না বলিয়া আর তাহাকে সেই খাবার দেওয়া উচিত নয় মনে করবেন না।

নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত কিছু খাইতে দেওয়া উচিত নয়।

তাহার কোনও খাবার খেতে রুচি বা অরুচি আসে এসম্বন্ধে তাহার সম্মুখে কিছু আলোচনা করা উচিত নয়।

খাদ্যে রুচি বা অরুচি সম্বন্ধে তাহাকে অপরে কিছু বল্‌বেন না।

সে আদৌ খেতে পারে না এরূপ বল্‌বেন না।

অপরের ক্ষুধার সহিত তাহার ক্ষুধার তুলনা করিবেন না।

তাহাকে জানিতে দিবেন না যে তাহার খাওয়ার জন্য আপনি চিন্তিত ও ব্যথিত।

নিজে যখন খাইতে শিখিবে তখন তাহাকে আর খাওয়াইয়া দিবেন না।

খাইবার জন্য তাহাকে কোনও রকমে পীড়ন করিবেন না।

বালককে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, ধমকানি দিয়া অথবা জোর পূর্ব্বক খাওয়াইবেন না।

মনে রাখিবেন সুস্থ শিশু যদি একবার না খায় তাহাতে তাহার কিছু ক্ষতি হয় না। মাতাপিতা যেমন যা তা খায় ছেলে সেই ভাবে খাবে এরূপ নহে। অনুকরণ দ্বারা বালক ভাল মন্দ খেতে অভ্যস্ত হয়।

যে সমস্ত খাবার শরীরের পক্ষে উপকারী তাহাই খাইতে শিখানো কর্ত্তব্য।

শিশুর মুখ

চিকিৎসকগণ বলেন যে অল্প বয়সে দাঁত পড়া বাল্যজীবনের একটী রোগ। শিশুদিগের জন্মের পূর্ব্বে দেহ পরিপোষণের অভাব গর্ভস্থ শিশুর অসুস্থতা। এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের এই রোগ থাকিলে শিশুদিগেরও এই রোগ হওয়া সম্ভব। ইহাতে শিশুকাল হইতেই এই রোগ থাকিলে শিশুকে অল্প বয়সে এবং অনেকবার দন্ত রোগ চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাওয়া উচিত।

অসুবিধা ভোগ করাইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা করা প্রয়োজন। যদি সকল দাঁত পড়া পর্য্যন্ত পিতামাতা অপেক্ষা করেন তাহাতে তাহার ব্যয়ও অধিক হইবে এবং শিশুর পক্ষেও তাহা ক্ষতিকর হইবে। সেইজন্য শিশুদিগের প্রথম দাঁত উঠার পর হইতে মধ্যে মধ্যে চিকিৎসকের উপদেশ লওয়া উচিত।

আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের কোনও কোনও প্রদেশে দাঁত দেখাইবার জন্য শিশুরা বিদ্যালয় হইতে ছুটি পায়।

সুস্থ থাকিতে হইলে মুখের রোগ নিবারণের পক্ষে যে রকম প্রয়োজন আর কোনও অঙ্গ সুস্থ রাখা তত প্রয়োজন নহে।

মুখের ভিতর দিয়াই বাতাস এবং খাবার প্রবেশ করে অতএব যদি মুখ অপরিষ্কার থাকে তাহা হইলে কোনও সময়ে নানা রোগের জীবাণুপুঞ্জ দেহে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব এই সকল জীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত উপযুক্ত শক্তি-মুখে থাকা প্রয়োজন। কারণ যদি এই জীবাণুপুঞ্জ কোন প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের মধ্যে আশ্রয় করে তাহা হইলে অতি সত্বর সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ দেহের জীবনীশক্তির অংশ সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে।

শিশুদিগের অভ্যাস

দৈনন্দিন কার্য্য সূচির মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক এই কয়েকটী অভ্যাসই যদি শিশুদিগের করান যায় তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী অন্য কোনও অভ্যাস ততটা সহায়তা করিবে না। নিউইয়র্ক সহরের স্বাস্থ্যবিভাগ কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটী নিয়ম শিশু-দিগের শিখাইবার জন্য স্থির করিয়াছেন।

শিশুদিগের নানা প্রকারের খাবার খাইতে অভ্যাস করান উচিত। এক প্রকার বা দুই প্রকার খাবার সর্ব্বদা খাওয়ান উচিত নহে। তাহাদের শারীরিক উন্নতিকর খাদ্য খাওয়ান উচিত। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। কিছুক্ষণ অন্তর তাহাদের অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া উচিত। প্রত্যহ স্নান করান উচিত। প্রত্যহ তিনবার করিয়া দাঁত মাজা এবং বিশেষতঃ রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া দাঁত মাজা কর্ত্তব্য। মুখ এবং হাত সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে এবং খাইবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া হাত ধুইবে। দশ হইতে নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগকে ভাল বাতাস চলে এইরূপ ঘরে প্রত্যহ ১১ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক শিশুকে মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম ও খেলায় যোগদান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিদিন বালকের নিয়মিত সময়ে কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

শিশুদিগের মেজাজ

সকল সময়েই শিশুদিগের রাগের কোনও না

কোনও কারণ থাকে। যদি শিশু অসুস্থ কিম্বা ক্লান্ত না হয় অথচ তাহার রাগ দেখা যায় কিম্বা রাগ যদি তাহার স্বভাব হয় তাহা হইলে ইহা তাহার উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর। নিজের ক্রোধ সংযম করিয়া তাহাকে আদর্শ দেখাইবে।

শিশুদিগের রাগ নিবারণ করিতে হইলে তাহাকে উচিতমত বিশ্রাম ও শান্তি উপভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে সে রাগের দ্বারা কিছু লাভ করে না। তাহার রাগ কোনও রকমে গ্রাহ্যের ভিতর না আনাই কর্ত্তব্য। এই উপায়ে শিশুর রাগ কমিতে পারে।

অধিক রাত্রি জাগরণ করা কিম্বা গোলমালের ভিতর লইয়া যাওয়া অনুচিত। কোনও রকমে উৎকোচ, ভর্ৎসনা বা ধমকানির দ্বারা ভয় দেখান উচিত নয়। বালকের সরল ভাব পরিবর্ত্তন করিও না। তাহার রাগ সম্বন্ধে আলোচনা না করাই কর্ত্তব্য। তাহার রাগের সময় কাহারও হাসা উচিত নয় তাহাতে সে ইহাকে মজা বলিয়া মনে করে। লোকে তাহার মেজাজ সম্বন্ধে যাহা বলে তাহাতে মনোযোগ দেওয়া বা চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। শিশুর ক্রোধ হইলে অন্য কোনও লোক যেন তাহাকে বিরক্ত করিয়া ক্রোধের উপশম করিতে চেষ্টা না পায়। যাহাতে সে রাগ করে ঐ রকম কোনও কাজ করা উচিত নয়, কিম্বা রাগের সময় সে যাহা চায় তাহা দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখিবেন যদি কোনও শিশু রাগ করিয়া কিছু লাভ করে তাহা হইলে সে রাগ করে। ক্রোধ সংযম মনুষ্যত্ব-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

শিশুগণের হিংসাবৃত্তি

হিংসাবৃত্তি শিশুরও ভয়ানক ক্ষতিকর। ইহা তাহাকে অসুখী করে, মনে নিরানন্দ ভাব আনে এবং সে কাহারও সহিত মিশিতে পারে না। যখন সে বড় হয় তখনও এই হিংসাবৃত্তিই তাহার সুখ ও উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হয়। শিশুর খেলানা ও স্বত্বকে অবহেলা করিও না।

তাহার জিনিষপত্র যাহাতে অপরের সহিত ভাগ করিয়া লইতে পারে এবং অপরের যে সকল জিনিষে দাবী আছে সে তাহাতে যেন অবহেলা না করে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কোনও শিশুকে ছাড়িয়া অপর কোনও শিশুকে অধিক আদর করা উচিত নয়। সকল শিশুর প্রতি সমান ভাবে ব্যবহার করিতে হয়। কোনও শিশুকে অপরের সহিত তুলনা করা উচিত নয়।

শিশু হিংসাবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই মনে রাখিবেন। কোনও শিশুই জন্মকাল হইতেই হিংসুক হয় না। ভাল শিক্ষা দিলে হিংসাবৃত্তি নিবারিত ও শোধিত হইতে পারে। ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি অপরের সহিত সুচারুরূপে কার্য্য করিতে বা খেলা করিতে পারে না। স্মরণ রাখবেন ঈর্ষ্যাপরতন্ত্রতা কু-অভ্যাস।

শিশুদিগের উপর পিতা মাতার ক্ষমতা

শিশুর উপর অপর কাহারও অপেক্ষা পিতামাতার প্রভাব অধিক। যখন হইতে কিছু কিছু শিক্ষা করে তখন হইতে তাহার পিতামাতা তাহার সহিত থাকেন। শিশুকে মিত্রতা শিখাইতে হইলে তাহাকে মানুষের মত দেখিতে হইবে। (যেমন যুবকদের অনুভব বৃত্তি থাকে শিশুদিগেরও আছে।) তাহার সহিত স্নেহপূর্ণ ও ভদ্র ব্যবহার করুন। কোনও সাংসারিক বিষয়ের

আলোচনা হইলে তাহাতে শিশুরা যাহা বলে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের মতামত অবহেলা করিবেন না।

নিজে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া দেখান যে সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত। শিশু যখন কোনও প্রশ্ন করে তখন তাহার মিথ্যা উত্তর দিয়া ভুলাইবেন না। কোনও কাজ করিতে হইলে তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে শিখান উচিত। সে যে কাজ করে তাহাতে প্রশংসা করা উচিত এবং চেষ্টা করিলেও প্রশংসা করুন। শিশুকে বকিবার পূর্ব্বে সে কি বলে এবং তাহার মনোভাব কিরূপ তাহা মনোযোগ দিয়া শুনুন।

তাহাকে সর্ব্বদাই ছোট ছেলের মত দেখিবেন না। ইহাতে আপনি হয়'ত সুখী হইতে পারেন কিন্তু শিশুর বুদ্ধির পক্ষে ইহা ক্ষতিকর। কোনও কিছু শিখাবার বয়স হয় নাই এমন মনে করবেন না! শিশু যত শীঘ্রই সকল বিষয় জ্ঞান লাভ করে, নিজের কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল, ততই জীবন যাত্রা তাহার পক্ষে সুগম হইবে।

শিশু যাহা কিছু চায় তাহাই দিয়া তাহাকে নষ্ট করিবেন না। জীবনে সে যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই পাইতে পারে না। এইকথা সে যত শীঘ্র বুঝিতে পারে ততই ভাল। ইহাতে তাহাকে হতাশ করিবে না।

শিশু-অবস্থায় যেরূপ শিক্ষা পায় বয়সকালে সেইরূপই তৈয়ারী হয়। আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন শিশুকে সেই প্রকারই তৈয়ারী করিতে পারিবেন। অতএব সে যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করুন। প্রত্যেক পিতামাতারই শিশুদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। তাহার সহিত খেলা করুন, গল্প করুন এবং লেখাপড়া করুন।

কলিকাতার লোক সংখ্যা

	১৯২১ সালে	১৯৩১ সালে	বেশী
পুরুষ	৭,২৪,২৪৮	৭,৮৭,৪০৩	৬৩,১৫৫
স্ত্রীলোক	৩,৫৩,০১৬	৩,৭৪,০০৭	২০,৯৯১
মোট—	১০,৭৭,২৬৪	১১,৬১,৪১০	৮৪,১৪৬

বর্ত্তমান আদম-শুমারীতে বাংলার জন-সংখ্যা

বিভিন্ন জেলার বিস্তৃত হিসাব

জেলার নাম	পুরুষ ১৯৩১	স্ত্রী ১৯৩১	মোট ১৯৩১	বাড়তি বা কমতি
ব্রিটিশ বাংলা	২৫,৯৭৯,৮৮৩	২৪,০২৭,৪৯৩	৫০,০০৭,৩৭৬	+৩,৩০৭,১৭৫
বর্দ্ধমান	৮১২,০৪১	৪৫৮,৬১৫	১,৫৭০,৬৫৬	+১৩৫,৮৮৫
বীরভূম	৪৭২,৬০৯	৪৭৪,৮১৬	৯৪৭,৪২০	+৯৫৭,০০০
বাঁকুড়া	৫৫৭,৪৬৩	৫৫৪,৮৭৪	১,১১২,৩৩৭	+৯২,৩৯৬
মেদিনীপুর	১,৪১৩,৭৩৩	১,৩৭৭,৫৮৬	২,৭৯১,৩১৯	+১২৪,৬৫৯
হুগলী	৫৮৮,৮২২	৫১৭,৯৮০	১,১০৬,৮০২	+২৬,৬৬০
হাবড়া	৬০০,১৬৭	৪৯৯,২১২	১,০৯৯,৩৭৯	+১০১,৯৭৯
২৪-পরগণা	১,৪৬৩,১৮০	১,২৪৫,৩২৯	২,৭০৮,৫০৯	+২৪৯,৭১৭
কলিকাতা	৭৮৭,৪০৩	৩৭৪,০০৭	১,১৬১,৪১০	+৮৪,১৪৬
নদীয়া	৭৮৮,৩০৪	৭৪১,৪৭২	১,৫২৯,৭৭৬	+৩৫,০৭৮
মুর্শিদাবাদ	৬৮৪,১৪৩	৬৮৬,৭১৫	১,৩৭০,৮৫৮	+১৪৭,২৫৭
যশোহর	৮৭০,০৯০	৭৯৯,৬৮৭	১,৬৭০,৫৭৭	—৫১,৬৪২
খুলনা	৮৪৯,২৬৪	৭৭২,৭১৫	১,৬২১,৯৭৯	+১৫৩,০০৯
রাজশাহী	৭৪১,২০৭	৬৮৭,৯২১	১,৪২৯,১২৮	—৬৮,২১০
দিনাজপুর	৯২২,৭৮০	৮৩১,৩৭২	১,৭৫৪,১৫২	+৪২,২৫৭
জলপাইগুড়ি	৫৩৪,৩৮৪	৪৪৯,২১০	৯৮৪,৫৯৪	+৪৭,৩২৫
দার্জ্জিলিং	১৬৮,৩৩৯	১৪৮,০০০	৩১৬,৩৩৯	+৩৩,৫৯১
রংপুর	১,৩৫৩,৫২৪	১,২৩৫,৮৯৩	২,৫৮৯,৪১৭	+৮৫,৯৯২
বগুড়া	৫৫৭,৩৫৬	৫২৯,১৩৭	১,০৮৬,৪৯৩	+৩৭,৪৫১
পাবনা	৭৪০,৭২৪	৭০৯,১১১	১,৪৪৯,৮৩৫	+৫৫,৩৭৮
মালদহ	৫২৭,৫৪৮	৫৩৫,৭৬১	১,০৬৩,৩১০	+৫২,৪২৭
ঢাকা	১,৭৪২,৯৩৪	১,৬৯০,১৬৯	৩,৪৩৩,১০৩	+২৭৫,৯৬৭
মৈমনসিং	২,৬৬২,৮২৫	২,৪৫২,১৮৩	৫,১১৫,০০৮	+২৭৮,৩৮৬
ফরিদপুর	১,২০৪,১৬৫	১,১৫১,৭৭৮	২,৩৫৫,৯৪৩	+১৩৬,৬৯৩
বাখরগঞ্জ	১,৪৯৬,২৪৩	১,৪২৪,৭১৬	২,৯২০,৯৫৯	+৩১৮,১৮০
ত্রিপুরা	১,৫৯৬,৬৮২	১,৫১২,৪৮৬	৩,১৮৯,১৬৮	+৩৬৪,৫১৮
নোয়াখালী	৮৫৭,৯৩২	৮৪৫,৭৫০	১,৭০৩,৬৮২	+২৩০,৮৯৬
চট্টগ্রাম	৮৭১,১০৩	৯২১,৯৮৯	১,৭৯৩,০৯২	+১৮১,৬৭০
চট্টগ্রামপার্ব্বত্য অঞ্চল	১১৪,১১৮	৯৯,০০৮	২১৩,১২৬	+৩৯,৮৮৩
দেশীয় রাজ্য	৫১৫,৪৯২	৪৫৬ ৭৯৯	৯৭২,২০১	+৭৫,৩৬৫
কুচবিহার	৩১২,৮১৯	২৭৭,২৫৩	৫৯০,০৭২	—২,৪১৭
ত্রিপুরা রাজ্য	২০২,৬৭৩	১৭৯,৫৪৬,	৩৮২,২১৯	+৭৭,৭৮২
দেশীয় রাজ্য সমেত বাংলা	২৬,৪৯৫,৩৭৫	২৪,৪৮৪,২৯২	৫০,৯৭৯ ৬৬৭	+৩,৩৮২,৫৪০

রক্তহীনতায় অব্যর্থ ঔষধ
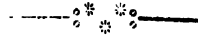
আজকাল আমাদের দেশে রক্তহীনতা রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই অধিকদিন যাবৎ ভুগিলে, রক্তহীনতা উপস্থিত হয়। সময় মত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে এই রক্তহীনতা হইতেই শেষ পর্য্যন্ত ক্ষয়জাতীয় রোগের আবির্ভাব হইয়া দেহকে অতি শীঘ্রই ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। আজকাল এই অবস্থা দূরীকরণার্থ বহুবিধ ঔষধ আবিষ্কৃত হইলেও "হিমোজেন" নামক একটি ঔষধ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য কতিপয় ঔষধ বিশেষরূপে কার্য্যকরী বলিয়া বহু চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সদ্য রক্ত হইতে এই 'হিমোজেন' বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারী করা হয় এবং তৎসহ 'ভাইটামিন' নামক একটি অতি উপাদেয়, পুষ্টিকর দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

'হিমোজেন উইথ্ নর্ম্ম্যাল সেরাম্'— পেটের অসুখের সঙ্গে রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে এবং উদরের যক্ষায় ইহা বিশেষরূপে কার্য্যকরী।

'হিমো—হাইপো—ফস্ফা-ইটস্ কোং'—ফুস্ফুসের যাবতীয় রোগের সহিত রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে ইহা অব্যর্থ সন্ধান।

'হিমো— সার্সোপ্যারিলা'— সিফিলিস্ বা উপদংশ রোগে রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে তাহার অন্যান্য চিকিৎসার সহিত এই ঔষধপ্রয়োগ ও বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

'হিমোজেন উইথ্ লিভার এক্সট্রাক্ট'—ভীষণ রক্তহীনতায় ইহাই একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

'হিমো—মল্ট'—রক্তহীনতার ফলে শিশু-দিগের দেহের পরিপুষ্টি প্রতিহত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

'ম্যারো—হিমোজেন'— যাবতীয় ক্ষয়রোগ, অপরিপুষ্টি ও গলগণ্ডরোগে এই ঔষধ অতুলনীয়।

'হিমো-লেসিথিন্ ফস্ফেট' স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, হিষ্টিরিয়া ও অবসাদ রক্তহীনতার ফলে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ।

'রেডিও হিমোজেন'—দুর্ব্বলতা, অপুষ্টি, রিকেটস্, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও ফুসফুসের রোগের সহিত রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ অতুলনীয়।

'কুইনো—হিমোজেন'— ম্যালেরিয়ায় বহুদিন যাবৎ ভুগিবার ফলে রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

—×—

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতার একটী কারণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবিমলচন্দ্র রায়

এখন এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিকার কি? প্রথমতঃ শৈশবকাল হইতেই যাহাতে শিশুরা সুস্থ সবল হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সে দিকে মাতাপিতার বিশেষ যত্ন লইতে হইবে; তারপর ছেলেমেয়েদের জ্ঞান হইলে স্বাস্থ্যের উপকারিতা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে নৈতিক চরিত্রও যাহাতে উত্তমরূপে বিকশিত হইয়া উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সে বিষয়েও শিক্ষা দিতে হইবে। নৈতিক চরিত্রের সহিত স্বাস্থ্যের নিকট-সম্বন্ধ। সন্তান অসৎ, উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহার স্বাস্থ্য সবল সুস্থ থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষায়, কর্ম্মে, জ্ঞানে সমস্ত দিকেই উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

আমাদের শিক্ষার পদ্ধতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, জীবন নষ্ট হইয়া মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারিতেছে না। এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে শিক্ষার ভিতর দিয়া ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন হয়, শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্মের ভাব যাহাতে আসে সেরূপ শিক্ষার আলোচনা হওয়ায় দরকার। ইহাতে দেহের এবং মনের বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। ছেলেমেয়েরা যাহাতে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে দরকার। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা লম্বা ডিগ্রী লইয়াই ছেলেমেয়েরা বাহির হয় না, তাহারা নিজের নিজের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় শিখিয়া পাঠ সমাপ্ত করে। সে সমস্ত দেশগুলিতে শিক্ষার পদ্ধতিই ঐরূপ। সেই জন্য যদিও ঐ সমস্ত দেশে শতকরা ৯৭।৯৮ জন শিক্ষিত তথাপি বেকার সমস্যা আমাদের ন্যায় এত অধিক নয়। আমাদের দেশে শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ৮.৯ জন তথাপি আজ বেকার সমস্যা প্রবল। প্রতি বৎসর যে ক'জন ছাত্র রবিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতেছে তাহাদের আর এখন চাকুরী জুটিতেছে না। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার পন্থা তাহারা শিক্ষা পায় না কেরাণীগিরি করা ছাড়া যে তাহাদের আর গতি নাই। এই বেকার সমস্যার জন্য আজ বহু লোক অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে।

আজকাল মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ঠ হইতেছে ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এ শিক্ষা পদ্ধতিতে মেয়েদের স্বাস্থ্যের আরও অধিক ক্ষতি হইতেছে। পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক

শক্তি হীন সুতরাং যে শিক্ষা পদ্ধতি পুরুষেরই দৈহিক তথা মানসিক অবনতি ঘটাইতেছে তাহা যে মেয়েদের পক্ষেও কুফল ঘটাইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। দেশের প্রত্যেক লোকের চেষ্টা ব্যতীত ইহার প্রতীকার নাই। আমাদের দেশকাল অনুযায়ী শিক্ষা পাওয়াই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের জন্য শুধু কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক মুখস্থ করাইয়া পৃষ্ঠে বড় বড় ডিগ্রী খেতাব লাগাইয়া স্বাস্থ্য জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ছাড়িয়া দিতেছে। ফলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বড় বড় ডিগ্রী খেতাবরূপ বেড়ী পরিয়া চরিয়া খাইতে পারিতেছে না; শুধু ডিগ্রী, খেতাবের ভার বহন করিয়া মরিতেছে। এই বেকার সমস্যার দিনে আমাদে প্রত্যেকেরই স্বাধীন-ভাবে যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার বহুল প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে আমরা ঠেকিয়াও শিখি না, চেষ্টা করি না, পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি।

শুধু কাগজ কলমে লিখিলে বা সভা সমিতি করিয়া বর্ত্তৃতা দিলেই ত আর কাজ হয় না! প্রত্যেকেরই চিন্তা করা ভাবা উচিত এবং সেই সঙ্গে কাজ করা উচিত। এক্ষণে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যখন দিতে হইতেছে তখন সেই সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিব।

ছেলেমেয়েরা অন্ততঃ পক্ষে একবেলা যে কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম যাহাতে করিতে পারে, সে বিষয়ে মাতাপিতা বা অভিভাবকদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহাদের পক্ষে প্রত্যুষে এবং বৈকালে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করাই শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। শুধু ছেলেদের পক্ষেই এ নিয়মটী ধরাবাঁধা করিলে চলিবে না, মেয়েরাও যাহাতে নানা প্রকার ক্রীড়া বা শারীরিক উন্নতির জন্য কোন বিশেষ ব্যায়াম করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেকে মেয়েদের জন্য শারীরিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহাদের মত—মেয়েরা আজীবন গৃহের কোণে অবরুদ্ধা থাকিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় পারিবারিক সুখশান্তি আনায়ন করিবেন, তাহাদের পক্ষে শারীরিক বলের চর্চ্চা করিয়া দস্যি সাজা কোন প্রয়োজন নাই বরং ইহাতে তাঁহাদের প্রাণ হইতে স্নেহ, মমতা চলিয়া যায়। এ সুযুক্তি (?) খণ্ডন করিবার সাধ আমার নাই। দেহচর্চ্চা করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলে রোগ ব্যাধির হস্ত হইতে নিজেকে নিরাময় করিবার শক্তি উপার্জ্জন করিলে, নিজেকে সদা সুখী ও উন্নতির পন্থা আয়ত্তে আনিলে যে মানুষের প্রাণে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা চলিয়া যাইবে বা 'ভাগবৎ অশুদ্ধ' হইবে এমন কোন কারণ দেখি না। পরন্তু আজকালকার স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে মেয়েদের শারীরিক বলের খুবই প্রয়োজন। অনেকে আবার স্ত্রী স্বাধীনতার নাম করিতেই ফোঁস্ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবেন। যাক্ সে পথে এখন আর যাইব না। পারিবারিক সুখ শান্তির কথা ধরিলেও মেয়েদের স্বাস্থ্য চর্চ্চার খুবই প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বার মাসে তের প্রকারের রোগ ভোগ আমাদের সংসারে নিত্য সহচর এবং মেয়েদের মধ্যেই সাধারণতঃ রোগ ভোগ অধিক। এজন্য দেহটাকে সবল সুস্থ করিয়া রোগের আকর হইতে না দেওয়া পারিবারিক শান্তির যে কতদূর

সহায়ক তা' আমাদের দেশের শতকরা একশত জন ভুক্তভোগীই জানেন। জাতির দিক দিয়া দেখিলে যে কেহই দেখিতে পাইবেন যে মা যদি রুগ্না হন, অম্বলের ব্যারামে ভোগেন তাঁর গর্ভজাত সন্তান কখনই সুস্থ, সবল হইয়া জন্মে না বা জন্মিয়াও ডিস্‌পেপ্‌সিয়াকে ডাক্তার বণ্টন করিয়া খাইয়াও ছাড়াইতে সক্ষম হয় না। এইরূপ সন্তান লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্মিয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেছে না কোন দিন করিবে? আজ যাহারা মেয়ে কাল তাহারা সন্তানের জননী হইবে। এজন্য আজ হইতেই তাহাদের শরীর এমন উপাদানে, এমন ভাবে তৈরী করিতে হইবে যাহাতে কাল তাহারা সুস্থ, সবল সন্তান সন্ততীর জন্ম দিয়া সমাজের, দেশের, জাতীর উন্নতির সাহায্য করিতে পারে। জাতির বল ভরসা দেশের মেরুদণ্ড কাহারা ?

যাক্, এখন আমার নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বলি। শারীরিক পরিশ্রমের সহিত তাহাদের যথাসাধ্য পুষ্টিকর আহার্য্য দিতে হইবে। আমাদের দেশে সকলের সংসারের অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে ছেলেমেয়েদের নিয়মিত পুষ্টিকর আহার্য্য জোগাইতে পারেন; ইহা খুবই সত্য কিন্তু পুষ্টিকর আহার্য্য যে সমস্তই মূল্যবান ইহারও কোন কারণ নাই। একটু বিবেচনা করিয়া চলিলেই হয়। আজকাল সহর, বাজার. পল্লীগ্রামে সমস্ত স্থানেই চায়ের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তৎ সহিত বিস্কুট সহচরও বিদ্যমান। প্রাতঃকালে শয্যার মধ্যেই এক পেয়ালা চা এবং দুখানি বিস্কুট ছেলেমেয়েদের সম্মুখে না ধরিয়া দিয়া কিছুক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য করাইয়া পরে ১৫।২০টী ভিজান অঙ্কুর-যুক্ত ছোলা আদার বা ইক্ষুগুড়ের সহিত খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে ব্যয় কম অথচ আহার্য্যও পুষ্টিকর। নানা প্রকার ফলমূল যাহাতে তাহারা খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লী-গ্রামে আম, জাম, কাঁটাল, পেঁপে, খেজুর, পেয়ারা আনরস, খরমুজ, বেল, কুল, নেবু, নারিকেল, কলা প্রভৃতি সময়োপযোগী ফল মুল অনায়াসসাধ্য এবং ইহার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না। এ সমস্ত ফলমুল ছেলেমেয়েদের অধিক খাইতে দেওয়া উচিত। পল্লীগ্রামে অনেক গৃহস্থ ঘরেই বৈকালে ছেলেমেয়েদের মুড়ি নারিকেল, দুধ চিড়া কলা প্রভৃতি খাইতে দিতে দেখা যায়, ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা। সহর বাজারে দেখিতে পাই বৈকালেও ছেলেমেয়েদের চা পান করিতে দেওয়া হয় এবং তৎসহিত একটু পাউরুটার টুক্‌রা বা দু'চারখানা বিস্কুট দেওয়া হয়। অনেক গৃহে দু'খানা ফুল্‌কা লুচির ব্যবস্থা জল খাবারের জন্য করা হয়। তাহাও পরিষ্কার সাদা বিদেশী চিনির সাহায্যে। বলা বাহুল্য ইহা অপেক্ষা পল্লীগ্রামের ব্যবস্থা সহস্র-গুণে ভাল। "বাঙ্গালীর বিস্কুট মুড়ী" ভেজাল বর্জ্জিত একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য ইহা অনেক বিজ্ঞগণই পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তারপর নারিকেল একটা উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। অনেকে ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখ করিবে এই ভয়ে নারিকেল, পেয়ারা, কলা প্রভৃতি জিনিষ খাইতে নিষেধ করেন কিন্তু ইহা অন্যায়। ছোটবেলা হইতেই এ সমস্ত জিনিষ তাহাদের আহারের অভ্যাস করান ভাল, অতিরিক্ত খাইয়া না ফেলে ইহাই দেখা প্রয়োজন। আহারের অভ্যাসের উপর গুরুপাক জিনিষ হজম করিবার শক্তি অনেকটা নির্ভর করে।

নারিকেল, পেয়ারা, কুল, কাঁটাল প্রভৃতি জিনিষ ফল মূল যদিও গুরুপাক কিন্তু খুবই পুষ্টিকর খাদ্য এবং এই সমস্ত ফল ছেলেমেয়েদের নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা করিলে তাহাদের অসুখ ত' করিবেই না পরন্তু তাহাদের স্বাস্থ্যের বহুল উন্নতি হইবে। আজকাল বিদেশী সাহেবী রংধারী চিনি দেশে সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বা আর্থিক হিসাবে দেখিতে গেলে এই চিনি আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই চিনি দেহের কোন উপকারেই আসে না, পুষ্টিকর জিনিষ ইহার মধ্যে কিছুই থাকে না। অন্যদিকে দেশে এই চিনির আমদানী হইয়া প্রতি বৎসরে কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে এবং দেশের লাল পুষ্টিকর চিনির আবাদকে একেবারে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে। আর দশ বৎসরের মধ্যে মনে হয় দেশ হইতে ইক্ষুগুড়ের চাষ একেবারে উঠিয়া যাইবে।

যাক্, দরিদ্রতার দোহাই দিয়া ছেলেমেয়েদের জন্য যথাসাধ্য পুষ্টিকর আহার্য্য না জোগান কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া কি করিয়া ছেলেমেয়েদের জন্য যথাসাধ্য পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় কয়েকটী কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। এ স্থলে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অবশ্য ইহার মধ্যে আমার খুব বেশী কিছু স্বার্থ নাই। প্রতি গৃহেই দেখিতে পাই রোহিত মৎস্য গৃহে আসিলে মুড়াটী যায় কর্ত্তার থালায়, ভাল দুধটুকু ভাল আমটী, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর আহার্য্যটীর অধিক অংশটুকু, অল্প হইলে প্রায় সমস্ত অংশটুকু গৃহকর্ত্তার থালাতে যায় বাকি অংশ লইয়া ছেলেমেয়েরা মারামারি করে, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বা গৃহের যাহারা বধূ তাহাদের ঘ্রাণের দ্বারাই অর্দ্ধ পরিমিত আহার সারিতে হয়। আমার মতে প্রত্যেকটী উৎকৃষ্ট আহার্য্যের অধিক অংশটুকু কর্ত্তার থালায় না দিয়া ছেলেমেয়েদের পাতায় দেওয়া উচিত। তাহাদেরই এখন উৎকৃষ্ট আহার্য্যের প্রায়োজন, তাহাদের এখন দেহের বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশের সময়। উৎকৃষ্ট আহারই হইতেছে তাহার প্রধান উপাদান। যাক্, এ সমস্ত লিখিয়া আর পাঠক-পাঠিকাদের বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে আমার বড় বেশী কিছু লাভ নেই তবে এটুকু পড়িয়া যদি নিজের বাড়ীর কর্ত্রীদের একটু নজর এ-দিকে হয় এই ভরসায়ও যে লিখি নাই এমন মিথ্যাও বলিতে বাধ বাধ ঠেকিতেছে।

আর দু'একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রত্যেক অভিভাবকদেরই উচিত শিশুকাল হইতেই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উপদেশ, উৎসাহ দেওয়া, কেন না, ছোটবেলা হইতে স্বাস্থ্য জিনিষটাকে যত্নের অভাবে কুশিক্ষায় নষ্ট করিয়া দিলে সে স্বাস্থ্য যুবা সময়ে পূর্ণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, ফলে স্বাস্থ্য এবং তৎসহিত মনটীও আজীবন নষ্ট হইয়া যায়। বয়স্ক হইয়া ঠেকিয়া যখন মানুষ স্বাস্থ্যের উপকারিতা বুঝিতে পারে তখন অনেকেরই আর তাহা পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হয় না। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে খোলা আলো এবং মুক্ত বায়ুই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহ মন, প্রাণ, স্বাস্থ্য। আহার্য্য অপেক্ষাও এই দুইটী জিনিষ শুধু মানব নয়, পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুর অধিক প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। আজকাল অনেক অভিভাবকেরা বলেন, "আজকালকার ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকালে আতঙ্কে প্রাণ শিউরে উঠে

না আছে মুখে লাবণ্য, চোখে জ্যোতিঃ, দেহে শক্তি, বুকে বল। আমরা যখন এদের বয়সী ছিলাম, তখন কি যে উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, বল ছিল আমাদের প্রাণে! এরা যেন সব প্রাণহীন।" আজকালকার অভিভাবকদের একদিন ঐরূপ অবস্থা ছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিতে না পারিলেও একদিন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শৌর্য্যে, বীর্য্যে খুবই উন্নত ছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাহা আমরা দরিদ্রতা এবং কুশিক্ষার জন্য হারাইয়াছি। জাতি হিসাবে আমাদের উন্নত হইতে হইলে যাহারা এখন জাতীর মেরুদণ্ড তাহাদের প্রতি যথাসাধ্য যত্ন লইতে হইবে। প্রত্যেক মাতাপিতা বা অভিভাবকগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন আশা করি।

প্রবন্ধের আকার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করা আর উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

জল খাওয়া

অনেক ব্যক্তি অধিক পরিমাণ জল খাইতে নিষেধ করেন। কেহ কেহ ভাত খাওয়ার সহিত জল খাওয়া একেবারে নিষেধ করেন, এবং ভাত খাওয়ার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে জল খাইতে বলেন। তাঁহাদের মতে জলের মিশ্রণে পাকরস নষ্ট হওয়ায় বা কম পড়ায় ভুক্ত দ্রব্যের হজমে ব্যাঘাত ও বিলম্ব হয়।

এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন, অধিক জল সেবন করিলে পাকরসের শক্তি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কম না হইয়া জল সেবনের জন্য বরং বৃদ্ধি পায় এবং সেজন্য হজম ভাল ও শীঘ্র হয়। স্বাস্থ্যের জন্য জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"অজীর্ণে ভেষজ বারি, জীর্ণে বারি বলপ্রদ।"

ইহার জন্যই শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায় এবং শরীরে উত্তাপ আপনা হইতেই কম বা বেশী হয়। শীতল বা গরম জল সেবনের অব্যবহিত পরেই ঐ জল গাত্রের চর্ম্মের নীচে উপস্থিত হয় এবং লোমকূপ হইতে উহা বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া শরীর শীতল করে; জল রক্তের সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া উহা হজমের সাহায্য করে এবং দূষিত পদার্থ সকলের সহিত মিশিয়া শরীর হইতে ঐ দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিতে সাহায্য করে। গাত্রের চামড়া দ্বারা জল শোষিত হয় না বলিলেই হয়।

গঙ্গাজলের বিশেষত্ব

বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌দিগের নূতন সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল জীবাণু দৃষ্ট হয় না তাহারা ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু আছে তাহারা বহু অপকারী জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে। তাহাদিগকে ব্যাক্‌ট্রোফাজ বলে ব্যাক্‌ট্রোফাজ কলেরা আমাশায় এবং অতিসারে জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে। সেগুলিকে দেখিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহাদিগকে দেখা যায় নাই গঙ্গা-জলে এই ব্যাক্‌ট্রোফাজ পাওয়া যায়। ইহা চক্ষে দেখা না গেলেও গঙ্গাজল ব্যবহারে ঐ সকল জীবাণুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা গিয়াছে স্কুল অব্ ট্রপিকাল মেডিসিনের গবেষণাগারে গঙ্গাজলে আরও ব্যাক্‌ট্রোফাজ মিশাইয়া উহাকে উপরিক্ত রোগগুলির অব্যর্থ ঔষধরূপে ব্যবহারোপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইতেছে অতঃপর পরিষ্কার থিতানো গঙ্গাজল, হয় ত বৈজ্ঞানিকদিগের ফতোয়ায়, ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে সাদরে আসন পাইবে। হিন্দুগণ আবহমান কাল অতিশয় তৃপ্তির সহিত ইহা পান করিয়া আসিতেছেন। গঙ্গাকে সুরধনী জ্ঞানে তাঁহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

মৎস্য ভোজন

মৎস্য ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে প্রোটীনের ভাগ খুব বেশী, এবং এই প্রোটীনই দেহ গঠনে বিশেষ সাহায্য করে।

মাংসের তুলনায় মৎস্য সহজ পাচ্য। ইহাতে খরচ অনেক সময় একটু বেশী পড়িলেও ইহা পুষ্টিকর। মৎস্যের মধ্যে যাহাদের দেহ চর্ম্ম পাতলা তাহারা স্থূলচর্ম্ম-বিশিষ্ট মৎস্য অপেক্ষা অধিক সুপাচ্য। যে সকল মৎস্যে আঁশ ক্ষুদ্র তাহারা ডিস্‌পেপসিয়া রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। মৎস্যের মাংস শক্ত ও মোটা হইলে উহা সহজপাচ্য হয় না। লবণাক্ত শুষ্ক মৎস্য পাকস্থলীর পক্ষে তেমন উপকারী নহে, কারণ উহার মাংস শক্ত হইয়া যায় এবং সহজে পচনশীল রহে না।

চিংড়ি ও কর্কটের মাংস একটু বেশী দুষ্পাচ্য। ইহাকে সহজপাচ্য করিতে হইলে উহার সহিত ভিনিগার মিশাইয়া লইতে হয়।

মৎস্য ক্রয় করিবার সময় যাহাতে উহা যতদূর সম্ভব টাটকা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে মৎস্য পচিতে আরম্ভ করে তাহা পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন জন্মায়। মাছের গা টিপিয়া উহা টাটকা কি না ধরা যায়। টাটকা মাছ অল্প শক্ত হয় এবং টিপিলেই অনতি বিলম্বে পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হয়। পচা মাছের রীতি ইহার বিপরীত। মাছের চোখ-টাটকা অবস্থায় বেশ উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু পচিতে আরম্ভ করিলে উহা নিষ্প্রভ হয় এবং কাণও বিবর্ণ হইয়া থাকে।

খাদ্যের পরিমাণ

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এক মণ হইতে দেড় মণ ওজনের সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ দৈনিক খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—

প্রাতঃকালে—

অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ কিঞ্চিৎ আদা সহ /০ এক ছটাক, এবং কিঞ্চিৎ গুড় বা বাতাসা।

মধ্যাহ্নে—

চাউল—৵০ আধ পোয়া।

ডাল—/০ এক ছটাক।

মৎস্য—/০ এক ছটাক।

দুধ—/০ এক ছটাক।

আলু—/১০ দেড় ছটাক।

অন্য সব্জী—৵০ আধ পোয়া।

ঘৃত—।০ সিকি ছটাক।

তৈল—।০ সিকি ছটাক।

বৈকালে—(জলখাবার)—

সন্দেশ বা অন্য মিষ্টান্ন—২টা (/০ এক ছটাক)। কোন দিন মোহনভোগ বা লুচি, সিঙ্গাড়া, কচুরি প্রভৃতি মোট /০ এক ছটাক। গরম দুধ /০ এক ছটাক। সময়ের কিছু ফল।

রাত্রিতে—

আটা—৵১০ আড়াই ছটাক।

ডাল—/০ এক ছটাক।

মৎস্য—/০ এক ছটাক।

দুধ—/।০ এক পোয়া।

আলু—/১০ দেড় ছটাক।

অন্য সব্জী—৵০ আধ পোয়া।

ঘৃত—।০ সিকি ছটাক।

তৈল—।০ সিকি ছটাক।

ছোলা বা মুগ এক বেলা জলে ভিজাইয়া তাহার পর একখানি ভিজা কাপড়ের উপর ছড়াইয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

লবণ ও মসলা তরকারীতে অধিক দেওয়া এবং তরকারী অধিক সিদ্ধ করা অপকারী। লবণ ও মশলা রুচি হিসাবে অল্প করিয়া আহার করিতে হইবে। তরকারীতে অনেকে গুড় মিশ্রিত করেন, তাহা দোষাবহ।

যাঁহারা নিরামিষাহারী, তাঁহারা মৎস্যের পরিবর্ত্তে মৎস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছানা খাইবেন।

কাজের কথা

কয়েকটি কাজের জিনিস তৈরী করবার প্রণালী

THEATRICAL COLD CREAM.

White wax	100 grammes
Ceresin	100 grammes
Liquid paraffin	400 grammes
Sodium borate	8 grammes
Distilled water	173 mils.

Perfume, a sufficient quantity.

মোম ও Ceresin মিশিয়ে তার সঙ্গে তরল প্রেট্রোল দাও। যতক্ষণ না ভালরূপে মিশে ততক্ষণ ফুটাও। জলে sodium borate গুলিয়া উত্তাপ দাও যাহাতে তেল ও জলের উত্তাপ সমান হয়। তখন জল ও তেল মিশিয়ে নাড় যতক্ষণ না জমিয়া যায়।

HONEY AND TOLU COUGH SYRUP.

Tincture of Tolu	4 drs.
Tincture of Opium camphorated	2 ozs.
Syrup of Squill	2 ozs.
Honey, enough to make ...	1 pint.

Dose: One teaspoonful.

WHITE PINE EXPECTORANT.

Fluid extract of white pine bark	1 oz.
Fluid extract wild cherry ...	1 oz.
Tr. Camphor Co.	2 ozs.
Chloroform	2 drams
Syrup of Tolu	8 ozs.
Glycerin enough to make ...	1 pint

মিশাও। শিশি নাড়। তারপর ১ টেবিল চামচ জলের সঙ্গে তার অর্দ্ধেক সিরাপ দিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন কর।

MUSTARD LINIMENT.

Oil of mustard	2 drs.
Chloroform	2 drs.
Spirit of turpentine	2 drs.
Alcohol	1 pint

মিশাও।

ANODYNE LINIMENT

Tincture of belladonna ...	1 ozs.
Tincture of aconite	4 ozs.
Spirit of camphor	8 ozs.

মিশাও।

COLD IN THE HEAD. (মাথার সর্দ্দি)

Menthol	3 grains
Powdered boracic acid ...	1 dr.
Bismuth subnitrate ...	$1\frac{1}{2}$ drs.
Powdered benzoin	$1\frac{1}{2}$ drs.

মিশাও। বেশ খানিকটা নিয়ে দিনে ৫।৬ বার নস্যের মতো সেবন কর।

CARBOLIC HEALING SALVE.

Carbolic acid	2 drs.
Lanolin	1 oz.
Resin cerate	4 ozs.

একসঙ্গে গলিয়ে নাড় যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হয়। পুরানো ঘায়ের অব্যর্থ মালিশ।

COLD CREAM.

Lanolin	8 ozs.
Vaseline	2 ozs.
Rose water	4 ozs.
Vanillin	3 grs.
Otto of Rose	2 drops

গরম না করিয়া খলে মিশাও।

LIP SALVE

Oil of almond, sweet ... ... 8 ozs.
White wax ... ... 1 oz.
Potassium chlorate, powdered 2 drs,
Carmine ... ... 2 grs.

সামান্য গরম করিয়া মিশাও। নাড়িতে নাড়িতে ঠাণ্ডা কর। একটু গন্ধ দাও।

SPRAY FOR CATARRH

Thymol ... ... 10 grs.
Eucalyptol ... ... 10 drops
White Oil ... ... 4 ozs.

একসঙ্গে মিশাও। (ক্রমশঃ)

বিবিধ

গভর্ণরের দান

উত্তর বঙ্গের আর্থিক দুরবস্থায় প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য রাজসাহী বিভাগের কমিশনার, রঙ্গপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। জেলা বোর্ড এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্যদানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

দুর্দ্দাশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য গভর্ণর স্বয়ং ৮০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

ডাক্তার রমণের সংবর্দ্ধনা

গত ২৬শে জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতা টাউন হলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণকে ও ৩০শে জুন ডাঃ আনসারিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

স্বগৃহ প্রবেশ

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে ৩২নং অপার সার্কুলার রোডে "লিবার্টি" "বঙ্গবাণী" ও "নবশক্তি"র নূতন ভবন "লিবার্টি হাউসের" দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। ভারতবিখ্যাত নেতা ডাঃ আনসারি এই নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নূতন গৃহে সহযোগীগণের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হউক এবং তাঁহারা অকপটভাবে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করুন ইহাই ভগবানের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা।

গিরিশৃঙ্গে অভিযান

বৃটিশ সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ২৪,৪৪৭ ফিট। উহা যুক্ত-প্রদেশের গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত। সম্প্রতি ৬ জন

যুবক ঐ শৃঙ্গের উচ্চতম স্থানে আরোহণে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই বয়স ৩৩ বৎসরের কম। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পর ৯ দল লোক ঐ শৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। এবারের অভিযানকারীরা সকলেই ইংরাজ—তাঁহাদের দলের নেতার নাম এফ, এস, স্মাইথ।

পতির পীড়ায় আত্মহত্যা

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কাদাইএর শ্রীযুত কমলা কান্ত ভট্টাচার্য্য যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তাঁহার পত্নী কেরোসিনে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

স্যার গজনভীর প্রত্যাগমন

বাঙ্গালার শাসন পারিষদের সদস্য এ, কে, গজনভী ৩০শে জুন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রিন্স আকরাম হোসেনের নিকট নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯২৯—৩০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে ৬২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থকষ্ট হ্রাস

প্রেসিডেণ্ট হুভার এক বৎসরের জন্য ঋণ শোধের কিস্তি রেহাই দানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইয়াছেন, ইহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান বৎসরে ২৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং আগামী বৎসরে ৫৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ঋণ শোধ বাবদ দিতে হবে না।

বানর নির্ব্বাসন

দিল্লী সহর হইতে বানর নির্ব্বাসনের জন্য মিউনিসিপাল কর্ত্তারা ৬ হাজার টাকায় সম্প্রতি একজনকে কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন।

বাঙ্গালা ও বেহার হাইকোর্টের প্রধান জজ

বাঙ্গলার হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস ১৫ই আগষ্ট হইতে ছুটি লইবেন এবং সার চারুচন্দ্র ঘোষ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

পাটনা হাইকোর্টে চিফ জষ্টিস বিদায় লইবেন এবং সার জওলাপ্রসাদ তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

ভারত সমস্যায় লর্ড আরউইন

রক্ষণশীল দলের ভারত সম্পর্কিত কমিটীর সভায় লর্ড আরউইন তাঁহার বক্তৃতায় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রেষ্টিজ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় জাতিকে এখন আর ভারতবাসীরা শ্রদ্ধা করে না। আরউইন ইহার ৩টী কারণ দিয়াছেন। যথা—

১। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয়। ২। ইউরোপীয় মহাসমরে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ। ৩। সিনেমা গৃহে বৃটীশের কার্য্যকলাপ প্রচার।

সম্মানকর উপাধি লাভ

লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার জে, এন, রায় ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্পর্কে যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন তজ্জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার নগরীর ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা তাঁহাকে ডি, এস্‌সি উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ের এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সুরাবর্জ্জনে মহাত্মা গান্ধী

"আমি যদি এক ঘণ্টার জন্যও সমগ্র ভারতের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইতাম, তবে কোন প্রকার ক্ষতি পূরণ না দিয়া সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করিয়া দিতাম, গুজরাটে যত তাড়ির গাছ আছে, সব কাটিয়া ফেলিতাম, শ্রমিকদিগের জন্য মনুষ্যোচিত ব্যবস্থা করিতে কারখানাওয়ালাদিগকে বাধ্য করিতাম, শ্রমিকরা যেখানে নির্দ্দোষ পানীয় এবং আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এরূপ খাদ্য ভাণ্ডার ও বিশ্রামাগার খুলিতে বাধ্য করিতাম। কারখানাওয়ালারা যদি বলিত যে, অর্থাভাবে তাহারা তাহা করিতে অসমর্থ তবে আমি কারখানা বন্ধ করিয়া দিতাম।

ময়লা হইতে সার উৎপাদন

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সমিতির বঙ্গীয় শাখা সমিতির এক সভায় সম্প্রতি মিঃ, জি, ব্রানসবি উইলিয়ামস্ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতের বড় বড় সহরের পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে যে ময়লা জন্মে তাহা একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুড়াইয়া ও শুকাইয়া সার উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই সার প্রতি টন ১৫৲ দরে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। আজকাল পয়ঃপ্রণালীর ময়লা কোন কাজে লাগান হয় না; হয়ত ইহা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যেই জমিয়া থাকে এবং তাহাতে জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। ইহা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইলে একদিকে সহরের নর্দ্দামাগুলি পরিষ্কার থাকিবে এবং অপরদিকে সার উৎপাদনের ব্যবস্থা দ্বারা অর্থাগমও হইবে।

কয়লা হইতে খাদ্য উৎপাদন

এলবুমেন খাদ্য সামগ্রীর একপ্রকার সার বস্তু। বহু বৎসরের গবেষণার ফলে কয়লা হইতে এক প্রকার কৃত্রিম এলবুমেন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিক এলবুমেন হইতে দামে খুব সস্তা হইবে। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক ক্লাউড সম্প্রতি এক বক্তৃতায় উপরোক্ত গবেষণার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

সাত দিনে পৃথিবী ভ্রমণ

আমেরিকার অধিবাসী প্রসিদ্ধ মিঃ উইলি পোষ্ট এবং মিঃ হেরল্ড গেটি বিমানপোতে চড়িয়া মস্কো পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন। ইঁহারা সাত দিনে পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিমানযাত্রা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত "গ্রেফ জেপেলিন" ২০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছিল। ইঁহারা "গ্রেফ জেপেলিন"কে পরাস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তৈল হইতে রবার উৎপাদন

রুশিয়ার কোন কোন বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় তৈল হইতে এক প্রকার রবার উৎপন্ন হইয়াছে। রাষ্ট্রের গোপন কথা বলিয়া তৈল হইতে রবার প্রস্তুতের প্রণালী প্রকাশ করা হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, এই প্রণালীতে উৎপন্ন এক টন রবার রেড ট্রায়েঙ্গল রবারের কারখানায় পাঠান হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা বিভিন্ন রবারের জিনিষ প্রস্তুত হয় কিনা তাহার পরীক্ষা হইতেছে।

কংগ্রেসের নামে মিথ্যা চাঁদা আদায়

তারকেশ্বর প্রজা-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন পাল জানাইতেছেন, তারকেশ্বর কংগ্রেস কমিটীর নাম দিয়া কয়েকটী যুবক ও বালক ট্রেনে চাঁদা আদায় করিয়া থাকে। আমি তারকেশ্বরে তদন্ত করিয়া অবগত হইলাম, তারকেশ্বরে কংগ্রেস কমিটীর চাঁদা আদায়ের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। ট্রেণের আরোহীগণ ও অন্যান্য সকলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। শুনিলাম ঐ সমস্ত চাঁদা-আদায়কারী যুবক সাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। তারকেশ্বরে এজন্য খুব গোলযোগ চলিতেছে।

কেবল তারকেশ্বর বলিয়া নহে, ট্রামে, বাসে. রেলে, পথে (সময়ে সময়ে পথে দল বাঁধিয়া গান করিয়া) বিবিধ অনুষ্ঠানের নামে এইরূপ বহু জুয়াচোরের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা ভদ্র-লোকগণকে ঠকায়।

স্মৃতি পূজা

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গত ২৯শে জুন কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে সার সি, ভি, রমনের সভাপতিত্বে এক সভায় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতিপূজা করা হইয়াছে।

হিক্স্ থার্ম্মোমিটার

হিক্স্ ক্লিনিকাল থার্ম্মোমিটার প্রস্তুতকারক লণ্ডনের জেমস্ জে, হিক্সের বিজ্ঞাপন স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান সংখ্যায় ৷/০ পৃষ্ঠায় বাহির হইয়াছে। ইহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাতা।

ইঁহাদের বিরাট প্রতিষ্ঠান ইঁহাদের সততার উপর নির্ম্মিত। প্রত্যেক থার্ম্মোমিটার—বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ইঁহাদের কারখানা হইতে বাহির হয়।

Messrs. Allen & Hanburys Ltd. (A.H.P. Jennings, Special Representative) Block C. 3. Clive Building, Calcutta.—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই মূল্য তালিকা পাইবেন।

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি
(সত্ত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

সম্পাদক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক— শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ., বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতু উদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া দুরারোগ্য প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ
ইউক্যালিপটীন
ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরতরু"
শিশি ১।৵ মাঃ ।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্রাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

সূচী

নবম বর্ষ] ভাদ্র ১৩৩৮। [?ম সংখ্যা

মস্তিষ্ক ও তাহার কার্য্যাবলী

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ L. M. S.

ডাঃ টমসন্ বহুপূর্ব্বে উইণ্ডসর ম্যাগাজিন পত্রে “দেহ ও মস্তিষ্ক” নামে একটি প্রবন্ধে বলেন যে বহুদিন ধরিয়া লোকের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোনই ধারণা ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে মস্তিষ্ক-বাচক বা তদর্থসম্বন্ধীয় কোন শব্দ পাওয়া যায় না। এরিষ্টট্‌ল (Aristotle) মস্তিষ্কের উল্লেখ করিয়াছেন ; তাঁহার মতে মস্তিষ্কের কায শরীরের গরম রক্তকে ঠাণ্ডা করিয়া হৃৎপিণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের যে সকল কায তাহা আমরা কতকটা স্পষ্ট দেখিতে পাই, কিন্তু মস্তিষ্ক এত নীরবে কাজ করিয়া থাকে ও তাহা এত অনুমান সাপেক্ষ, যে এখন পর্য্যন্ত ইহার সকল ক্রিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় নাই। মনীষি গ্যালেন (Galen) ১৬০ খৃঃ অব্দে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে মস্তিষ্ক চিন্ময় আত্মার (Conscious mind) আধার মাত্র। ইহার পর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বহুদিন আর কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ডাঃ টম্‌সন্ যে বৎসর ডাক্তার হন সে সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহই জানিতেন না যে, চিন্তার সহিত মস্তিষ্কের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা, মস্তিষ্ক মনের ইন্দ্রিয় মাত্র। ফুসফুসের বায়ুকোষ গুলির (air cells) যেমন একই কাজ—মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশের তেম্‌নি একই কায। দর্শন, শ্রবণ, অনুভব, চিন্তা প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এই সহজ সত্যটিও সে সময় তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহার প্রধান কারণ মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সমস্ত পরীক্ষা বাঁদর, কুকুর প্রভৃতির মস্তিষ্কের উপর করা হইয়াছিল ; মানব মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা করার সে সময়

কোন সুযোগ ছিল না। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এ ব্যাপারটী সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তারগণ বাহির করিয়াছিলেন। রোগ বিশেষে কিম্বা মস্তিষ্কে কোনরূপ গুরুতর আঘাত লাগিলে, মানসিক ক্রিয়ার যে সকল ব্যতিক্রম ঘটে, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিবার কালে তাঁহারা উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যথা বাক্যোচ্চারণ ব্যাপারটী একা মানুষ সম্বন্ধে প্রয়োগ্য ; অন্য জীবের এ শক্তি নাই। চিন্তার সহিত বাক্যের নিয়ত সম্বন্ধ ; কোন বিষয় চিন্তা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে মানুষ বাক্যের দ্বারা তাহা করিয়া থাকে। সন্ন্যাস রোগে (apoplexy) বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতাটী লোপ পায়। ইহার কারণ মস্তিষ্কের যে স্থানটীতে বাক্যোচ্চারণ করিবার শক্তি নিহিত থাকে, সে স্থানটী নষ্ট হইয়া যায়।

হাঁসপাতালের একটী রোগী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক ; এ ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না অথচ শ্রবণ শক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় নাই—সে মনে মনে পুস্তকাদি পাঠ করিতে ও বুঝিতে সমর্থ ছিল। ইহার বন্ধুরা বলে—এক দিবস, সুরাপানে প্রমত্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি ইহার চক্ষুর মধ্যে তাহার ছাতার অগ্রভাগ এরূপ ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেয় যে তাহাতে চক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট না হইয়া মস্তিষ্কের যে স্থানটীতে কথন-কেন্দ্র (Uttering Speech Centre) নিহিত ছিল সেই স্থানটীর অনিষ্ট হয় ও রোগীর বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হয়। এই স্থানটী ছাড়া মস্তিষ্কের অন্য কোন অংশের বিশেষ অনিষ্ট হইলেও, রোগীর বাক্‌শক্তি কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না।

একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইবে। মনে কর, মস্তিষ্কটী বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ একটী অট্টালিকা। এই অট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে এবং ইহার প্রতি প্রকোষ্ঠে জলবহা নালী গিয়াছে। কোন কারণে কোন একটী প্রকোষ্ঠের নালা যদি কম জোর হয় তাহা হইলে ভিতরের জলের চাপে উহা কাটিয়া যাইতে পারে ও উক্ত প্রকোষ্ঠের দ্রব্যগুলি জলের স্রোতে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইহাতে অন্যান্য প্রকোষ্ঠস্থিত দ্রব্যের কোনই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। মস্তিষ্কের মধ্যে যে সকল রক্তবহা ধমনী আছে তাহারা কতকটা এই জলবহা নালার ন্যায়। এই সকল ধমনী মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করায় মস্তিষ্কের যথাযথ কার্য্য সম্পন্ন হয়। যে সময় রক্ত উক্ত ধমনীদিগের মধ্য দিয়া চলাচল করে সে সময় উহাদের গাত্রে একটা বিশেষরূপ চাপ (Pressure) উৎপন্ন হয়। যদি কোন কারণে ধমনীর গাত্র কমজোর হয় (যথা পুরাতন কিড্‌নি রোগে ও গাউট রোগে) তাহা হইলে রক্তের চাপে উহা ফাটিয়া যাইতে পারে। ধমনী ফাটিয়া গেলে নিকটস্থ মস্তিষ্ক পদার্থ রক্তস্রোতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় এবং তত্রস্থ অংশের যে ক্রিয়া তাহার বিলোপ বা ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। বাক্য উচ্চারণ কল্পে মস্তিষ্কে তিনটী কেন্দ্রের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রথমটি শ্রবণ কেন্দ্রের সন্নিকট ; শব্দ সমুহ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া এখানে নীত হইয়া সংরক্ষিত হয় ; দ্বিতীয় স্থলটী দর্শন কেন্দ্রের সন্নিকট—চক্ষু দ্বারা শব্দসমূহ এই স্থলে নীত হয় ; আর তৃতায় স্থলটি দ্বারা স্বরযন্ত্র (larynx) জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতির পেশী সমুহের সংকুঞ্চন ও প্রসারণ হওয়ায় বক্যোচ্চারণ হয়।

উচ্চারণ-কেন্দ্র ও পাঠ-কেন্দ্র এক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু তাহারা যে স্বতন্ত্র তাহা নিম্নলিখিত রোগীনীর বিবরণে প্রকাশ। একটী রমণী এক দিবস প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন যে তিনি সংবাদ পত্র বা পুস্তক কিছুই পড়িতে পারিতেছেন না অথচ তাঁহার দৃষ্টিশক্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তাঁহার শ্রবণ শক্তিরও কোন গোলযোগ ঘটে নাই, বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তিও সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ছিল। সম্ভবতঃ নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার মস্তিষ্কের middle cerebral artery নামক ধমনী, যাহা পাঠ-কেন্দ্রে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহার অবরোধ বশতঃ বা তাহার গাত্র ফাটিয়া যাওয়ায় ঐরূপ ঘটিয়া থাকিবে। সন্ন্যাস রোগে (apoplexy) বাক্যোচ্চারণের বিভিন্ন কেন্দ্র বিনষ্ট হয়।

কোন একটী ভদ্রলোকের সহসা উচ্চারণ ও পাঠশক্তি একসঙ্গে বিনষ্ট হয় কিন্তু তাঁহার শ্রবণ শক্তি পুর্ব্বের ন্যায় অনাহত ছিল। এই লোকটীর দ্বারা আর একটী রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। সে রহস্যটী এই যে বাক্য ও অঙ্ক এ দুই বিষয়ের জন্য মস্তিষ্কের স্বতন্ত্র স্থল নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ভদ্রলোকটী কথা কহিতে ও লিখিতে অসমর্থ ছিলেন বটে কিন্তু অঙ্ক লিখিয়া দিলে পড়িতে তাঁহার কোন গোলযোগ হইত না। বড় বড় হিসাব নিকাশ তিনি অবাধে করিতে ও বুঝিতে পারিতেন।

সঙ্গিতের জন্য আবার মস্তিষ্কে স্বতন্ত্র কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং দেখা যায় খুব সুনিপুণ সঙ্গিত বেত্তারও এই কেন্দ্র নষ্ট হইলে কোন গানেরই স্বরলিপি পাঠ করিতে পারেন না অথচ পুস্তকাদি পাঠে তাঁহার কোন গোল ঠেকে না। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে হয়ত স্বরলিপি পাঠ করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিন্তু স্বরলিপি ভিন্ন অন্য বিষয় পাঠ করার শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে।

সন্ন্যাস রোগে যখন মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধিত হয়, বাক্য উচ্চারণ সম্বন্ধে যে সকল ব্যতিক্রম ও বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে এই মনে হয়, কোন পুস্তকাগারে ভিন্ন ভিন্ন তাকে যেমন বিভিন্ন পুস্তকসকল সাজান থাকে আমাদের মস্তিষ্কেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থল নির্দ্দিষ্ট করা আছে। কেহ যখন কোন একটী নূতন ভাষা শিক্ষা করেন সে সময় উক্ত ভাষার জন্য তাঁহার মস্তিষ্কে একটী নূতন স্থান গড়িতে থাকে। যথা—একজন ইংরাজ যিনি তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজী ব্যতীত ফরাসী ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষায়ও ব্যুৎপত্তিশালী। ঐরূপ লোকের মস্তিষ্কের রোগ বিশেষে বা গুরুতর আঘাতজনিত মস্তিষ্কের অনিষ্টসাধনে দেখা গিয়াছে যে সে ব্যক্তি তাঁহার মাতৃভাষা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, ফরাসী কতকটা পড়িতে পারেন, ল্যাটিন তদপেক্ষা নির্ভুল পড়েন এবং গ্রীক্ পড়িতে একটুও ভুল হয় না। এই ঘটনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে ইহাঁর মস্তিষ্কে যে শেল্‌ফে ইংরাজী ভাষা ছিল সেটী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ফরাসী ভাষার শেল্‌ফ-খানির কতকটা, ল্যাটিনভাষার অত্যল্প অনিষ্ট ঘটিয়াছে আর গ্রীক্‌ভাষার শেল্‌ফখানির মোটেই অনিষ্ট হয় নাই। আর একটী কথা ইহা হইতে এই পাওয়া যায় যে মস্তিষ্কে যে সকল ভাষার শেলফ্ আছে, তাহাতে ক্রিয়াপদ সমূহ সর্ব্বাগ্রে সজ্জিত, সর্ব্বনাম ও বিশেষণ পদ সমূহ তাহার পর সজ্জিত এবং বিশেষ্যপদ সকলের পরে সজ্জিত হয়।

নিম্নের ঘটনাতে এই কথাটী স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। এক ব্যক্তি কথা কহিতে অসমর্থ বলিয়া হাসপাতালে আসে। ডাক্তার টম্‌সন্ তাহার কারণ এইরূপ স্থির করেন যে, মস্তিষ্কের যে স্থানটীতে কথন-কেন্দ্র (Speech centre) অবস্থিত, এ ব্যক্তির মস্তিষ্কের সেই স্থানটিতে একটী অর্ব্বুদ (Tumour) জন্মাইয়া তাহার বাক্‌শক্তি বিনষ্ট করিয়াছে। ডাঃ টম্‌সন্ তখন রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন ও ছাত্রদিগকে বলিলেন যে, ঔষধ সেবনে রোগীর যদি উপকার হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সে ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্যপদ সর্ব্বশেষে ব্যবহার করিবে। ১৫দিন ঔষধ সেবন করিবার পর রোগীর সম্মুখে ডাঃ টম্‌সন্ একখানি ছুরিকা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলতো এটা কি ?" সে উত্তর করিল "তুমি কাটবে।" অতঃপর একটী পেন্‌সিল লইয়া জিজ্ঞাসা করায় কহিল "তুমি লিখবে।" অনেকদিন পরে এই ব্যক্তি বিশেষ্যপদ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা অপর একটী কারণ এই যে মানবশিশু যখন প্রথম কথা কহিতে শিখে তখন সে বিশেষ্যপদগুলিই শিক্ষা করিয়া থাকে ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়াপদগুলি শিখে ; সেই জন্য ভুলিবার সময় আগে বিশেষ্যপদগুলি ভুলিয়া যাইতে হয় ও বৃদ্ধেরা লোকের নাম করিবার সময় প্রায়ই ভুল করিয়া বলেন।

জীব জগতে মানুষ ওরাংওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরগুলির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত। মানুষ ও বানরের দেহস্থ যন্ত্র সমূহ অনেকটা একরূপ। অধ্যাপক হাক্‌সলি (Huxley) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কে বাহ্যতঃ কোনরূপ সমাদৃশ্য নাই অথচ মন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা কোন মানুষের পক্ষেই একেবারে অসম্ভব নয় ; কিন্তু কোন বানরই সহস্র চেষ্টায় এ সকল শিখিতে সমর্থ হয় না। মানুষের সৃজন-ক্ষমতা অসাধারণ ও তাহার তুলনায় বানরের কিছুই নাই। নদীর উপরকার সেতুটী মানুষের আশ্চর্য্য সৃষ্টিমহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। মানুষ ও বানরের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে, এই মনে হয় যে, মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য না থাকিলেও গুণগত পার্থক্য যে খুব বেশী মাত্রায় আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অধুনা স্থির হইয়াছে যে, মস্তিষ্ক চিন্তাবৃত্তির আধার নহে ; ইহা চিন্তাকারীর চিন্তার যন্ত্রমাত্র। যেমন বেহালার নিজের সুর বাহির করিবার ক্ষমতা নাই কেবল বাদকের সুর বাহির করিবার যন্ত্র মাত্র। সেইরূপ মস্তিষ্কেরও নিজের চিন্তা করিবার শক্তি নাই। যাহার মস্তিষ্কের ওজন্ যত বেশী, সে তত বুদ্ধিমান একথার মুলে কোন সত্য নাই। বর্ত্তমানে হেল্‌ম্‌-হোল্‌জ্ (Helmholtz)এর তুল্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কে জন্মাইয়াছে ? অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার মস্তিষ্কের ওজন একটী সাধারণ ব্যক্তির মস্তিষ্কের অপেক্ষা কম। আজকাল মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আর একটী অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এই যে, চিন্তা করিবার সময় আমরা সমস্ত মস্তিষ্কটা কাজে নিযুক্ত না করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র নিযুক্ত করি। হস্তপদাদির যেমন দক্ষিণ বাম আছে, মস্তিষ্কেও তদ্রূপ আছে। ইহাদের একটা অংশ চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কাজে ব্যাপৃত থাকে, অপরটা অলসভাবে বসিয়া কাটায়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অর্দ্ধাংশ একেবারে নষ্ট হইয়াও রোগী বহুদিন জীবিত আছে ও তাহার মানসিক ক্ষমতার কোনরূপ ব্যতিক্রম

ঘটে নাই। এস্থলে মস্তিষ্কের অলস অংশ নষ্ট হয়—যেটী চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়—সেটি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় অবস্থান করে।

মস্তিষ্কই যদি চিন্তা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ কারণ হয়, তাহা হইলে, যাহার মাথা যত বড় তাহার তত চিন্তাশীল হওয়া উচিত—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। যেমন মানুষের দুটী চক্ষু থাকা সত্ত্বেও সে কোন জিনিষকে দুটা না দেখিয়া একটাই দেখে ও এক চোখে দেখিলেও সেই একটাই দেখে, সেইরূপ দুটী মস্তিষ্ক থাকিলেও মানুষ দ্বিগুণ চিন্তা করে না। এখন প্রশ্ন এই যে চিন্তা করিবার কালে আমরা দুইটী মস্তিষ্ক (দক্ষিণ ও বাম) নিয়োজিত না করিয়া একটাই বা করি কেন? আমরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সে সময়, আমাদের দক্ষিণ, বাম, কোন মস্তিষ্কই চিন্তা করিবার উপযোগী হয় না। মানসিক ক্ষমতাসমূহ আমাদের স্বোপার্জ্জিত জিনিষ। ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেহ বাক্য উচ্চারণ করে না; নবজাত শিশুর চক্ষু কর্ণাদি থাকিয়াও না থাকার সামিল বলিলে হয়, কারণ, সে কোন পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা শিশু ক্রমে ক্রমে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে থাকে। শিক্ষা দ্বারা তাহার মস্তিষ্কের স্থান বিশেষের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কেন্দ্র তৈয়ারী হয়। এই কারণেই যতদিন অনুশীলন ও অভ্যাস দ্বারা মস্তিষ্কে বেহালা বাজাইবার জন্য একটী বিশেষ কেন্দ্রের উদ্ভব না হয় ততদিন কেহ সুনিপুণ বেহালাদার হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, সময় ও অনুশীলনের আবশ্যক। একটী মস্তিষ্ক দ্বারা যখন কায চলিতে পারে তখন উভয় মস্তিষ্ককে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রমের আবশ্যক কি? এই অকারণ কালক্ষয় ও পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্যই মানুষ একটা মস্তিষ্কেই পরিণত করিবার চেষ্টা করে। এখন কথা এই—দক্ষিণ ও বাম এই দুই মস্তিষ্কের মধ্যে কোন মস্তিষ্কটা চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী হয়? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যাহারা প্রধানতঃ দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের বেলায় বাম মস্তিষ্ক আর যাহারা বাম হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ মস্তিষ্কটী পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বাক্য উচ্চারণ-কেন্দ্র এবং অন্যান্য জ্ঞান-কেন্দ্র সমূহ প্রধানতঃ বাম মস্তিষ্কে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। শিশু কথা কহিবার পূর্ব্বে ইসারায় মনোভাব ব্যক্ত করে; সঙ্কেত ও ইঙ্গিত একরূপ অস্ফুট-ভাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের মস্তিষ্কে হস্ত-সঞ্চালনের-কেন্দ্র সমূহ যেস্থলে অবস্থিত, তাহার অব্যবহিত পরেই বদন, ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতির পেশীগুলির কেন্দ্র সংস্থাপিত। ইহার ফলে এই হয় যে, শিশু হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে করিতেই ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি নড়িতে আরম্ভ করে। ওষ্ঠ, জিহ্বা, বদন প্রভৃতি নাড়িলে, ধ্বনি প্রকাশ হয়। এবং এই ধ্বনিই কালক্রমে বাক্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে শিশুর মস্তিষ্কে বাক্যোচ্চারণের কেন্দ্রের আবির্ভাব হওয়ার পর হইতে কালক্রমে চিন্তা-কেন্দ্রের এবং তাহার পর জ্ঞান-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। অতএব দেখা যায় যে, বয়সের সহিত আমরা আমাদের বাম মস্তিষ্কে কতকগুলি কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া আমাদের মস্তিষ্কে আরও কতকগুলি করিয়া কেন্দ্র থাকে; এগুলি সহজাত অর্থাৎ আমাদের জন্মকাল হইতেই বর্ত্তমান থাকে। এই পরবর্ত্তী কেন্দ্রগুলি আমাদের

মস্তিষ্কের বাম দক্ষিণ উভয় অংশে সমান ভাবে বিদ্যমান থাকে। এ কেন্দ্রগুলির কি কাজ দেখা যাউক; দৃষ্টান্ত স্বরূপ দর্শন কেন্দ্রের উল্লেখ করা যাক্। চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় বলিলেও চক্ষুর নিজের কোন দেখিবার শক্তি নাই; মস্তিষ্কেরই শুধু দেখিবার শক্তি আছে। চক্ষুর রেটিনা (Retina) নামক পর্দায় পদার্থের যে প্রতিবিম্ব পড়ে Optic nerve (দর্শন-স্নায়ু) দ্বারা তাহা মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে নীত হয় ও তাহা দ্বারা পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। আমাদের যেমন দক্ষিণ ও বাম দুইটা দর্শনেন্দ্রিয়, তেমনি মস্তিষ্কের দক্ষিণ ও বামে দুইটা দর্শন-কেন্দ্র আছে। যদি কোন ব্যক্তির দক্ষিণ ও বাম মস্তিষ্কস্থিত দর্শন-কেন্দ্র দুইটী নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে, চক্ষু থাকিয়াও সে ব্যক্তি অন্ধ হয়। দর্শন-কেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা চলে। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ অনুভব প্রভৃতির জন্য যে সকল কেন্দ্র আছে সেগুলি ছাড়া আমাদের দক্ষিণ ও বাম উভয় মস্তিষ্কেরই আর কতগুলি কেন্দ্র আছে। আমাদের দেহে যে সকল ইচ্ছাধীন পেশী আছে এই কেন্দ্রগুলি সেগুলিকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। এই সকল কেন্দ্র হইতে স্নায়ু সমুহ উৎপন্ন হইয়া নিম্নে আসিতে আসিতে একস্থানে পরস্পর কাটাকাটি—ঠিক যেমন ইংরাজি X অক্ষরের দুটী বাহু পরস্পর কাটাকাটি করিয়াছে সেইরূপ আর কি। ইহার ফলে দেহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পেশীসমুহ বাম মস্তিষ্কের কেন্দ্র দ্বারা এবং বাম পার্শ্বস্থ পেশী সমুহ দক্ষিণ মস্তিষ্কের কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে এই কারণে কোন ব্যক্তির দক্ষিণ মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার বাম অঙ্গে পক্ষাঘাত আর বাম মস্তিষ্কের কেন্দ্র নষ্ট হইলে দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে চিন্তা কার্য্যের জন্য একটিমাত্র মস্তিষ্ক হইলেই যদি চলে, তবে দুইটা মস্তিষ্কের কি প্রয়োজন? এই মাত্র দেখাইলাম যে, আমাদের দৈহিক ক্রিয়াগুলির জন্য দক্ষিণ বাম উভয় মস্তিষ্কেরই আবশ্যকতা আছে; অনুভব করিতে ও পেশী সঞ্চালনের জন্য দুইটী মস্তিষ্কেরই তুল্য দরকার আর একটী কথা এই যে, শৈশবে কোন কারণে কাহারও যদি চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত মস্তিষ্কটী যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অপরটিকে ঐ সকল কার্য্যের উপযোগী করিয়া না তুলিতে পারা যায় এমন নহে।

অনেকে মনে করেন, আমাদের উভয় মস্তিষ্ককেই যদি চিন্তাদি কার্য্যে অভ্যস্ত করা যায় তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। ইহাদের বিশ্বাস মস্তিষ্কের যত বেশী অংশ চিন্তাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে, ততই ভাবের আধিক্য হইবে। ইঁহাদের জানা উচিত যে মস্তিষ্কের ভাব-সৃজন করিবার কোনই শক্তি নাই ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে কখনই মঙ্গল বা সুফলপ্রদ হয় না। একটি বালিকা দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার না করিয়া সকল কার্য্যই বাম হস্ত ব্যবহার করিত। এই কারণে তাহার বাম হস্তখানি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার ফল এই হয় যে, উক্ত বালিকার বাক্য উচ্চারণের কেন্দ্রগুলি সম্যকভাবে পরিণত হইতে পারে নাই।

মস্তিষ্কে কোন একটা নূতন কেন্দ্রের উদ্ভব করিতে হইলে, রীতিমত সাধনার আবশ্যক। একটী বয়স্ক ব্যক্তি যদি কোন বিদেশীয় ভাষায় পারদর্শী হইতে চাহেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া উক্ত ভাষার শব্দাদি অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে ঐ সকল শব্দ তাঁহার মস্তিষ্কের উচ্চারণ-কেন্দ্রে স্থান

লাভ করিবে এবং আবশ্যক মত মুখে আসিতে সমর্থ হইবে। এ ব্যাপারটি নিতান্ত সহজ নয়—ইহাতে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির (will power) প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

কুম্ভকার যেমন একতাল কাদা লইয়া তাহা হইতে তাহার ঈপ্সিত পদার্থ নির্ম্মাণ করে, মানুষের ইচ্ছাও (will) তেমনি মস্তিষ্ককে গঠিত করিয়া তুলে। সূর্য্যরশ্মি যেমন চক্ষুর রেটিনা নামক পদার্থকে উত্তেজিত করে, মানুষের ইচ্ছাও তেমনি মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ইচ্ছাও নির্দ্দিষ্ট ভৌতিক পদার্থ বিশেষ। সূর্য্যরশ্মির যেমন physical, chemical ও physiological কার্য্য দৃষ্ট হয়, ইচ্ছারও তদ্রূপ থাকা সম্ভব। ইচ্ছাকে এক কথায় মনের লাগাম বলিতে পারা যায়। চিন্তা কালে ইচ্ছা মনকে সংযত করিয়া রাখে ও মন আবার দেহকে সংযত করে। চিন্তাকালে যতটা সংযমের আবশ্যক হয় এতটা অন্য কোন সময়ে বা অন্য কোন বিষয়ে হয় না।

নানাদিক হইতে ভাবস্রোত আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে ও প্রত্যেক পদে অন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা একটি মানসিক দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ; মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে শারীরিক দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, রোগীর দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাধারার ও ভাবের কোন কূল কিনারা থাকে না ও অবশেষে অসঙ্গত প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়। মানবজীবনে অসম্বন্ধ, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা দ্বারা কোন সুফল প্রসূত হয় না বরং যথেষ্ট অনর্থ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সকলেরই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা দরকার; দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকিলে ভাবস্রোতে আমাদের দিশাহারা হইতে হয় না। যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যানুযায়ী কথা কহে, চিন্তা করে, কার্য্য করে, সেই যথার্থ মানুষ। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের খুব বেশী মানসিক শক্তি সত্ত্বেও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাবে জীবন একেবারে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। একারণে সকলেরই আত্মসংযম অভ্যাস করা উচিত। যাহাদের আত্মসংযম নাই, তাহাদের দশা অনেকটা ভগ্নপ্রাকার নগরীর ন্যায় বেষ্টন প্রাচীরের অভাবে নিরাপদ মনে করা যাইতে পারে না।

"কলেরাই বিসূচিকা"

"বিসূচিকা অজীর্ণ সম্ভব ব্যাধি"

(আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

শাস্ত্রে বিসূচিকা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণগুলি আলোচনা করিলে বিসূচিকা ও কলেরা একই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নিদান সম্বন্ধে কিছু বিপ্রতিপত্তি থাকিয়া যায়. কারণ কলেরা রোগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশিষ্ট বীজাণু সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, Sprillum Choleræ Asiaticæ নামক বীজাণু যাহা সাধারণতঃ Comma Bacillus নামে পরিচিত, তাহাই এই রোগের কারণ। কাহারও অজীর্ণ থাকুক বা নাই থাকুক তাহাতে কিছু যায় আসে না। এই বীজাণু খাদ্য কিম্বা পানীয়ের সহিত উদরে প্রবেশ করিলে যদি শরীরের প্রাকৃতিক শক্তি তাহাদিগকে নষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের বংশ বিস্তার করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। সাধারণ অতিসার হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহাতে এক প্রকার বিশিষ্ট বর্ণের (চাউল ধোয়া জলের ন্যায়) দ্রব ভেদ হইতে থাকে। ইহাকে serous purging বলা হয় সাধারণ অতিসার প্রবল হইলে সে ক্ষেত্রেও এবম্বিধ মলভেদ হওয়া সম্ভব। তৎপ্রকার অতিসারকে Cholera morbus বা cholera infantum কহে। কিন্তু Asiatic Cholera হইতে উক্ত-বিধ কলেরার পার্থক্য, এই সকল বীজাণু দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। Asiatic Cholera সংক্রান্ত রোগীর মল অনুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিলে ঐ জাতীয় বীজাণু পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ খাদ্য-পানীয়ের সহিত এই বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে। রোগীর মল কিংবা বমির উপর মক্ষিকা বসিলে ঐ বীজাণুগুলিকে তাহারা খাইয়া ফেলে। পুনরায় যখন খাদ্য বা পানীয়ের উপর বসে, তখন খাদ্য বা পানীয় বীজাণু-সম্পৃক্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে মক্ষিকার শরীরে বীজাণুগুলি ১২দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। Cf. In body of the house fly, the specific organism may exist for twelve days. এতদ্ভিন্ন যদি কলেরা রোগীর মল বা বমি ধুলা বা ছাই চাপা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাতাসে উড়িয়া যাইয়া খাদ্য ও পানীয় দূষিত করিতে পারে। কিম্বা কোন ব্যক্তির মুখে যদি সেই ধুলি যায় তবে তাহার সহিত বীজাণুও মুখপথে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। এক জাতীয় লোক আছে, তাহাদিগকে কলেরার Carrier বলা হয়। তাহাদের শরীরে কলেরার বীজাণু পুষ্টিলাভ করে অথচ তাহাদের কলেরা হয় না। কিন্তু তাহাদের

দ্বারা সংস্পৃষ্ট খাদ্য পানীয়ে বীজাণু সংক্রমিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে এই বীজাণু শরীরে প্রবেশ করার পর তাহাদের শরীর নিস্রাব (toxin) পরিপাক যন্ত্রের উত্তেজনা সাধন করে। তাহার ফলে শরীর হইতে দ্রব পদার্থ উদরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মুখ ও মলমার্গ হইতে বহির্নিঃসরণ হইতে থাকে এবং বিসূচিকার অন্যান্য লক্ষণগুলি ও আসিয়া উপস্থিত হয়। জীর্ণাজীর্ণের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। নিদানেই যখন এইরূপ পার্থক্য, তখন কি করিয়া অজীর্ণ-সম্ভূত বিসূচিকা এবং বীজাণু-সম্ভূত কলেরাকে এক রোগ বলা যায়।

অধুনা অনেকেই এই মত পোষণ করেন। এতদ্ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রকার জ্বর, যক্ষ্মা, শ্বাস, চোখউঠা, আমাশা প্রভৃতি বহু রোগকে বীজাণু-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত এই সকল রোগগুলি বীজাণু-সম্ভূত বলিয়া উক্ত হয় নাই। তাহা বলিয়া নেত্রাভিযন্দ এবং opthalmia, আমাশা এবং Dysentry, যক্ষ্মা এবং Phthisis প্রভৃতি রোগ সকল যে পরস্পর বিভিন্ন এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কোন কারণ নাই। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সকল প্রকার রোগের নিদান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ এবং পরিণাম এই তিনটীই সকল রোগের নিদান। চরকোক্ত 'ত্রিবিধো হেতুঃ সংগ্রহঃ" ইহাতে 'সংগ্রহ' এই কথা বলাতে চতুর্থ হেতু নাই বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই ত্রিবিধ হেতু নির্দ্দেশ করায় এবং বীজাণুকে রোগের কারণ না বলায় আয়ুর্ব্বেদের যে কোন ন্যূনতা হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বরং বীজাণুকে কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের ইহাই একটি সিদ্ধান্ত যে, ব্যভিচার দেখাইতে পারিলে আর তাহাকে গ্রহণ করা হইবে না। বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে কোথাও রোগ উৎপন্ন হয় কোথাও বা হয় না। সুতরাং ইহার রোগ উৎপাদনের ব্যভিচার আছে। এই জন্য ইহা কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বীজাণুর এই প্রকার ব্যভিচার দেখিয়া বলেন যে, শরীরে যদি কোন কারণে এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—যখন কোন এক জাতীয় বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে বংশ বিস্তার করিতে পারে. তখন তদ্‌জাতীয় বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে তত্তৎ রোগ উৎপন্ন হইবে। শরীরের এই যে অবস্থা, ইহাকে তাঁহারা Susceptibility বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, "যদি কোন কারণে" এই কথার অর্থ কি? আমরা জানি বীজাণু এক প্রকার সূক্ষ্ম ক্রিমি। ক্রিমি-সকল তত্তৎ অনুকুল স্থান না পাইলে বাঁচিতে পারে না। যেমন, আবদ্ধ জল মশক বৃদ্ধির কারণ। রুদ্ধ ও ক্লিন্ন স্থলে নানা জাতীয় ক্রিমি উৎপন্ন হয়। জীব তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে দূর হইতেও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, নিকটে কোন মাছি নাই অথচ একটা কাঁঠাল ভাঙ্গিলে কি জানি কোথা হইতে মক্ষিকার পাল আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাহ্য জগতে এই যে ব্যাপার, আমাদের শরীরের ভিতরও ঠিক এই প্রকার। যদি কোন বীজের পুষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের অবস্থা নিম্নরূপ হওয়া আবশ্যক। প্রথমে চাই ক্লেদ,

দ্বিতীয়তঃ চাই শ্লেষ্মা এবং তৃতীয়তঃ চাই বায়ুর দ্বারা সেই জিনিষটাকে ফাঁপাইয়া তুলা। দধিকে অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে আমরা এক প্রকার বীজাণু দেখিতে পাই। ইংরাজীতে ইহাকে Lactose bacillus বলে। যাঁহারা দধি প্রস্তুত প্রণালী সম্যক অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে ফুটন্ত দুধে সাজা দিলে দুধ দধিতে পরিণত হয় না। দুধকে বরফের মধ্যে রাখিয়া যদি তাহাতে সাজা দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুধ অবিকৃত থাকিয়া যায়। দধি প্রস্তুতের ব্যাপারটী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ (a certain degree of temperature) দধিতে পরিণত হয়। এই সময়ে সাজা গুলিয়া দিয়া দুগ্ধকে নাড়িয়া ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতে হয়। ফাঁপান শব্দের অর্থ ভিতরে কিছু বায়ু প্রবেশ করান। দুগ্ধের তাপ কমিয়া না যায় সেজন্য কম্বল চাপা দেওয়া অথবা উনানের পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দুগ্ধস্থ জলরূপী ক্লেদ এবং নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় তাপ ফাঁপান এবং সাজা দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। দুগ্ধের এতাদৃশ অবস্থায় lactose bacillus তাহার বাসের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া আসিয়া পড়ে এবং ঐ দুগ্ধে বংশ বিস্তার করে। এখানে অনেকে বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রদত্ত সাজার সহিত সমাগত lactose bacillus দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির প্রতি কারণ। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পল্লীগ্রামে সাজার পরিবর্ত্তে তেঁতুল দিয়া দধি পাতা হয়। সে দধিও পরীক্ষা করিলে lactose bacillusএর বিদ্যমান পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য জীব কোন স্থলে বাস করিলে, তাহার দুইটী শারীরিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। (১) সে কিছু খাইবে এবং (২) শরীর হইতে কিছু মলাংশ ত্যাগ করিবে। এই মলাংশ যে কোন দ্রব্যে মিশ্রিত হইলে দ্রব্যটী দুষ্ট হইতে পারে। বীজাণুর মাত্র ইহাই কার্য্য।

ক্ষেত্র বীজাণু বাসের উপযোগী হইলে, সেই ক্ষেত্রে বীজাণু আসিয়া বংশ বিস্তার করে। ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বীজাণু সংক্রমণের পূর্ব্বে ক্ষেত্রের কিদৃশী অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা সম্যক নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, মাত্র Susceptibility বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ ক্ষেত্রস্থ বায়ু, তেজ ও জলের বৈষম্য উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা বায়ু, তেজ ও জলকে সকল প্রকার বিকৃতির কারণ বলিয়াছেন।

বাহ্য জগতের ন্যায় শরীরেও বায়ু, তেজ ও জলের বৈষম্য নিমিত্ত শরীর বিকৃত হইলে যে জাতীয় বীজাণু শরীরে অবস্থান করিয়া বংশ বিস্তার করিতে পারে, তদ্‌জাতীয় বীজাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বায়ু, তেজ ও জল—জীব শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামে অভিহিত হয়। ইহারা শরীরের দুষ্টি সাধন করে বলিয়া ইহাদিগকে ত্রিদোষ বলা হয়।

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই ত্রিবিধ-নিদান সেবন জন্য বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে শরীর বিকৃত হইলে, যাদৃশ বীজাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাদৃশ বীজাণু প্রবেশ পূর্ব্বক বংশ বিস্তার করে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, বীজাণু যদি রোগের কারণ না হয় তবে সংক্রামক রোগের বিস্তার কি প্রকারে সম্ভব হয়। বীজাণুই-ত' এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক রোগ উৎপাদন করে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "কিন্তু পূর্ব্বে Susceptibility থাকা চাই।"

সংক্রামক রোগগুলির প্রাদুর্ভাবের এক একটি নির্দ্দিষ্ট কাল দেখা যায় অর্থাৎ কালপ্রভাবে দেশটী এমন অবস্থায় পরিণত হয় যখন কোন এক নির্দ্দিষ্ট বীজাণু বৃদ্ধি পাইতে পারে তদ্রূপ প্রভাব-বিশিষ্ট কালের প্রভাবে আমাদের শরীরের বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য জন্য আমাদের শরীরকে রোগ প্রবণ করিয়া তুলে। বায়ু, পিত্ত ও কফই রোগ উৎপাদন করিয়াছিল, বীজাণু মাত্র আগন্তুক। তদ্দেশে বাস জন্য তদ্‌কাল প্রভাবে তাহাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য নিমিত্ত এতাদৃশ রোগ উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জীর্ণাজীর্ণের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; একথার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। মাত্র অজীর্ণ উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া এইরূপ কথা বলা হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আমাশয়স্থ পাচক-পিত্তের অন্তর্গত Hydrochloric Acid দুর্ব্বল না হইলে কলেরা বীজাণু রোগ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। Hydrochloric Acidএর দুর্ব্বলতা মানেই পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা সুতরাং সেই সময়ের খাদ্য যে সম্যকজীর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

বিসূচিকা একটি আমসমুত্থ ব্যাধি। আম প্রদুষ্টির নিমিত্ত অতি মাত্র আহারই যে কেবল একমাত্র কারণ তাহা নহে। মহর্ষি চরক বলেন' "নতু খলু কেবলমতিমাত্রমেবাহাররাশিমাম প্রদোষ করমিচ্ছান্তি। অপি তু খলু গুরুরুক্ষশীতশুষ্কদ্বিষ্ট বিষ্টম্ভি বিদাহশুচি বিরুদ্ধানামকালে অন্নপনোনামুপসেবনম্। কাম ক্রোধ লোভ মোহের্ষ্যাহ্রী শোকভয়োদ্বেগ পতপ্তেন মনসা বা যদন্নপানং মুপযুজ্যাতে তদপ্যামাযে। প্রদূষয়তি"। কিন্তু কেবল যে অতি আহার করিলেই আমদোষ হয়, এরূপ নহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, উদ্বেগ ও ভয়ে মন আকুল হইলে তদ্‌কালে যে অন্ন ভোজন করা যায় তাহাও আমদোষ উৎপন্ন করে।

Hot weather favours the spread of Cholera. As in all infectious maladies, all causes which decrease vitar eritance such as alcoholism exposure, convalescence from other diseases, and even profound mental depression, distinctly increase the susceptibility of the patient. (Practice of medicine by Hare). বিশেষতঃ যেখানে বহু লোক একত্রে সমাবিষ্ট হয় যেমন কোন পর্ব্বোপলক্ষে, তীর্থ-স্থানে বা মেলায় এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কারণ বহু লোকের সমাবেশের জন্য তাহাদের শরীর নিঃসৃত মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও উচ্ছ্বাস বায়ু, জলও দেশদুষ্টি করে। পরন্তু সময়ের হিতাহার না হওয়ার জন্য অগ্নিবৈষম্য নিবন্ধন আমদোষ উৎপন্ন হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

এই সকল কারণে আমরা কলেরা ও বিসূচিকাকে এক রোগ বলিয়া স্থির করিয়াছি।

মনের স্বাস্থ্য ও শিশুপালন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু M. B., D. Sc.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনের রোগ সাধারণে সহজে ধরিতে পারে না

এই সকল রোগীর সহিত কথাবার্ত্তায় হঠাৎ তাঁহাদের মানসিক বিকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অপর সকল বিষয়েই তাঁহারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন, কিন্তু কোনরূপ তর্কের দ্বারা তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণাগুলির উচ্ছেদসাধন করা অসম্ভব।

মনের রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক

মানসিক রোগের বিবরণ শুনিলে অনেকেই তাহা হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ভুক্তভোগীর পক্ষে যে তাহা কতটা কষ্টদায়ক তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব। মনের রোগের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রোগী এমন কোন দুঃসাধ্য কাজ নাই যাহা না করিতে পারে। যদি বলা যায় হাত-পা কাটিয়া ফেলিয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে, তবে রোগী তাহা করিতেও প্রস্তুত। শারীরিক ক্যান্সার ব্যাধির যন্ত্রণার সহিত অনেক মনের ব্যাধির যন্ত্রণা সমতুল্য। মনের রোগে রোগীই যে কেবল কষ্ট পায় তাহা নহে, তাহার আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। না বুঝিয়া তাহারা অনেক সময় রোগীকে অন্যায় পীড়ন করে। তাহাতে রোগ উপশম না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।

মনের রোগের প্রতিকার

কি কারণে মনের রোগ হয় মনোবিদ্‌গণ অনেক চেষ্টা করিয়া তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসায় মনের রোগ সারে। মানসিক রোগের কারণ অত্যন্ত জটিল। ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। মনোবিৎ দেখিয়াছেন পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মনের রোগের সূত্রপাত হয়; পরিণত বয়সে সেই রোগ পরিস্ফুট হয় মাত্র। পিতা মাতার উভয়ের মানসিক ব্যাধি থাকিলে সন্তানের মনের রোগের সম্ভাবনা অধিক। এজন্য দুইটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বংশের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ করা উচিত নহে। হাবা, বোবা, কালা বা পঙ্গু সন্তান বংশানুক্রমিতার ফলে জন্মে। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ মানসিক রোগ যে কেবলমাত্র বংশগত দোষে উৎপন্ন হয় এমন কথা বলা যায় না,—শৈশবের আবেষ্টনই এই সকল রোগ উৎপত্তির মূল কারণ অতএব শিশুপালনে সতর্ক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শিশুর আবেষ্টন

শিশুকে উপযুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে রাখিতে পারিলে সে সবল সুস্থ ব্যক্তিতে পরিণত হইবে। অনুপযোগী আবেষ্টনে শিশু ক্রমে হয়ত অকর্ম্মণ্য, রোগযুক্ত, দুষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক শিশুর

ভিতরেই সামাজিক হিসাবে ভাল ও মন্দ সংস্কার রহিয়াছে। অনুকূল আবেষ্টনে সদ্‌বৃত্তি পরিস্ফুট হয়; আবেষ্টন প্রতিকূল হইলে কুস্বভাব দেখা দেয়। শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বিহার, সামাজিক অবস্থা, জলবায়ু প্রভৃতিকেই আবেষ্টন বলা হয়। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ শিশুই যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহা তাহাদের সদ্‌বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশলাভের পক্ষে অনুকূল নহে। চেষ্টা করিলে, সকলের পক্ষে কিছু-না-কিছু উন্নতিসাধন সম্ভব। শারীরিক বৃদ্ধি সম্বন্ধে চিকিৎসক বলিতে পারেন, কি করিলে কি দোষ কাটিয়া যায়, বা কি করিলে শরীর নীরোগ ও সবল হইতে পারে। সেইরূপ, কিরূপ ঘটনায় ও কিরূপ উপায়ে মনের অসৎ বৃত্তিগুলি সংযত করা যায়, কি উপায়ে ও কি ঘটনায় সৎপ্রবৃত্তির প্রকাশ ও পরিপুষ্টি সম্ভব, মনোবিৎ তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করেন।

শৈশবের প্রভাব

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, Child is father of the man। ভবিষ্যতে কোন্ ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইবে, শৈশবের আবেষ্টনের উপরই তাহা অনেকটা নির্ভর করে। শৈশবে মনে যে রেখাপাত হয়, পরিণত বয়সে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়—সাধারণেও তাহা কতকটা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক কি প্রকার আবেষ্টনের প্রভাবে কি বিশেষ পরিণতি হয় তাহা বলা বড় শক্ত। আবেষ্টনের প্রভাব অতি জটিল। সাধারণের ধারণা যে-সকল ঘটনা বা বিষয় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে-সমস্তই বুঝি আমাদের জ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে; ভয় পাইলে বলিতে পারি কেন ভয় পাইতেছি; রাগিলে জানা থাকে কেন রাগ হইল। অর্থাৎ, পূর্ব্ব ঘটনার প্রভাব মনে থাকিলে সেই ঘটনার স্মৃতিও মনে থাকে। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে যাহা আমাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে এবং যাহার প্রভাব আমাদের কার্য্যকলাপে সর্ব্বদা পরিস্ফুট হয়; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সকল ঘটনার কোন স্মৃতিই থাকে না। কেন রাগ হইল, কেন ভয় পাইলাম, তাহা সব সময় বলিতে পারি না; কিংবা কারণ পাইলেও তাহা বিচারে যথেষ্ট বা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। এই অজ্ঞান মন শৈশবের আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠে এবং ইহার প্রভাব চিরদিন থাকিয়া যায়। সকল ক্ষেত্রেই Prevention is better than cure, অর্থাৎ রোগপ্রতিষেধের চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। নির্জ্জান মনের উৎপত্তি যখন অনেকাংশে শৈশব আবেষ্টনের উপর নির্ভর করে, তখন শিশুর স্বভাব বিগড়াইতে দিয়া পরে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করা অপেক্ষা, গোড়া হইতেই সতর্ক হওয়া সমীচীন। শিশুর মন অনুসন্ধানের সার্থকতা এইখানে। যেখানে পূর্ব্বেই অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এবং মানসিক বিরোধের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, সেখানে মন-চিকিৎসার দ্বারা উপকার পাওয়া যাইবে।

শিশুপালনে ত্রুটি

কি লক্ষণের সাহায্যে শিশুর মনে বিরোধ চলিতেছে বুঝা যাইবে, এখন তাহার আলোচনা করিব। শিশুর যদি কখন কোন কদভ্যাস দেখা দেয়, যদি সে অল্পে ভয় পায়, অতিরিক্ত লজ্জাশীল হয়, যদি সে একগুঁয়ে হয়, সামান্য কারণে বিরক্তি বোধ করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার মনে বিরোধ চলিতেছে এবং পালনের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। শিশুর আহার-বিহার সম্বন্ধে যত্নবান হইলে অনেক সময়ে এই সকল দোষ সংশোধিত হইতে পারে।

এতটা সতর্কতা সত্ত্বেও যদি দোষ থাকিয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে পিতামাতা বা স্বজনবর্গের আচরণের ক্রটিই ইহার মূল কারণ। এই সকল সামান্য দোষ-ক্রটি থাকিয়া গেলে অনেক সময় পরিণত বয়সে নানা অনিষ্টের কারণ হয়। দেখা গিয়াছে, পাঁচ বৎসর বয়সে পা দিবার পূর্ব্বেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এই সময়ে শিশু-পালনের দোষক্রটি ঘটিলে চিরকাল তাহার ফলভোগ করিতে হয়। পিতামাতার অজ্ঞতাবশতই যে পালনের ক্রটি ঘটে তাহা নিঃসন্দেহ। এইজন্য প্রত্যেক পিতা-মাতারই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে পৃথিবী হইতে মানসিক রোগীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

শিশুপালনের নিয়ম

শিশুকে প্রতিপালন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা সকল পিতামাতারই জানা দরকার। কেন সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য তাহার বিচার জটিল বলিয়া উল্লেখ করিব না। যাহাতে প্রথম হইতেই শিশুর আহার-বিহার ও মলমূত্র ত্যাগে সদভ্যাস জন্মে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সাধারণের ধারণা নাই যে, কত অল্প বয়সে সদভ্যাস শেখান সম্ভব। চেষ্টা করিলে এক মাসের শিশুকেও নিয়মিত সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করান যাইতে পারে। আহারও নিয়মিত সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন-তখন স্তন্যপান শিশুর পক্ষে মঙ্গল-দায়ক নহে। শিশু কাঁদিলেই তাহাকে খাওয়াইতে হইবে, এ ধারণা সর্ব্বদা পরিহার্য্য। ক্ষুধার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে শিশু কাঁদিলে বুঝিতে হইবে তাহার কোন অস্বস্তি হইয়াছে। ভিজা বিছানা, অনুপযুক্ত পরিধান এবং কীটাদির দংশনে শিশু কাঁদিতে পারে। শিশুর শরীর সম্বন্ধে যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার বিবরণ যে-কোন শিশুপালন সংক্রান্ত পুস্তকে পাওয়া যাইবে; সুতরাং এখানে তাহার পৃথক আলোচনা অনাবশ্যক। তবে যে-সকল ব্যাপারের সহিত মনের সংযোগ আছে তাহারই বিচার করিব।

আঙুল-চোষা

শিশুর মুখবিবর ও মলদ্বারে স্বল্প কারণেই অযথা উত্তেজনা হইতে পারে। নিয়মিত আহার ও মল-মূত্রাদি ত্যাগের অভ্যাসে এইরূপ উত্তেজনার শান্তি হয়। চোষণ-ক্রিয়া শিশুর পক্ষে সুখকর। এই জন্য, যথাসময়ে স্তন্যপানে ক্ষুধাজনিত উত্তেজনা প্রশমিত না হইলে শিশু আঙুল চুষিয়া কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করে এবং ক্রমে আঙুল চোষার সুখে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই সুখের অত্যধিক উত্তেজনায় শিশুর মানসিক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। অপরিষ্কার আঙুল হইতে নানাপ্রকার অনিষ্টকারী বীজাণুও শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। এই সমস্ত কারণে শিশুকে রবারের চুষী বা আঙুল চুষিতে দেওয়া অনুচিত। দাঁত উঠিবার সময়ে মাড়ির সুড়সুড়ি নিবারণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শক্ত চুষিকাঠি অল্পস্বল্প দিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

অতিরিক্ত আদর

শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু পরিষ্কার করিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহার কামস্থানগুলিতে অযথা হাত না দেওয়া হয়। পিতামাতা অনেক সময়ে শিশুকে অতিরিক্ত আদর করেন। ঠোঁটে মুখে অতিরিক্ত চুম্বনাদি ভাল নহে। একটু বয়স বেশী হইলে গাঢ় আলিঙ্গনাদিতেও শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে।

অপর পক্ষে শিশুকে একেবারেই আদর না করা ঠিক নহে। পরিমিত আদরেই শিশুর মনোবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে। যে-শিশু ভালবাসা বা আদর পায় নাই, তাহার নানারূপ মানসিক বিকার ঘটা সম্ভব। পিতা ও মাতা উভয়েরই আদর শিশুর আবশ্যক। একজন অতিরিক্ত আদর করিলে এবং আর একজনের নিকট আদর কম পাইলে শিশুর মানসিক অনিষ্ট সাধিত হয়। অল্প বয়স হইতেই শিশুকে প্রত্যহ অন্ততঃ অল্পক্ষণের জন্য একলা অন্ধকারে থাকিতে দেওয়া উচিত।

শিশুর আবদার

শিশুর সকল আবদারে কর্ণপাত করা উচিত নহে। আবার একেবারে না শোনাও অন্যায়। প্রথম হইতেই শিশুকে বুঝিতে দিতে হইবে যে সকল ক্ষেত্রে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। পিতামাতার একমাত্র সন্তান, প্রথম সন্তান, কনিষ্ঠ সন্তান, রুগ্ন সন্তান—ইহারা অনেক সময় অপরিমিত আদর পাইয়া থাকে। এবিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক! দেখা গিয়াছে, এই সকল শিশুরই ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক রোগের সম্ভাবনা বেশী।

খেলার সাথী

শিশুকে সমবয়স্ক সাথীদের সহিত খেলা করিতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ছোট-বড় ভাই-ভগ্নীদের স্নেহযত্ন আব্দার অত্যাচারের মধ্যে শিশুর পালন ভাল। শিশুর অল্পবয়সে মাতার আবার সন্তান হইলে, অনেক সময়ে নবাগতের উপর শিশুর হিংসা দেখা দেয়। অভ্যস্ত আদর না পাওয়ায়, অথবা কম আদর পাওয়ায় শিশু মনে অশান্তি ভোগ করে। এই অশান্তির মাত্রা সময় সময় এতই প্রবল হয় যে তাহাতে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। ইহাকে চলতি ভাষায় এঁড়ে লাগা বলে। পিতামাতার কর্ত্তব্য, শিশুকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিয়া এই হিংসা নিবারণ করা। তখন শিশু আপনা হইতেই নবাগতকে ভালবাসিবে।

শিশুর মনোকষ্ট

মনে রাখা উচিত, শিশুর মনেও হিংসা, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি প্রবলভাবে দেখা দিতে পারে। এই সকল উপহতি-জনিত (emotion) কষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির কষ্টেরই অনুরূপ। বয়স্ক ব্যক্তির পুত্রশোকের যে কষ্ট, শিশুর একটা ভালবাসার পুতুল ভাঙিয়া গেলে তদনুরূপ কষ্ট হইতে পারে। এইরূপ কষ্ট পাইলে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহার সান্ত্বনার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। খেলার সাথীর বিচ্ছেদও সময় সময় শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। শিশু যাহাতে আত্মীয়স্বজন ব্যতীত বাহিরের লোকের নিকটেও যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

শিশুর কৌতূহল

শিশুর কৌতূহল অতি প্রবল। এই কৌতূহল দমনের চেষ্টা না করিয়া যাহাতে তাহা চরিতার্থ হয় তাহা করিতে হইবে। অবশ্য, প্রশ্নের উত্তর শিশুর বোধশক্তির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। জন্ম ও কাম ব্যাপার ঘটিত নানা প্রশ্ন শিশু প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে। পিতামাতা শিশুর কোন প্রশ্নের কদাচ মিথ্যা উত্তর দিবেন না। লজ্জার বশে মিথ্যা জ্ঞান প্রদান করিলে তাহা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে যে কত অনিষ্ট উৎপাদন করে তাহা মনোবিৎ জানেন। কাম-ঘটিত প্রশ্নের উত্তরে শিশু যেটুকু বুঝিতে পরিবে, বা যেটুকুর জন্য সে কৌতূহল কেবল ততটুকুই বলা কর্ত্তব্য। বড় হইয়া শিশু বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ

করিলে তাহার নানারূপ সঙ্গদোষ ঘটিতে পারে। পিতামাতার উচিত, লজ্জা না করিয়া এ-সম্বন্ধে শিশুকে সাবধান করিয়া দেওয়া। অনেকের ধারণা, শিশুকে কাম-সম্বন্ধীয় কোন কথা না বলিলে সে বুঝি বড়ই পবিত্র থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে শিশু স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ এই সকল ব্যাপারের বিকৃত জ্ঞান অন্যান্য বালক-বালিকা চাকর-বাকর ও বাড়ির লোকের কথাবার্ত্তা, এবং পশুদের ব্যবহার হইতে আহরণ করে। এ-সকল লোকের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা নিতান্ত অনিষ্টকর—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিশু যদি প্রথম হইতেই পিতামাতার নিকট তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পায় তবে সে অসঙ্কোচে তাঁহাদের নিকট সমস্ত কথাই বলিবে, ফলে কুসঙ্গীদের সহিত মিশিবার আগ্রহ তাহার কমিয়া যাইবে। দেড় বৎসর বয়সের পর শিশুকে আর পিতামাতার সহিত একশয্যায় শুইতে দেওয়া উচিত নহে, এবং উপায় থাকিলে দুই তিন বৎসর বয়স হইতে শিশুকে পৃথক ঘরে শুইতে দেওয়া ভাল।

(ক্রমশঃ)

রোগীর পথ্য

কবিরাজ—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীর্ণজ্বর

জীর্ণজ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"ত্রিসপ্তাহব্যতঃ তস্য জ্বরো-যস্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদ কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥"

কিন্তু চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিবার কালে সাধারণতঃ দশ দিনের পরও যে জ্বর থাকে তাহাকে পুরাতন বা জীর্ণজ্বর বলিয়া ধরিয়া লইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। দশ দিনেও যদি জ্বর ত্যাগ না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দোষ রস-রক্তাদি ধাতুগত হইয়া নানা প্রকার বিকৃতি ঘটাইতেছে, সেইজন্য জ্বর ত্যাগ হইতেছে না। অথবা প্লীহা-যকৃৎগত হইয়া উহাদিগকে বৃদ্ধি করিতেছে। জীর্ণজ্বর কিনা তাহা পূর্ব্বে ঠিকমত চিনিয়া লইয়া পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

যাহাহউক, জীর্ণজ্বরে একেবারে উপবাস নিষিদ্ধ। একেবারে উপবাস করিলে শরীরের বল কমিয়া যাইবে। নূতন জ্বরে যেরূপ দুগ্ধ পথ্য নিষিদ্ধ, সেইরূপ পুরাতন জ্বরে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যদি শ্লেষ্মার প্রকোপ না থাকে, তাহা হইলে রোগীকে একমাত্র দুগ্ধপথ্যই জীবন দান করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একথা আপনারা নূতন জ্বর প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছেন।

পুরাতন জ্বরে বহু উপদ্রব থাকে। একই রোগীর যে বহু উপদ্রব থাকিবে এমন কোন কথা নাই। যদি রোগীর অজীর্ণ না থাকে তাহা হইলে ছাগ মাংসের যুষ দেওয়া যাইতে পারে। রন্ধিত মাংস দেওয়া উচিত নহে। এইরূপ কই বা মাগুর মাছের ঝোল ও দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর জন্য যে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাটনা না দিয়া মাত্র ধনে, গোলমরিচ ও সৈন্ধব মাপমত দিয়া মাছ তুলিয়া রাখিয়া রোগীকে ঝোল পান করিতে দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে জীর্ণজ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিকে পথ্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

অতিসার

এই রোগ যেদিন প্রকাশ পায় সেদিন রোগীর লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। লঙ্ঘন দিবার পর খৈএর মণ্ড অথবা অন্ন মণ্ড দধি বা ঘোল সহযোগে ব্যাধিত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। অতিসারে বেল একটি সুপথ্য। ভেদ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীকে বেল খাইতে দিলেও সুফল দর্শায়। যখন বুঝা যাইবে, রোগী আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে তখন অন্নপথ্য দিতে হইবে।

এক বৎসরের পুরাতন শালি ধান্যের (হৈমন্তিক) অন্ন, মৌরলা, জিয়ল অর্থাৎ কই, মাগুর প্রভৃতি মাছের ঝোল; দধি অথবা ঘোল পথ্য হিসাবে দিতে হইবে। এই ব্যাধি-পীড়িত রোগীর জন্য যে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাতে ধনে, জীরা, সামান্য মাপমত সৈন্ধব দিয়া রন্ধন করিতে হইবে। মাছের ঝোলে এইরূপ বিশেষ করিয়া ধনে ও জীরা দেয়ার উদ্দেশ্য, ধনে, ও জীরা অতিসারের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবশ্য মাপমত ব্যবহার করা উচিত; উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিলে উপকার না করিয়া অপকার করিবে।

এই ক্রম অবলম্বন করিয়া অবস্থাভেদে পথ্য প্রয়োগ করিলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সুফল অনিবার্য্য। রক্তাতিসারে যদি ছাগদুগ্ধে বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ ক্ষুধার সময় রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। অবশ্য দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিতে হইবে, নচেৎ অতিসারের রোগীর পক্ষে দুগ্ধ জীর্ণ করা অসম্ভব হইবে। যে পরিমাণ দুগ্ধ লওয়া হইবে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের আট ভাগের এক ভাগ বেলশুঁঠ দিয়া পাক করিতে হইবে। ফুটিয়া উঠিলেই নামাইয়া লইয়া পরিস্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া রাখিতে হইবে। জুড়াইলে রোগীকে সেবন করিতে দিতে হইবে। এই প্রণালীতে পাক করা দুগ্ধ একাধারে আহার ও ঔষধ উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে।

অতিসারে নিদ্রা অতি সুপথ্য। প্রথমে রোগীর যখন পুনঃ পুনঃ ভেদ হইতে থাকে তখন যদি রোগী নিদ্রিত হইতে পারেন তাহা হইলে নিদ্রা কাল পর্য্যন্ত ভেদ বন্ধ থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় নিদ্রা সেবনের পর আর ভেদ হয় না। অবশ্য অতিসারের প্রথমাবস্থায় ভেদ বন্ধ করার চেষ্টা করা চিকিৎসকের অনুচিত কর্ম্ম। তথাপি নিদ্রাদ্বারা যদি আপনা হইতে ভেদ বন্ধ হয় তাহাতে ক্ষতি নাই।

অতিসারের পথ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল। আর একটা কথা, যদি রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহা হইলে উক্ত বিধানানুসারে পথ্য প্রয়োগ করিবেন, নচেৎ জোর করিয়া নিয়ম রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

অজীর্ণ

বৈদ্যকশাস্ত্রে অজীর্ণ ব্যাপকার্থ বোধক শব্দ। বিসূচিকা পর্য্যন্ত ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে অজীর্ণ সম্ভব ব্যাধি। কিন্তু আমরা এস্থলে অজীর্ণ বলিতে আহার সুজীর্ণ না হওয়ার ফলে পেট-ফাঁপা, মলকাঠিন্য, দিবা রাত্রে বহুবার মল নিঃসরণ এবং অম্ল প্রভৃতি ধরিয়া লইয়া তাহার পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আজ বড়ই দুঃখের বিষয়, অজীর্ণ রোগে আমাদের দেশের বহু নর-নারী আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যহানি করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। ব্যাধি নিবারণের জন্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা নাই, তাই অল্প বিস্তর বহু লোকেই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। প্রথমে পুরুষের কথাই ধরা যাউক। বাল্য কাল হইতে সেই নয়টা দশটায় তাড়াতাড়ি অন্নগ্রহণ করিয়া বিশ্রাম না করিয়া স্কুলে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বিড়ম্বিত চাকুরী-জীবনেও সেই অবস্থায় কাটিতে থাকে। সেই নয়টা দশটায় খাওয়া আবার বৈকালে বাড়ী আসিয়া খাওয়া! এখন বলুন ত', এই ভাবে জীবন চলিলে স্বাস্থ্য ক'দিন ভাল থাকিতে পারে? অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যাধি উৎপন্ন হইবার অপরাধই বা কি? এ ত' পুরুষের পক্ষের কথা, আজ মেয়েদেরও এই অনিয়মের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তাঁহাদেরও পুরুষের ন্যায় স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিতে গিয়া পুরুষের মত কঙ্কালসার দেহ হইয়া পড়িতেছে।

এই অজীর্ণ ব্যাধি হইতে বহু মারাত্মক ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। পশ্চিমের আলোক প্রাপ্তা মেয়েদের অবস্থা ত' এই। যাঁহারা পশ্চিমের আলোক প্রাপ্ত হন নাই এরূপ মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি হইবার কারণ যথেষ্ট আছে। প্রথম কথা, অল্প বয়সে মাতৃত্ব লাভ। অবশ্য নারীত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্ব লাভ। তাই বলিয়া নারীত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বেই কন্যাগণকে মাতৃত্ব লাভ করিতে দেওয়া সমাজ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কদাচ উচিত কর্ম্ম নহে। তাহাতে সন্তানগণের স্বাস্থ্য ভাল হয় না এবং মাতারও স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। ফল, সূতিকা প্রভৃতি ব্যাধি। অল্প বয়সে কন্যাগণকে মাতৃত্ব লাভ করিতে না দেওয়ার পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বহু নির্দ্দেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

আর একটি ভয়াবহ সংস্কার, পর্দ্দা প্রথা! ইহাতেও অল্প বিস্তর মহিলাগণের স্বাস্থ্য-হানি হইয়া থাকে। জেলের কয়েদীদিগের ন্যায় মহিলাগণকে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাস্থ্য-হানি ঘটাইয়া জাতি ধ্বংশ করিয়া কোনই লাভ নাই। বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠের শান্তির কল্পনা কি বাঙালীকে চৈতন্য দান করিবে না!

এই অবরোধ প্রথার ফলে, এই অল্প বয়সে মাতৃত্ব লাভ করার ফলে বঙ্গের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিনী জননী ও ভগিনীগণকে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ-গ্রস্ত হইতে হয় এবং অকালে কালের কবলে নিপতিত হইতে হয়। অনেকে আরো সাথে সাথে চা ও পানের সহিত দোক্তা সেবন করিয়া ব্যাধি প্রবল করিয়া তুলেন। আজকাল অম্লের অসুখ হওয়া যেন কুলললনাগণের সহজ ব্যাধির ভিতর আসিয়া গিয়াছে। ঐ অজীর্ণ দোষ, একটু একটু ঘুস ঘুসে জ্বর, সঙ্গে একটু কাশি ও আছে এবং শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিলেই ভয়াবহ ব্যাধির আশঙ্কা

করিতে হইবে। জানিয়া রাখিবেন, ক্ষয় রোগে পুরুষ অপেক্ষা নারীই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমি সংস্কারক নহি অতএব এসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। প্রসঙ্গক্রমে অতি দুঃখের সহিত জানাইলাম।

অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে মনের অপ্রসন্নতা ঘটে, আহারে রুচি থাকে না এবং কোষ্ঠও ঠিক পরিস্কার হয় না। যদি পেট ফাঁপা, কোষ্ঠ কাঠিন্য মল ভেদ, অম্ল প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে খাদ্য এক পঞ্চমাংশ বা এক চতুর্থাংশ কমাইয়া দিতে হইবে এবং সাথে সাথে খাদ্যেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এক বৎসরের পুরাতন হৈমন্তিক চাউলের অন্ন মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে পাক করিয়া সেবন করিতে হইবে। প্রসারণীর (গাঁদাল) ঝোল অথবা পলতা, উচ্ছে বা হিঞ্চের ঝোল, জিয়ল মাছের ঝোল, দধি বা ঘোল সেবন করিতে হইবে। দধি বা ঘোলের সহিত ভাত মাখিয়া তাহাতে একমাত্রা ভাস্কর লবণ বা হিঙ্গাষ্টক চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিতে পারিলে ভাল হয়। অন্যথায় হিঙ্গু ২রতি ও জীরা চূর্ণ /০ আনা ও সৈন্ধব ২রতি মিশাইয়া সেবন করিলে চলিতে পারে। অজীর্ণ রোগীর আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। জল খাবারের জন্য ঘোলের সরবৎ, পেঁপে, বেলের-মোরব্বা, কুমড়ার মিঠাই প্রভৃতি সেবন করা যাইতে পারে। মুক্ত বায়ু সেবন করা এই রোগে একটি সুপথ্য।

যে সকল রোগীর কেবল কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে, তাঁহাদের রাত্রিকালে দুগ্ধের সহিত যাঁতায় ভাঙা লাল আটার রুটি উপযুক্ত পথ্য। লাল আটার রুটি ও দুগ্ধ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিস্কার হয়। দিবসে সর্ব্ব সমেত অন্ততঃ দুইটী হরীতকী সেবন করিলেও বিশেষ উপকার লাভ করা যাইতে পারে। যাঁহাদের মাত্র কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে, তাঁহাদের অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই; এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট।

অজীর্ণ রোগে বড় মাছ, দুগ্ধ, ঘৃত, আলু প্রভৃতি তরকারী, লঙ্কার ঝাল সেবন করা অনুচিত। এই রোগে রাত্রি জাগরণ বর্জ্জনীয়। শরীরের অবস্থা ভেদে স্নান আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার কারণ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কেন হয়, কি কারণে,
কবিতায় অর্পিলাম সংক্ষেপ তালিকা।
সবাকার কি দায়িত্ব মানব জীবনে,
ভেবে দেখ বৃদ্ধ যুবা বালক বালিকা।
জীবন কুসুম হেথা ক্ষণকাল রবে,
প্রতিদিন প্রতিপলে কমিছে প্রমাই।
ব্যাধির দংশনে যদি শুকায় নীরবে,
ব্যর্থ বন্ধু বিড়ম্বনা বিষম বালাই।
ক্ষুধা না থাকিলে, আর তাহার উপর,
অনিয়ম যদি হয় রোজ রাত্রি দিন।
" ডিস্‌পেপ্‌" দেখা দিবে দেহের ভিতর,
অম্লভাব প্রকাশিবে বিচ্ছেদ বিহীন।
তাড়া তাড়ি আহারের কি যে পরিণাম,
সাবধান আফিসের কেরাণী মানব।
ছুটাছুটি করা মিছে ব্যর্থ মনস্কাম,
ক্ষণেক বিশ্রামে কেন্ উদাস নীরব।

দশটা হইতে ছ'টা কলম হাঁকায়ে,
চলা ফেরা বন্ধ ক'রে চিন্তা মগ্ন থাকা।
এইরূপে একঘেয়ে জীবন বিকায়ে,
পরিণামে হাড় সার রোগে তনু ঢাকা।
ব্যবসায়ী-বিদ্যালয়ে পুস্তকের চাপে,
ছেলেরা মেয়েরা হায় লাবণ্য বিহীন।
দেখে'ও দেখে না কেহ গুরুজন, বাপে,
পরিশেষে এই রোগে দেহ হয় লীন।
নবেল পড়িয়া কিংবা তাসের খেলায়,
সময় কাটিছে আজো যে গৃহ লক্ষীর।
সাবধান হও দেবী এ ভ্রান্ত লীলায়,
দুষ্ট ব্যাধি আক্রমিবে দেহের মন্দির।
অনেক বিলম্বে বেশী তফাত তফাত,
অল্প আর অতিরিক্ত করিলে ভোজন।
রোগের কবলে হবে নিশ্চয় নিপাত,
প্রথমে উদরে পীড়া লিভারে বেদন।

অতি উষ্ণ ঠাণ্ডা দ্রব্য, মাংস গুরুপাক,
মদ্যপান প্রতিদিন আরম্ভ করিলে।
জীবনের লক্ষ্য পথে বিষম বিপাক,
আলেয়া আলোর মোহে অকালে মরিলে।
পরমাসে প্রতিকার নিশ্চয় কহিব,
কতদিন আর বন্ধু বেদনা সহিব।

কতিপয় রোগের বিশেষ ঔষধ

শক্তিসামর্থ্য লাভের উপায় ঃ— উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ও সম্পূর্ণরূপে হজমের অভাবেই শরীর নষ্ট হয়। সাধারণতঃ আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার সারাংশ খুব সামান্যই আছে। এই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত পরিমাণে দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করিবার ফলে দেহ অচিরেই বিনষ্ট হয়। তখন শক্তিসামর্থ্য বা কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না। এই প্রকার অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, "ভাইনো-মল্ট" নামক একটি ঔষধ শক্তিসামর্থ্য লাভের অমোঘ উপায়।

বহুমূত্র রোগের নূতন ঔষধ ঃ— বহুমূত্র রোগে 'ইনসুলিন' নামক একটি ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন করিয়া চিকিৎসা হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল ইমিনিউটী লেবরেটরী হইতে 'ওরেলিন' (Oralin) নামক একটি নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে। ইহা সেবন করাইয়া ব্যবহার করা হয়। ইহার কোনও প্রকার বিষাক্ত ফল হয় না বলিয়া ইহা অবাধে বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সকল কারণে ইহা 'ইন্‌সুলিন' অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইয়াছে এবং দেশে বিদেশেও ইহা যথেষ্ঠ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিলাতে লণ্ডন হাঁসপাতালে ডাঃ ও, লিটন্ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন।

অকাল বার্দ্ধক্য বন্ধ করিবার উপায় ঃ— আজকাল অকাল বার্দ্ধক্য যুবক যুবতীদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ইহার ফলে দেহ ও মন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহা বন্ধ করিবার একটি উপায় অতীব প্রয়োজনীয়। বহু চিকিৎসকের বিশ্বাস যে, 'ভাইরোজেন' নামক একটি ঔষধ এই অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকরী।

স্ত্রীরোগের অমোঘ উপায় ঃ— ঋতুসম্বন্ধীয় রোগে নারিগণ একবার আক্রান্তা হইলে সহজে নিরাময় হইতে পারেন না। এই অবস্থা বহুদিন যাবৎ স্থায়ী হইলে স্বাস্থ্য একবারেই ভগ্ন হইয়া যায়। এই প্রকার বহু রুগ্না নারিগণের উপর ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 'হর্ম্মোজেন' নামক একটি ঔষধ এইরূপ গুরুতর অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্ষয়রোগের ঔষধ ঃ— সর্ব্বপ্রকার রোগের পরিণামে এই ক্ষয়রোগ উপস্থিত হইতে পারে। ইহা একবার দেহে প্রবেশ করিলে সহজে দূর হইতে চাহে না। সাধারণতঃ উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে এই অবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষরূপে পরীক্ষা করতঃ দেখা গিয়াছে যে, 'কাইনোজেন' নামক একটি ঔষধ এই অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রসূ।

রক্তহীনতার অমোঘ ঔষধ ঃ— সকল প্রকার গুরুতর রোগের পরিণামে রক্তহীনতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঠিক সময়মত ধরা না পড়িলে এই রোগ যখন ক্রমশঃ জটিল হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর কোন ঔষধই কাজ করে না। সম্প্রতি 'হিমো-লিভারেক্স' নামে একটি ঔষধ বাহির হইয়াছে। বহু বিখ্যাত চিকিৎসকের অভিমত যে, রক্তহীনতায় ইহা একটি অমোঘ ঔষধ।

দুর্ব্বলতার ঔষধ ঃ— রক্তহীনতা ও তৎসহ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বাল্যের খাদ্যাভাবজনিত ক্ষীণতা, দীর্ঘকালস্থায়ী ফুসফুসের রোগ, বেরিবেরি ও খাদ্যাভাবজনিত দুর্ব্বলতা, কর্ম্মে অনাশক্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ প্রভৃতি অবস্থায় 'রেডিও-হিমোজেন' নামক একটি ঔষধ বিশেষরূপে কার্য্যকরী।

মেকি

শ্রীসুশান্তকুমার সিংহ

ভাই শোভা ঃ

তোর চিঠিটার উত্তর দিতে একটু দেরী হল, তার জন্য কিন্তু রাগ করিস্ না, শরীরটা ভাল নাই, আর মনও না সেই জন্য প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তোকে সকালে লিখব বলে মনে করিতাম আর সকালে, সন্ধ্যার দোহাই দিতাম—আজ কয়দিনের সকাল সন্ধ্যার সমবেত চেষ্টার ফলে লিখ্ছি—আর তোকে লেখা ত' দু' চার লাইনের কাজ নয়! বাপ্ কি জেরাই না করেছিস্! উকীলের স্ত্রী কিনা ?

তোর সমস্ত চিঠিটার মধ্যে নানা ভাব ভাষার ছলে একটা প্রশ্নই ভেসে উঠেছে যে, কেন আমি বিয়ে করতে রাজী নই, টিপ্পনি কাটতেও ছাড়িসনি, কাউকে লুকিয়ে ভালবেসেছি কিনা অর্থাৎ প্রেমে আরও অর্থাৎ লভে পড়েছি কিনা অথবা আধুনিক মেয়ের মত সিষ্টার হ'য়ে দেশের কাজ করব কিনা ? অবশ্য আমি যে আধুনিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু লভেও কারুর পড়ি নাই বা সিষ্টার হবার মত সদিচ্ছাও নাই। আরও দশজন সাধারণ মেয়ের মতই আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠে সেই এক শুভ লগ্নের জন্য—যেদিন সাহানার সুরে উৎসব কোলাহলের মধ্যে অপরিচিত —লাজ কম্পিত দুটী কর নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব। আমার মনের মধ্যে আজ ও কল্পনার ছবিতে গৃহ-জীবনের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে, যেন—দীপ্ত সিন্দুর শিখা মণ্ডিত হইয়া কোন সুদূরে এক পল্লী অগণে স্বামী সেবা করিতেছি-সেখানে বর্ণ ও গন্ধের সমাবেশ, অফুরান্ত আনন্দের লহরী। সত্যি, বলছি ভাই এত মধুর এই কল্পনা যে আমি এক এক সময় তন্ময় হইয়া উঠি কিন্তু পরক্ষণেই কল্পনার কামনাকে কল্পলোকেই রাখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিজিসের পাতাটা খুলে বসি। সমস্ত সাধারণ নারীর মতই আমার হৃদয়ের অন্তরাত্মা যা হইবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে বুকটা এক অনাস্বাদিত আনন্দ পাইবার আশায় অধীর হইয়া উঠিলে উপায় নাই-- না—না—নাই, আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তি যে আমায় পেতেই হবে।

কথাটার মানে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়ত একটু কষ্ট হবে। বাপমায়ের আদরের দুলালী, বিবাহের সম্বন্ধ ত আসিতেছে নানা জায়গায় আমার সকল আশা পূর্ণ হবার মধ্যে কোনও বাধা যখন নাই তখন কেন এই বেদনা, এই অতৃপ্তি। এই রুদ্ধ যাতনায় অগ্নিস্রাবী দহনে কেন নিজেকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিতেছি। আজ আমার দীর্ণ নারী হৃদয়ের অন্তরালে যে কয়টী কথা অশ্রুসাগরের অতলতলে লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলান তাই তোকে জানাইব।

আমার যৌবন শ্রীমণ্ডিত (?) সুসজ্জিত দেহ অনেকের মনে নাকি মায়ালোকের সৃষ্টি করে। আমার কণ্ঠের গান অনেককে মুগ্ধ মত্ত করে, পাশের

সার্টিফিকেট অনেককে আলেয়ার মত আকর্ষণ করে—আমি নাকি রূপসী অপর্য্যাপ্ত কেশ—সাপের মত বাঁকিয়া পিঠ বহিয়া দেহ জড়াইয়াছে কজ্জলকৃষ্ণ চক্ষু দুইটীও যে আমার রূপের অঙ্গ তা' আমি জানি কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে আসল মানুষ আমি নাই। যে বালিকা প্রফুল্ল কুন্দ নলিনীর মত দিন দিন বাড়িয়া উঠিয়া পিতামাতার নয়নের মণি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহা সূর্য্যাতাপ মলিন শতদলের মত একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। আমাকে আমি নিজে হত্যা করেছি, এক দিনে নয়—দিনে-দিনে, পলে পলে।

বিদুষী মেয়ে—এই খেতাবটা কিনিবার জন্য আমায় কি করিতে হইয়াছে জানি। নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। প্রভাত সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি শিশির-সিক্ত পত্র ও পুষ্পের উপর পতিত হইবার পূর্ব্বেই চা-বিস্কুট খেয়ে বইয়ের পাতা খুলে ম্যাধরাজার বংশাবলী আলোচনা করিতাম—না হয় জ্যামিতির প্রবলেম নিয়া মাথা ঘামাইতাম। তারপর আটটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে ডাক পড়িত 'বাবা গাড়ী আয়া'—কাজেই দুটো আলু ভাতে ভাত কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে গাড়ীতে উঠিতাম। আর গাড়ীখানাও তেমনি—পাছে আমাদের শুচিতা কারুর দৃষ্টিপর্শে নষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য এমন ভাবে দরজা জানালা বন্ধ থাকিত যে সূর্য্যের প্রখর আলোক সেই বূহ ভেদ করিয়া আমাদের স্পর্শ করিতে ভয় পাইত।

ফিরে যখন আসিতাম তখন দূরে দিকচক্রবাণে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। দুখানা শুকনা রুটী আর চা খেয়ে সন্ধ্যার প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়িতে বসিতাম। রচনা. অঙ্ক প্রভৃতি অনেকগুলি কিছু এই সময়ের মধ্যে করিয়া কাল নিয়া যাইতে হইবেই। এমনি ভাবে অনাহারে বিনা ব্যায়ামে আলো বাতাসের অভাবে—পাশের পর পাশ যেমন দিয়াছি তেমনি নিজের স্বাস্থ টাকে হারিয়ে কঙ্কালসার হইয়া উঠিয়াছি।

রুজ পাউডারের অন্তরালে আমার নিজের স্বরূপ মূর্ত্তিটাকে দেখিয়া আমি নিজেই শিহরিয়া উঠি। সমস্ত শরীরটী যেন একটী সুদীর্ঘ সরল রেখা, নাকটা বকের ঠোঁটের মত বেরিয়ে পড়েছে। চোখ দুটী কোটরগত। একটু দাঁড়াইলে সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে ঘুরিয়া উঠে—চশমা ছাড়া দুনিয়া ঝাপসা দেখায়, অর্গানে গান আসে না কান্না আসে। সামান্য যা ক্ষুধা ছিল—অনাহারে তাও কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। হায় একদিন এই পড়ার প্রাইজ নিয়ে আমোদ করেছিলুম, অপরাজেয় দুরাকাঙ্ক্ষার উন্মত্ত উল্লাসে নিজেকে অবেহেলা করেছিলাম, তখন কি জানতুম যে আমার অদৃষ্টাকাশে একখানি মেঘ নিষ্ঠুর কৃষ্ণ যবনিকা রহিয়াছে। সেদিন অন্ধকার গৃহে যে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিয়তির নির্ম্মম ফুৎকারে চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল।

মানুষকে খুন করিলে নাকি ফাঁসি হয়। নিজের দেহটাকে নিজে নষ্ট করিবার চেষ্টা করাও নাকি অপরাধ কিন্তু এই যে দিনের পর দিন ধরিয়া আমি নিজেকে যে তিলে তিলে হত্যা করেছি, তার কি শাস্তি আমায় দিয়াছে বরং আমার সুখ্যাতিতে পাড়ার পাঁচজন পঞ্চমুখ হয়ে উঠিয়াছে, খবরের কাগজে ছবি বাহির হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত আত্ম-তৃপ্তির মধ্যেও আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে—আজ আমি একা।—

এ কি বিদ্যাশিক্ষার দোষ। না---তা—নয় কিন্তু প্রণালীর যে দোষ সে কথাটা হাজার বার বলিব,

এ অভিজ্ঞতা যে আমার প্রাণের বিনিময়ে হইয়াছে। সকাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রুদ্ধগৃহে, অর্দ্ধাশনে বইয়ের পর বই মুখস্থ করার নাম যে বিদ্যাশিক্ষা নয় সেকথাটা উচ্চৈঃস্বরে মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে আমি ভয় পাই না। মানুষের দেহে যে ব্যায়াম, বিশ্রাম, আলো, বায়ু, দরকার, এই সহজ সরল সত্যকে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্বাস্থ্য, উদ্যমকে মা সরস্বতীর চরণতলে অঞ্জলি দেওয়ার নাম বিদ্যাশিক্ষা নয় কিছুতেই নয়। হয়ত তুই বলবি যে কেন স্কুলে ব্যায়াম করা হয় কিন্তু একবার বুকে হাত দিয়া বল্ দেখি যে সে কি সত্যই ব্যায়াম। সপ্তাহে একদিন দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড রৌদ্র কিরণে আধ ঘণ্টা ড্রিল করার নাম হয়ত ব্যায়াম হইতে পারে কিন্তু সে ব্যায়াম দেহের উন্নতি না করিয়া ধ্বংশের পথেই মানুষকে লইয়া যায়। ফলে যে মেয়েটী রূপের, স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার লইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে চায়, কিছু দিনের মধ্যেই তার সে রূপ বিদ্যার আগুনে দগ্ধ হইয়া যায়, তার সকল লাবণ্য সুষমার উপর একটা অবসাদের অন্তর্যাতনার কালিমা আসিয়া পড়ে।

এই জন্যই আমি বিবাহ করিতে চাই না। আমার এই গিল্টিকরা রূপ দেখে যে আমায় আদর করিয়া নিয়া যাবে তার কাছে যে অল্পদিনের মধ্যেই আমার স্বরূপ ধরা পড়ে যাবে আমি যে আসল নই। মেকি, এই সত্য যখন সে উপলব্ধি করবে তখন—তখন কি আর সে আমায় আদর করবে—যত্ন করবে? আর তা' ছাড়া সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া যখন তিনি আসবেন একটু সেবা পাবার আশায় উন্মুখ হবে, তখন আমি হয়ত রোগশয্যায়—বেদনায় তাঁরই সেবা দাবী করব। আমি তাঁর সুখে সঙ্গিনী, দুঃখে সান্ত্বনাদায়িনী, রোগে শুশ্রূষাকারিনী হয়ে তাঁর চিত্তকে আমার ক'রে নিতে পারব না বরং আমার এই ক্ষণভঙ্গুর চিররুগ্ন দেহটাকে নিয়ে তাঁকেই বিব্রত হইতে হইবে, তারপর যদি কখনও আমার সন্তান হয়, তাদের অবস্থা—না—সেইজন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আর নয়—নিজেকে হত্যা করিয়াছি, তার জন্য আমি দায়ী, আর কাহাকেও আমার এই দগ্ধ হৃদয়ের সংশ্রবে আনিয়া তাহাকেও হত্যা করিব না। স্বহস্তে আগুণ জ্বালাইয়া নিজেকে দগ্ধ করিয়াছি, মঙ্গল ঘট ভাঙ্গিয়াছি, তাহার শাস্তি এক আমিই ভোগ করিব।

আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে, কেন আমার এই শাস্তি। হায়, যদি পাশের লোভে, মরীচিকার পশ্চাতে না দৌড়াইতাম, যদি সহরের মেয়ে না হইয়া বাংলার কোন শ্যামল পল্লীর কোন এক নিভৃত অংশে জন্মগ্রহণ করিতাম, তবে হয়ত সেবা পরায়ণা, গৃহকর্ম্ম নিপুণা হইয়া সত্যই কাহার ঘর আলো করিতাম। ব্যর্থ মাতৃত্বের হাহাকারে এমনি ভাবে ব্যাকুল হইতাম না, কিন্তু হায়, যেখানে আশা যত বেশী সেখানে কি নিরাশাও তত বেশী।

যাক্! আমার মর্ম্মবেদনা শুনিয়াও কি তুই আজ আবার আমায় গৃহের ভার নিতে বলিস্! এমনি ভাবে গভীর ক্লান্তির মধ্যে, জীবনের বাকী দিন কাটিতে, অবসাদ খিন্ন দেহ যৌবনের ঊষায় যেদিন মৃত্যুর তুষার শীতল স্পর্শে শান্তি পাবে সেইদিন আমার সত্যই শক্তি। এই দুর্ব্বিসহ জীবনের বোঝা নামাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।

কেমন আছিস্? খুকু কেমন আছে? কার মতন দেখিতে হয়েছে? তাকে আমার 'কিসি' দিস তুই আর তোর 'উনি' আমার ভালবাসা জানিস্। চিঠির জবাব দিতে যেন আমার মত দেরা করিস্ না।

ইতি—তোর আভা।

দরদী

শ্রীযতীন মিত্র

রামনগরের জমিদার রামকমলবাবুর জীবিত কালেই তাঁর সংসারের মধ্যে মনমালিন্যের সূত্রপাত সুরু হয়। তিনি চারটি পুত্র রাখিয়া হঠাৎ একদিন হার্টএর অসুখে মারা যান। বড় শ্রীশচন্দ্র পিতার জীবিতকালে বিষয় সম্পত্তির দেখা শুনা করিতেন। মেজ এবং সেজ হরিশ ও জ্যোতিষ তখনও লেখা পড়া করিত। কনিষ্ঠ সতীশএর বয়স তখন সবে ৯ বৎসর। ছোট ছেলেটী, সদাহাস্যময়, গ্রামের সকলকারই প্রিয় ছিল। রামকমলবাবুর মৃত্যুর সময় শ্রীশ ও হরিশের বিবাহ হয়েছিল কিন্তু শ্রীশচন্দ্র অল্প বয়সেই বিপত্নীক হন এবং দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেননি।

গ্রীষ্মকাল। বাহিরে সেদিন যেন গরমটা অত্যধিক মনে হচ্ছিল। বাড়ীর সকলকার খাওয়া দাওয়া তাড়াতাড়ি সারা হয়ে গেছলো। হরিশের স্ত্রী সরলা সবেমাত্র নিজের ঘরে বসে একটী বই পড়তে সুরু করেছেন এমন সময় সতীশ কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে প্রবেশ করলে। বাড়ীর মধ্যে সতীশকে সরলা আর জ্যোতিষ সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসত। তারও যা কিছু মনের কথা হতো ঐ দুটী প্রাণীর সঙ্গে। ৯ বৎসরের বালক তার মেজ-বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে হঠাৎ প্রশ্ন করলে "আচ্ছা বৌদি তুমি আজকাল আমায় ভালবাস না?" সরলা বইটী পাশের টেবিলে রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কি করে জানলে?" সে তখন আবল তাবল কত কি কথা বলে গেল—"আমায় তুমি ছবির বই দেবে বলেছিলে দিলে না, শুতে আসবার সময় একবারও ডাকলে না" ইত্যাদি। সরলা তাকে আদর করে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল "কেন, আমি তোকে ডাকিনি বলে রাগ কর্ত্তে আছে, ছিঃ? আমি দেখলুম তুই মার কাছে বসে গল্প শুনছিস্ তাই তোকে ডাকিনি বলে রাগ কর্ত্তে আছে, ছিঃ? "ছি ছি কাঁদতে নেই. আমি তোমার ছবির বই কালই আনিয়ে দেব ঠাকুরপোকে দিয়ে।" হরিশ এমন সময়ে ঘরে এল। হরিশের মেজাজটা ছিল অন্ততঃ রুক্ষ। তার চোখে বাড়ীর কোন কাজটাই সুন্দররূপে সমাধা হতো না। সকলকার ব্যবহারই তার কাছে বিসদৃশ ঠেক্‌তো। সতীশকে তার মেজ বৌদির কোলের মধ্যে কাঁদতে দেখে তার কাছে স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লো। তীব্র স্বরে বলে উঠলেন "বাঁদর ছেলে, লেখা পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কেবল দিনরাত লোকের সঙ্গে ফুষ্টি নাষ্টি করা হচ্চে।" সতীশ মেজদার গলার স্বর শুনে ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কোন রকমে জবাব দিল "কেন মেজ বৌদি আমায় শুতে আসবার সময় ডাক্‌লে না?" হরিশের গলার স্বর একপর্দ্দা চড়ে গেল "বেশ করেছে ডাকেনি? সারাদিন রাত এই হচ্ছে। দূর হয়ে যা এখান থেকে হতভাগা ছেলে, আবার যদি

কোন দেখি এই রকমের ন্যাকামী করে বাড়ীময় বেড়ান হচ্চে তাহলে বাড়ী থেকে দূর করে দেব।" তারপর সরলাকে উদ্দেশ করে বল্‌লে "ফের যদি দেখি তুমি ঐ হতভাগাটাকে এই রকম করে 'নাই' দিচ্ছ ত আমি বাড়ী ছেড়ে যাব।" সরলার সমস্ত প্রাণটা কেঁপে উঠলো। সে বেশ ভালরকমই জানত তার স্বামীর মুখের কথার দাম কতটা। সতীশ দ্বিতীয় কথা না বলে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

সতীশ সোজা গিয়ে হাজির হলো তার সেজদার ঘরে। সেজভাই জ্যোতিষ তার ছল ছল চোখ দেখেই কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করে জিজ্ঞাসা করলে "কিরে সতু, মেজদা বুঝি বকেছে, তোকে এত করে বলি বৌদিদের দাদাদের মান্য করে চলবি তাত তোর হবে না। কেবল তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া কর্ব্বি।

সতীশ চোখ দুটীকে বেশ করে মুছে নিলে তার-পর জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা সেজদা কি রকম করে মান্য কর্ত্তে হয়?"

জ্যোতিষ—"কেন, এই আপনি বলে কথা কইবি। যা জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন তাছাড়া অন্য কথা বলবি না। যা বলবেন তা শুনবি।"

সতীশ যেন কেমন একটু চঞ্চল হয়ে পড়লে "তাহলে তোমাকেও আপনি বলতে হবে তাহলে! না সেজদা, তোমায় আমি আপনি বলবো না? রাগ কর্ব্বে না?"

"নারে পাগলা আমায় তোকে আপনি বলতে হবে না।"

সতীশ যেন খানিক তার হারাণো উদ্যম ফিরে পেল। কোন কথা না বলেই ছুটে গেল তার মার কাছে। তার মা তখন পাড়ার সুধা পিসীর সঙ্গে পাড়াতে বোসদের বাড়ীতে যে বিয়েটা হয়ে গেছলো তারই আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। সতীশ তার মার কাছে জিজ্ঞাসা করে বস্‌লো "মা! আমি দাদাদের সঙ্গে এবার থেকে আপনি বলে কথা কইব। তোমার সঙ্গেও কি আপনি বলে কথা কইতে হবে!" সৌদামিনী ওরফে সতুর মা হঠাৎ সতীশের কথা শুনে চমকে গেলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন "হাঁরে হঠাৎ ও কথা বল্লি কেন? কি হয়েছে।"

সতীশ তখন সকল কথাই তাঁর কাছে বলে গেল এবং সেজদা তাকে যে সব কথা বলেছে তাও বলতে ভুল্লে না। সৌদামিনীর অজ্ঞাতসারেই একটী দীর্ঘ-শ্বাস তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সতুতে কাছে টেনে নিয়ে কোলের কাছে বসিয়ে বলতে লাগলেন, "না বাছা, আমায় তোকে আপনি বলতে হবে না যতুদের আপনি শোনবার ইচ্ছা হয়েছে শোনাস।" সতীশ তারপর বিশেষ কোন কথা না বলে মার কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

২

আজ প্রায় ১৫ দিন হয়ে গেছে হরিশচন্দ্রের কাছ থেকে ধমক খাবার পরের দিন সে যখন একলা নিজের ঘরে বসে ছিল ও তার মেজ-বৌদি পিছন থেকে এসে তার চোখ দুটী চেপে ধরেছিল এবং তার মেজ দা সেদিন বজ্র-গম্ভীরস্বরে তার মেজ-বৌদিকে তার সঙ্গে কথা কইতে দিব্যি দিয়ে বারণ করে দেন। সতীশ যেন সেদিন থেকে একটী নূতন মানুষ হয়ে গেছে। মনের মধ্যে তার শত ঝড়ের সূচনা হলেও তাকে সে প্রকাশ হতে দেয় না। মনটা তার কথা কইবার জন্য পাগল হয়ে উঠে মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই ৯ বৎসরের বালক তার মনের দুয়ার একেবারে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। জ্যোতিষের সঙ্গেও

আজকাল আর বিশেষ কথা কয়না। সমস্ত বাড়ীটায় একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়লো।

এ রকম অবস্থায় একদিন সকালে সতীশের মা দেখেন সতীশের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ছেলে একেবারে নিঃসাড় হয়ে পড়েছে। মার প্রাণ হঠাৎ অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠলো। ছেলেদের ডেকে বললেন। তারা এসে কয়েকদিন অপেক্ষা কর্ব্বার কথা বলে চলে গেল।

সতীশ আজ ৫ দিন হলো ভীষণ জ্বরের প্রকোপে এক রকম জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে আছে। আজ সকাল থেকে কেবল ভুল বকছে। সৌদামিনী আর থাকতে না পেরে জ্যোতিষকে ডেকে তাঁর কয়েকখানি গহনা বাঁধা দিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসবার কথা বললেন। জ্যোতিষ তার দাদাদের ভাল রকমই চিনতো। সে আর কোন কথা না বলে গহনাগুলি বাঁধা রেখে ডাক্তার আনতে গেল। সেখানকার Civil Surgeon ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে যখন বাড়ী এল তখন তার দাদারা বাহিরে কোথায় বেড়াতে গেছেন। সতীশের ঘরে ডাক্তারকে নিয়ে জ্যোতিষ যখন প্রবেশ করলো, তখন সতীশ তখন ভুল বকছে—"আমি আর দুষ্টামি করবো না, তোমাদের সঙ্গে কথা আর আমি কইবো না মেজ-বৌদি।" ডাক্তার দেখে বল্লেন "এই অল্প বয়সে ভয়ানক মানসিক উত্তেজনার জন্যে এরকম হয়েছে। রোগটা এখন climax এ উঠেছে। বাঁচবার আশা কিছুই দেখিনা।" কয়েকটি ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন।

হরিশ যখন বাড়ী এল তখন মা সতীশের শিয়রে বসে মাথায় বরফ দিচ্ছেন। হরিশ ঘরে এসে সরলার কাছ থেকে যখন শুনলে যে ডাক্তার এসেছিল তখনই কোন কথা না বলে চলে গেল সোজা নিজের ঘরে। যাবার সময় মাকে শুধু বলে গেল "মা আমাদের বল্লে কি আমরা ডাক্তার আনতুম না।"

জ্যোতিষ ডাক্তারের মুখে সকল কথা শুনে আর স্থির থাকতে পার্লে না—ছুটে গেল তার মেজ-বৌদির ঘরে। সরলা আকুল আবেগে ধূলায় পড়ে কাঁদছে। তাকে দেখেই "সতু আমার কেমন আছে" বলে উঠলেন। জ্যোতিষ সকল কথা বলতে গিয়ে দেখে তার মেজদা ঘরের মধ্যে বসে আছেন। যা বলবার জন্যে গিয়েছিল তার কোন কথাই বলা হলো না। শুধু "ভাল নেই" কথাটা বলে চলে এল। সতীশের ঘরে এসে দেখে "মা" সতীশের মাথায় আইস্-ব্যাগ ধরে নিঃশব্দে কাঁদছেন। সতীশও একটু চুপ করে আছে। সতীশ ঘুমাচ্ছে ভেবে ঘর থেকে যেই বেরিয়ে আসতে যাবে তখনই সতীশ বিকট চীৎকার করে উঠলো "আমি ভাল হব মেজদা, আমায় অমন করে বকো না—উঃ মা, জল—মেজ বৌদি তুমি—" আর যে কি বলে গেল বোঝা গেল না। সরলা চীৎকার শুনে সতীশের ঘরে ছুটে এল এবং শেষ কথাটা তার কানে এল। তার জ্ঞানশূন্য দেহ দরজার সামনে লুটিয়ে পড়লো। ঘরের মধ্যে তখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

* * *

দিন পাঁচ ছয় পরের কথা। সরলার ঘর ডাক্তারে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে। সকলেই বলছে। 'Excusive Mental exercise হওয়ার দরুণ Brainএ বড্ড বেশী রকম ঘা লেগেছে। ডাক্তার ব্রাউন যাবার জন্যে ঘর থেকে বেরোবামাত্র হঠাৎ সরলা চীৎকার করে উঠলো "সতু দাঁড়া দাঁড়া আমি যাচ্ছি, কাঁদিস না ভাই। আমি তোর জন্যে নূতন ছবির বই আনিয়েছি।" বলেই কেমন যেন নিস্তেজ

হয়ে পড়লো। তৃপ্তির হাসিতে মুখটা ভরে উঠলো। দৃষ্টি তার স্থির হয়ে রইল হরিশের উপর। ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি এসে একজামিন করে দেখে হার্টএর কোন আর সাড়া নেই।

মুক্ত আত্মা চলে গেল রেখে গেল সহস্র বাধা ঘেরা দেহের কঙ্কাল।

খেয়ালী।

আয়ুর্ব্বেদ-নিন্দা

বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টতা।

(ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম্ ডি)

কিছুদিন হইল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের (Indian Medical Gazette) এপ্রিল সংখ্যা আমার হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদকে চিকিৎসা-শাস্ত্র (Science) বলা যায় না, অতএব আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত অন্যায় এবং তাহাতে প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির পথ অবরোধ করা হয়। আজ কাল অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসকই আয়ুর্ব্বেদকে অজ্ঞানের আকর ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া থাকেন। অতএব তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমরা এই বিষয়টী সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যদি আয়ুর্ব্বেদের মূলে কিছুই সত্য না থাকে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানই সত্যের একমাত্র অধিকারী হয়, তাহা হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, গভর্ণমেণ্টের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত ও অমূলক আয়ুর্ব্বেদের প্রচার জন্য অনর্থ অর্থ ব্যয় করা উচিত নহে।

অতএব সর্ব্বপ্রথমেই বিচার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কাহার মূলে কতটুকু সত্য আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যাহাকে বিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন সেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আজ অবধি স্থায়িত্বের রেখাপাত হয় নাই। বিজ্ঞান বলিতে বিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের স্বরূপই এই যে, সম্যক্‌জ্ঞাত বস্তু চিরকালই এক ভাব থাকে। দিন আসে দিন যায়, বৎসর আসে বৎসর যায়, যুগ আসে যুগ যায়, সত্য একবার যে রূপে দেখা দেয়, চিরকালই সেইরূপ বিরাজমান থাকে। কালবশে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। কেবল সত্যেরই পরিবর্ত্তন নাই, সত্য সনাতন। পরিবর্ত্তন-বিরহই তাহার বীজ। চঞ্চল বস্তু কখনই সত্য হইতে পারে না। একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। উন্নতির দোহাই দিয়া সনাতন সত্যে

পরিবর্ত্তনের ছায়াপাত করা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যে বিজ্ঞানের গন্ধমাত্র নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে আজ যাহা বলে কাল তাহা উল্টায়। যাঁহাদের কথার একদিনের স্থিরতা নাই, তাঁহারা কি করিয়া যে বিজ্ঞানের ও সত্যের অভিমান করেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাঁহারা নবীন উন্নতির মোহে সত্যের স্বরূপ বিস্মৃত হন নাই, তাঁহারা ইহাঁদের বৃথা আস্ফালনে আত্মবিস্মৃত হন না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেমনিই পরিবর্ত্তনশীল, আয়ুর্ব্বেদ তেমনই পরিবর্ত্তন-রহিত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদে যাহা বলা হইয়াছে আজও তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজমান। উন্নতি মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান যদ্রূপ সর্ব্বদাই বাদ প্রতিবাদ শ্রান্ত, ত্রিকালদর্শী জ্ঞান প্রসূত আয়ুর্ব্বেদ তদ্রূপই উন্নতির বৃথাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বাদ প্রতিবাদরূপ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল নির্দ্বন্দ্ব। অধিকন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আত্মাভিমানে অভীভূত হইয়া যে সব শাস্ত্রীয় সত্যের উপর অজস্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিত, কালক্রমে সেই সকল সত্যের মধ্যে অনেকগুলিকেই একে একে স্বাভিমান চূর্ণ করিয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, লক্ষ্য অতি উচ্চ। আর্ত্তজনের দুঃখ প্রশমন ও যথাসম্ভব রোগ-শান্তিই আয়ুর্ব্বেদের একমাত্র লক্ষ্য।

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ॥

যে ঔষধে রোগীর রোগ দূর হয় তাহাই প্রকৃত ঔষধ। যিনি রোগীকে রোগ মুক্ত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতৎ বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ

ব্যাধির নিদানজ্ঞান এবং রোগীর দুঃখ শান্তি করাই বৈদ্যের বৈদ্যত্ব। আয়ু না থাকিলে আয়ু দান করা বৈদ্যের কার্য্য নহে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন। আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসার যে মহান উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হইল, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে সেই উদ্দেশ্য দুষ্ট। পাশ্চাত্য চিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাদের তাৎকালিক ভ্রান্ত মতের অনুসরণ। রোগী বাঁচে কি মরে তাহাতে তাঁদের ক্ষতিবৃদ্ধি ত নাই-ই, বরং তাঁহাদের ভ্রান্ত মত ত্যাগ করিয়া রোগীর প্রাণ দিলে বিষম দোষভাগী হইতে হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্য নেশায় জ্ঞানহারা হন নাই, তাঁহাদের এ কথা বুঝাও কঠিন, ভাবিতেও কষ্ট হয়! কিন্তু ইহা আসলেই অতিরঞ্জিত নহে।

বিলাতের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসন নামক সভা বিলাতের পণ্ডিত কৃতি চিকিৎসকগণে সুশোভিত। সেই সভার কথা, সকলের নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সংশয় নাই। ডাক্তার এক্সহামের (Dr. Axham) প্রতি তাঁহাদের আচরণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের মত তাঁহাদের সাময়িক প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া রোগীর আরোগ্যের কারণ হইলে তাঁহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইংলণ্ডে বার্কার নামে এক ব্যক্তি (এখন তিনি স্যার হারবার্ট বার্কার) পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান না শিখিয়া, চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য

হন। ডাক্তার এক্সহ্বাম (Dr. Axham) তাঁহাকে সাহায্য করেন। আনাড়ী ডাক্তারকে সাহায্য করিয়া ভূরি ভূরি মনুষ্যের দুঃখ দূরীকরণরূপ দুরপনেয় অপরাধে তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। চিকিৎসকদল হইতে তিনি বহিষ্কৃত হইলেন কিন্তু সত্যের অপলাপ করা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত হইল। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের ক্ষমতা অতিক্রম করিল। গৌণ অপরাধীর অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইল বটে, কিন্তু মুখ্য অপরাধীর অপরাধ দোষ না হইয়া গুণে পরিণত হইল। একযাত্রায় পৃথক্ ফল। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের উদার চেষ্টা সত্ত্বেও বার্কার জনসাধারণের অকুণ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হইয়া নাইট্ উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, বার্কারের উপাধি প্রাপ্তিতে এক্স্হ্যামের (Axham) অপরাধের মার্জ্জন হইল। কিন্তু সত্যপ্রিয় ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের কাছে তাহা হইবার নহে। Axhamএর দণ্ড অক্ষুণ্ণ রহিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সত্যপরায়ণতার পরিচয়ও অক্ষুণ্ণ রহিল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসার মাসিক পত্রগুলি পড়িলে একেবারেই আত্মহারা হইতে হয়। প্রত্যেক কাগজেই অক্ষুণ্ণ সত্যের অচল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণগুলি সর্ব্বদাই পরস্পর বিরোধী। কেহ কাহারও সহিত মিলে না। ইহাতেও তাহাদের হেয়ত্বের জ্ঞান হয় না ইহাই বড় বিস্ময়ের বিষয়। রোগের নিদান কি, অদ্যাবধি তাহার প্রকৃত উত্তর পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পাওয়া গেল না। কালচক্রের আবর্ত্তনে যেমন দিনের পর দিন আসে, তেমনই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবর্ত্তনে উত্তরের পর উত্তর আসে--বিরাম নাই, অন্তও নাই। বলা বাহুল্য নিষ্পত্তি সুদূর পরাহত। তবে একটা জিনিষ আছে, যখন যেটা বলা হয় তখন সেটাই খাঁটি একমাত্র সনাতন সত্য। আজকার সত্য কালকার সত্যের বিরুদ্ধ। তথাপি উভয়ই সত্য নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মিথ্যার গন্ধমাত্রও নাই। কেবল সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদাদিই মিথ্যার আকর। দুদিন আগে জীবাণুগণই (bacilli) রোগের একমাত্র কারণ ছিল। এখন কিন্তু তাহারা উচ্চাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া দেহান্তরস্থ গ্রন্থি সমূহের (endocrine system) বশ্যত্ব স্বীকার করিতেছে। আবার হয়ত অতি অল্প দিনেই এই সদ্যোজাত শিশুর অন্তিম সময় উপস্থিত হইবে এবং রক্তের ক্ষারত্ব ও অম্লত্ব ব্যঞ্জক P H-ionএর ন্যূনাধিক্যই রোগের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই চক্রবৎ আবর্ত্তনশীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা কে বলিতে পারে? তবে একটী জিনিষ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন প্রবাহ অভিমানের তমোরাশি ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মহর্ষি চরক প্রদর্শিত, মিথ্যাহার-বিহারভ্যাং, নিদানের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবাণু তত্ত্বের (Bacteriology) মোহে মুগ্ধ। জার্ম্মাণ দেশীয় চিকিৎসক কক্ (Koch) প্রণীত কতকগুলি সূত্রকে অবলম্বন করিয়া এই জীবাণু তত্ত্ব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে! অথচ কোন ক্ষেত্রেই এই সূত্রগুলি সম্যক্ প্রযোজ্য হয় না ও মাত্র পাঁচ ছয়টী রোগে আংশিক প্রযোজ্য হয়। এমন কি প্রসিদ্ধ টাইফয়েড জ্বরেও দেখা যায় যে টাইফয়েড জীবাণু

ভিন্ন ষ্ট্রেপটোককাস্ (Streptococcus) পাওয়া যায় এবং সেই ষ্ট্রেপটোককাসগুলিই টাইফয়েড জ্বরের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি করে; যথা, রক্তস্রাব প্রভৃতি। অতএব টাইফয়েড জ্বর যে টাইফায়েড জীবাণুকৃত এই মত ভ্রান্ত। জীবাণুতত্ত্বের (Bacteriology) আইন এই যে, রোগীর রক্তে যে প্রকার জীবাণু পাওয়া যায়, তাহারই Vaccine দ্বারা সে রোগী নিঃসংশয় আরোগ্যলাভ করিবে। যদি না করে, তাহা হইলে দোষ সে হতভাগ্য রোগীর, নবাবিষ্কৃত মিথ্যা তত্ত্বের নহে। কিন্তু তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, ষ্ট্রেপটোককাস সেরাম (Serum) ও ভ্যাক্‌সিন (Vaccine) দিয়া অথবা কোলাই ভ্যাক্‌সিন দ্বারা টাইফয়েড সারে, টাইফয়েড ভ্যাকসিন দ্বারা ফাইলেরিয়ার জ্বর দূর হয় এবং উন্মত্তরোগীর ভীষণ পক্ষঘাত রোগ (General paralysis of the insane) ম্যালেরিয়া জীবাণু দিলে সারে। তথাপি দারুণ পাশ্চাত্য মোহে বলিতে হইবে ব্যাকটিরিওলজি (Bacteriology) সত্য ও উহার বিরুদ্ধে বলিলে অতিপাতক হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজে আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে কেহই কুণ্ঠা বোধ ত করেনই না বরং যিনি যে পরিমাণে নিন্দা করিতে পারেন তিনি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেই পরিমাণে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দেখিয়াও দেখে না, শিখিয়াও শেখে না। দুই এক বার ভুল করিলেই লোকে যা তা বলিতে পশ্চাৎপদ হয় না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট এই সনাতন নিয়ম খাটে না। উন্নতির দোহাই দিয়া তাঁহারা ভুল করিতে লজ্জা বোধ করেন না, মনুষ্যজীবন লইয়া খেলা করিতে কুণ্ঠিত হন না; আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বেষানল সকল অবস্থাতেই সমভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে।

শোথ রোগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লবণ নিষিদ্ধ। লবণে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়, অতএব জল ক্ষয় দ্বারা শোথের শান্তি করে—এই অন্ধ অভিমানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকগণ (৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে) আয়ুর্ব্বেদকে সদাই উপহাস করিতেন ছাত্রগণও বিলাতী মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে যোগ দিত। পাশ্চাত্য ক্ষণভঙ্গুর সত্যের প্রভাবে শোথ রোগীকে অম্লান চিত্তে লবণ দেওয়া হইত এবং তাহার ফলে অনেক রোগীই দুঃখময় সংসার হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে অচিরেই বিশ্রাম লাভ করিতেন। অহঙ্কার বিজড়িত মিথ্যা সত্যের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মনুষ্য বধে কখনও কুণ্ঠা উপস্থিত হইত না। অপ্রতিহত কালবেগে কিছু দিন পরে ইউরোপে উইডাল (Widal) এবং জাবাল (Javal) আবিষ্কার করেন যে, ক্লোরাইডের দ্বারা শোথ উপস্থিত হয়, অতএব শোথ রোগে লবণ একেবারে বর্জ্জনীয়! সোডিয়াম ক্লোরাইডকেই লবণ বলে। এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদিগের সুর ফিরিল। যাঁহারা এত দিন শোথ রোগে লবণ দিয়া প্রাণবধ করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা সেই মুখেই লবণ বর্জ্জনের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য ক্ষণিক মিথ্যা সত্যের মোহে যে এত কাল হত্যা করিলেন, তাহার জন্য কাহারও মনে অনুতাপের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভিমান ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বেষ তাঁহাদের হৃদয় সমভাবে অধিকার করিয়া রহিল। যে আয়ুর্ব্বেদ যুগ যুগান্তর হইতে লবণ বর্জ্জন ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে তাহা পূর্ব্ববৎ সমভাবে অজ্ঞানের আধারই রহিল। আর যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান শোথ রোগে লবণের উপকারিতা শতমুখে ঘোষণা করিয়াছিল, সেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানই জ্ঞানের অপরিসীম ভাণ্ডার, সত্যের অবিনাশী হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

"ধন্যো বৈদিশিকো মোহঃ" (বিদেশীয় মোহকে ধন্য)

(ক্রমশঃ)

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৶৹ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি
(স্বত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

HEALTH.

(Bengali)

৮মী সংখ্যা আশ্বিন—September ৯ম বর্ষ

স্বাস্থ্য

প্রতি সংখ্যা ।/০

বার্ষিক ২৲

সম্পাদক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

নবম বর্ষ] আশ্বিন—১৩৩৮। [৮ম সংখ্যা

ভারতীয়দের খাদ্য সমস্যা

শ্রীচিত্রলেখা গাঙ্গুলী

ভারতে খাদ্য বিষয়ে গবেষণার পরীক্ষাগারের প্রধান কর্ণেল ম্যাক করিসন (Col. R. Mc Carrison) M.D., D.Sc., LL.D., C.I.E., I.M.S., মহাশয় আমাদের, ভারতবাসীদের বিষয়ে সম্প্রতি গবেষণা করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখিলাম। আমার নিজের মত এই প্রবন্ধে কিছুই নাই।

যদিও আমাদের খাদ্যে কতটা পরিমাণ Protein বা ছানা জাতীয় উপাদান থাকা দরকার তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়—তাহলেও অনেকে ইহা মানেন যে মাঝামাঝিরূপ শ্রমকারী লোকের প্রত্যহ অন্ততঃ ১০০ গ্রাম (বা ৪ আউন্স) এই ছানা জাতীয় উপাদান খাওয়া উচিৎ। যাঁহারা অধিক পরিশ্রম করেন তাঁহাদের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্য অনেক বেশী খাওয়া দরকার কারণ প্রধানতঃ এই Protein বা ছানা জাতীয় উপাদানের উপরেই শরীরের মাংসপেশীগুলির বৃদ্ধি, স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলির কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও শক্তি নির্ভর করে। এই ছানা জাতীয় উপাদানের মধ্যে অন্ততঃ তিন ভাগের এক ভাগ জীব জগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া দরকার। আপনারা সকলেই জানেন যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি জীব জগৎ হইতে প্রাপ্ত উপাদান ও ডাল ইত্যাদির মধ্যে ঐ Protein বা ছানা জাতীয় উপাদান উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত উপাদান।

কঙ্গো দেশে (Congo) খাদ্যের পরিমাণ বিষয়ে বহু গবেষণার পর নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্য সাধারণ কার্য্যক্ষম ব্যক্তির জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে (১) প্রোটিন বা ছানা জাতীয় খাদ্য ১২০ গ্রাম (২) স্নেহ জাতীয় উপাদান (or fat) ৯০ গ্রাম ও

(৩) শর্করা জাতীয় উপাদান (Carbohydrate) ৫৫০ গ্রাম। বলা বাহুল্য এই এই সকল উপাদান-গুলির ওজন লওয়ার সময় যে সকল খাদ্য হইতে এই উপাদান লওয়া হইয়াছে তাহার জলীয় ভাগ বাদ দিয়া হিসাব করা হইয়াছে—যেমন মাছ হইতে ৪ আউন্স ছানা জাতীয় উপাদান পাইতে হইলে ৮ আউন্সের অধিক মাছ হওয়া দরকার কারণ মাছে জল থাকে প্রায় অর্দ্ধেক ও হাড়, কাঁটা, ছাল, আঁস থাকে শতকরা ২০ ভাগের বেশী।

গ্রীষ্ম প্রধান ভারতে, বিশেষতঃ গরম কালে স্নেহ পদার্থ (fat) ১০ গ্রামের স্থলে ৫০।৬০ গ্রাম খাওয়া চলে--যদি অবশ্য ঐ স্নেহ পদার্থের বেশীর ভাগ জীব জগৎ হইতে প্রাপ্ত—স্নেহ পদার্থ হয় (অর্থাৎ মাখম, ননী, ঘৃত, চরবী ইত্যাদির ভাগ বেশী হয় ও তৈল বা ভেজিটেব্ল প্রডাক্ট কম থাকে) যদি শারিরীক পরিশ্রম করা হয় তাহা হইলে অবশ্য শর্করা জাতীয় উপাদান বাড়াইতে হইবে। সাধারণতঃ যদিও ১০০ গ্রাম ছানা জাতীয় উপাদানই সাধারণভাবে কাজ যাহারা করে তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট, তাহা হইলেও কার্য্যের পরিমাণ ও ঋতু ও দেশ অনুযায়ী ইহা বাড়ান বা কমান দরকার। উত্তর ভারতে, ঠাণ্ডার সময় এই ছানা জাতীয় উপাদানের পরিমাণ অধিক হওয়া দরকার, দক্ষিণ ভারতে ৭৫ গ্রাম (protein) ছানাজাতীয় উপাদান ৫০ গ্রাম স্নেহ পদার্থ (fat) ও ৪৫০ গ্রাম শর্করা জাতীয় উপাদানেই এই জন সাধারণ লোক ভাল ভাবে থাকিতে পারে। শরীর রক্ষার নিয়মানুযায়ী উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত ছানাজাতীয় উপাদানে শরীরের সকল প্রয়োজন মিটে না।

[illegible] থেকে পাওয়া উপাদানগুলি (যথা ছানা, মাখম, ঘৃত, ননী, পনীর) ভারতীয়দের পক্ষে অতীব উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট দেখা যায়—এই জন্য গো-দুগ্ধের পরিমাণ যাহাতে বাড়ান যায় সে চেষ্টা সকলেরই করা দরকার। উত্তর ভারতে চাষে উৎপন্ন জিনিষগুলির ভিতর শতকরা ৬০ ভাগ গম ও যব হয়। পাঞ্জাবে গম আরও বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়। মধ্য ভারত, উত্তর ডেকান ও বোম্বাই প্রদেশে বেশীর ভাগ লোকেই গম ব্যবহার করেন। গরীব লোকেরা যব ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোনও কোনও জাতের লোকেরা গম ও চাল দুইই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা, বর্ম্মা ও মাদ্রাজের ও বোম্বায়ের কতক অংশ ভাতই সাধারণতঃ লোকে খাইয়া থাকেন ভারতে অন্যত্র গরীবেরা যোয়ার ও বাজরা ব্যবহার করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহা দেখা গিয়াছে যে শারিরীক ক্ষমতা গম বা আটা যাহারা ব্যবহার করেন তাহাদের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; ও ভাত খাইয়া যাহারা জীবন ধারণ করেন তাঁহাদের মধ্যে সকল অপেক্ষা কম—যব, যোয়ার ব্যবহারী জাতীয়েরা মাঝামাঝি রকম পুষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য ব্যবহারে শরীরের উপর ভিন্ন ভিন্ন ফল হয় ইহাতে তাহা প্রমাণ হয়।

ঘৃত, দুধ, মাখম, চর্ব্বি ইত্যাদি স্নেহ পদার্থের পরিমাণ ও এর ব্যবহৃত দ্রব্যের গুণের উপর শরীরের পুষ্টি অনেকটা নির্ভর করে।

খাদ্যের এই সব উপাদান ছাড়া অন্য গুণ যাহাকে খাদ্যপ্রাণ (বা Vitamin) বলা হয় ও যাহা খাদ্যের ওজন মোটেই বাড়ায় না তাহার উপর নির্ভর করে। এই গুণের অভাবে খাদ্যগুলি শরীরের মধ্যে কার্য্যকরী হয় না। এই 'খাদ্যপ্রাণ' যেন খাদ্যগুলির শক্তি, যাহা দ্বারা ঐ খাদ্যগুলি শরীরের

কাজে লাগে ও শরীরকে পুষ্ট করে। এই 'খাদ্য-প্রাণ' প্রধানতঃ ৫ প্রকার।

'খাদ্যপ্রাণ' 'ক' (Vit. A)—দুধ, মাখম, ঘৃতে থাকে (অবশ্য যদি গরুগুলিকে মাঠে চরান ও ভাল ভাবে খাওয়ান হয়)।

'খাদ্যপ্রাণ' 'খ' (Vit. B)—সবরকম শস্যজাত দানাগুলিতে পাওয়া যায়—যদি সেগুলিকে খোসা ছাড়াইয়া পালিস করিয়া না ব্যবহার করা হয়।

'খাদ্যপ্রাণ' 'গ' (Vit. C)—পাতাযুক্ত শাক সব্‌জি ও ফলে পাওয়া যায়।

'খাদ্যপ্রাণ' 'ঘ' (Vit D)—জীবজগৎ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি স্নেহ পদার্থতে পাওয়া যায়—যথা কডলিভার অয়েল (Cod Liver Oil) ননী।

'খাদ্যপ্রাণ' 'ঙ' (Vit E)—মাংস ও শস্যের দানাগুলিতে পাওয়া যায়।

এই গুলির মধ্যে ক, খ ও গ আমাদের দেহের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, ঘ বা Vitamin D, আমাদের শরীরের চামড়ায় রৌদ্র লাগাইলে উৎপন্ন হয়। দেশে রৌদ্রের তাপ যথেষ্ট কেবল সভ্যতার চাপে গায়ে ২।৪ জামা না পরিয়া থাকিলে আমাদের দেশে এই খাদ্যপ্রাণটির অভাব হয় না। পর্দ্দা প্রথা দূর করা ও বালক বালিকাদের শুধু গায়ে খানিকক্ষন খেলিতে দিলে এই খাদ্যপ্রাণ ঘ'র (Vit. D) অভাবে আমাদের ভুগিতে হয় না। ভারতে উত্তর দিক হইতে যেমন দক্ষিণে আসা যায় খাদ্য প্রাণ (Vitamin) অভাব জনিত রোগ তেমনই অধিক দেখা যায়। সেই জন্য দক্ষিণের অপেক্ষা উত্তর ভারতের লোকেরা বেশী কর্ম্মঠ, তাহাদের মাংসপেশীগুলি ভাল, রোগ প্রতিরোধক শক্তি তাহাদের বেশী ও খাদ্য দোষের (deficiency disease) জন্য রোগ তাহাদের কম। ইহা বলা যাইতে পারে যে ভারতীয় শ্রমিকদের যেমন জীব জগতে প্রাপ্ত ছানা জাতীয় বা স্নেহ জাতীয় উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) কম হয়। তাহাদের শ্রম করিবার ক্ষমতা ও কার্য্য করিবার শক্তি তেমনি কম হয়।

কর্ণেল ম্যাক করিসন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতের ব্যবহৃত খাদ্য ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শিখ, পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়দের খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর—তাহার পরই গুরখাদের খাবার, পুষ্টি হিসাবে কানারীয় (Kanarese)দের খাদ্য গুরখাদের পরে ও তাহাদের পর বাঙ্গালী জাতীর খাদ্য, ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য মাদ্রাজীদের।

ম্যাকষ্টিক সাহেবের মতে—প্রথম দলে "শিখ, পাঠান, মারাট্টা—ইহাদের খাদ্য প্রায় একই গুণ বিশিষ্ট, যদিও উপরিলিখিত ফর্দ্দ অনুযায়ী তাহাদের গুণ বলা যাইতে পারে, তাহার বহু দূরে আছে গুরখাদের খাদ্য, তাহারও বহু পশ্চাতে প'ড়ে থাকে কানারী ও বাঙ্গালীর খাদ্য ও বেচারা মাদ্রাজীর খাদ্য তালিকা সর্ব্ব নিকৃষ্ট।

বাঙ্গালীর খাদ্য ভাত, ডাল, চচ্চড়ী, ঝোল, অম্বল—তাহাকে ভাল করা বিশেষ দরকার, খরচা না বাড়াইয়া একটু যত্ন করিলে আমাদের ভাতের গুণ অনেক ভাল করা যায়, যদি আমরা সিদ্ধ চাল বর্জ্জন করি, ফেন না ফেলে ভাত খেতে আরম্ভ করি তাহ'লে এই উৎকৃষ্ট শর্করা জাতীয় উপাদানটিকে সর্ব্বগুণ সমন্বিত করা যায়। ইহার পুষ্টির ক্ষমতা বাড়ান হয় খাদ্যপ্রাণটিও ঠিক থাকে। ডালের রাঁধিবার প্রণালী বদলাইলেই উহার গুণগুলিও পুরাপুরা আমরা উপভোগ করিতে পারি। পাতা বিশিষ্ট তরকারি বা শাক আমরা যত পাই ভারতে কোনও জাতিই

তত ব্যবহার করে না। কিন্তু রাঁধিবার দোষে, ভেজে মসলা দিয়ে, তার সকল গুণগুলিই আমরা নষ্ট ক'রে দিই কেবল সুস্বাদু করবার জন্য. এই শাকগুলি কাঁচা বা ভাপে সিদ্ধ করে খাওয়া উচিৎ। মাছ ও দুধের পরিমাণ ঠিক করিয়া তাহাদের গুণ যাহাতে উৎকৃষ্ট থাকে তাহা দেখিয়া লইলে বাঙ্গালীর খাদ্য অনেক অংশে ভাল হইয়া যাইবে। বাঙ্গালী আর শ্রম করিতে বিমুখ হইবে না। ছানা জাতীয় ও স্নেহ জাতীয় উপাদানের অভাব, খাদ্যপ্রাণের অভাব দরুণ অবসাদ, দুর্ব্বলতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি যে সকল দোষ আমাদের জাতকে খর্ব্ব ক'রে রেখেছে, সেগুলি দূর হইয়া বাঙ্গালী আবার তাহার পূর্ব্বেকার অধিকার ও স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর চক্ষে শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মঠ জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবে।

দ্বাদশটা শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য সহজ ব্যায়াম পদ্ধতি

সকলেরই প্রত্যহ ব্যায়াম করা উচিত। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্ধর মত উদাসীন অথচ ছাত্রদের একটা বিশিষ্ট কর্ত্তব্য, বলতে কি পড়াশোনার চেয়েও বিশিষ্টতর কর্ত্তব্য হচ্ছে স্বাস্থ্যোন্নতির সাধনা করা। পড়াশোনার মত এর জন্যও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছাত্রদের ব্যয়িত করা দরকার।

ব্যায়ামের নানা পদ্ধতিও আছে, শরীর সাধনার নানা উপায়ও আছে। ভ্রমণ, সন্তরণ, উদ্যানপালন, (gardening) শিকার, অশ্বারোহন, টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়া, এরা সবাই শরীর রক্ষার সহায়ক। কিন্তু এদের নির্ব্বাচন কর্ত্তে হয় প্রয়োজন, সুবিধা, সামর্থ্য এই সব হিসেব ক'রে। তবে এটা ঠিক যে বাড়ীতে হাতে থেকেই শুধু যে ব্যায়াম করবার প্রক্রিয়া আছে তা সকলের পক্ষেই করা সম্ভব।

আমরা এখানে গৃহাঙ্গনে সাধ্য বারটা অনুষ্ঠেয় দিচ্ছি। আমাদের এ শিক্ষা খেলাধূলার চেয়ে উপকারীতা হিসাবে ছোট কিন্তু নিরুপায়ে এবং অসমর্থের পক্ষে এ মন্দের ভাল এবং এদেরই পক্ষে এটা অবশ্য কর্ত্তব্য, তা এই সম্পর্কে গুটিকত কথা বলা দরকার।

১। শরীরের উন্নতি হয় দেখেই কতকগুলি বিশিষ্ট অঙ্গসঞ্চালনের উপর মানুষের নজর পড়েছে। লোকের যে ধারণা আছে – ঔষধ যত তিক্ত ততই ভাল, তথাচ যে ব্যায়ামে শরীর সর্ব্বাপেক্ষা আড়ষ্ট হবে ততই শুভ—তা নিছক ভুল। বরঞ্চ শরীরের পক্ষে এ প্রকারের ব্যায়াম অনিষ্টকর।

২। সুইডেন্ ও জার্ম্মানীর কতকগুলি অস্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চরণ আমাদের দেশের ব্যায়াম পদ্ধতিতে ঢুকে পড়েছে। মনে রাখতে হবে যে

প্রকার অঙ্গচালনা হেতু নিকৃষ্টতর জীবদেহ হ'তে মানুষের আজ বর্ত্তমান দেহে প্রগতি হয়েছে, সেই সেই অঙ্গচালনাই শুধু তার পক্ষে বিধেয়।

৩। জিমন্যাষ্টিকের বহু প্রচলিত প্রক্রিয়া আছে যাদের প্রত্যেককেই সমর্থন করা চলে না, তাদের অস্বাভাবিকত্বর দরুণ যেমন পিঠটা পশ্চাদ্দিকে অসম্ভব রকমে বক্র করা ইহা শরীরের পক্ষে হানিকর। অপ্রয়োজনীয় শ্বাসপ্রঃশ্বাসের ব্যায়ামও আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়।

আমাদের এ পদ্ধতি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বভাবসম্মত। সেই বিশ্বাসেই আমরা এ পদ্ধতি উপস্থাপিত করছি বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁদের আফিসের কাজে বসে থাকতে হয় দিনের বেশী সময়টা।

এ' পদ্ধতির গুণবর্ণনা করবার আগে কিন্তু বলবার কথা আছে। এ' পদ্ধতি কিন্তু ছেলেদের খেলার বদলে চলে না, আর বয়স্কদের আনন্দ বিধায়কও এ' নয়। এর কাজ হচ্ছে শরীরের উন্নতি করা ও তার কাঠামকে অটুট রাখা ; এতে দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডও সতেজ হয় না, পক্ষাঘাত রোগীও আরাম হ'ন না, আবার মুখমণ্ডলের চিন্তারেখাও দূরীভূত এ' করবে না। হবে কি ! হবে দাঁড়াবার ভঙ্গিমা সুন্দরতর দেহের উৎকর্ষতা স্পষ্টতর।

এ' ব্যায়াম অভ্যাস কর্ত্তে হবে প্রাতে শয্যাত্যাগের পর আর ব্যায়ামের পরে কর্ত্তে হবে স্নান। এর ক্রিয়া হবে রক্তসঞ্চালনের উপর, শ্বাসপ্রঃশ্বাসের উপর, হজমের উপর এবং অন্যান্য শারীরধর্ম্মের উপর (ঘর্ম্ম, ইত্যাদি)। এই অনুষ্ঠেয়ের প্রত্যেকটাতেই পৃষ্ঠের ও বক্ষের মাংসপেশীর সঞ্চালন হয় যথেষ্ট। পদস্থাপনার একটু বিশেষ রকম দৃষ্টি দেওয়া এ'তে দরকার।

(১ম চিত্র দণ্ডায়মান)

এই ব্যায়ামে দণ্ডামান ভঙ্গিমার শ্রীবিকাশ হয়। বিদ্যালয়ে দাঁড়াবার, বসবার, চলবার অঙ্গস্থাপনা ও ভঙ্গিমার সম্বন্ধে বড় উদাসীন, তাতে হয় কি এমন ভাবে দাঁড়ান শেখা হয় যাতে পরস্পর অঙ্গের দ্রুত কার্য্যকারিতা হয়ে পড়ে অসম্ভব। দাঁড়ান চাই শরীর আড়ষ্ট না করে এমনভাবে ঋজু দেহে যে উদরমধ্যস্থ যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক সন্নিবেশ হয়, কাজও হয় স্বাভাবিক, যাতে শরীরের প্রতি গ্রন্থির ওপর যে চাপ পড়ে তা হয় সহজ ও সুস্থ, পেশীসমূহের অযথা সঙ্কোচ না আসে।
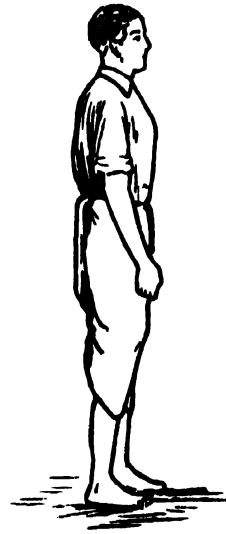
১ম চিত্র ২য় চিত্র

সমরেখায় পা দুখানি ৬।৮' ইঞ্চি তফাতে রেখে দাঁড়ান। একটা পা রাখুন (দক্ষিণ অথবা বাম) আর একটার ৩।৪" ইঞ্চি সম্মুখে। পদদ্বয়ের সীমা-দেশ দিয়ে শরীরের ভার রক্ষা করুন। শরীরের কাঠামটা এখন সরল ও উন্নত করুন। উদর বেষ্টনীও উন্নত করুন, স্কন্ধস্থ পেশীবৃন্দেরো সঙ্কুচিত

করবেন না। হবে কি শরীরটা যে উঁচু হয়ে উঠল, লম্বা হ'ল এটা বেশ অনুভব কর্ত্তে হবে।

স্মরণীয়—

১। শরীরের আড়ষ্টতা থাকবে না।

২। শরীরের কাঠাম থাকবে সোজা, কাঁধের মাংসপেশী থাকবে অনাড়ষ্ট।

৩। শরীরের ওজন পায়ের গোড়ালীর দিকে পড়বে না।

৪। উদরচর্ম্মাবরণীর প্রথমার্দ্ধ করতে হবে উঁচু আর নিম্নার্দ্ধ থাকবে সোজা।

প্রসারণ (১ম ও ২য় চিত্র)

এই অঙ্গচালনা স্বভাবসম্মত—এতে মেরুদণ্ড সোজা হয়, বক্ষ উন্নত হয় আর উদরাবরনীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে থল্‌থলে হওয়া বন্ধ হয়।

ব্যায়াম পদ্ধতি

এক গুনুন ! হাত দুখানা উঁচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। যতদূর উঁচু নিজেকে করা সম্ভব তাই করুন—যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে কিছু পাড়ছেন। (২য় চিত্র)

৩য় চিত্র

এবার দুই ! হাত দুখানা নাবিয়ে নিন্, পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটি স্পর্শ করুন কিন্তু অনুভব করুন যে সমস্ত দেহ আপনার তখনও উন্নত রয়েছে। আপনি যেন দৈর্ঘে বড় হয়েছেন আরও। এই যে অনুভূতির কথা বললুম, এটা কিন্তু প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই। (১ম চিত্র)

৪র্থ চিত্র

স্মরণীয়—
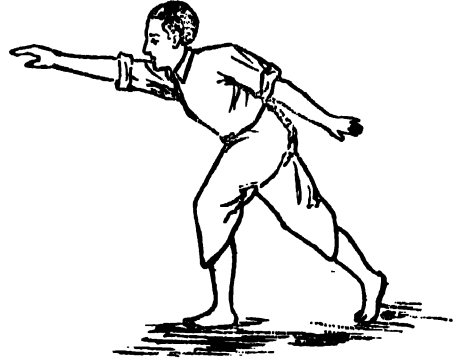
১। আড়ষ্টতা যেন না আসে

২। পিঠ যেন না বাঁকা হয়।

৩। হাত দুখানা উঁচু করবেন, দুলিয়ে নয়।

৪। পেশী সঙ্কোচ যতদূর না হয় ততই ভাল।

৫। দিনে দশবার এটা অভ্যাস করুন, প্রথম প্রথম ২।৩ বার করলেও চলে।

৬। অঙ্গসঞ্চালন তালে তালে হওয়ার দরকার নেই; তার কারণ হচ্ছে—এ' সব ব্যায়ামে নির্দ্দোষিতা হচ্ছে সত্যিকারের প্রয়োজন।

উৎক্ষেপন (৩য় ও ৪র্থ চিত্র)

নিক্ষেপ করবার সময় যে যে অঙ্গসঞ্চালন করতে এ' ব্যায়ামে মূলতঃ তাই দরকার। এই সব সঞ্চালনের প্রত্যেকটা স্তর বেশ ক'রে অভ্যাসগত করতে হবে। শুধু শেষেরটা হ'লেই চলবে না, হাত, পা, দেহ প্রত্যেকেরই সমঞ্জস সঞ্চালন দরকার।

এ' ব্যায়ামে হবে একদিকে পৃষ্ঠের ও পার্শ্বের

পেশীর অপরদিকে দুই হাতের ও দুই পায়ের বৃহৎ পেশীর (Large muscles) ব্যবহার।

হাতের ও পায়ের যে অবস্থান প্রথমার্দ্ধে (৩য় চিত্র) দ্বিতীয়ার্দ্ধেও তারই অনুরূপ। (৪র্থ চিত্র) চিত্র দু'টার প্রতি দৃকপাত করলেই এদের অবস্থা-সাম্য অনুভূত হবে।

ব্যায়াম পদ্ধতি

পা দুখানা ২৪" ইঞ্চি তফাতে রেখে দাঁড়ান, বাঁ পা খানা ডান পায়ের ৬" ইঞ্চি সামনে রাখুন।

গুণুন এক! হাত দুটো একত্র করুন, কটিদেশ উন্নত করুন, শরীরের ভার দক্ষিণ পদে বিন্যস্ত করুন। (৩য় চিত্র) দক্ষিণ পদের জঙ্ঘাদেশ ভেঙ্গে দিয়ে, শরীরটাকে দক্ষিণে কাৎ করুন। বাম পদ রইল আপনার সোজা ও অনাড়ষ্ট (Relaxed), শুধু তার গোড়ালী রইল উঁচু।

৫ম চিত্র

এবার দুই। ঝটিতি শরীরটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়েই দক্ষিণ হাত নিক্ষেপ করুন। এখন আপনার বাঁ পা নিক্ষেপের শক্তিতে চলে এ'ল সামনে, জঙ্ঘাদেশ তার রইল বাঁকা এদিকে ডান পা হয়ে গেল সোজা ও গোড়ালী উঁচু, আপনার পিঠ, মাথা ও গোড়ালী রইল যেন এক সমক্ষেত্রে। (on a plane).

৬ষ্ঠ চিত্র

স্মরণীয়—

১। শরীরের কোথাও যেন অযথা টান ধরে না।

২। প্রত্যেকটা সঞ্চালন হবে সরল, অবাধ ও সমঞ্জস।

৩। পেশীর স্বেচ্ছাসঙ্কোচ পরিহার কর্ত্তে হবে, স্বাভাবিক সঙ্কোচ তার আপনিই হবে।

৪। দশবার করুন এ' অধ্যায় দিনে, এ'কে দুভাগে ভাগ করেও নিতে পারেন। ভাল অভ্যস্ত হ'লে দুটো একসঙ্গে করবেন তালে তালে। ৩য় অবস্থা হ'তে চতুর্থ অবস্থায় গতি ও ৪র্থ অবস্থা হ'তে ৩য় অবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি তালে, ছন্দে হওয়া ভালই।

৫। সমর্থ হ'লে দিনে বিশবার করা যেতে পারে।

উত্তোলন (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্র)

পাশ হ'তে ভার তোলা অথবা কোন নিম্নস্থান হ'তে ভার তোলার সময়ের যে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চরণ, এই ব্যায়ামে সেই স্বভাবিক সঞ্চরণই হবে। এ'তে ব্যায়াম হবে পৃষ্ঠের ও পদদ্বয়ের।

এ'র দুটো পর্য্যায়; নিম্নভার উত্তোলন ও উচ্চভার উত্তোলন।

নিম্নভার উত্তোলন—পদ্ধতি।

২৪"।২৮" দূরে রাখুন পা দুটো সমমুখী ক'রে, পার্শ্বদেশে চাপ দিয়ে।

গুণুন এক! দক্ষিণ-জঙ্ঘা বাঁকিয়ে ফেলুন, হাত দুখানা নিয়ে আসুন ডান পায়ের ডান ধারে, ভূমি হ'তে বার ইঞ্চি উপরে, বাঁ পা রইল সোজা, পিঠ রইল সোজা, (flat) শরীর সঞ্চালন হ'ল শুধু কটিদেশে ও জঙ্ঘায়।
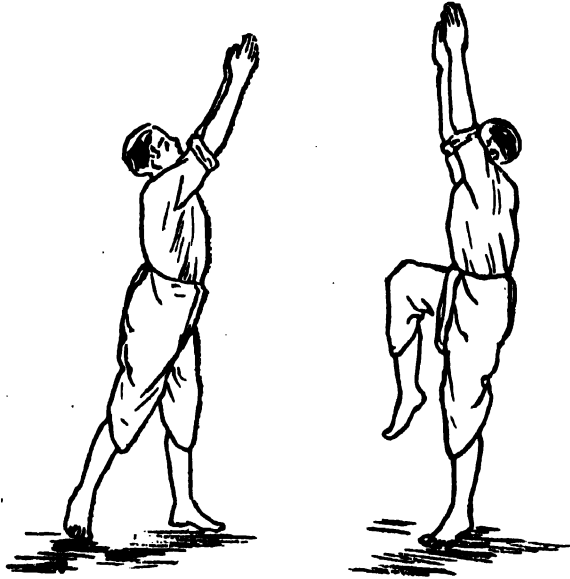
৭ম চিত্র ৮ম চিত্র

এবার দুই! বাঁ পায়ের দিকে ওজনটা নিয়ে ঘুরে গিয়ে, এবার তুলুন ওপরে। ব্যস্।

আবার বাম জঙ্ঘা বেঁকিয়ে ডান পা সোজা রেখে ঠিক একই প্রকার সঞ্চালন বামদিক হ'তে আরম্ভ করুন। (৫ম চিত্র) হাত দুটো যাবে বাঁ পার বাঁ দিকে, ভূমি হ'তে বার ইঞ্চি উপরে।

উচ্চভার উত্তোলন পদ্ধতি

এক! ৬ষ্ঠ চিত্রের ভঙ্গিমায় দাঁড়ান, দেখুন হাত দুটো একেবারে ভূমি স্পর্শ করেছে, দক্ষিণ জঙ্ঘাদেশ এবং কটিদেশ রয়েছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কুব্জ, পিঠ কিন্তু সোজাই (flat), আর বাঁ পা ঠিক ৫ম চিত্রেরই মত অবস্থিত।

দুই। ভারটাকে তুলে মাথার উপরে রাখুন (৭ম চিত্র)। ভারটা যখন বাম দিক থেকে উত্তোলিত হবে, দক্ষিণপদ সোজা হ'য়ে যাবে শুধু গোড়ালী রইবে তার উঁচু, তখন পেশীসমূহের বিশেষ রকম আয়াস হওয়ার কথা।

নিম্নভার উত্তোলনের মত, এ'ই অভ্যাস ডান দিক হ'তে কর্ত্তে হবে, বাম দিক হ'তেও কর্ত্তে হবে।

স্মরণীয়—

১। অনাড়ষ্ট সমঞ্জস সঞ্চরণ প্রয়োজন; শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের অবস্থিতি চিত্র দেখে মিলিয়ে নেওয়া দরকার।

২। ভারটা যখন উচ্চে উত্তোলিত হবে তখন যতদূর সম্ভব শরীরটাকে দীর্ঘ-করুন যেন অতি উচ্চে আপনার ভারটাকে রাখ্‌তে হবে।

৩। দুই প্রকার উত্তোলনই দিনে দশবার অভ্যাস করুন।

বৃক্ষারোহণ (১ম ও ৮ম চিত্র)

মানুষের ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাসে তার আরোহণ করবার প্রবৃত্তির মূল্য কম নয়। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা এ' বিদ্যায় ত' সিদ্ধ হস্তই ছিলেন। আজও শিশুদের চলা ফেরায় সেই জাতীয় প্রবৃত্তির অস্তিত্ব বিকাশ দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা সম্বন্ধে আধুনিক মত

শিশুর যাহা বক্তব্য তাহা বলিতে দাও

(বার্ট্রেণ্ড রাসেল)

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, L.M.S.

শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনুমান (Theory) আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্ব-বিশিষ্ট নব পরিবর্ত্তন শিশুর বাল্যবয়সের উপর লক্ষ্য প্রদর্শন করার উপর নির্ভর করে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দুইটী আধুনিক উন্নতশীল চর্চ্চার ফল; এই দুইটী মত—যথা, মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) ও ব্যবহারিক স্বভাব (Behaviourism) মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে মনোবিশ্লেষণ শিশুর অপকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির নিরোধ করা এবং ব্যবহারিক স্বভাব—যাহা দ্বারা শিশু ভাল স্বভাবগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

সর্ব্ব প্রথম ফ্রয়েড্ শিশু সম্বন্ধীয় গবেষণা পূর্ণবয়স্কদিগের অনুপাতে আলোচনা করেন অর্থাৎ পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিরূপ শিশুদের অবস্থা হওয়া উচিত তাহা লইয়া গবেষণা করেন কিন্তু তাহা ভ্রমপূর্ণ। কারণ, তিনি যথার্থ শিশু লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই কিম্বা যাহাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাহারা প্রচলিত প্রথামূলক নিয়মে বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদের মনোভাব গোপন করিতে খুব সাবধানতার সহিত শিক্ষিত হইয়াছে।

শিশুদিগের চিন্তাধারা বুঝিতে গেলে যখন হইতে তাহারা প্রথম কথা কহিতে শিখে তখন হইতে তাহাদের অবাধে কথা কহিতে দেওয়া আবশ্যক। ইহা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার যেহেতু ধাত্রীরা, শাসনকর্ত্রীরা ও স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ সকলেই এ জিনিষটার বিপক্ষে থাকায় শিশুদিগের অবাধবাক্য কথন বাধা প্রাপ্ত হয়।

মনোভাব এবং চরিত্র শিশুর পরিণত বয়সের পূর্ব্বকালীন প্রভাব দ্বারা অবধারিত হয়। শিশুর বয়স যখন ছয় বৎসর তখন হইতে তাহার মোটামুটি গঠন (স্বভাব চরিত্র, স্বাস্থ্য, মেজাজ ইত্যাদি) নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। মানসিক শিক্ষা কিছু দেরীতে হইলে ক্ষতি নাই। ইহা নিশ্চয় ভাবে কেহ বলিতে পারে না যে, আট বৎসরের পূর্ব্বে শিশুর মানসিক শিক্ষা না দিলে শেষ অবধি সে অশিক্ষিত রহিয়া যাইবে। এযাবৎ শিশু-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা বা গবেষণা হয় নাই। বৈজ্ঞানিকরা বীজাণুদিগের আচরণ বা গিরগিটী জাতীয় উভচর জন্তুবিশেষের ব্যবহারিক বিধি লইয়া ব্যস্ত, এধারে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগকে শিশু-চরিত্র বিচার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ—একধারে পর্য্যবেক্ষণকারীর ভাবাবেশ প্রবণতা (Sentimentality) ও অপর

দিকে শিশুদিগের নৈতিক নিষেধ ভীতি (fear of moral prohibition) অধুনা শিশু সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক অনুশীলন উপরিউক্ত দুইটী প্রতিবন্ধক দূরিভূত হওয়ায় অনেটা সহজসাধ্য হইয়াছে।

শিক্ষকের কার্য্য শুধু বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ নহে; ন্যায়ানুগত গুণাবলী যাহা অপরিণত শিশু-চরিত্রে স্ফুরণ হওয়া আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি তাহা এই:—ঘৃণারাহিত্য, ভয়শূন্যতা, প্রকৃত সত্তা বা বাস্তবত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা ঘটীত বৈজ্ঞানিক ভাব এবং সেই সমস্ত স্বভাব যাহা স্বাস্থ্য ও চলনসই সামাজিক জীবন ধারণের উপযোগী তাহার অধিকার প্রাপ্তি।

এই আবশ্যকীয় বস্তুগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইটী বিষয়ে অনেক আধুনিক শিক্ষক অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। পুরাতন নিয়মানুবর্ত্তিতা বা শাসনাধীনতা নিরর্থক বোধ হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে তাহা ত্যাগ করায় যখন শিশুগণ তাঁহাদের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন দেখা গেল যে পূর্ব্বোক্ত সৎ গুণাবলি কিছুমাত্র তাহাদের চরিত্রগত হয় নাই ও তাহার অভাবে তাহারা নিজেদের পক্ষে ও অপরের পক্ষে একটী আবর্জ্জনাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মনোভাব দ্বারা ব্যক্ত বাস্তবত্ব জড়িত বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ (scientific attitude to reality) বলিতে ইচ্ছা পরিপূর্ণতার কল্পনা হইতে অনুসন্ধিৎসায় প্রাধান্য বুঝায় (Preponderance of curiosity over phantasies of wish fulfilment)।

আধুনিক উন্নতিশীল জগতে 'অনুসন্ধিৎসা' যাবতীয় নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ববিশিষ্ট এবং কেবলমাত্র যাঁহাদের এই গুণ আছে তাঁহারাই ইহা শিশুচরিত্রে প্রদান করিতে সমর্থ। আজকাল শিক্ষা-বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা সাধারণ ভাবে (Public) বা ব্যক্তিগতভাবে (Private) জোর করিয়া বলেন যে শিক্ষকদের অধিকাংশই ভীত কৌমার্য্যব্রতধারী সুতরাং এই 'অনুসন্ধিৎসা' গুণহীন।

বাস্তব জগতের সহিত নিকট সম্বন্ধ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা আজকাল অসমঞ্জস্য বলিয়া গৃহিত হইয়াছে এবং যুবকদিগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গ-সম্বন্ধীয় সংশ্রব হইতে দূরে থাকার আজ্ঞা হেতু চিরদিনের জন্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিশুদিগের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আমিও পক্ষপাতী নহি। সৎপ্রবৃত্তিগুলির গঠন স্বতঃ সঞ্জাত নহে এবং যেমনই হউক অষ্টম বর্ষের পর শিশুদিগের অধিক জ্ঞানার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে ও যথারীতি শিক্ষা না দিয়া তাহাদের নিজেদের উপর ছাড়িয়া দিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। ছোট শিশুদের উপর অপেক্ষাকৃত বয়ঃ-প্রাপ্ত বালকদের অসৎ ব্যবহার হইতে দেওয়া উচিত নহে। এই গণ্ডীর ভিতর শিশুদের যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া চলে।

খুব অল্পবয়স্ক শিশুদিগের ও শারীরিক অসম-সাহসিক ক্রিয়াগুলি করিতে দেওয়া উচিত; ইহাতে সামান্য হইতে অধিক শারীরিক অনিষ্ট বা আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও ক্ষতি নাই। খুব বেশী রীতি, নীতি বা চালচলন শিখাইলে তাহারা সমাজে ভীরু হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে।

কোন্ রকম ভাবের প্রতিবন্ধকতা শিশুদিগের অবাধ বাক্য কথন সম্বন্ধে হওয়া চাই না। যখন একটী শিশু বলে যে তাহার পিতার কিম্বা মাতার মৃত্যু সে কামনা করে—ইহা অসদভিপ্রায় বলিয়া

তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারণ তাহাকে বাধা দিলেই যে সে চিন্তার আত্যন্তিকতা হ্রাস হইবে তাহা নহে বরং বাধাপ্রাপ্ত চিন্তা অব্যক্ত থাকায় অন্তর্মুখীন্ হয় ও প্রবল ভাব ধারণ করে। যখন সে শিশুসুলভ কল্পনায় অসংযতভাবে প্রবৃত্ত হয় তাহা পূর্ণবয়স্কদিগের নিকট যতই অযথা বলিয়া প্রতিপন্ন হউক্ না কেন তথাপি তাহা "চুপ্, চুপ্," বলিয়া বন্ধ করিয়া দিতে নাই।

অনেকে রাজনীতি সম্বন্ধে অবাধ বাক্যকথন বা স্বাধীন মত পোষক বাক্যকথন সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ইহা আমাদের স্বাধীনতার রক্ষাসাধন করিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে ইহা আমাদের অসৎ প্রবৃত্তিগুলির বহির্গমনের অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিজনক রাস্তা। ভাবগুলির কার্য্য সম্পাদন করিতে কোন না কোন প্রকারের গতিপ্রদ কর্ম্মকুশলতা (motor activity) দরকার। ইহা গতিপ্রদ ক্রিয়া না হইয়া যাহাতে শুধু বাক্যপ্রদ হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়।

একটী শিশু রাগিয়া গেলে হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাকে কিন্তু একজন সভ্য ভদ্রলোক শুধু বাক্য দ্বারাই ক্রোধ প্রকাশ করেন। ইহা হইতে দেখা যায় অবাধ বাক্যকথন কতটা দরকার ও কার্য্যকরী।

যে লোকটী অবাধ বাক্যকথনে বাধাপ্রাপ্ত সে তাহার শত্রুর প্রতি ঘৃণাবশতঃ তাহাকে হত্যা করিবার মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে অথচ একই কারণে ঘৃণাভাব পোষণ করিয়া আর একটী লোক যে অবাধ বাক্যকথনে অভ্যস্ত সে হত্যা না করিয়া তাহার নামে স্বল্প কথায় প্রকাশিত বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে।

পাঠশালে, আমি শিশুদিগের মধ্যে ঝগ্ড়া হইলে প্রথমে তাহারা সাম্‌নের মাথায় যে কোন অস্ত্র পায় তাহা দ্বারা কাটাকাটি করিতে থাকে ও ক্রমশঃ অস্ত্র শস্ত্রের পরিবর্ত্তে ঘুসাঘুসি করিয়া থাকে ও সর্ব্বশেষে মারামারির বদলে বচসা করিয়াই খুসী হয়। শিশুদিগের মধ্যে যাহাদিগকে গৃহে নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় ও বলিয়া দেওয়া হয় যে অপর সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভাল বলিবে ও কাহারও নিন্দা করিবে না তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মারামারি করিতে ইচ্ছুক।

উপরি উক্ত সীমার অন্তর্গত শিশু স্বাধীনতার কৃতিত্ব এই যে ইহা দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না—শুধু যে অসুবিধাজনক মুহূর্ত্তে সাময়িক ভাবে নিজেদের প্রকাশ করিতে নিবারিত হয় তাহা নহে।

অধিকাংশ বালকবালিকাদের অসৎপ্রবৃত্তিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে নিবারিত করা সম্ভব যদি তাহাদিগকে নৈতিক শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বিশেষভাবে ও সুস্পষ্টরূপে পরিহার করা যায়।

শিষ্টাচার, বদান্যতা ও শ্লীলতা পুনঃ পুনঃ বাক্য ও উপদেশ দান দ্বারা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের এমন একটা পদ্ধতি খুঁজিয়া বাহির করা দরকার যাহা দ্বারা সুবিধাজনক পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাড়িতে পারে।

যে সমস্ত শিশুদিগের ভ্রমপূর্ণ পুরুষানুক্রমিক

চলিত নৈতিক শিক্ষা দ্বারা নৈতিকবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগাপেক্ষা ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্কাবধি শিশুদিগকে যদি ঠিক ভাবে পরিচালন করা যায় তাহা হইলে তাহাদিগের পরবর্ত্তী জীবনব্যাপী শিক্ষা এমন সমস্ত পদ্ধতিতে দেওয়া যায় যাহা স্বাধীনভাবে ও বিচারশক্তি সহকারে সম্ভবপর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা

আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক কবিরাজ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

কিৎ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া চিকিৎসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিৎ ধাতুর অর্থ রোগাপনয়ন। যে ক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা রোগ দূর করিবার চেষ্টা করা হয়, সেই ক্রিয়াকে চিকিৎসা বলে। রোগ উৎপন্ন হইলে চিকিৎসা দ্বারা যেমন তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করা হয়, সুস্থ ব্যক্তির ভবিষ্যতে কোন রোগ না হয় এবং স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে সেজন্য চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।

সুস্থের অনাগত রোগের চিকিৎসা, অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন তন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত। রস ও অয়ন এই দুইটী শব্দ লইয়া রসায়ন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জীবের বল ও পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। সেই খাদ্য দ্রব্যগুলি পরিপাক-শক্তির প্রভাবে সম্যক পরিণত হইয়া যখন সার ও কিট্ট বিযুক্ত হয় এবং সারাংশ শরীরে শোষিত হয়, তখন সেই সারাংশকে রস বলা হয়। এই রসের দ্বারাই জীবের বল ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। এই রস শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ করে। এমন কি কেশাগ্র ও নখাগ্র পর্য্যন্তও রসের গতি বিদ্যমান থাকে।

রসের উৎপত্তি, গতি ও মার্গ অব্যাহত থাকিলে শরীরের বল ও পুষ্টি অব্যাহত থাকে সুতরাং আগন্তু-রোগ ভিন্ন অন্য কোন রোগ আসিতে পারে না। সুস্থ-ব্যক্তির স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, রসায়ন ঔষধ সেবন করা আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ। রোগ-চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বলেন, অবিকৃত বায়ু, পিত্ত ও কফ জীব শরীর রক্ষণের হেতু। তাহারা বিকৃত হইলে স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। এই বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় আনয়নই চিকিৎসকের কার্য্য।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। জীবদেহ এবং জড়দেহ উভয়ই পঞ্চভূতাত্মক হইলেও জীবের চেতন অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া জড়দেহ হইতে জীব-দেহের পার্থক্য আছে। জড় উৎপন্নের পরক্ষণ হইতেই ক্ষয়ের দিকেই যাইতে থাকে কিন্তু জীবদেহ উৎপন্নের পরক্ষণ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন কিছু বাড়িতে হইলে, হয় তাহাতে উপাদানান্তরের

সংযোগ, না হয় বায়ুর দ্বারা কঁাপাইয়া তুলিতে হয় কিংবা উভয়ই আবশ্যক হয়। জীবদেহের বৃদ্ধির প্রতি এই দুইটীই আবশ্যক। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহাই আমাদের শরীরের উপাদানরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। খাদ্যে শারীর উপাদান থাকিলেও উহা শারীর দ্রব্য হইতে বিসদৃশ। পাকের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই দ্রব্য ধাতু ও ধাত্বনুভয়রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। যাহার ক্রিয়া—পাক উৎপাদন, তাহাকেই 'পিত্ত' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পাক হইলে কেবল চলে না, তাহাদিগকে আবার যথাযথ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। যাহার শক্তিতে দ্রব্য যথাযথ স্থানে যাইতে সক্ষম হয়, তাহার নাম 'বায়ু'। এবং যে দ্রব্য নবাগত দ্রব্যকে শরীরের দ্রব্যের সহিত সংযোগ-সাধন করে, তাহার নাম 'কফ'। চেতনাধিষ্ঠিত পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহের মধ্যে বায়ু, তেজ ও জল এই তিনটীকে যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফ বলা হয়। ইহারা শরীর রক্ষণের প্রধান কারণ।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে সমানগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে দ্রব্য বাড়িয়া যায় এবং অসমান-গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে উভয়ই কমিয়া যায়। শরীর রক্ষণের জন্য আমরা যে খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করি তাহার আধিক্য বা অল্পতা বশতঃ এই বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য বা অল্পতা উপস্থিত হইতে পারে। যে দ্রব্য বায়ু, পিত্ত বা কফের তুল্যগুণ বিশিষ্ট সেই দ্রব্য উহাদিগকে বাড়াইবে এবং যে দ্রব্য উহাদের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট তাহারা উহাদিগকে কমাইবে। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় জন্য শারীর রোগ উৎপন্ন হয়।

বৃদ্ধি জন্য যেখানে রোগ হয়, সেখানে প্রথম বৃদ্ধি লক্ষণ দেখা যায়। সেই সময় বৃদ্ধি দোষের নির্হরণ অর্থাৎ, ক্ষয় করাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়নই প্রথম চিকিৎসা। এই অবস্থায় যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহা হইলে, দোষের প্রকোপ হয়। প্রকোপ বলিতে 'বিকৃতি' বুঝায়। তখন এই বিকৃতি দূর করা এবং দোষ নির্হরণ করা এই দুইটী কার্য্য। এই অবস্থায় যদি চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে দোষের প্রসার আরম্ভ হয়; অর্থাৎ, দোষ স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে থাকে। এই অবস্থায় দোষের গতি বন্ধ করা এবং পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার চিকিৎসা প্রয়োজন। এই অবস্থায়ও চিকিৎসিত না হইলে সর্ব্বদেহে ধাবমান দোষ কোন একটি স্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাকে দোষের স্থান সংশ্রয় কহে। এই অবস্থায় সেই স্থান হইতে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনা এবং পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার চিকিৎসা আবশ্যক। এই অবস্থায়ও যদি চিকিৎসা করা না হয়, দোষ তখন দূষ্যের সহিত অর্থাৎ, রস-রক্তাদি ধাতু কিংবা পুরীষ মূত্রাদি মলের সহিত সংযুক্ত হইয়া জ্বর, অতিসার প্রভৃতি কোন একটি বিশিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হয়। তখন উৎপদ্যমান রোগের পূর্ব্বরূপ দেখা যায়। তখন দোষ দূষ্যের সংযোগ দূরীকরণ এবং পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার চিকিৎসা আবশ্যক।

এই অবস্থায়ও যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহা হইলে কোন বিশিষ্ট রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তৎপ্রত্যনীক চিকিৎসা এবং পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া থাকে। এই সময় রোগের প্রতিবিধান না করিলে রোগ দীর্ঘকালানুবন্ধী হয় এবং রোগের উপদ্রবাদি দেখা যায়। তখন রোগ কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠে; এই সময়ও প্রতিবিধান না করিলে রোগ-অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং প্রথম

যখন দোষের বৃদ্ধি হইবে, তখনই তাহা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক আরোগ্যকামী ব্যক্তির সচেষ্ট হওয়া উচিত। দোষের ক্ষয় হইলে সযোনি-বর্দ্ধন দ্রব্য দ্বারা তাহাকে সাম্যাবস্থায় আনার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

নিবেদন

শ্রীবিমলচন্দ্র রায়

আজ "স্বাস্থ্যে"র বিশেষতঃ পাঠিকাদের নিকট কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই নবযুগে আমার কথাগুলি কাহারও কাহারও নিকট বিদ্রূপের বিষয় হইবে, অথবা কেহ কেহ হয় ত আমার উদ্দেশ্যে কতকগুলি আশীর্ব্বাদের (?) বোঝা নিক্ষেপ করিবেন, তথাপি সে জন্য অনেকটা প্রস্তুত হইয়াই সাহসে ভর করিয়া কথাগুলি বলিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। আমি এই প্রবন্ধে চা, পান-দোক্তা প্রভৃতি দু'একটী বদভ্যাসের বিষময় ফল বলিব এবং তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ জিনিষের বিষয় উল্লেখ করিব, যদ্দ্বারা আমার বিশ্বাস অনেকেই উপকৃত হইবেন।

এ স্থানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি। আমার মনে হয়, অতি অল্প সংখ্যক মেয়েরাই নিয়মিত "স্বাস্থ্য" বা এই ধরণের পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন। আজকাল ঈশ্বরের কৃপায় বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস এবং নাটকের অভাব নাই; অনেকেরই বোধ হয়, অবসরমত সেগুলি পড়িয়া এ সমস্ত পড়িবার অবকাশ থাকে না। এ স্থলে কেহ মনে করিবেন না যে আমি তাঁহাদের উপন্যাস বা নাটক পাঠ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করিতেছি; আমার বক্তব্য এই যে, আজ শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত প্রতিগৃহেই যেমন নাটক নভেলের ছড়াছড়ি দেখা যায়, এ সমস্ত জিনিষের সেরূপ কদর দেখিতে পাই না। অথচ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রত্যেক জিনিষটীই সর্ব্বাগ্রে পড়িয়া, শুনিয়া জানা যে কত প্রয়োজন, তাহা যে কেহই একটু চিন্তা করিলেই প্রণিধান করিতে পারেন। কি করিয়া পরিবারস্থ সকলকে সুস্থ্য, নীরোগ রাখা যায়,—কি করিয়া সাধারণ রোগ ব্যাধিগুলি আরোগ্য করান যায়,—কি করিয়া শিশু পালন করিতে হয়,—কিরূপ শিক্ষায় শৈশবকাল হইতেই শিশুদের দীক্ষিত করা উচিত ইত্যাদি অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় মেয়েরা আজকাল জানিবার জন্য আগ্রহ দেখান না। ইহা অতিশয় দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। শুধু মেয়েদের সম্বন্ধেই নয়,—প্রায় সকলেরই দেখি মাসিক পত্রিকাখানি আসিলে সর্ব্বাগ্রে তাহার রঙীন ছবিগুলি লইয়া বিশ্লেষণ করেন এবং তৎপর নভেল গল্পগুলি পড়িয়া পত্রিকাখানি ফেলিয়া রাখেন। জানিবার শিখিবার সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও যে প্রত্যেক মাসিক বা অন্যান্য পত্রিকাতে না থাকে, তাহা নহে; তবে দুঃখের বিষয় অনেকেই সেগুলির

প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বোধ করি সঙ্গত মনে করেন না। আশা করি আমাদের মা বোনরা এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন এবং যাহাতে আপন আপন এবং পরিবারস্থ সকলের স্বাস্থ্য উত্তম রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন সে বিষয়ে নিজেদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মেয়েদের স্মরণ রাখা উচিত যে পরিবারস্থ সকলকে সুস্থ রাখা সম্বন্ধে তাঁহারা অনেকটা দায়ী। যাক্ এখন বক্তব্য বলি।

আজ সর্ব্বত্রই শুনিতে পাইতেছি দারিদ্র্যের পীড়নে দেশ জর্জ্জরিত। আমাদের এ শোচনীয় অবস্থার মূলেই রহিয়াছে দরিদ্রতা। দেশের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার মনে হয় না যে, দেশে দারিদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে বরং মনে হয়, দেশের লোক বেশ স্ফুর্ত্তিতে এবং সুখেই বুঝি আছে। বাহিরে দেখিতে পাই বাবু ভায়া হইতে আরম্ভ করিয়া মুটে মজুর পর্য্যন্ত চায়ের দোকানে মসগুল হইয়া চায়ের পেয়ালাতে মুখ চুবাইতেছে দিনে তিন চারিবার করিয়া। পান সিগারেটের দোকানে স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অন্দর মহলে দেখি বাড়ীর কর্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্য্যন্ত চা পানে মত্ত। পান-দোক্তার ত কথাই নাই। পূর্ব্বে চা এবং সিগারেট শুধু সহরেই প্রচলিত ছিল, এখন সভ্যতার দিনে পল্লীতেও তাহাদের প্রসার প্রতিপত্তি কম নয়। আজ প্রতি পল্লীতে নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যেও চা না হইলে চলে না। দিনের কঠোর পরিশ্রম যাহারা তামাকের সুখটানে ভুলিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিত, আজ তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই প্রাতঃকালে চা না হইলে ঘুম ভাঙ্গিতে চায় না এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক বাটি চা না হইলে পরিশ্রমের পর নিদ্রাদেবী আসিতে চান না। সিগারেট শুধু ভদ্রবাবুদের মধ্যে আজ সীমাবদ্ধ নাই; যাহার দৈনিক আয় হয়ত চার গণ্ডা পয়সা, লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া যে ক্ষেতে জমি চাষ করিতেছে, সেও আজ সিগারেট ফুঁকে। তবে হয়'ত কমদামী। গেল বৎসর বাবুরা একেবারেই সিগারেট ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু অশিক্ষিত পল্লীবাসী যাহারা প্রথম সিগারেট ফুঁকিয়া বাবু সাজিতেছে তাহারা বিশেষ ত্যাগ করে নাই। আজ ত' প্রায় স্থানেই বিশেষতঃ কলিকাতায় যে স্থানে শিক্ষিত-ভদ্র নামধারী দেশ হিতৈষী ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব অধিক সেস্থানে সকলের মুখেই আবার বিদেশী সিগারেট জ্বলিতেছে। বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর পদাঙ্ক অনুকরণ করিয়া আজ আবার সিগারেট দেশ বিদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বেড়াইতেছে। পল্লীতে যাহারা ভয়ে ভয়ে সিগারেট ছাড়িয়াছিল, তাহারা সানন্দে অনেকেই দেখিতেছি সিগারেট পান করিতেছে। আর একটা জিনিষের কাটতি পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত চাষীদের মধ্যে অত্যধিক আজকাল হইয়াছে, সেটী হইতেছে টর্চ্চলাইট প্রায় প্রত্যেকের হাতেই দেখি টর্চ্চলাইট। পূর্ব্বে যাহারা তেলে পাকা লাঠি লইয়া দুপুর রাত্রে বন বাদাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, আজ তাহারা টর্চ্চ না হইলে চলাফেরা করা অসুবিধা মনে করে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে টর্চ্চে তার কি প্রয়োজন? সে উত্তর দিয়াছিল,—"বাবু, রাত বিরেতে চলাফেরা করি, পোকামাকড়টা, শিয়েল শূয়রটা রাস্তায় পড়তে পারে ত, সেই জন্যই কষ্ট ক'রে জমায়ে তিন টাকা দিয়ে আলোটা কিনলাম।" আমার একজন বন্ধু সেখানে ছিলেন, তিনি বল্লেন— "ঠিক করেছিস্, আজ সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে এ প্রকার হরেক উন্নত জিনিষের খুবই প্রয়োজন আছে।"

আপনারা বলিবেন দেশের নিরক্ষর লোক, বিশেষতঃ কৃষকদের আজ এরূপ অবস্থা নাই যাহাতে তাহারা পাঁচটী বিলাসিতার জিনিষ ক্রয় করে। আমিও বলি তাহাদের সত্যই আজ সে অবস্থা নাই, দুবেলা পেট পুরিয়া খাওয়া আজ তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না কিন্তু তবু তাহারা সাধ্যমত বিলাসিতার জন্য ব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তাহার কারণ একে তাহাদের বিবেচনা শক্তি নাই, তৎপর তাহারা এই প্রথম বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনদিন বিলাসিতার নাম গন্ধ জানিত না, সুতরাং এখন তাহারা মোহে পাগল। আহার না জুটিলেও তাহারা যতটুকু জীবন কবুল করিয়া পারে তাহা করিতেছে। তাহারা অনেকে হয় ত' কুফল বোঝে কিন্তু মোহের বশে বিবেককে হারাইয়া ফেলে। শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই যেমন চা পানের অপকারিতা জানেন তথাপি ত্যাগ করেন না।

আমি অনেক দেখিতে পাই যে মা স্নেহের আতিশয্যে কচি শিশুকে ঝিনুকে করিয়া চা পান করাইয়া থাকেন। যে দেশে অধিক শিশুমৃত্যুর জন্য চতুর্দ্দিক হইতে শোকার্ত্তা জননীর ক্রন্দন আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে, আবার সেই দেশেই কিনা জননী স্নেহভরে নবজাত সন্তানকে চা-বিষ পান করাইয়া থাকেন। প্রাতঃকালে প্রতি গৃহেই দেখা যায় চায়ের স্থানে বাটীর প্রত্যেকেই ভীড় পাকাইয়াছে। বাটীর ছোট খোকাটীকে বা খুকীটীকে একটু কম চা দাও সে রাগিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে,—এমনি ভাবে তাহারা তৈরী হইতেছে। দেশের লোক দরিদ্রতার দোহাই দিয়া শিশুদের উপযুক্ত দুগ্ধ জোগায় না, কিন্তু প্রতিদিন বাটীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা দুবেলা চা পানে কত পয়সা নষ্ট করে, সে হিসাব রাখে কি? ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যে প্রাতঃকালে চায়ের নাম জপিয়া শয্যাত্যাগ করে এবং কেট্‌লীর চারিপাশে জড় হয় এ কাহাদের শিক্ষার প্রেরণাতে? সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় আমাদের মা, বোনেরাই এজন্য প্রায় সম্পূর্ণ দায়ী।

চায়ের পরিবর্ত্তে ছোলা—

চা—চায়ের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বাস্থ্যে বহুবার হইয়া গিয়াছে, এ স্থলে আমি সংক্ষেপে ইহার অপকারিতার বিষয় কিছু উল্লেখ করিব। অপকারিতা বলিতে যাইতেছি বলিয়াই কেহ মনে করিবেন না যে ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার অপকারিতা হিসাবে উপকারিতা পরিমাণ এত অল্প যে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। চা উত্তেজক পানীয়। উত্তেজক জিনিষ মাত্রেই ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি আনায়ন করিয়াই পুনরায় অবসাদ আনয়ন করে; তখন সেই অবসাদ দূর করিবার জন্য আবার সেই উত্তেজক পদার্থটী সেবন করিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। গাঁজাখোর এবং মাতালদের দৃষ্টান্ত দিলে সকলেই এ কথাটীর সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। চায়ের মধ্যে 'কেফিণ' নামক একটী উগ্র উত্তেজক পদার্থ বিদ্যমান। সেই জন্য চা খোর মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে ইহা সেবন করিলে ক্ষণিকের জন্য একটু সুখ অনুভূত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই যখন পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসে, তখন আর এক পেয়ালা চায়ের জন্য প্রাণ 'আন্‌চান্‌' করে। এইরূপে অনেকে দৈনিক ৮।৯ পেয়ালা চা উদরাসাৎ করেন—ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। আধুনিক অনেক নব্যবাবু, এমন কি অনেক বোনেরা পর্য্যন্ত বলেন,—"ভাত না খেয়ে আমি দু'দিন বেশ কাটিয়ে

দিতে পারি ; কিন্তু—বাবা—'চা'টা না হ'লে চল্‌বে না।" কি লজ্জার, অনুতাপের কথা !

'চা'য়ে আর একটী বিষম ক্ষতিকর উপাদান অবস্থান করে, তাহার নাম—ট্যানিক এ্যাসিড। চা সেবনে—স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগ জন্মে। শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণই হইতেছে—চা সেবন করা। আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিয়া থাকে ;—তাহারও একটী প্রধান কারণ,—অত্যধিক এই বিষ পান করা।

ছোলা—ছোলা খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। ভিজান অঙ্কুরযুক্ত ছোলাতে "খাদ্যপ্রাণ" অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অবস্থান করে। প্রাতঃকালে চায়ের পরিবর্ত্তে সামান্য পরিমাণে ছোলা পুর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিয়া একটু আদা বা ইক্ষুগুড়ের সহিত ভোজন করা খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহাতে ব্যয় অল্প। বাটীর সকলেই খাইতে পারেন। এ ব্যবস্থাতে নাসিকা কুঞ্চন করিবার কোন হেতু নাই। বিশেষজ্ঞগণ ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দেশে বহু শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি আজকাল এইরূপ খাদ্যপ্রাণযুক্ত জিনিষ,—যাহা আমরা এতদিন হেয় জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি —দৈনিক নিয়মিত আহারের তালিকাভুক্ত করিতেছেন। আধুনিক শিক্ষিত শিক্ষিতাদের ইহাতে মাথা কাটা যাইবার কিছুই নাই।

বিস্কুটের পরিবর্ত্তে আদা

বিস্কুট—বিস্কুটের ভিতর এমন কোন পুষ্টিকর উপাদান অবস্থান করে না, যাহাতে সুস্থ, নীরোগ ব্যক্তির কোন উপকারে আসিতে পারে। গুণের মধ্যে ইহা সহজ পাচ্য এবং মুখরোচক, মোটেই পুষ্টিকর নহে। ইহার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বিশেষতঃ যে সমস্ত বিস্কুট বিলাত হইতে টিনে আমাদের হতভাগ্য দেশে চালান আসে, তাহার ত্রিসীমানাও খাদ্যপ্রাণ অবস্থান করে না। দৈনিক চায়ের সহিত বিস্কুট খাইয়া বড় বড় বাবু সাজিতে আমরা অনর্থক কতকগুলি পয়সা ব্যয় করি।

আদা—চায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিস্কুট যেমন তাহার নিত্যসঙ্গী, তেমনি ছোলার সহিত আদারও অত্যন্ত ঘনিষ্টতা। আদার গুণাগুণ কিছু বলিতেছি। আদার একটী প্রধান গুণ হইতেছে জীর্ণ করাইবার প্রবল শক্তি ইহাতে বিদ্যমান। আদায় শারীরিক বল এবং মানসিক তেজ এই দুইই বৃদ্ধি করে। ইহা আহারে রুচি জন্মায়। একটা প্রবাদ আছে—"আদানুন খেয়ে লাগা।" এই কথার তাৎপর্য্য, খুব উৎসাহ এবং তেজের সহিত কার্য্য সুসম্পন্ন করা। পুর্ব্বে আমাদের দেশে আদা ছোলা প্রাতঃকালে খাইবার রীতি ছিল, কিন্তু এখন নব্য সভ্যতার যুগে এই কথাটী লিখিতে বা বলিতে ভয় করে।

(ক্রমশঃ)

রোগীর পথ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কবিরাজ শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা চল্‌তি কথায় যাহাকে 'আমাশা' বা 'রক্ত আমাশা' বলি, বৈদ্যকশাস্ত্রে তাহাকেই প্রবাহিকা নামে কথিত হয়। বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য বেশী পরিমাণে সেবিত হইলে শরীরস্থ বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফ বা আমকে মলের সহিত প্রবাহন (কুন্থন) দ্বারা বারে বারে অল্প মাত্রায় নিঃসরণ করাইয়া দেয়। রক্ত পৃথক ভাবে অথবা এক সাথেই আসিতে পারে। এই অবস্থাটীকে প্রবাহিকা বলে।

প্রবাহিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোগ প্রকাশ পাইবার পরই লঙ্ঘন দেওয়ান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর যদি এই অসুখের সহিত জ্বর থাকে তাহা হইলে কথাই নাই। লঙ্ঘন দেওয়াইতে হইবে বলিয়া সকলকেই লঙ্ঘন দেওয়ান চলে না। বালক, বৃদ্ধ দুর্ব্বল প্রভৃতিকে লঙ্ঘন দেওয়ান উচিত কর্ম্ম নহে। লঙ্ঘন দেওয়ানর আবশ্যকতা আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই ব্যাধি শরীরে একবার প্রবেশ লাভ করিলে শরীরকে অপটু করিয়া ফেলে এবং মধ্যে মধ্যে ইহার আক্রমণ ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য এই ব্যাধি শরীরে প্রকাশ পাইবামাত্র শরীরের যত্ন লইতে হয়। যদি রোগীর বিরেচন প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে বিরেচন দেওয়া হিতকর। বিরেচন দিলে প্রবাহিকার বীজ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায় এবং রোগারোগ্যের সহায়তা করে। বিরেচনের জন্য এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টর অয়েল) উপযুক্ত।

প্রবাহিকার প্রথমাবস্থার লঘুপথ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এজন্য বার্লি, শটীর পালো, খৈএর মণ্ড প্রয়োগ করা চলিতে পারে। বার্লি প্রভৃতি প্রয়োগের সময় কাঁটানটের শিকড়ের রস ১ তোলা ও মরীচ চূর্ণ ½ খানা মাত্রায় তাহাতে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ সুফল লাভ করিতে পারা যায়। প্রবাহিকায় যদি আমের সহিত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে রক্তাতিসারে যেরূপ ভাবে ছাগ দুগ্ধের প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে সেই ভাবে ছাগ-দুগ্ধ-পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

ব্যাধি যেমন উপশমের দিকে যাইবে তেমনই বিবেচনা সহকারে পথ্যেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আম নিঃসরণের বেগ কমিয়া আসিলে অন্নপথ্য প্রয়োগ করাই সঙ্গতঃ। রাত্রিকালে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে ভাজা দুই একখানা লুচি রোগীকে দিতে পারা যায়। তবে গুরুপাক দ্রব্যাদির দ্বারা রন্ধিত বা লঙ্কার ঝালযুক্ত প্রভৃতি কোন পথ্য প্রয়োগ

করা উচিত নহে। প্রবাহিকায় ইসপ্‌গুল—ইসপ্‌গুল প্রবাহিকার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য। প্রবাহিকার সকল অবস্থাতেই ইসপ্‌গুল প্রয়োগ করা চলে। প্রবাহিকা রোগীর জন্য সর্ব্বদা ইসপ্‌গুল ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এবং পিপাসার কালে সেই জল ছাঁকিয়া রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া উচিত। গরম জলে ভিজানই সঙ্গতঃ এবং দিবসে দুই বার ভিজাইতে হইবে। পুরাতন ও নূতন প্রবাহিকায় ইহা সাক্ষাৎ অমৃত তুল্য। নূতন অবস্থার দিবসে দুই তিনবার প্রয়োগই যথেষ্ট।

প্রবাহিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সর্ব্বদা পেটে ফ্লানেল জড়াইয়া রাখা ভাল। জামা, কাপড়, বিছানা প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। এই রোগীর জন্য যে জল ব্যবহার করা হইবে তাহা ফুটাইয়া পান করিতে দিতে হইবে। জল গরম অবস্থায় পান করিতে দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। এই ব্যাধিতে ফল সেবন নিষেধ।

গ্রহণী রোগ

আমাশয়ের নীচে যে নাড়ী আছে তাহাকে গ্রহণী বা অগ্ন্যাধিষ্ঠান কহে। সেই নাড়ীতে পীড়া উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাকে গ্রহণী রোগ বলা হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যদি পূর্ব্বে অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যাধি থাকে তাহা হইলে অনেক সময় তাহা হইতেই গ্রহণীতে পরিণত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, অতিসারের পর অনেকে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

গ্রহণী একটি ভীষণ ব্যাধি। প্রথম হইতে যত্ন না লইলে কালে দুর্জ্জয় হইয়া উঠে। নিত্য স্নান এই রোগে ভাল নহে। কোন গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া অনুচিত। দুগ্ধ পান করিতে দেওয়াও চলে না।

রোগের আদিতে অবস্থা বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন অবশ্য দেওয়াইতে হইবে এবং সাথে সাথে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্ন, খৈ, চিঁড়া প্রভৃতির মণ্ড, মুগ বা মুসুরের যুষ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পথ্য। এই সকল পথ্য প্রয়োগ করিবার কালে ধনে চূর্ণ /০ আনা পরিমাণে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। মুগ বা মসূরের যুষ প্রস্তুত করিবার কালে তাহাতে যদি চই এক টুকুরা ফেলিয়া দিয়া প্রস্তুত করা যায়। তাহা হইলে একাধারে আহার ও ঔষধ উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে কচি বেল এই রোগে প্রয়োগ করা চলিতে পারে। মাছের ঝোল দিতে হইলে ক্ষুদ্র জাতীয় ও জিয়ল মৎস্য ব্যবহার করা উচিত। এই সাথে খলিশা মৎস্যও প্রয়োগ করা চলিতে পারে। অজীর্ণ ব্যাধিতে যে ভাবে অন্ন প্রস্তুত করিবার কথা বলা হইয়াছে সেই ভাবে অন্ন প্রস্তুত করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত। এখন কথা, রোগীর যদি লোভ না থাকে তাহা-হইলে তাঁহার রুচি অনুসারে এই সকল পথ্যের ভিতর মাপ মত ও সময় মত সেবন করিতে পারেন। তবে প্রয়োগকারী জানিয়া রাখিবেন, পেট-রোগাদের অত্যধিক মাত্রায় লোভ থাকে। এই রোগে দিবা নিদ্রা যাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

যদি রোগীর শোথ দেখা দেয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ব্যাধি গুরুতর এবং হৃদযন্ত্রও খারাপ হইয়াছে। সে সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া ঔষধ পথ্য সেবন করাইতে হইবে। শোথের জন্য পুনর্নবার রস ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং হৃদযন্ত্রের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ পথ্য

ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই রোগে মুখে ঘা ও দেখা দিতে পারে। ক্ষত দেখা দিলে সোহাগার খৈ ও মধু একত্র মিশাইয়া ক্ষত-স্থলে লাগাইতে হইবে অথবা ভেড়ার দুধ লাগাইতে দিতে হইবে।

ক্রিমি

প্রায়শঃ বালক-বালিকাগণকে মলদ্বারে ক্রিমির চুলকানিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। বয়স্কেরাও যে ইহার হাত হইতে নিস্তার লাভ করেন এরূপ নহে।

এই ক্রিমির এমনই অত্যাচার যে বালক-বালিকাগণ অস্থির হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় মায়ের মাথার কাঁটা দিয়া ক্রিমি বাহির করিয়া দিতে হয়, তবে শান্ত হয়। এই অবস্থাটী সাধারণতঃ রাত্রিকালেই দৃষ্ট হয়। যখন বুঝা যাইবে মলভাণ্ডে ক্রিমি সঞ্চিত হইয়াছে তখনই বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এরূপ অবস্থা ঘটিলে, জল গরম করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় মলদ্বারে পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। এই ভাবে বস্তি প্রদান করিলে অন্ততঃ একমাস ক্রিমির উৎপাৎ থাকে না।

ক্রিমিতে দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্রব্যাদি কুপথ্য। কিন্তু বালক-বালিকাগণকে দুগ্ধ পান করিতে দিতেই হইবে। এই সামান্য কারণে দুগ্ধ বন্ধ করিবার প্রয়োজন দেখি না। একেই এই রোগে আক্রান্ত হইলে বালক-বালিকাগণ কৃশ হইয়া পড়ে। তবে দুগ্ধ প্রয়োগ করিবার কালে তাহাতে পরিস্কার চুণের জল দিয়া পান করিতে দিতে হইবে, তাহা হইলে আর দুগ্ধ অপকার করিবে না। এই ব্যাধিতে কটু, তিক্ত, কষায় রসাত্মক দ্রব্য সকল অধিক হিতকর। এই জন্য পল্‌তা, বেত্রাগ্র, নিম প্রভৃতির ঝোল, মাছের ঝোল, ভাত দেওয়া যাইতে পারে। ক্রিমিতে রসোন একটি সুপথ্য। রোগীকে ডাইল দিতে হইলে তাহাতে রসোন দিয়া পাক করিলে চলিতে পারে। রসোন সেবন করাইলে ক্রিমি সকল সহজে বাহির হইয়া যায়। আর এক কথা, প্রত্যহ প্রাতঃকালে আচ্ছটী অর্থাৎ আস্খাওড়া পাতার রস অথবা পালিধা অর্থাৎ পাল্‌তে মাদারের পাতার রস সেবন করাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে পথ্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়।

অর্শ

অর্শ রোগ প্রকাশ পাইলে নিম্নলিখিতভাবে পথ্যের বিধান করিতে হইবে। ভাতের সহিত পল্‌তা প্রভৃতি তিক্তদ্রব্যাদির ঝোল, পুনর্নবা ও বেতো প্রভৃতি শাক, কালায়ের ডাইল, দুগ্ধ, মাখন ও ঘোল রোগীকে সেবন করিতে দিতে পারা যায়। এই সঙ্গে ওল ভাতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাই, অর্শরোগে উষ্ট্রী-দুগ্ধ বিশেষ হিতজনক। যদি কাহারও এবিষয় অভিজ্ঞতা থাকে, প্রকাশ করিলে কৃতজ্ঞ রহিব। রসোন ক্রিমির ন্যায় অর্শেও বিশেষ উপকার করে। ইহা কলায়ের ডাইলের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পেঁয়াজ, রসোন সেবনে জাতি যায় না! যাঁহারা আচার পরায়ণ তাঁহাদের অবশ্য সেবন অনুচিত কর্ম্ম। স্বাস্থ্যের জন্য বা ঔষধার্থে অন্নের সেবনে ক্ষতি নাই। পলাণ্ডু প্রভৃতি সেবন না করা দেশাচার মাত্র।

যদি অর্শের বলির যন্ত্রণা অনুভব হয় তাহা হইলে, বালুকা পোট্টলি বদ্ধ করিয়া গরম করিয়া যে পরিমাণ তাপ সহ্য হয়, সেই ভাবে স্বেদ দিতে হইবে। এই রোগে মৎস্য সেবন নিষেধ।

পাণ্ডু

এই রোগে শালি ধান্যের অন্ন, কাঁচ্‌কলার ঝোল, মাছের ঝোল (জিয়ল মৎস্যই ব্যবহার করা উচিত), মুগ, মসূরের যুষ প্রভৃতি খাদ্যের জন্য দেওয়া যাইতে পারে। শাকের ভিতর পুনর্নবা, কাঁটানটে, তেলা-কুচা প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। পুরাতন চাল-কুমড়া পাইলে রোগীর পথ্যের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগে বাধা নাই। এই রোগে ঘোল সেবন করিতে দিলে পরমোপকার লাভ করা যায়। পাণ্ডু রোগীকে দিবা নিদ্রা সেবন করিতে দেওয়া উচিত কর্ম্ম নহে। জ্বর না থাকিলে অবস্থা ভেদে এইরূপ পথ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। জ্বর থাকিলে জ্বরের পথ্যের ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। অবস্থাভেদে স্নান আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

মনের স্বাস্থ্য ও শিশুপালন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, M. B. Dsc.

শিশুর খেলা

শিশুর পক্ষে কি আবশ্যক ও সে নিজে কি চায়, তাহা সর্ব্বদা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। শিশুর খেলার মধ্য দিয়া যাহাতে তাহার বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ হইতে পারে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, শিশুর মনে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছাসমূহ রহিয়াছে। কখনও শিশু বাপ-মাকে আদর করিতে চায়, কখনও বা তাঁহাদের আদর পাইতে চায়, কখনও বা সে খেলার সঙ্গীদের নেতা হয়, কখনও বা অন্য শিশুর নির্দ্দেশে চলে। এই প্রকারের পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি যাহাতে চরিতার্থ হয়, পিতামাতা তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা না জন্মে, ততক্ষণ মন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না এবং ভবিষ্যতে মানসিক রোগের বীজ থাকিয়া যায়।

শিশুর বিদ্যাশিক্ষা

শিশু কি ভাবে চলে, কি করে না-করে, তাহার আগ্রহ কোন্ বিষয়ে, এ সমস্তই মূলতঃ তাহার স্নেহবন্ধনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে, ভালবাসার ভিতর দিয়াই তাহা দিতে হইবে। শিশু যাহাকে ভালবাসে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহারই কার্য্যকলাপের অনুকরণ করে। তাহার আদর্শই শিশুর নিজের আদর্শ হয়। যে শিক্ষক ছাত্রকে ভালবাসেন, তিনি বিশেষ বিদ্বান না হইলেও তাঁহার শিক্ষাদান সফল হয়। অপর পক্ষে ছাত্রের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে মহাজ্ঞানী শিক্ষকের চেষ্টাও পণ্ডশ্রম হয়। কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া

হইতেছে, তাহা অপেক্ষা কে শিক্ষা দিতেছে, তাহাই বড় কথা। কত প্রকার শিক্ষাপ্রণালী এ যাবৎ আবিষ্কৃত ও পরিত্যক্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবিষ্কর্ত্তার হাতে তাঁহার নিজ প্রণালী সর্ব্বদা সফল হয়, কিন্তু যখনই তাহা অপরে প্রয়োগ করে, তখনই তাহাতে বিফলতার সম্ভাবনা দেখা দেয়; কারণ আবিষ্কর্ত্তার উৎসাহ চেষ্টা ও ছাত্রের প্রতি মনোভাব স্বভাবতঃ অপরে বর্ত্তে না; শিক্ষকের গুণেই শিক্ষা-প্রণালী সার্থক হয়। ছাত্রেরা যে শিক্ষককে ভালবাসে না বা ভক্তি করে না, তাঁহার নিকট কিছুই শেখে না।

শিশুর মন পরীক্ষা

বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য যে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা দরকার, এখন তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। অনেক স্কুল-কলেজেই এখন শারীরিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা চলিতেছে। বালক-বালিকাদের মানসিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও যে আবশ্যক, তাহা অতি-অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন। মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যায়ই কাম্য। দুঃখের বিষয়, চিকিৎসক-দিগের মধ্যেও এ-সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। অনেকেই মনে করেন, *mens sana in corpore sano*, অর্থাৎ শরীর সুস্থ রাখিলেই মন সুস্থ থাকিবে —এই প্রবাদ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত, তাহা মনোবিৎ চিকিৎসকমাত্রেই জানেন। পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্য সত্ত্বেও মানসিক ব্যাধির ফলে মানুষ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই মনের পৃথক চিকিৎসা আবশ্যক। আপাততঃ হয়ত সমস্ত ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ইহার ঔচিত্য সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে মনোবিৎ দ্বারা মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক শিশুরই পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। যে-শিশুর কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে, তাহার মানসিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। স্মরণ রাখা উচিত, মানসিক ব্যাধির কষ্ট অনেক সময় উৎকট শারীরিক পীড়া অপেক্ষাও দুঃসহ। এই কষ্টনিবারণকল্পে সমস্ত চেষ্টাই প্রশংসনীয়।

মনের রোগের লক্ষণ কি?

এই লক্ষণগুলির কোনও একটি বা একাধিক দেখা যাইলে মনের রোগ সন্দেহ করিতে হইবে।

পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য দুর্লভ।

অনিদ্রা, আহার ত্যাগ, অভ্যস্ত কর্ম্ম পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন, অন্যমনস্কতা, বাক্যে ও কার্য্যে অসংযম, স্বাভাবিক লজ্জার হ্রাস, মৌনীভাব বা অতিরিক্ত কথা বা অসংলগ্ন কথা, এক কথা বার-বার বলা, এক কার্য্য বার-বার করা, সামান্য কারণে ক্রন্দন বা হাস্য, হঠাৎ ধর্ম্মে ঝোঁক, বাতিকগ্রস্ত হওয়া, ফিট্ জড়ভরত বা স্তম্ভিতের ভাব, সকল বিষয়েই উৎকণ্ঠা, সামান্য কারণে গুরুতর অসুখ বা বিপদের আশঙ্কা, একলা থাকা ভিড়ের মধ্যে যাওয়া বজ্রপাত ও জীবজন্তুর অত্যধিক ভয়, অত্যধিক মৃত্যুভয়, কাল্পনিক মূর্ত্তি বা বস্তু দর্শন বা শব্দ শ্রবণ, নিজেকে মহাপাতকী বা হীন মনে করা, নিজেকে কোন বিষয়ে অত্যন্ত বড় বা বিভূতিসম্পন্ন মনে করা, অপরে গুণ করিয়াছে অথবা বেতার বৈদ্যুতিক শক্তি হিপ্‌নটিজম বা মন্ত্রের দ্বারা অনিষ্ট করিতেছে বলা, খাদ্যে বিষ আছে বলা, কাশিয়া বা থুথু ফেলিয়া লোকে অপমান অনিষ্ট করিতেছে বলা, অকারণে লোকে ষড়যন্ত্র করিতেছে বা পুলিসে পিছু লইয়াছে বলা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনে কোন অর্থশূন্য চিন্তার বার-বার উদয় হওয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য বার-বার করিতে

বাধ্য হওয়া—যেমন বার-বার হাত ধোয়া বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গণনা করা, কাজ করিয়াও করিয়াছি কি-না সন্দেহ—যেমন বন্ধতালা বার-বার টানিয়া দেখা, সাধারণ কাজ করিতে যাইয়া বার-বার পিছাইয়া আসা বা নানা বাধার কল্পনা করা, বিনা কারণে উদ্দাম ভাব।

* আপনার শিশুর বয়স কত?

সে কি তাহার বয়সের অনুযায়ী কাজ করিতে পারে?

৬মাস হইতে ৯০মাসের শিশু

(১) চিৎ করিয়া দিলে উপুড় হইতে পারে

(২) উপুড় করিয়া দিলে মাথা ও বুক তোলে

(৩) বসাইয়া দিলে মাথা খাড়া করিয়া রাখে

(৪) হাত দিয়া জিনিষ ধরিতে পারে

(৫) জিনিষ ধরিয়া মুখে দেয়

(৬) হাতে জিনিষ ধরিয়া খেলা করে ও তাহা সরাইয়া লইলে কাঁদে

(৭) এক হাতে একটা করিয়া দুইটা জিনিষ ধরিতে পারে

(৮) মা, মা, বা, বা, দা, দা ইত্যাদি শব্দ করে

(৯) উচ্চ হাস্য করিতে পারে

(১০) মাকে চিনিতে পারে ও দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করে

(১১) হাসি মুখ দেখিলে হাসে ও ভয় দেখাইলে কাঁদে

৯০ মাস হইতে দেড় বৎসরের শিশু

(১) কোনও আশ্রয় ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, সময় সময় নিজেও দাঁড়ায়

(২) হামা দিয়া সিঁড়ি উঠিতে পারে

(৩) ধরিয়া পা পা করিয়া চলাইলে চলিতে পারে

(৪) দুই আঙুলে জিনিষ ধরিতে পারে

(৫) দেখাইয়া দিলে ছোট জিনিষ বাটির মধ্যে রাখিতে পারে

(৬) হিজিবিজি আঁকিতে পারে

(৭) দুহাতে দুইটা জিনিষ ধরিয়া তৃতীয় জিনিষ ধরিতে চেষ্টা করে

(৮) খেলার জিনিষ ঢাকা দিলে খোঁজে ও ঢাকা সরাইয়া বাহির করার চেষ্টা করে

(৯) মা, বাবা ইত্যাদি ছোট কথা বলিতে পারে

(১০) ডাকিলে সাড়া দেয়

(১১) নাও, দাও এই প্রকার কথা বুঝিতে পারে

(১২) 'নিও না' 'কোরো না' বারণ শোনে

(১৩) ডান হাত বেশী ব্যবহার করে

দেড় হইতে দুই বৎসরের শিশু

(১) চলিতে পারে

(২) বসিয়া সিঁড়ি নামিতে পারে

(৩) জিনিষ ছুড়িয়া দিতে পারে

(৪) দেখাইয়া দিলে ছোট বাক্স, যেমন দেশলাইয়ের বাক্স, উপরি উপরি দুই-তিনটা সাজাইতে পারে

(৫) দুই হাতে তিনটা জিনিষ ধরিয়া রাখিতে পারে

(৬) অল্প কথা বলিতে পারে

(৭) দেখাইতে বলিলে হাত মুখ ইত্যাদি দেখায়

---

* শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল এম্. এস্. সি. দ্বারা পরীক্ষিত।

(৮) খাবে ? শোবে ? ইত্যাদি প্রশ্ন বুঝিতে পারে

(৯) দেখাইলে ছবি দেখে

(১০) হাত দিয়া খাইতে পারে

(১১) নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করে

(১২) জামা কাপড় পরাইতে গেলে বাধা দেয় না

দুই হইতে তিন বৎসরের শিশু

(১) দেখাইয়া দিলে | এই রকম খাড়া রেখা টানিতে পারে

(২) দেখাইয়া দিলে কাগজ দুই ভাঁজ করিতে পারে

(৩) হাতে না পাইলে ছড়ি দিয়া জিনিষ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে

(৪) তিন-চারটা ছোট বাক্স—যেমন দেশালাই-য়ের বাক্স উপরি উপরি সাজাইতে পারে

(৫) তিন চারটা কথা দিয়া পদ (sentence) বলিতে পারে

(৬) সাধারণ জিনিষের ছবি দেখিলে চিনিয়া নাম বলিতে পারে

(৭) জিনিষের 'ভিতর' 'বাহির' বুঝিতে পারে

(৮) যেখানে-সেখানে প্রস্রাব করে না

(৯) গল্প শোনে

(১০) একলা খেলা করে

(১১) নানা প্রশ্ন করে

তিন হইতে চার বৎসরের শিশু

(১) দেখাইয়া দিলে ——— ও O এই রকম আড় দিকে রেখা ও গোল রেখা টানিতে পারে

(২) গোল চৌকা ইত্যাদি জিনিষের বিশেষত্ব বুঝিতে পারে

(৩) পাঁচ-ছয়টা ছোট বাক্স উপরি উপরি সাজাইতে পারে

(৪) আঁকাছবি দেখিয়া গোটাকতক জিনিষ সাজাইতে পারে

(৫) 'তুমি' 'আমি' সর্ব্বনাম ব্যবহার করে

(৬) 'ছোট' 'বড়' 'সাদা' 'ভাল' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে

(৭) 'জন্য', 'কেন', 'কাছে', 'আর' কথা ব্যবহার করে

(৮) গল্প শুনিয়া বলিতে পারে

(৯) নাম বলিতে পারে

(১০) জুতা জামা পরিতে চায়

(১১) জিনিষ গুছাইয়া রাখিতে পারে

(১২) খেলায় বাহাদুরি দেখাইতে চায়

(১৩) বাড়ির বাহিরে যাইতে চায়

(১৪) আরশি ব্যবহার করে

(১৫) দুইটা বা তিনটা অঙ্ক—যথা, ১-৫-৩ এক-বার শুনিয়া বলিতে পারে

(১৬) রঙের নাম জানে কিন্তু কোনটা কি সব সময় বলিতে পারে না (ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা প্রণয়ণে

প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসক কবিরাজ—শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ন।

জন্ম :—১৩ই ভাদ্র, ১২৫৩ সন। মৃত্যু :—২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬ সন।

স্বায়ত্ত চিকিৎসা—

কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান :—কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৬৭নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

কবিরাজ শীতলচন্দ্রের লেখার পরিচয় স্বাস্থ্যের পাঠক-পাঠিকাকে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বাস্থ্যে কবিরাজ শীতলচন্দ্রের লেখা একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে। শীতলচন্দ্র ৬০ ষাট বৎসরকাল চিকিৎসা কার্য্যে রত থাকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে বাংলায় তিন পুরুষের চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। বহু রোগী দেখিয়া এবং বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই অকপট হৃদয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বায়ত্ত চিকিৎসা নামক গ্রন্থ, কবিরাজ শীতলচন্দ্রের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আজীবন সাধনার শেষ দান। এই গ্রন্থ প্রণয়ণের অব্যবহিতকাল পরেই ৮২ বৎসর বয়সে কবিরাজ শীতলচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার রোগ পরিচয়,

চিকিৎসা-পথ্য, অনাগত রোগ প্রতিষেধ বিষয় এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, সামান্য বাংলা লেখা পড়া জানিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক ঔষধটী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বিস্তৃত ভাবেই গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। কেমন করিয়া রস-উপরস ধাতু-উপধাতু শোধন, জারণ, মারণ করিয়া ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হয় তাহা অতি সহজভাবে আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেক সময় অনেক গাছ-গাছড়া চেনা সম্ভব হয় না বলিয়া গ্রন্থলিখিত গাছ-গাছড়ার সহজ পরিচয় দেওয়াতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

গ্রন্থকার যে সকল ঔষধের শতাধিক স্থলে সুফলতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সকল ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। নিজ ব্যবহৃত সুফলপ্রদ ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধের উল্লেখ করেন নাই। পরমানন্দের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গোঁড়ামীর ছায়ামাত্রও নাই। তাহা গ্রন্থ পাঠেই উপলব্ধি হইবে। কবিরাজ শীতলচন্দ্র এই গ্রন্থে যে উড়ুম্বরামৃতের প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী বলিয়াছেন, সেই উড়ুম্বরামৃত যদি পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ পাশ্চাত্য মতে বিচার করিয়া ব্যবহার করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন এবং ঋষিকল্প চিকিৎসক কবিরাজ শীতলচন্দ্রের উদ্দেশ্য আরো সার্থক হইবে। চিকিৎসক, চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার্থী ও গৃহস্থ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বসন্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীঅভয় কুমার সরকার, M. B., D. P. H.

ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার, ফরিদপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৲।

সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড,

ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার মহাশয় বহু নূতন কথার আলোচনা করিয়া পুস্তকখানিকে সাধারণের উপযুক্ত করিয়াছেন। বসন্ত রোগ, তাহার বিস্তার, প্রকার ভেদ নির্ণয়, সকল বিশেষে সবিশেষ বর্ণনা তাঁহার নিজ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনায় এই পুস্তকখানির উপকারিতা, সাধারণ ও বিশেষজ্ঞের নিকট বর্দ্ধিত হইয়াছেন। টীকার বিষয় ও টিকাদার এবং স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য বিষয়ক পরিচ্ছেদটী অতীব উপকারী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থের, দেশে বসন্ত হইবার পূর্ব্বের কর্ত্তব্য, টিকা লওয়ার কথা সাবধানতা, টিকা লওয়ার উপকারিতা ও বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা ইত্যাদি বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে সবিশেষ বর্ণনা করিয়া দেশবাসীর উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষতঃ টিকা বিভাগের কর্ম্মচারীদের পক্ষে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি ইত্যাদির মেম্বরদের পক্ষে যাহারা সদা সর্ব্বদা লোকেদের স্বাস্থ্য বিষয় জ্ঞান বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকে অনেক শিখিবার জিনিষ আছে।

আমরা সাধারণ গৃহস্থ, লাইব্রেরী পল্লী-সেবার জন্য অধুনা প্রতিষ্ঠিত সকল সমিতিগুলিতে এই পুস্তকের প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমরা গ্রন্থকার অভয় বাবুকে এই পুস্তকের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। এইরূপ পুস্তক সকল সংক্রামক রোগ বিষয় লিখিলে তিনি দেশের বহু উপকার করিবেন।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কারখানা সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের উক্তি ঃ—

সিরাম, ভ্যাক্সিন, ইনজেক্‌টিউল ও অন্যান্য ঔষধের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ কারখানা।

১৯২৭ সালে কলিকাতায় যখন ট্রপিকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের ফার ইষ্টার্ণ এসোসিয়েসনের সপ্তম অধিবেশন হয়,—তখন এই অধিবেশনের অনেক খ্যাতনামা সভ্য—বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর লেবরেটরী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং—তত্রত্য ব্যবস্থা সকল দেখিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের চিকিৎসকগণকে বিদেশ হইতে আনীত ভ্যাক্সিন এবং সিরামের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু এখন সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে তিনি এই কোম্পানী পরিদর্শন করিয়া জানিতে পারিবেন যে, এই বিষয়ে তাঁহারা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

এই অধিবেশন শেষ হইলে এই কোম্পানী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারেল মেজর জেনারেল জি, টেট. এম্ ডি, কে-এচ-এস, আই-এম-এস, মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র লাভ করেন। সভ্যগণ উক্ত ল্যাবরেটরীতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার আধুনিক, বৈজ্ঞানিক প্রণালী দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার সিগা, ডাক্তার হাটা এবং আরও অনেক গণ্যমান্য চিকিৎসক বলেন যে, এই লেবরেটরী একটী চমৎকার প্রতিষ্ঠান।

এতদ্ভিন্ন হ্যাফ্‌কীন ইনষ্টিটিউটের কর্ণেল মেকি, পঞ্জাবের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ হাঁসপাতালের কর্ণেল বেক্‌লী, নিজাম রাজ্যের চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার দালাল ও কাপ্তান ডাটিয়া, সাঙ্গাইনের ডাক্তার হিক্স, কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাঁসপাতালের ডাক্তার জিউরাজ মেটা, গোয়ার চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল কর্ণেল মেলন এবং আরও অনেকে এই লেবরেটরীর অশেষ সুনাম করেন।

ডাক্তার জি, ডি, দেশমুখ এম. ডি, (লণ্ডন,) এফ আর, সি, এস নিখিল ভারত মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত বেঙ্গল ইমিউনিটি লেবরেটারী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং তত্রত্য আধুনিক নিয়মানুসারে সিরাম, ভ্যাক্সিন এবং অন্যান্য ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লেবরেটরীর কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

"এ কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ ও অন্যান্য ডাক্তার মহোদয়গণের সৌজন্যে ও সাহায্যে আমি তাঁহাদের কার্য্যালয়টি পরিদর্শন করিতে পারিয়াছি। অদ্যকার ন্যায় উপদেশ ও শিক্ষাপূর্ণ দিবস আমার জীবনে কমই আসিয়াছে। এইখানে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিরাপ ও ভ্যাক্সিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং এইসমস্ত প্রণালীগুলি বিজ্ঞানসঙ্গত ও নির্ভুল। এই কোম্পানির কারখানাটি অতি উত্তম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্থাপিত এবং ইহাদের স্বতন্ত্র অশ্ব ও পশুশালা আছে। আমি এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।"

ইহারা একটী বিরাট বৈজ্ঞানিক ও দেশ হিতকর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার প্রতিকার

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ

খাদ্য দ্রব্য গুণাগুণ করিয়া বিচার,
বর্জ্জন করিতে হবে ভেজাল খাবার।
ঘিয়ের সামগ্রী যাহা শোভিছে দোকানে,
সর্ব্বদা হেরিবে তাহা বিষের নয়ানে।
বাজারের বিজ্ঞাপনে কোরোনা প্রত্যয়,
মোহের ছলনে সদা জীবন সংশয়।
খাঁটী ঘৃত বলি' কত আসিছে বাজারে,
বিজ্ঞাপন মোহে লোক কিনিছে তাহারে।
ব্যবসায়ী মেড়োদের বুদ্ধি বলিহারি,
এ দেশের স্বাস্থ্য-নাশ করায় সবারি।
প্রত্যেক খাদ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই,
না ছাড়িলে পানদোষ উপায় যে নাই।
প্রতিদিন পাকা ফল উত্তম আহার,
এই রোগে মহৌষধি লেবু ব্যবহার।
দধি, ঘোল, নারিকেল, কচি ডাব-জল,
গ্রহণ করিলে এতে ফলিবে সুফল।

কাষ্ঠের বদলে আজো কয়লার জ্বালে,
রন্ধন করিয়া কেন ভুগিছ' অকালে।
"ইক্‌মিক্ কুকারের" করিলে প্রচার,
ব্যাধির কবল হ'তে নিশ্চয় নিস্তার।
ডাক্তার মল্লিক আজ বহুদিন গত,
যশের সৌরভ তাঁর বহিছে নিয়ত।
ধীরে ধীরে চিবাইয়া আহার করিলে,
এই রোগ হ'তে বন্ধু নিশ্চয় তরিলে।
আচমন কালে নিতি দন্তের মার্জ্জন,
সুলক্ষণ প্রথা এতে ব্যাধির নিধন।
তারপর অল্পক্ষণ করিয়া বিশ্রাম,
সারাদিন পায়ে ফেল' মস্তকের ঘাম।
মিনিট দশেকে কারো হবে নাকো ক্ষতি,
অবহেলা কর যদি অশেষ দুর্গতি।
দশ্‌টা হইতে ছ'টা অফিস ভিতর,
মাঝে মাঝে চলা ফেরা অতি হিতকর।

কথনো শরীরে যদি ক্লান্তি অনুভবে,
বিশ্রামের প্রয়োজন নিদ্রায় নীরবে।
একাদশী পূর্ণিমা'র ব্রত উপবাস,
বিনষ্ট করিয়া দেয় ব্যাধির আভাস।
রোগের কবলে যবে অবস্থা নিদান,
স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে ব্যবস্থা বিধান।

চয়ন

গোলমাল ঃ—

ব্রিটিস মেডিকেল এসোসিয়েসন (British Medical Association) একটী সভায় স্থির করিয়াছেন যে, রাতে কোন গোলমাল হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তজ্জন্য লোকের স্বাস্থ্যহানী জন্মে এবং এটা জন-সাধারণের পক্ষে গ্লানিজনক অতএব ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সমুচীন।

রাত্রে মোটর গাড়ী চালাইবার সময় হর্ণ বাঁজাইতে পারিবে না এবং গাড়ীতে শক্ত হাল (solid tires) থাকিতে পারিবে না এই দুটী পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

মোটর সাইকেলে যাহারা যাতায়াত করেন তাঁহারা যে পদ্ধতিতে গমনাগমন করেন, অনর্থক দেরী না করিয়া দ্রুতগামী হইলে গোলমালের স্থায়িত্ব অনেকটা কমিয়া যায়।

রক্তের চাপের উপর চা এবং কফি পানের দোষনীয় ফল ঃ—

আইওয়া মেডিকেল সভার কাগজে এই ভাবে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে যে, চা এবং কফি পান কোন বয়সেই বাঞ্ছনীয় নয় বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য উপরোক্ত প্রকার উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহারে শরীরের পক্ষে সহনীয় নয়। কেফিন (যে জিনিষটী চা এবং কফি এই উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান আছে) হৃদ্‌পিণ্ডকে উত্তেজিত করে এবং তন্নিমিত্ত রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। যদিও রক্ত বাহিনী শিরাগুলি প্রসারিত হয় তজ্জন্য রক্তের চাপ বেশী হইতে পারে না কিন্তু বৃদ্ধদের শিরাগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হওয়ায় যুবাদের শিরার ন্যায় প্রসারিত হইতে পারে না। এই হেতু হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা জনিত রক্তের চাপাধিক্যতা কুফল প্রকাশ পায়। বৃদ্ধদিগের এ নিমিত্ত চা এবং কফি পান ত্যাগ করা সঙ্গত। অনর্থক স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং রক্তের চাপ বৃদ্ধি কুফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

যকৃৎ আহার মূত্র যন্ত্রের অসুখের কারণ ঃ—

অধুনা চিকিৎসকদিগের মত যে, যকৃতের মধ্যে এমন একটী জিনিষ আছে যে জন্য উহা আহার করিলে রক্তহীনতা রোগ আরাম হয়; এই মতের প্রচলন হওয়া অবধি যকৃতের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লোকের ধারণা হইয়াছে যে প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে যকৃত একটী উৎকৃষ্ট পদার্থ। কিন্তু বাস্তবিক বিষয়টী ঠিক ইহার বিপরীত।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞদিগের মত এই যে যকৃত এবং অন্যান্য শারীরিক যন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে boric acid নামক একটী পদার্থ এবং অন্য বিষাক্ত জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে নিহিত আছে। কাজেই এই সমুদয় যন্ত্র আহার করিলে

উক্ত বিষাক্ত পদার্থগুলি শরীর হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় যকৃত এবং মুত্র যন্ত্রের ক্রিয়া অত্যধিক বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য উভয় যন্ত্রই ক্রমশঃ খারাপ হয়।

প্রাণিদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যকৃতে যথেষ্ট পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ আছে। ইন্দুরগুলিকে যকৃত খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে অল্প দিনের মধ্যেই উহাদিগের মুত্র যন্ত্রের পীড়া হইয়াছে।

(Bright's disease) একজন বিখ্যাত ডাক্তার এই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন যে, যাহারা যথেষ্ট পরিমাণে যকৃত আহার করে তাহারা ভবিষ্যতে মুত্র যন্ত্রের পীড়ায় (Bright's disease) মৃত্যু মুখে পতিত হইবে।

বিবিধ

বারমেসে লেবু ফলাইবার উপায়

লেবুর ন্যায় হিতকারী ফল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেবু মুখরোচক, রোগ বীজ নাশক। কাগজী লেবুর ২।৪ ফোটা রস কলেরাদি সংক্রামক রোগের সময় জলে দিয়া খাইলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। লেবুর চর্ম্মের রং ফর্সা করারও যথেষ্ট শক্তি আছে। প্রত্যেক সংসারেই লেবু গাছ রোপণ করা উচিত। বার মাস যাহাতে গাছে লেবু ধরিতে পারে, তাহার একটা সহজ উপায় আছে। যখন বসন্ত কালে লেবুর ফুল ধরে, তখন গাছের অর্দ্ধেক বা বার আনা আন্দাজ ফুল নষ্ট করিয়া দিতে হয়, অথবা লেবু কচি অবস্থাতেই ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। এইরূপ করিলেই বারমাস লেবু ধরিতে আরম্ভ করে। এইরূপে আমের মুকুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বার মেসে আম গাছ করা যায়। সাধারণের ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

সূর্য্যালোকে বিদ্যুৎ

জলপ্রপাত হইতে অথবা স্রোতস্বিনী নদী হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উদাহরণ বিরল নহে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক আবার সমুদ্র তরঙ্গ হইতেও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কারের আশা করিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি জর্ম্মণীর এক যুবক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, জলপ্রপাত, নদী বা সমুদ্র কিছুই চাই না, তিনি সূর্য্যালোক হইতেই বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির করিয়া প্রয়োজন মত কাজে লাগাইতে পারিবেন। প্রকাশ তিনি ইতিমধ্যে এক বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রাদির সাহায্যে ইহার পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন। সূর্য্যালোকের অনন্ত শক্তির কথা ঋষির দেশ এই ভারতে কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিকের এই আবিষ্কারে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই আবিষ্কারে পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসিগণ অতি মাত্রায় আনন্দিত হইয়াছেন। যাহাদের দেশে সূর্য্যালোক সুদুর্লভ সামগ্রী, বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস,

স্থানে স্থানে কয়েক দিন, যাহারা সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায়, তাহাদের ইহাতে অধিক লাভ হইবে না। সূর্য্যালোক হইতে যদি বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হয় এবং সেই শক্তি যদি প্রয়োজনমত কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ইউরোপ আমেরিকা অপেক্ষা এই এসিয়া মহাদেশেই যে তাহা শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের প্রভূত সহায় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা তথন হয়ত তাহাদের দেশ ছাড়িয়া এই নিত্য সুলভ সূর্য্যালোকের দেশে আসিয়া কল-কারথানা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইতে পারে; কিন্তু সে শুভদিন আসিতে এখনও বিলম্ব আছে।

আলু দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়

সাধারণতঃ আলু ব্যবসায়ীরা দীর্ঘকাল আলু রক্ষা করিবার জন্য কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু ইহাতে অপকার হয় এবং আলুর স্বাদও নষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত জলে আলু ধৌত করিয়া রক্ষা করে। কিন্তু ইহাতেও আলুর স্বাদ তেমন থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়—কাঠের ছাই দ্বারা ঘসিয়া রাখা অথবা গোবরের জল দ্বারা আলু ধৌত করা। গোবরের জল দিয়া ধুইলে আলুগুলিকে অল্প রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। এই উপায়ে রাখিলে আলুর কোন গুণ নষ্ট হয় না এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে। এই উপায় অত্যন্ত সহজ।

মজবুত পুটিন

একটু ধুনা ও রজন খুব মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণ খাঁটী সরিষার তৈল দিয়া ঘুঁটিতে হইবে। যত বেশী মাড়া হইবে ততই আঠা পাতলা হইয়া যাইবে। সেই জন্য তৈল খুব কম পরিমাণ দেওয়া দরকার। এই আঠা এলুমিনিয়ম কিম্বা টীনের পাত্রে লাগাইলে খুব শক্ত হইয়া যায়।

বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যর্থনা

বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যর্থনাঃ—মহাত্মাজি বিলাতে পদার্পণ করিলে তথাকার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের তরফ হইতে মিষ্টার বার্ট্রাণ্ড রাসেল (ইনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ লেখক) মহাশয় গান্ধীজীর গলায় প্রথম মাল্যদান করিবেন এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনি নাইডুর গলায় মাল্যদান করিবেন।

মিসেস রোরাবিন। সাধারণ অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ লরেন্স হউসম্যান গান্ধিজীকে ফোকষ্টোনে সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

পূজার বাজারে পিকেটিংঃ—এবার মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের দিক হইতে পূজার সময় যাহাতে বিদেশী জিনিষ লোকে না ক্রয় করে, সর্ব্বত্র পিকেটিং আরম্ভ করা হইয়াছে, এবার পূজায় স্বদেশী দ্রব্যই যাহাতে সকল লোকে ব্যবহার করেন প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালির সেই চেষ্টা করা উচিত। "মায়ে"রা যথন কাজে লেগেছেন সাফল্য নিশ্চিত মনে হয়।

হিন্দুসমাজে পিতার অত্যাচার

কাটোয়া মহকুমায় এক ব্রাহ্মণ তিনশত টাকা কন্যাপণ চুক্তি করিয়া জনৈক বিকলাঙ্গ কুৎসিত বৃদ্ধ পাত্রকে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করায় তাহার পিতার এই কার্য্যে কন্যা অমত জানায়। ইহাতে বালিকার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পিড়ন করিতে থাকায় সে নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার জন্য এক আত্মীয়ার বাটিতে আশ্রয় লইয়া তাহার পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে এই বিবাহ বন্ধ রাথার জন্য মামলা রুজু করিয়াছে।

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি
(সত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

HEALTH.

(Bengali)

৯ম সংখ্যা কার্ত্তিক—October ৯ম বর্ষ

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ., বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

স্বাস্থ্য

নবম বর্ষ] কার্ত্তিক ১৩৩৮। [৯ম সংখ্যা।

খাদ্যে ভেজাল, Food Adulteration.

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্.

ভেজালের অর্থঃ— (১) খাদ্যদ্রব্য হইতে মূল্যবান অংশ উঠাইয়া লওয়া—যেমন, দুধের মাটা। (২) খাদ্যে কম-দামের বা খেলো-জিনিষ মিশান, যেমন, ঘিয়ে চীনাবাদাম তৈল। (৩) ওজন বাড়াইবার জন্য, সস্তার ভারী জিনিষ মিশান, যেমন ময়দায় রামখড়ি; বা (৪) তাহার খারাপ অবস্থা লুকাইবার জন্য, রং বা গন্ধদ্রব্য কিছু দেওয়া—যেমন, পচা মাছের মুখ ও কানকো বারম্বার ধুইয়া, আলতা দিয়া রং করা। ভেজালের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

এরারুট (Arrowroot)—চাউল, ভুট্টা, ক্যাসাভা বা আলু চূর্ণ।

আটা (Atta)—রামখড়ি (soap-stone), চা-খড়ি (chalk), চূণ, ফটকিরি, চীনামাটী (kaolin), বিবর্ণ করা (bleached) ভূষি-চূর্ণ, চাউল, আলু, ভুট্টা বা ঘাসের বীজচূর্ণ।

বার্লি (Barley)—French chalk, চা[illegible] শঠি, কেশুয়া দানা, চাউল, ময়দা বা আলু চূর্ণ।

মাখন (Butter)—জল, দধি, বেশী বেশী লবণ, বিভিন্ন প্রকার তাল জাতীয় (palm) বৃক্ষ হইতে নিষ্কাশিত তৈল, শূকর বা গোমাংসের চর্ব্বি; [illegible] গোঁজা তৈল, তিল তৈল, নারিকেল তৈল, ভ্যাসেলীন, মার্গারীন,* চট্‌কান কলা, কচুসিদ্ধ। [চীনাবাদামের, তুলার বীজের, নারিকেলের, তিলের ও অপরাপর তৈলের সহিত গোরুর চর্ব্বি চট্‌কাইয়া "মাখন" তৈয়ারি হয়!] খাঁটি মাখনে, [illegible] ভাগের বেশী জল থাকা উচিত নয়।

---

*Margarine এ দেশের Vegetable Product এর চেয়ে ভাল। উহাতে গোমাংসের চর্ব্বি, তাল-জাতীয় বৃক্ষ হইতে নিষ্কাশিত তৈল, নারিকেল তৈল, তুলার বীজের তৈল, সামান্য জল, চিনি ও গ্লিসারিণের সঙ্গে, জাফ্রাণ, হরিদ্রা বা annatto দিয়া রং করা হয়।

লঙ্কার গুঁড়া (Cayenne pepper)—সুরকির গুঁড়া, গরাণের ছালের গুঁড়া, মরিচা (লৌহচূর্ণ), মেটে সিন্দুর, গৈরিক মাটি চূর্ণ।

ছানা (Chhana)—মাটা তোলা দুধ হইতে প্রস্তুত ছানা, বাসি-ছানা, ময়দা।

Cocoa—ইটের গুঁড়া, ময়দা, চর্ব্বি মরিচা (iron oxide)

Confectionery (লজেঞ্জেস ইত্যাদি)। টার্টারিক অ্যাসিড, ময়দা, রামখড়ি, আনিলীন্ রং।

Flour—See Atta.

সিরাপ (Fruit Syrups)—স্যাকারিন, বিলাতী এসেন্স, স্যালিসিলিক ও বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড।

ঘৃত (Ghee)—ভেড়া, ময়াল সাপ বা শূকর চর্ব্বি; মহুয়া (কোঁচড়া), এরণ্ড, নারিকেল, চীনা-বাদাম, পোস্ত বা কুসুম বীজের তৈল, ফুলওয়ারা মাখন; সাদা ভ্যাসেলীন্ petroleum jelly; চাউল, বাজরা, গোল-আলু, রাঙা-আলু, কচু, পাকা কলা, চুপড়ি-আলু প্রভৃতি চটকান বা চূর্ণ।

[সামান্য পরিমাণে খাঁটি দুধ ও খাঁটি ঘিয়ের সঙ্গে, কয়েকটা লেবু বা পানের পাতা ও প্রচুর চর্ব্বি একত্রে ফুটাইলে, সবটা উৎকৃষ্ট দানাদার খাঁটি ঘিয়ের মত দেখিতে হয় !!!]

গ্লিসারিন (Glycerin)—গ্লুকোজ + জল।

Goor- চিনির রস।

মধু (Honey)—বিলাতী চিনি বা সিরাপ, [illegible] ও জেলাটিন্!

Mango-juice cakes (আমসত্ব)—তেঁতুল, গুড়, প্লাটিকুচি, ময়দা।

Malai (মালাই)—মাটা-তোলা, বাসি দুধ হইতে তৈয়ারী ; এরোরুট বা পাণিফলের পালো।

দুধ (Milk)—মোটা-তোলা, পাণিফলের পালো বা এরোরুট, বাতাসা, সুজি, মহিষ দুধ, চূণের জল, সুধু জল। খাঁটি গো-দুগ্ধে, শতকরা ৮৮½ ভাগ জল, অন্ততঃ ৩½ ভাগ মাখন ও ৮½ ভাগ মাখন ব্যতীত অন্য কঠিন পদার্থ থাকিবে।

সরিষার তৈল (Mustard Oil)—হুড়হুড়ের বীজ, তারাবীজ, সোরগোঁজা কোঁচড়া (মহুয়া) বীজ, বাদাম, তুলার বীজ, চীনাবাদাম, পোস্ত, এরণ্ড বা তিল তৈল, জীরা, মূলার রস, লঙ্কাচূর্ণ, ব্লুমলেস অয়েল বা তজ্জাতীয় কেরোসীন তৈলের (মেটে তৈলের) গোষ্ঠি, তৈল বাহির করিবার জন্য সর্ষের সঙ্গে সোরগোঁজা বা অপর কিছুই দিবার প্রয়োজন আদপে হয় না।

ডাল (Pulses)—চীনামাটী বা রামখড়ি চূর্ণ (ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য)। Olive oil—তুলার-বীজের তৈল।

চাউল (Rice)—কুঁড়ো, খারাপ চাউল (যেমন, বর্ম্মাদেশের বা গুমো চাউল।)

জাফ্রাণ (Saffron)—সুক্ষ মাংসকুচি ! Sago—আলুচূর্ণ, ক্যাসাভা।

লবণ (Salt)—ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড বা সাল্‌ফেট্, চূণ জাতীয় লবণ, সোরা।

গরম মসলা (Spices)—কলের সাহায্যে উপাদানগুলি হইতে সুগন্ধি তৈল বা কাথ বাহির করিয়া লওয়া। পোকা-ধরা মশলা মিশ্রণ, ধূলা, কুটা।

চিনি (Sugar)—সুজি, মিহি সাদা বালি

চূণ, পালো, plaster of paris, চাউলের গুঁড়া।

চা (Tea)—ব্যবহার-করা সিদ্ধ-পাতা শুকান; গরাণ কাটের গুঁড়া।

আমাদের খাদ্যে এই সকল ভেজালের কথা মনে রাখিয়া পূজার ছুটিতে পাঠকগণ যদি এই সকল কথা নিজ নিজ সাধ্যমত প্রচার করেন তাহা হইলে অনেক অজ্ঞ ভদ্র লোকদের উপকার করা হইবে ও তাঁহাদের রোগ হইতে বাঁচান হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য

শ্রীহরিপদ মিত্র, এম. এ.

বাংলা দেশের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ. তন্মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা ৭০ লক্ষের উপর। এই সকল বালক বালিকার প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ ২ হইতে ৩ বৎসর স্কুলে যাতায়াত করিয়াই বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করে। ইহাদের পুঁথিগত বিদ্যা তো হয়ই না, পরবর্ত্তী জীবনে কাজে লাগে এমন কিছু নীতি অথবা অর্থকরী বিদ্যা ইহারা কিছু শিক্ষা করে না। ৭০ লক্ষের মধ্যে ২৩ লক্ষ বালিকার সংখ্যা, ইহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এই সকল বালিকারা পরবর্ত্তীকালে যখন মা হয় তখন সন্তান পালন অথবা নিজেকে সুস্থ রাখার মত বিদ্যা ইহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল বালক বালিকারাই পরবর্ত্তি কালে নাগরিক হয়। ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবার কোন আশা নাই।

বাংলা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন কার্য্যকরী হইলে ৩৬ লক্ষ বালক বালিকাকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা কি হইবে তাহার ক্যারিকুলামে (পাঠ্যতালিকা) কি থাকিবে সে সব পরের কথা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুইটী বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই। প্রথমটি হইতেছে এই যে শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে শিশুমনের সম্যক বিকাশ হয় এই কথা মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন। বাংলা দেশে বর্ত্তমানে বালক এবং বালিকাদের জন্য যে ৫৬ হাজার বিদ্যালয় আছে তাহাতে ৪ হাজারের অধিক সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নাই। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা যাহা কিছু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহাকেও অশিক্ষা বলিলে দোষ হইবে না। ইউরোপের সমস্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের ভার লইয়াছেন মেয়েরা। আমাদের দেশে পুরুষ শিক্ষকদ্বারা উহা করাইবার ব্যর্থ প্রয়াস আমরা করিয়াছি; ফলে এদেশের শিশুমনের সম্যক বিকাশ হইতে পারে নাই। আমাদের মনে হয় জেলা বোর্ডগুলিতে সভ্য নির্ব্বাচনের বেলায় মহিলাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

পাঠ্যতালিকাতে তিনটি R (Three R' S reading, writing, arithmetic) শিখাইবার ব্যবস্থা এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, এবং থাকা উচিত। আমাদের মনে হয় স্বাস্থ্য শিক্ষা অর্থাৎ শরীর পালনের মোটামুটি নিয়মগুলি ছাত্রদিগকে হাতে কলমে শিখাইতে হইবে। ছাত্রেরা সকাল বেলায় দাঁত মাঝে কিনা, রাত্রিতে ব্যবহৃত কাপড় ছাড়ে কিনা, মাঝে মাঝে হাতের নখ কাটে কি না, অথবা চুল নিয়মিত আঁচড়ায় কিনা এ সকল কথা ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং যেখানেই ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য হইবে তাহার সমাধান জন্য ছাত্র এবং অভিভাবকগণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে উপদেশ দিতে হইবে। কথাগুলি অত্যন্ত নীরস এবং ছোট মনে হয়, কিন্তু যখন পরবর্ত্তী কালে আমরা দেখি যে বাংলার যুবকদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন একেবারে অকর্ম্মণ্য তখন উহার ফলাফল আমাদের উপলব্ধি হয়। ছাত্রমঙ্গল সমিতি (Student welfare Committee) সম্প্রতি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে বাংলা দেশে শতকরা ৪০ জন দাঁতের রোগে এবং প্রায় ৩০ জন চোকের রোগে ভোগে। চোকের এবং দাঁতের রোগ কি বাল্যের কুঅভ্যাসের ফল নহে ? ছাত্রমঙ্গল সমিতি আরও বলিয়াছেন যে ছেলেদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় না। পুষ্টিকর অর্থে আমরা বুঝি খাদ্যপ্রাণ-বহুল (Vitamins) খাদ্য। বাংলার ছেলেরা ইচ্ছা করিলে সকাল বেলায় এক ছটাক অঙ্কুরিত ছোলা ও আদা এবং টিফিন হিসাবে নারিকেল, মুড়ি, গুড় অথবা লাল আটার রুটি, আলুসিদ্ধ খাইতে পারেন। কিন্তু একথা তাহাকে বলিয়া দিবে কে ? চা বিস্কুট ছাড়িয়া মুড়ি মুড়কীতে রুচি জন্মাইবে কে ? বাঙ্গালীর ছেলে ডাল খাইতে ভয় পায় এবং লাল আটার রুটির নামে মূর্চ্ছা যায়। দুগ্ধ তো পান করিবার অভ্যাস একেবারেই গিয়াছে। আমরা সাদা চাউলের ভাত খাই চিবাইতে বড় আলস্য বোধ হয়, ফলমূল খাওয়ার কথা মনেও হয় না, দোকানের কচুরী জিলিপী বড়ই রসনাকে তৃপ্তি দেয়, ফলে বাঙ্গালী যুবক ২৩ বৎসরে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, এবং যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকে তাহাও মৃত্যুরই নামান্তর। বাংলার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগকে জাতিগঠনের এই মহাভার গ্রহণ করিতে হইবে। শিশুমন গুলিকে কেবল জ্ঞানে নহে, শিশু দেহগুলিকে স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষয়িত্রী হইবেন একাধারে জ্ঞানদাত্রী এবং পালয়িত্রী। বাংলায় ৪৫ লক্ষ বিধবা গৃহকোণে নির্য্যাতনে এবং অনশনে কাটান ইহারা কি শিশুশিক্ষা ও শিশুরক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিতে পারেন না ?

দ্বাদশটা শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য সহজ ব্যায়াম পদ্ধতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সঞ্চরণে পদদ্বয়ের ব্যায়াম হয় যথেষ্ট আর উদরপেশীর (abdominal muscle) সঙ্কুচন হয় বিশেষভাবে। ৮ম চিত্রে দেখুন লোকটা যেন তার পা দিয়ে নিজেকে ঠেলে দিয়ে, আর হাত দুখানা দিয়ে কিছু ধরে উপরে উঠতে চায়। এ' ব্যায়ামে হস্তের সঞ্চালন, প্রসারণ ব্যায়ামের হস্ত-সঞ্চালনের অনুরূপ।

৯ম চিত্র

ব্যায়াম পদ্ধতি

এক! হাত দুখানা উঁচু করুন, দক্ষিণ জঙ্ঘা উঁচু করুন। বাম পদতলের সম্মুখাংশ দিয়ে শরীরের ভার রক্ষা করুন, যতদূর সম্ভব দেহ এবার উন্নত করুন, এক গণনার সঙ্গে সঙ্গেই. (৮ম চিত্র)

দুই! দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করুন (১ম চিত্র)।

সাবধান--

১। দুই গণনার সঙ্গে সঙ্গেই, শরীরে যেন নুব্জতা না আসে, ঠিক প্রথম চিত্রের মত সতেজে খাড়া হয়ে, উন্নত বক্ষে দাড়িয়ে থাকা চাই।

২। এই অভ্যাস অবিরাম গতিতে তালে তালে করা যেতে পারে কিন্তু সে তাল হওয়া চাই ধীর, দ্রুত নয়।

ভ্রমণ (১ম ও ৯ম চিত্র)

বিপরীত বাহু এবং পদের যুগপৎ সঞ্চালনে হণ্টন আমাদের ব্যায়ামেরই সামিল, এ'তে পা দুটো সমমুখী হওয়া দরকার, পায়ের সীমাংশদেশ দিয়ে শরীরের ভার সমতা রক্ষা করা দরকার। ৯ম চিত্র, ভ্রমণেরই অতিরঞ্জিত চিত্র হলেও ব্যায়াম কর্ত্তে হবে ঐ ভঙ্গিতেই।

শরীর শ্রীবৃদ্ধির দিক দিয়ে হণ্টন অতি উত্তম ব্যবস্থা। বাহুর অবাধ সঞ্চালন ও পদদ্বয়ের কার্য্য তৎপরতায় যথেষ্টই আশা করা যায়—কিন্তু এই স্বাভাবিক উন্নতির পন্থাও আমাদের কাজে আসে না আমাদের বেশভূষার দোষে ও অভ্যাসের দোষে।

ব্যায়াম পদ্ধতি

এক! দক্ষিণ জঙ্ঘা সম্মুখে উত্তোলন করুন,

দক্ষিণ হাতকে দুলিয়ে দিন সামনে, শরীর এখন নির্ভর করছে দক্ষিণ পদতলের সম্মুখ সীমাংশদেশের উপর।

দুই! ১ম চিত্রানুরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়ান, বাম জঙ্ঘা উত্তোলন ক'রে, অনুরূপ অঙ্গচালনা করুন।

১০ম চিত্র

স্মরণীয়—

১। শরীর খাড়া রাখবেন।

২। হণ্টনের সময় গোড়ালীর সবলে ভূমিস্পর্শ যথাসম্ভব পরিহার করুন। গোড়ালীই সর্ব্বাগ্রে ভূমিস্পর্শ করবে কিন্তু নিঃশব্দে। স্মরণ রাখতে হবে যে আপনি হাওয়ার উপর হাঁটতে চান, আপনার গতি সম্মুখে ও উচ্চে।

৩। হণ্টনের যে পদ্ধতি আমরা দিচ্ছি---এর সঙ্গে গা' এলিয়ে ঘুরে-বেড়ান অঙ্গভঙ্গীর কোন সাদৃশ্য নেই।

৪। হাত ও পায়ের চালনা আয়ত্ত হয়ে গেলে, হণ্টনের ব্যায়াম করতে হবে না থেমে, অবিরাম তালে তালে।

দৌড়ান (১ম ও ১০ম চিত্র)

হস্তের দ্রুত সঞ্চালনে এবং পদপত্র দিয়ে শরীরের দ্রুত উৎক্ষেপনে, এই স্বাভাবিক গতিশীল অঙ্গচালনা সঞ্জাত হয়। (১০ম চিত্র) দেখুন দক্ষিণ পা যখন সম্মুখে, বাম হাত থাকে তখন পিছনে। এই যে বিপরীত অঙ্গের, হাত ও পায়ের, যুগপৎ সঞ্চালন, হণ্টন বা দৌড়ানর সময় লক্ষ্য হয়, এর জন্ম শরীরের ভার সমতা রক্ষণ করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হ'তে।

এই ব্যায়ামে রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্রুততর হয় এবং শরীরের প্রতি অঙ্গের ব্যবহার হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। (১০ম চিত্র)

ব্যায়াম পদ্ধতি

এক! ডান হাত দুলিয়ে দিন সামনে, বাম জঙ্ঘা উৎক্ষিপ্ত করুন উচ্চে—অথচ সম্মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান পা' দিয়ে শরীরকে ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত করুন।

দুই! ঠিক বিপরীত অবস্থায় হস্ত, পদ, স্থাপনা করুন এবং বাঁ পা দিয়ে শরীরকে ঊর্দ্ধে ঠেলে দিন।

১১শ চিত্র

স্মরণীয় -

১। প্রথমে কয়েকবার দৌড়বেন। শক্তি ও সামর্থ্য বাড়লে সময়ও বাড়িয়ে দিন।

২। শরীরের সর্ব্বদা উন্নত ও প্রসারিত অবস্থান

প্রয়োজন। ভূমিস্পর্শের সময় পদস্থাপনা যেন হয় খুব নিঃশব্দ।

৩। আয়ত্ত হ'লে পরে তালে তালে পা ফেলে দৌড়ান সমীচিন।

১২শ চিত্র

উল্লম্ফন (১১শ ও ১২শ চিত্র)

কোন বাধা সম্মুখে পড়লে অথবা নাগালের বাইরে কোনও বস্তু আহরণের সময়, উল্লম্ফনের সাহায্য নিতে হয়। সুতরাং এ' এক স্বাভাবিক অঙ্গচালনাই। এ' ব্যায়ামের প্রথমার্দ্ধে (১১শ চিত্র) সর্ব্বাঙ্গীন পেশীর ব্যবহার হয় এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে (১২শ চিত্র) পা, পিঠ ও বাহুর পেশীসঙ্কোচ বিশেষভাবেই হয়। প্রথমার্দ্ধ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ যখন একত্র করা হবে, না থেমে, তখন পুনরুল্লম্ফনের পূর্ব্বের স্থির অবস্থা হচ্ছে ১১শ চিত্র। প্রথম প্রথম বিনা লম্ফনে শুধু অঙ্গচালনা আয়ত্ত করা দরকার।

ব্যায়াম পদ্ধতি

এক। জঙ্ঘা ও কটিদেশ বাঁকিয়ে শরীরটাকে সম্মুখে হেলিয়ে দিন। (১১শ চিত্র) হাত দুটা দুলিয়ে পিছনে নিয়ে যান, দু' পায়েরই গোড়ালী কিঞ্চিৎ উঁচু করুন। খেয়াল রাখবেন, এই যে শরীরের অবস্থিতি এ খুব স্বাভাবিক, সহজ, অনাড়ষ্ট হওয়া চাই জিমন্যাষ্টিকের মত অস্বাভাবিক নয়।

দুই। দুলিয়ে সামনে আনুন হাত, লাফ দিয়ে শূন্যে উঠুন। (১২শ চিত্র) পর মুহূর্ত্তে ভূমিস্পর্শান্তে একাদশ চিত্রানুরূপ ভঙ্গিতে দেহ-সন্নিবেশ করুন।

অনুশীলন—

১। উল্লম্ফনের সময় যে যে অঙ্গ সঞ্চালন করা প্রয়োজন সেইগুলো লক্ষ্য ক'রে তত্রস্থ পেশীর ক্ষমতা অনুধাবন করা উচিত, যাতে ব্যায়াম কালে সহ্যসীমা অতিক্রান্ত না হয়।

২। প্রথমে একটী করিয়া লাফ দিন, ভূমিস্পর্শ মাত্রেই জঙ্ঘা বাঁকিয়ে, গোড়ালী তুলে দাঁড়ান।

৩। আপনার উল্লম্ফন হওয়া চাই খুব হালকা, যেন বায়ুর উপর, যত নিঃশব্দ ও যত অল্প ভূমিস্পর্শ হয় ততই ভাল।

৪। পদদ্বয়ের ক্ষমতা থাকলে, অবিরাম উল্লম্ফন করা উচিত। ক্রমেই সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন, ৫।৬টা লাফ প্রথম প্রথম দেবেন।

শরীর সাধনার এইই দ্বাদশটা ব্যায়াম সহজ, সরল ও সুখসাধ্য।

আয়ুর্ব্বেদ-নিন্দা

বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম্ ডি

ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া জ্বর যে অমাবস্যা পূর্ণিমা ও একাদশীতে বৃদ্ধি পায়, এ কথা জানিতে বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছা করিয়া চক্ষু না বুজিলে সকলেই দেখিতে পায়। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধনান্ধকারে নষ্টদৃষ্টি অধ্যাপকগণ এই বিস্পষ্ট সত্যকেও উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে ক্রটি করেন নাই। মেডিকেল কলেজের কোনও খ্যাত-নামা অধ্যাপক তাঁহার অধীনস্থ হাউজ ফিজিসিয়ানকে কথায় কথায় বলেন, "তোমরা বল ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া পূর্ণিমায় বৃদ্ধি হয়।" উহাদের জীবাণুগণ কি পূর্ণিমার রাত্রে প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয় করে! এ সকল কথা একেবারে অন্যায়। তিন চারি বৎসর অতীত না হইতেই সেই অধ্যাপক নিজেই এমন কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, কোনও রোগীর অমাবস্যা পূর্ণিমাতে জ্বর হইতেছে শুনিলেই তাহার ফাইলেরিয়া হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিতেন। তথাপি সেই অধ্যাপকের আত্মাভিমান ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বেষ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সত্যের আদরের এই আর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শিশু-পরিচর্য্যার যে সকল বিধি আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই সুদীর্ঘ কাল পরে আজ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কথঞ্চিত প্রবৃত্ত। পাশ্চাত্য চিকিৎসক সকল বলিতেছেন, যে সূর্য্যের আলো নর শোণিতের ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট্ বৃদ্ধি করাইয়া দেহকে সবল করে। আমাদের দেশে এ কথা বহু কাল হইতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন। শিশুকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়া এদেশের সনাতন প্রথা। এ জন্য ভারতবর্ষে এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও Rickets কখনও হইত না। দুঃখের বিষয় যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গরমে এ প্রথাও গলিয়া যাইতে বসিয়াছিল।

আমাদের দেশে সকলেই জানেন, "আচার-প্রভবো ধর্ম্মঃ"। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আচারের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছাড়া কিছুই নাই। ইউরোপে মলমূত্র পরিত্যাগের পর জলশৌচ না করার প্রথার কথা মনের কোণেও উদয় হইলে ভারতবাসীমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এই সুদীর্ঘ কালেও ইউরোপ ধারণা করিতে পারে নাই যে, এই জলশৌচ সকল রকমেই কিরূপ প্রয়োজন। এত দিনে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই মাত্র বুঝিয়াছে যে,

মলত্যাগের পর শৌচ না করিলে গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে জীবাণু জন্মে এবং প্রস্রাব করিয়া শৌচ না করিলে ইউরিক্ এসিড দ্বারা প্রস্রাব-দ্বারে ক্ষত হইতে পারে।

ভারতবাসী মাত্রেই প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ ধুইয়া দাঁত মাজিয়া থাকেন। তাহার পর প্রয়োজন মত কিছু আহার করেন। দাঁত না মাজিয়া মুখ না ধুইয়া খাইতে নাই, একথা কি ইংরাজেরা জানেন? তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলেই বিছানায় বসিয়া বাসি মুখে চা খাওয়ার প্রথা মনে পড়িলে ভারতবাসীর বমি উপস্থিত হয়। হাত ধুইয়া খাইতে বসিতে হয় এবং ভোজনান্তর হাত মুখ ধুইতে হয়, একথা কোনও ভারতবাসীকে শিখাইতে হয় না। ভারতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা, নিরক্ষর চাষী পর্য্যন্ত, যাহা জানে ও যাহা নিয়ত করিয়া থাকে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাভিমানী স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়মানভিজ্ঞ ইউরোপীয়দিগকে সেইগুলি শিখাইবার জন্য আজও বায়স্কোপ প্রদর্শনীতে ছবি দেখাইতে হইতেছে। আহারান্তে হস্তমুখ প্রক্ষালনের প্রয়োজন ইউরোপ এখনও স্বীকার করে নাই।

সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহাতেই স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, সনাতন আয়ুর্বেবদ শাস্ত্র সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও তাহাতে যে সকল চিরসত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার আভাসমাত্র এত কাল পরে কদাচিৎ আয়ুর্বেবদ বিদ্বিষ্ট পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথে উদিত হয়। আয়ুর্বেবদের সত্য ঘোষণা করিয়া কত কথাই যে বলা যাইতে পারে তাহার আর সীমা নাই। কিন্তু সে সকল কথা উত্থাপন করা এখানে অনাবশ্যক। যাঁহারা বিজ্ঞানচ্ছলে পুঞ্জীভূত অসত্য কালিমায় আপনাদের আবৃত করিতে উৎসুক, যাঁহাদের কাছে সত্যের মর্য্যাদা ঘোষণা করিলে উপহাস্যাস্পদ, এমন কি দণ্ডনীয় হইতে হয়, যাঁহারা রুচির প্রতিকূল সত্যকে মিথ্যা বলিয়া পদাঘাত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতে তৎপর, যাঁহাদের কাছে অজ্ঞানই জ্ঞানের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, যাঁহারা উন্নতি-লিপ্সার পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যা সত্যকেই সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করেন ও সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে উন্নতি-পথের কণ্টক বলিয়া ঘৃণা করেন, যাঁহারা জটিল ও গভীর আয়ুর্বেবদ শাস্ত্রের পরিচয়ের সম্যক অভাবকেই আয়ুর্বেবদ শাস্ত্রের গুণাগুণ-বিচার যোগ্যতার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এক কথায়, যাঁহারা আধুনিক প্রচলিত প্রণালীর অন্ধানুসরণকেই চিকিৎসা বলিয়া গণ্য করেন ও সেই প্রণালী বর্জ্জন করিয়া রোগ শান্তি ও দুঃখ দূর করাকে হেয় ও দণ্ডনীয় মনে করেন, তাঁহারা মনের সাধে আয়ুর্বেবদের নিন্দা করিতে থাকুন। তাহাতে আয়ুর্বেবদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই, হইবেও না। পর্ব্বতে ঝড়বৃষ্টি হইলে পর্ব্বত কাতর হয় না। আয়ুর্বেবদ হিমালয় হইতেও অচল। মূর্খের বাক্‌বিতণ্ডা আয়ুর্বেবদ চিরকালই অকাতরে সহ্য করিয়াছে ও সহ্য করিতে সক্ষম।

—

রোগীর পথ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কবিরাজ—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙালী মুখ-পথে অথবা অন্য কোন পথে রক্ত আসিতে দেখিলে শিহরিয়া উঠে। শিহরিয়াই ত' উঠিবার কথা! রক্তপিত্ত অবহেলার রোগ নহে। এই ব্যাধি অবহেলা করিলে সোপদ্রব রক্তপিত্ত উপস্থিত হইয়া জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া তুলে। রক্তপিত্তেও রক্ত উঠে যক্ষ্মায়ও রক্ত উঠে, তাহা-হইলে রক্তপিত্ত রোগ চিনিবার উপায় কি? রক্ত-পিত্ত রক্তাগমপূর্ব্বক ব্যাধি কিন্তু যক্ষ্মা ক্ষয়পূর্ব্বক। রক্তপিত্ত রোগে যক্ষ্মারও অনেক লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে; সে অবস্থাটী ঘটে পরে। যেরূপ রেখা মাত্রই সরল রেখা হয় না কিন্তু সরল রেখা মাত্রই রেখা হয়, সেইরূপ জ্বর, কাস, রক্ত দেখিলেই তাহা যক্ষ্মা হইবে না। অবশ্য রক্তপিত্ত হইতে ক্ষয় আসিতে পারে।

রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

"ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্ব—ব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ॥
পিত্তং বিদগ্ধং সগুণৈর্ব্বিদহত্যাশু শোণিতম্।
ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা॥
ঊর্দ্ধং নাসাক্ষি কর্ণাস্যৈ মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ, রৌদ্র সেবন (ঘর্ম্ম আতপঃ ইতি-বিজয় রক্ষিৎ), শ্রম, শোক, পথ পর্য্যটন, রতিসেবন, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সমূহ সেবন, অগ্নির তাপ, ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটু রস অতি মাত্রায় সেবন করিলে পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া স্বকীয় গুণাদির দ্বারা রক্তকেও দূষিত করে। পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে বাড়াইয়া তুলে এবং পিত্তের স্বকীয় তীক্ষ্ণতা, উষ্ণত্ব ও পূতিগুণাদিসহ স্রোত মার্গে চলিবার কালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা, ধমনী-জাল কাটিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ফলে, তখন সেই পিত্ত-দুষ্ট রক্ত মুখ, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ঊর্দ্ধপথে বা মলদ্বার, লিঙ্গ, যোনি নাক, প্রভৃতি অধঃ দিকে কিংবা ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় দিক দিয়াই নিঃসৃত হইতে পারে। পিত্তের যখন অতি-শয় প্রকোপ হয় তখন সর্ব্বাঙ্গের লোমকূপ দিয়াও নির্গত হইতে পারে।

মুখ দিয়া হঠাৎ রক্ত উঠিলেই ভয়ের কিছু কারণ নাই। তবে রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র উপযুক্ত ঔষধ পথ্য ক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত। এখানে আমাদের জানিবার জন্য দেখা যাউক যে, কিরূপ রক্তপিত্ত সাধ্য। যদুক্তং, "ঊর্দ্ধং সাধ্য-মধোযাপ্যমসাধ্যং যুগপদ্গতম্।" অর্থাৎ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগ যাপ্য এবং উভয় মার্গগত অসাধ্য।

প্রথম কথা হইতেছে, যে সকল কারণে রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণ বর্জ্জন করিতে হইবে। এই রোগের কারণ সম্বন্ধে আপনারা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এরূপভাবে রক্ত দেখা দিলেই বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। রোগীর শরীরে যাহাতে পিত্তের প্রকোপ কম হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য স্নানাদির ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। এরূপ করিলে পিত্তের প্রকোপ অনেকটা কমিয়া থাকে। রক্তপিত্ত রোগে অনেক ক্ষেত্রে জ্বরও থাকে। জ্বর থাকিলে অবশ্য রোগীকে স্নান করান উচিত নহে।

রক্তপিত্ত রোগে দুগ্ধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। জ্বরাবস্থায়ও দুগ্ধ প্রয়োগে বাধা নাই। রোগী যে পরিমাণ দুগ্ধ সেবন করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারেন, সেই পরিমাণ দুগ্ধ সেবন করিতে দিতে পারা যায়। ছাগ দুগ্ধে রক্তরোধ করিবার বিশেষ শক্তি আছে, এজন্য এই রোগে ছাগ দুগ্ধের ব্যবহারই সমধিক প্রচলিত। যখন রক্তপিত্ত রোগীর রক্ত নির্গত হইতেছে তখন চট করিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে হৃদরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে সেরূপ চেষ্টা একটু করিতে হয়. নচেৎ রোগীর জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে। যখন অতি মাত্রায় রক্ত নির্গত হইতে থাকে তখন যদি বুঝা যায়, রক্তকে একটু সংযত করার প্রয়োজন তাহা হইলে ছাগ দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাক্ষাচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পথ্য প্রয়োগ করিলে রক্ত নির্গত হওয়ার বেগ কমিয়া আইসে। অথবা যজ্ঞ ডুমুরের পাতার রস এক তোলা পরিমাণ রোগীকে সেবন করিতে দিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়।

জ্বর না থাকিলে এক বৎসরের পুরাতন হৈমন্তিক চাউলের অন্ন রোগীকে প্রদান করিতে হইবে। কেহ যেন ভুল ক্রমেও এই রোগে রোগীকে মৎস্য প্রদান না করেন। ইহা অবশ্য বাঙালীর পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার! তিক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া যায়। এ জন্য বেত্রাগ্র, পলতা, উচ্ছে প্রভৃতির যে কোন একটির সহিত কাঁচকলা দিয়া তিক্ত ঝোল কল্পনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিতে হইবে। মুগের ডাইল দেওয়া যাইতে পারে।

অবশ্য এগুলি রোগীর পথ্যের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হইবে। কচু, আলু, আদা, পেঁয়াজ, রসোন প্রভৃতি কন্দ জাতীয় দ্রব্যাদি ভুল ক্রমেও প্রয়োগ করা উচিত নহে।

কাসবেগের সহিতও রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এজন্য কাস যাহাতে উপশম হয় তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঊর্দ্ধগ ও অধগ রক্তপিত্তে এই ক্রম অবলম্বন করিয়া পথ্যের বিধান করিলে সুফল লাভ করা যায়।

যদি নাক দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা-হইলে, ঠাণ্ডা জল নাক দিয়া টানিলে অনেক সময় রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। দূর্ব্বার রস ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া নাক দিয়া টানিলেও উপকার লাভ করা যায়। আর আর পথ্য সকল উক্ত বিধানানুসারে চলিবে।

অনেক রোগীর রোমকূপ দিয়াও রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এরূপ রোগী নিতান্ত বিরল নহে। এই ক্ষেত্রে জলে ফটকিরী গুলিয়া সেই জল দ্বারা গা মুছাইয়া দিলে রক্ত নিঃসরণ বন্ধ হইয়া যায় এবং পূর্ব্ব লিখিত পথ্য সকল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য রকমের ফল পাওয়া যায়। রক্তপিত্ত সম্বন্ধে অনেক

কিছু বলিবার আছে কিন্তু পথ্যের কথা বলিতে গিয়া সকল কথা বলা সম্ভব হয় না। এজন্য রক্ত সম্বন্ধে এই খানেই শেষ করা হইল।

কাস

কাস রোগ উপেক্ষা করিবার নহে। যে কোন প্রকারের কাসই হউক না কেন, সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহার শান্তির চেষ্টা করা উচিত। আর এক কথা, 'ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই ভয় হয়।' এই কাস হইতে ক্ষয় কাস উৎপন্ন হইয়া মানব শরীরকে ধ্বংস করিতে পারে।

কোন রোগের কথা বলিতে গেলে প্রথমে আমাদের দেখা আবশ্যক, কোন নিদান সেবন জন্য রোগ উৎপন্ন হইয়াছে এবং কাহাকে সেই রোগ বলে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ
ক্ষবথোস্তথৈব।
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ সংভিন্নকাংস্য
স্যস্বনতুল্য ঘোষঃ।
নিরেতি রক্ত্রাৎ সহসা সদোষো মনীষিভিঃ
কাস ইতি প্রদিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ, মুখের মধ্যে ও নাসা রন্ধ্রে, অথবা উদরস্থ অপকব রস বায়ুর দ্বারা উর্দ্ধ গতি প্রাপ্ত হইলে, ব্যায়াম, ভুক্ত দ্রব্য ভিন্ন মার্গগামী হইলে (বিষম লাগা), বেগ রোধ অর্থাৎ উপস্থিত মল-মূত্রের বেগ রোধ এই সকল কারণ উপস্থিত হইলে, প্রাণ বায়ু কুপিত হইয়া উদান বায়ুকে দুষ্ট করে এবং উভয় বায়ু কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ভগ্ন [illegible] পাত্রের শব্দের সহিত সহসা মুখ পথে নির্গত হইতে থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ কাস রোগ নাম করণ করিয়াছেন। তাহা হইলে এক্ষণে আমরা বুঝিলাম, কাস রোগ প্রতিষেধের নিমিত্ত পূর্ব্ব কথিত নিদান সমূহ পরিবর্জ্জন আমাদের একান্ত আবশ্যক। কাস কয় প্রকার তাহাও আমাদের এখানে জানা আবশ্যক। উক্ত হইয়াছে, 'পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।' ইহাদের মধ্যে বাহিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস প্রায়ই দেখা যায়। উরঃ ক্ষত জন্য কাস এবং কাস পুরাতন হইয়া কাসের সহিত ক্ষয় এই দুইটী আশঙ্কার রোগ।

যে কোন প্রকারের কাসই হউক না কেন সর্ব্ব প্রথমে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগান একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সম্ভব হইলে গরম জল পান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বুকে, গলায় ও পাঁজরে খাঁটা সরিষার তৈল মালিশ করিলে কাস রোগী অনেক সময় বিশেষ উপকার লাভ করিয়া থাকেন। কাস যদি বাত প্রকৃতির হয় তাহা হইলে, দধি সেবন করিতে দিতে পারা যায়। হরীতকী চূর্ণে তিন দিন বাসক পাতার রস দ্বারা ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া বাত প্রকৃতির কাস রোগীকে যদি এক আনা মাত্রায় গরম জল সহ সেবন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে অত্যন্ত সুফল লাভ করা যায়। এই যোগ প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠও পরিষ্কার হইয়া থাকে। এই বাতিক কাস রোগীকে যদি ফটকিরী চূর্ণ এক আনা পরিমাণে গোদুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উপকার লাভ করা যাইতে পারে। অন্যান্য পথ্য শরীরের অবস্থা ভেদে প্রয়োগ করিতে হইবে।

কাস রোগীর নির্ম্মল বায়ু একান্ত আবশ্যক। ধূলি ও ধূম যুক্ত বায়ু কাস রোগীর পক্ষে হিতকর

নহে। যেখানে কাস বেগ প্রবল সেখানে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করার চেষ্টা করাই সঙ্গতঃ। পঞ্চীকৃত বায়ুর ধূলিকণা শ্লেষ্মাশয়ে গমন পূর্ব্বক কাসবেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নাসা পথে শ্বাস গ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা কম। কারণ বিধাতার অপূর্ব্ব দেহ রচনার ভঙ্গীতে নিঃশ্বাসযোগে গৃহীত ধূলিকণা শ্লেষ্মাশয়ে গমন পূর্ব্বক অনিষ্টপাত করিতে সহজে সক্ষম হয় না। সেই সকল ধূলিকণা নাসা পথের রোমে অথবা ঐ স্থানের সঞ্চিত শ্লেষ্মার সহিত রহিয়া যায় এবং একটু যত্ন করিলেই বাহির হইয়া যায়।

রোগীর যদি কাসের সহিত ক্ষয় দেখা যায় তাহা-হইলে, ক্ষয় পূরক পথ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগীর জীর্ণ করার সামর্থ্য অনুসারেই পথ্য প্রয়োগ করা উচিত। এজন্য মাংস, রস, দুগ্ধ, ভাল মাছের ঝোল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রোগীর পথ্য সম্বন্ধে আলোচনা আমরা এইখানেই শেষ করিলাম। যদি কোন বিশেষ পথ্য সম্বন্ধে আলো-চনার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পরে সে বিষয় আলোচনা করা যাইবে। রোগীকে পথ্য প্রয়োগ কালে সকল সময় তাহার বল, বয়স খাদ্য জীর্ণ করিবার সামর্থ্য প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্থান পরিবর্ত্তন করাইবারও প্রয়োজন হইতে পারে। যাহা মানব শরীরের পক্ষে হিত তাহাই পথ্য। যথাযথ পথ্য প্রযুক্ত হইলে সাধ্য রোগে রোগাপনয়নে বেগ পাইতে হয় না। আমাদের দেশে যদি পথ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পীড়িতের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
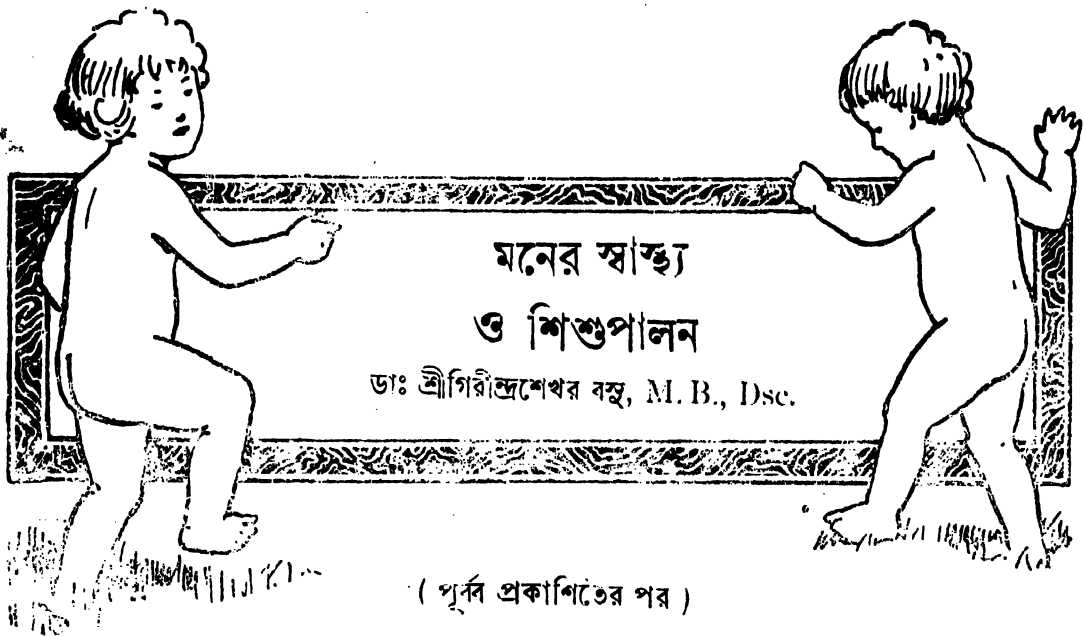
চার হইতে পাঁচ বৎসরের শিশু

(১) দেখাইয়া দিলে + এই রকম ঢেরা আঁকিতে পারে, চতুর্ভুজের চারি দিকে রেখা টানিতে পারে
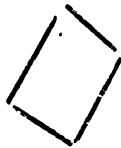
(২) পাঁচ ছয়টা ছোট বাক্স সাজাইয়া ঘর ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে পারে

(৩) দেখাইয়া দিলে কাগজ চার ভাঁজ করিতে পারে

(৪) বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের সব কথা উচ্চারণ করিতে পারে

(৫) নিজে স্নান করিতে, দাঁত মাজিতে, হাত ধুইতে, জামার বোতাম খুলিতে পারে

(৬) অন্য ছেলের সঙ্গে খেলা করিতে পারে

(৭) তিন-চারটা অঙ্ক—যথা, ৩—৫—৯—৪ একবার শুনিয়া বলিতে পারে

(৮) ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গুণিতে পারে

(৯) ———— দুইটা রেখার মধ্যে কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা বড় বলিতে পারে

(১০) এখন দিন না রাত বলিতে পারে

পাঁচ হইতে ছয় বৎসরের শিশু

(১) △ □ ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ দেখিয়া আঁকিতে পারে

(২) নমুনা দেখিয়া সাত-আটটা বাক্স সাজাইতে পারে

(৩) কথায় আধ-আধ ভাব থাকে না—স্পষ্ট উচ্চারণ হয়

(৪) গাছের পাতা নড়ছে কেন? মা ছেলেকে মারছে কেন? } এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে

(৫) নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতে পারে

(৬) চার-পাঁচটা অঙ্ক—যথা, ৫—৭—২—১—৪ একবার শুনিয়া বলিতে পারে

(৭) ডান হাত বাঁ হাত দেখাইতে পারে

(৮) এখন "সকাল না দুপুর" বলিতে পারে

(৯) মা বড়, না বাবা বড় বল্‌তে পারে।

অধিকাংশ মানসিক রোগের সূত্রপাত পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই হয়। অতএব শিশুপালনে সতর্ক হও

নিষেধ

১। শিশু কাঁদিলেই তাহাকে স্তন্য দিবে না। তাহার কষ্টের কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকার করিবে। ভিজা বিছানা, মশা বা পিঁপড়ার কামড়, পিপাসা, পেট-কামড়ানি ইত্যাদির জন্য শিশু ক্রন্দন করে।

২। জোর করিয়া খাওয়াইবে না।

৩। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বা ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কিছু করাইতে চেষ্টা করিবে না।

৪। অপরিচ্ছন্ন থাকিতে দিবে না।

৫। ভয় দেখাইয়া চাপড়াইয়া দোল দিয়া বা মুখে স্তন দিয়া সুস্থ শিশুকে ঘুম পাড়াইবে না।

৬। কখনও ভূত, প্রেত, জুজুর বা জীবজন্তুর ভয় দেখাইবে না।

৭। উপায় থাকিলে দেড় বৎসরের পর হইতে শিশুকে পিতামাতার সহিত একত্র শোয়াইবে না।

৮। শিশুর সহিত কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না।

৯। শিশুর কোন প্রশ্ন, এমন কি জন্মাদি ব্যাপারের প্রশ্নও কখনও ধমক দিয়া থামাইবে না, তাহার বুদ্ধির অনুরূপ সত্য উত্তর দিবে।

১০। পারিবে না বলিয়া সকল কার্য্যে শিশুকে নিরুৎসাহ করিবে না।

১১। শিশুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা উপহাস করিবে না।

১২। অন্য শিশুর তুলনায় শিশুর হীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে না।

১৩। ক্রীড়াশীল শিশুকে অনর্থক চুম্বন বা আদরে বিব্রত করিবে না।

১৪। কখনও অতিরিক্ত আদর, চুম্বন ইত্যাদি করিবে না।

১৫। শিশুর হাতে তাহার বুদ্ধির অগম্য খেলনা দিবে না।

১৬। সকল আব্দারের প্রশ্রয় দিবে না।

১৭। যে-দোষ বুঝাইয়া বা আদর করিয়া ভাল করা যায় তাহার জন্য শিশুকে শাস্তি দিবে না।

১৮। শিশুর সম্মুখে কখনও অসংযত ব্যবহার করিবে না।

১৯। উপযুক্তভাবে পালন করিলে শিশুকে কদাচিৎ শাসন করিতে হয়।

বিধি

১। জন্মের পর হইতেই মলমূত্রত্যাগ, আহার, নিদ্রা ইত্যাদির সুঅভ্যাস করাইবে। অল্প বয়সেই শিশুর সুঅভ্যাস আয়ত্ত হয়।

২। শিশুকে অল্প বয়স হইতে একলা অন্ধকারে থাকিতে অভ্যস্ত করাইবে।

৩। শিশুকে তাহার শক্তি অনুযায়ী স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবে।

৪। সমবয়স্ক বালক-বালিকার সহিত শিশুকে খেলা করিতে দিবে।

৫। শিশুর মনে নানারূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব বা ইচ্ছা থাকে, যথা—আদর পাওয়া, আদর করা; মারা, মার খাওয়া; হুকুম করা, হুকুমে চলা ইত্যাদি। যে-সকল খেলায় বা কাজে এই-সব

বিভিন্ন বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে তাহাই শিশুর মানসিক বিকাশের অনুকূল। কেবল শাসন বা কেবল আদরে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

৬। বালক ও বালিকাকে সমান ভালবাসা দেখাইবে।

৭। শিশুর প্রতি মাতাপিতার আদেশ দৃঢ়, শান্ত ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পূজা অবকাশের স্বার্থকতা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ।

নদী গিরি সাগরের যেকোন' খানে
যে জন বেড়াতে যায়, ব্যাধি না জানে,
পূজার এ অবকাশে
সুযোগ যদি বা আসে
তবে কেন কারাবাসে
মরিবে প্রাণে!
চেয়ে দেখ দরপনে বদন পানে।

বিদেশ ভ্রমণে ঘোচে মনের কালো,
মনের আমোদে হয় দেহের ভালো.
মনের ব্যাধির জের
সব চেয়ে বিপদের,
লুটে লও বাহিরের
কিরণ আলো,
লাবণ্যের জ্যোতি-স্নাত প্রদীপ জ্বালো।

নিবেদন

শ্রীবিমলচন্দ্র রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পান-দোক্তার পরিবর্ত্তে হরিতকী

পান,—পান আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও পানের গুণাগুণ উল্লেখ আছে। আহারের পর একটী পান খাওয়া মন্দ নয়; কিন্তু অত্যধিক পান খাওয়া কোন প্রকারেই উচিত নয়। অধিক পান খাইলে দন্ত, কেশ ও দেহের বলের হ্রাস হইয়া থাকে; এমন কি শ্রবণশক্তিরও হ্রাস হয়। জিহ্বার জড়তা আনয়ন করিতে পান অদ্বিতীয় মহারুক্ষ। ইহা রক্তপিত্ত বর্দ্ধক, কামোদ্দীপক এবং গুরুপাক। অত্যধিক পান খাইবার জন্য মেয়েদের মধ্যে দন্ত-রোগের এবং অম্বলের ব্যাধির প্রকোপ বেশী দেখা যায়। সুখের বিষয়, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিশেষতঃ সহরের বাসিন্দা যাহারা, তাহারা পান খাইবার বিশেষ পক্ষপাতী নহে। পল্লীগ্রামে এবং প্রাচীন-প্রাচীনাদের মধ্যে ইহার পশার প্রতিপত্তি অত্যধিক।

দোক্তা—চা-বিস্কুটে যেমন নিকট আত্মীয়তা, পান-দোক্তায়ও তেমনি অচ্ছেদ্য বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। তামাকের দ্বারাই দোক্তা এবং জর্দ্দা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বহু প্রাচীনকালে আমেরিকার রেড্-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই তামাকের ধূমপান করিত। তৎপর সার ওয়ালটার র‍্যালে ইংলণ্ডে তামাক আনয়ন করেন। আমাদের দেশে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংলণ্ডীয় রাজদূত সার টমাস্ রো তামাক আনয়ন করেন। এখন তামাক পৃথিবীখ্যাত। আজকাল কেহ এমন একটা গৃহ দেখাইতে পারিবেন না, যেখানে তামাক-দেবতা এক বেশে না এক বেশে বিরাজিত নহেন। বিড়ি, সিগারেট, দোক্তা, জর্দ্দা, নস্য প্রভৃতি হরেক অবতা-রের নাম উল্লেখের স্থানাভাব। দোক্তা এবং জর্দ্দা পানের কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় অনুসরণ করিয়া থাকে। একটী প্রবাদ আছে—"ছোট সাপের বিষ বেশী," পান মানুষের যত না অহিত করে, দোক্তা-জর্দ্দা তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অনিষ্ট করিয়া থাকে। তামাকে নিকোটিন নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অবস্থান করে। এক ফোঁটা নিকোটিন উদরস্থ হইলে মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন তামাক কোন্ শ্রেণীর বিষ।

দোক্তা এবং জর্দ্দা মাদকতা আনয়ন করে এবং ইহা ব্যবহারে অজীর্ণতা, অবসাদ, শিরঃশূল, অনিদ্রা, শিরঃঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ জন্মে। অত্যধিক দোক্তা বা জর্দ্দা সেবনে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হয়, দেহের রক্ত তরল

হইয়া যায় এবং রোগ-প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া যায়। যাঁহারা এই বদ্‌ভ্যাসে অভ্যস্ত তাঁহাদের পুত্রকন্যাও সচরাচর দুর্ব্বল ও শিরঃপীড়াযুক্ত হইয়া থাকে।

হরিতকী—হরিতকী নামটী আমাদের পরিচিত হইলেও জিনিষটীর সহিত আমাদের সবিশেষ জানা শোনা নাই। পল্লীগ্রামে বিধবাদের মধ্যে হরিতকীর প্রচলনটা বেশী। বিধবাদের মধ্যে পান খাইবার রীতি নাই সেইজন্য তাঁহারা অনেকেই হরিতকী খান। পানদোক্তা ছাড়িয়া আহারের পর হরিতকী খাওয়া খুবই হিতকর। হরিতকী সাধারণতঃ পঞ্চরস-যুক্ত—মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু এবং অম্ল। মধুর, তিক্ত এবং কষায় রস পিত্ত নষ্ট করিয়া থাকে; কটু, তিক্ত এবং কষায় রস কফ নষ্ট করিয়া থাকে; অম্ল-রস বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হরিতকীর বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ আছে। বহু-রোগে হরিতকীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ভবতী রমণীর পক্ষে হরিতকী না খাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

স্নানে সাবানের পরিবর্ত্তে তৈল

সাবান—আজকাল ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই সাবানের চলন বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সাবানের উপকারিতা যাহাই হউক না কেন, আমাদের এ দরিদ্রদেশে তাহার বিপুল পশারে দেশবাসীর যে অনিষ্টসাধন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা তাহার গুণাবলী অধিক নহে। আমরা সাহেবদের দেখি স্নানে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করিতে, সেই জন্য নিজেরাও সাবান মাখিয়া সভ্য, ভদ্র সাজি। কিন্তু আমাদের মনে পড়ে না যে, যাহাদের আয় দৈনিক ৬৷৹ তাহাদের পক্ষে যত-টুকু ভদ্র সাজা এবং বাবুয়ানি চলে, আমাদের দৈনিক ছয় পয়সা আয় লইয়া অনাহারে ততটুকু বাবুয়ানি সাজা সম্ভবপর নহে। পেটে দুবেলা আমরা আহার জোগাইতে পারি না, কিন্তু আমাদের বিলাসিতার উপকরণ দেখিলে মনে হয়, আমরা খুবই অর্থশালী জাতি।

সাবান ব্যবহারে বর্ণ উজ্জ্বল হয় ইহা একটী সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ধারণা। বেশী সাবান ব্যবহার করিলে শরীরের কমনীয়তা চলিয়া যায় এবং দেহ কর্কশভাব ধারণ করে, প্রয়োজন মত ব্যবহার করাই উত্তম।

তৈল—পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দনের প্রথা ছিল। এখনও আছে, তবে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই ইহা লুপ্ত হইবে। তৈল মর্দ্দন প্রথা উত্তম কিনা দেখা যাক্।

স্নানের পূর্ব্বে কর্ণে এবং পদদ্বয়ে তৈল দিবার ব্যবস্থা আছে। কর্ণে তৈল প্রদান করিলে বধিরতা জন্মে না এবং নানাপ্রকার কর্ণরোগ হইতে পারে না। পদদ্বয়ে তৈল প্রদান করিলে শ্রম দূর হইয়া গাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে এবং দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া থাকে। স্নানের পূর্ব্বে উত্তমরূপে দেহে তৈল মর্দ্দন করিলে উহা লোমকূপের ছিদ্রপথ দিয়া শরীরাভ্যান্তরে গমন করিয়া শরীর সুস্থ করে। মস্তকে তৈল প্রদান করিলে শরীর পুষ্ট হয়, নানাপ্রকার শিরঃপীড়ার শান্তি হয়, এবং কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। পূর্ব্বে মায়েরা শিশুর সর্ব্বাঙ্গ তৈলসিক্ত করিয়া রৌদ্র সেবন করাইতেন—ইহা যে অতি উত্তম প্রথা তাহা আজ-কালকার বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন। এখন দেখিতে পাই শিশুদের সর্ব্বাঙ্গ মূল্যবান পরিচ্ছদে ঢাকা থাকে এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার পাউডার, হেজ্‌লিন

প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে শিশুদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইয়া থাকে; পরন্তু অযথা বিলাসিতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তৈলের উপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সবিশেষ উল্লেখ আছে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত বিজ্ঞগণও ইহার উপকারিতা ঘোষণা করিতেছেন। কথায় বলে—"তেলে জলে বাঙ্গালী," আজ বাঙ্গালীর এই কথাটী ভাবিতে বোধ করি মস্তক লজ্জায় মাটিতে নত হইয়া পড়িবে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের মতিগতি পুরাকালের সমস্ত আচার পদ্ধতির উপরই বীতরাগ হইতে বসিয়াছে। এরূপ করা প্রকৃত শিক্ষিত লোকের ন্যায় বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে না, প্রত্যেক জিনিষটী এখন আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে দেশকালপাত্র অনুযায়ী আমাদের পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল, পাশ্চাত্য দেশের লোকের সহিত সর্ব্বক্ষেত্রেই তালে তালে পা ফেলিয়া চলিলে আমাদের ইষ্ট হইবে না। সে দেশের কালপাত্র অনুযায়ী তাহাদের চলিবার রীতিনীতি এবং তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহাদের অনুকরণ করিলে আমাদের অহিতই হইবে। প্রধান কথা হইতেছে তাহারা ধনী, আমরা নিঃস্ব দুর্ভিক্ষ পীড়িত।

বড় হইতে হইলে নিজেদের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, আমাদের সে সমস্ত নাই। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ যেদিন বলিলেন—"মূল্যবান খাদ্য মাত্রেই শরীরের পুষ্টি সাধনের সম্যক উপযোগী নহে। নানা প্রকার ফলমূল, শাক-পাতাও যাহা সকলে উপেক্ষা করে, তাহাই দেহের সম্যক উপযোগী"—সেদিন হইতে পাশ্চাত্যের কোটিপতি পর্য্যন্ত এই সমস্ত জিনিষের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ও সমস্ত "রাবিশ" বলিয়া উপেক্ষা করি। যাঁহারা ধনী তাঁহাদের ত্রিসীমানাও ও সমস্ত 'রাবিশ' মাল ঘেঁসিতে পারে না।

যেদিন বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন,—"সূর্য্যালোক প্রাণীর প্রাণ। প্রাণ ভরিয়া সেবন কর"—সেদিন হইতে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিগণ দেশকাল আবহাওয়া অনুযায়ী সম্ভবমত বস্ত্রসংক্ষেপ করিয়া রৌদ্র বায়ু সেবন করিতে যত্নবান হইলেন। আমাদের বাহাত্তর পুরুষ হইতে ঐ সত্য কথাটা চলিয়া আসিলেও, আমরা ইহার উপকারিতা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। আমরা শিক্ষিত হইয়া "এটিকেট্" দুরস্ত রাখিবার জন্য 'ওভারকোট' "অলেষ্টার ফলেষ্টর" গায়ে ঢুকাইলাম। আমাদের দেশকাল অনুযায়ী যে ঐ সমস্ত জিনিষ কতদূর উপযোগী, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলাম না। অথচ আমাদের দৈনিক আয় কত—না ছয় পয়সা। এইরূপে আজ আমরা মরণ-পথের পথিক হইয়াছি। এখন দুই সন্ধ্যা অন্ন জুটে না।

পরিশেষে মা-বোনদের নিকট আর একটী কথা বলিয়াই আজ প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিলাসিতার মাত্রা মেয়েদের মধ্যেই অত্যধিক প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য ইহা স্বাভাবিক, কারণ মেয়েরা ও জিনিষটীকে একটু বেশী প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের আজ যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে অযথা বিলাসিতার জন্য ব্যয় না করিয়া পুত্রকন্যার স্বাস্থ্য-শিক্ষার জন্য সেগুলি ব্যয় করিলে সার্থক হয়। যাঁহার এ জন্য যথেষ্ট আছে, তিনি অনায়াসে পাঁচটী সৎকার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে

পারেন। দেশে দুঃখী, গরীবের দুর্দ্দশার অন্ত নাই, সে দিকে তাঁহারা একটু চক্ষু মেলিয়া তাকাইলে, দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হয়। নিজের একটু স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশের, দশের মঙ্গল সাধন করিলে ইষ্ট বই অনিষ্ট হয় না। প্রবন্ধের আকার আর বর্দ্ধিত করিব না। বারান্তরে আবার কিছু আলোচনা করিব। অবশ্য মা-বোনদের শুভাশীর্ব্বাদের জোরে অতদিন সপ্রাণ দেহ থাকিলে হয়

পল্লী-জীবন

শ্রীহরিপদ বেরা

শান্তি মাঝে পাড়াগাঁয়ে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে,
মনের সুখে সবাই মিলে সেখানে বাস করে।
নীরব তাদের জীবন যাপন নাইক কোন রোগ,
সুস্থ সবল দেহ তারা সদাই করে ভোগ।

ভোরে উঠেই স্বভাবতঃ ব্যস্ত যে যার কাজে,
পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আবার সাঁজে।
ধরার বুকে ঘাসের উপর মুক্ত আকাশ তলে,
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে তারা পড়ে অবহেলে।

ভেজালহীন টাট্‌কা জিনিষ ধীরে ধীরে খেয়ে,
অজীর্ণতা রোগ তাদের আসেনাকো ধেয়ে।
পরিমিত পরিশ্রমে সুনিদ্রা হয় রাতে।
অকারণে ভুগ্‌তে হয় না জটীল রোগের হাতে।

মুক্ত বায়ু স্বচ্ছ জল প্রকৃতির যে দান—
—ফল মূল, খেয়ে তাদের শান্ত সুখী প্রাণ,
যক্ষ্মার আকর চায়ের দোকান বন্ধ তাদের তরে
গুড় ছোলা চিড়া মুড়ি তাতেই উদর ভরে।

নাই সেখানে বিজ্ঞান-বিদের উর্ব্বর মাথার ফল
ভগবানের দেওয়া ছাড়া আলো বাতাস জল।
নাইকো তাদের থিয়েটার আর বায়োস্কোপের নেশা,
অকারণে নভেল পড়া জেগে সারা নিশা।

সকাল বেলা নীরোগ দাঁতে নিমের দাঁতন করে,
রোদে জলে অনায়াসে চলে পায়ের জোরে।
সহর ছেড়ে' হবে ভালো পাড়াগাঁয়ে বাস।
স্বাস্থ্য-শান্তি সুখের মাঝে কাট্‌বে বার মাস॥

আয়ুষ্কল্যাণ

(এস্কেবি লিখিত)

ওলাউঠা

অজীর্ণের কারণে মল ভেদ হইলে, চলিত কথায়, তাহাকে 'পেট নাবানো' এবং গ্রাম্য কথায় 'পেট ওলানো, বা সংক্ষেপে 'ওলানো' বলা হয়। ঐ কারণে বমি হইতে থাকিলে, তাহাকে 'বমি উঠা' বা সংক্ষেপে 'উঠা' বলা হয়। অজীর্ণে ভেদ কিংবা বমি বা উভয়ই হইতে পারে।

ভেদ ও বমির মৃদু অবস্থা যখন উগ্র হইয়া অতিরিক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে তখন তাহাকে 'অতিসার' বলা হয়। অতিসার অবস্থা প্রচণ্ড হইয়া উঠিলে, দেহস্থ জলীয় ধাতু সকল দ্রুত নিঃসৃত হইয়া আক্ষেপ জন্মায় অর্থাৎ শরীরে 'খাল' ধরিতে থাকে এবং তজ্জন্য সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। এই অবস্থাকে বিসূচিকা বা ভেদবমি বা ওলাউঠা বা কলেরা বলা হয়।

বাতাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, কখনও কখনও প্রচণ্ড ঝড়ে শীঘ্রই পরিণত হয়। আবার, কখনও বা আচম্বিতে ঘূর্ণিবায়ুর রুদ্রমূর্ত্তিতে তাহার প্রচণ্ডতা প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রথমটীর আকারে যখন ভেদবমি হইতে থাকে তখন তাহাকে সচরাচর বিসূচিকা বলা হয় এবং দ্বিতীয়টীর আকারে যখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'এসিয়াটিক কলেরা' বা সংক্ষেপে 'কলেরা' বলা হয়। দুইটীই সমান মারাত্মক; কেবল আক্রমণের প্রচণ্ডতা হিসাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় এবং সেজন্য, বর্ত্তমান কালে, দুইটী বিভিন্ন নামে প্রচারিত হয়। আসলে, উহারা এক; তফাৎ কেবল এই যে প্রথমটীতে চিকিৎসার কিছু সময় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টীতে তাহা বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু, দুইটীতেই 'ওলা' এবং 'উঠা' দুইই হইয়া থাকে; এইজন্য ওলাউঠা বলিলে দুই রকমই বুঝায়।

লক্ষণঃ—অত্যন্ত মলভেদ, বমি, পেটব্যাথা, পিপাসা, হাইতোলা (জৃম্ভণ), শরীরে খা'ল ধরা (আক্ষেপ), দাহ, বিবর্ণতা, কম্প, ভ্রম, অজ্ঞানতা, অনিদ্রা, গ্লানি, মূত্ররোধ—ইহাদের কতক বা সব কয়টী প্রকাশ পায়।

আক্রমণ অপেক্ষাকৃত ধীর হইলে অর্থাৎ অজীর্ণ তথা অতিসারের লক্ষণে, প্রথম দুই একবার দাস্তের রং হলদে থাকে; তাহার পরই তাহা জলীয় ও পরে চাঁচি-কুমড়া পচার তরলাংশের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রবল আক্রমণে একেবারেই কুমড়া পচার মত দাস্ত হয়। দাস্তের ঐ অবস্থা হইলে, বুঝিতে হয় যে শরীরস্থ কফ, পিত্ত প্রভৃতি জলীয় ধাতু সকল দ্রুত নিঃসৃত হইতেছে। এই জলীয় ধাতুর অপচয়ে,

স্রোতস্থ ও দেহস্থ প্রবল বায়ুর তাড়নায়, খাল ধরা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

মূত্ররোধ, অনিদ্রা, অজ্ঞানতা ও কম্প, এ রোগের দুর্লক্ষণ। ধীর আক্রমণে, প্রথম হইতেই রোগের বিষয়ে মনোযোগী হইলে, ইহা নিশ্চয়ই মারাত্মক অবস্থায় পরিণত হয় না। প্রবল আক্রমণে, কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া, প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলে, রোগ নিশ্চয় উপশম হয়।

'মহামারী'র আকারে যখন কোনও স্থানে রোগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, শঙ্কাকুলতা, আবহাওয়া এবং আবহাওয়ার জন্য সেই স্থানবাসী লোকেদের দেহ-মনের অবস্থার বৈষম্য, তাহার কারণ। ভয় না পাওয়া, রোগ হইতে অব্যাহতির প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রতিষেধক :—

১। ভূমি-কুষ্মাণ্ডের মূল ॥০ তোলা কিঞ্চিৎ বিল্বপত্রের রসের সহিত মাখনের মত বাটিয়া সামান্য জলে গুলিয়া সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা ; কিশোরদের অর্দ্ধেক, বালকদের সিকি ও শিশুদের বয়স অনুযায়ী মাত্রার তারতম্য হইবে। দুই ঘণ্টা অন্তর তিনটি মাত্রায় রোগ উপশম হইবে।

প্রবল আক্রমণে ইহাতে বিশেষ কাজ হইবে না। ধীর আক্রমণে নিশ্চয়ই ফল হইবে। বমি হইয়া উঠিয়া যাইলে, তখনই আর এক মাত্রা দিতে হয়। মুহুর্মুহু বমি হইয়া ঔষধ নির্গত হইয়া পড়িলে আরশুলার একটী 'নাদি' (বিষ্ঠা) চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া, তারপর ঔষধ দিবে। যদি পুনরায় বমি হয়, পুনঃ ঐরূপ করিবে।

২। রৌদ্রদীপ্ত পরিষ্কার স্থানে জাত মানকচুর সূক্ষ্ম শিকড় ১ তোলা, মাখনের ন্যায় বাটিয়া, কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা ; অন্যান্যদের বয়স অনুযায়ী। এক ঘণ্টা অন্তর তিনটি মাত্রায় রোগ উপশম হইবে।

ধীর আক্রমণে নিশ্চয়ই ফল হইবে। বমি হইয়া যাইলে, তখনই আর এক মাত্রা দিতে হয়। বমি ও দাস্ত বন্ধ হইলে, ঔষধও বন্ধ করিতে হয়।

৩। রৌদ্রদীপ্ত পরিষ্কার স্থানে জাত অপামার্গের শিকড় ১ তোলা ২১টী গোলমরিচ সহ মাখনের ন্যায় পিষিয়া, সামান্য জলে গুলিয়া সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা ; অন্যান্যদের বয়স অনুযায়ী। একটী মাত্র মাত্রায়ই অধিকাংশ স্থলে উপকার হয় ; না হইলে, পরবর্ত্তী বমি বা দাস্তের পর আর এক মাত্রা সেব্য।

প্রবল আক্রমণেও ইহাতে সুফল হইতে পারে।

৪। রৌদ্রদীপ্ত পরিষ্কার স্থানে জাত পাথর-কুঁচি (হিমসাগর) গাছের একটী মাত্র সুপুষ্ট ও অকীট-দষ্ট পাতা ২১টী গোলমরিচের সহিত মাখনের ন্যায় বাটিয়া, কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা ; অন্যান্যদের বয়স অনুযায়ী। অধিকাংশ স্থলে, একটী মাত্র মাত্রায়ই রোগ উপশম হয় ; যদি না কমে, পরবর্ত্তী বমি বা দাস্তের পর আর এক মাত্রা সেব্য।

প্রবল আক্রমণেও সুফল হইবে।

৫। প্রস্ফুটিত একটী ধুতুরা ফুলের মধ্যস্থ ৫টী শীষ, ২॥০টা গোলমরিচের সহিত মাখনের মত বাটিয়া, কিঞ্চিৎ জলে সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা ; কিশোরদের ৪টী শীষ ও ২টা মরিচ, ৮ বৎসরের বালকের ৩টী শীষ ও ১॥০টি মরিচ, ৪ বৎসরের পক্ষে ২টি শীষ ও ১টা মরিচ এবং ২।১ বৎসরের বালকের পক্ষে ১টি শীষ ও আধখানা মরিচ ব্যবস্থা।

প্রবল আক্রমণেও সুফল হইবে।

৬। বটের পত্রাঙ্কুর ... ৩টা
কচি বিছুটি-পাতা ... ১টা
কচি স্থলপদ্মের পাতা ... ১টা

চন্দনের মত বাটিয়া ৩টী বটিকা কর। ১ ঘণ্টা অন্তর ১টী বটিকা কর্পূরজল সহ সেব্য। ইহা পূর্ণ-মাত্রা ; অন্যান্যদের বয়স অনুযায়ী।

৭। কর্পূর ... ১ ভাগ
শোধিত হিং ... ১ ,,
পিপুল ... ১ ,,
মুথা (শুষ্ক) ... ২ ,,

হিং গব্যঘৃতে মৃদু অগ্নিতে ভাজিয়া লইলে, শোধিত হয়। প্রত্যেক দ্রব্যটী সূক্ষ্ম করিয়া চূর্ণ করিবার পর প্রয়োজন মত সামান্য জল দিয়া মাড়িয়া ৪ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত কর। ২ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া বটিকা কর্পূরজল সহ সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা।

৮। ছোট এলাচ (খোসা বাদ) ১ ভাগ
শুঁঠ ... ১ ,,
যোয়ান ... ১ ,,
মরিচ ... ১ ,,
মুথা ... ১ ,,
কর্পূর ... ১০ ,,
মৃতসঞ্জীবনী সুরা
(অভাবে পরিশ্রুত সুরা) ১২৫ ,,

সুরা স্বতন্ত্র রাখিবে। কর্পূর খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে ফেলিবে। বাকী দ্রব্যগুলি সামান্য পিষিয়া ঐ সুরাতে ভিজাইয়া দিয়া, বায়ুবদ্ধ করিয়া সুরার পাত্রটী নিভৃতে রাখিয়া দিবে। এক মাস অন্তে পরিষ্কার ফ্লানেল কাপড়ে ঐ সুরা ছাঁকিয়া লইবে।

এক কাঁচ্চা জলের সহিত ১৫।১৬ ফোঁটা উক্ত ঔষধ সেব্য। ভেদ ও বমি বন্ধ হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। নচেৎ, হিসাব করিয়া, অবস্থা অনুযায়ী, ২ ঘণ্টা বা কম-বেশী অন্তর, পরবর্ত্তী মাত্রা বিহিত করিবে। ইহা পূর্ণমাত্রা। রোগের সকল অবস্থায় প্রযোজ্য।*

৯। শ্যাওড়া বা আস্‌শ্যাওড়া নামক দুই প্রকার বন্য বৃক্ষ হয়। তন্মধ্যে, ছোট গুল্মজাতীয় যে বৃক্ষ হইতে সচরাচর দাঁতন করিবার কাঠি আহরণ করা হয়, তাহা এ স্থলে লক্ষ্য নয়। অপর এক প্রকার শ্যাওড়া গাছ যাহা নাতিদীর্ঘ বৃক্ষরূপে জন্মে এবং প্রচুর ডালপালা সমেত ঝাঁকড়া গাছ হয়—সংস্কৃতে ইহাকে শাখোট বলে—তাহাই এখানে লক্ষ্য। অবশ্য, অভিজ্ঞ লোকেরা ইহারই দাঁতন ব্যবহার করেন, প্রথমটীর করেন না।

এই বড় শ্যাওড়া গাছের একটী মাত্র নিখুঁত নির্দ্দোষ পাতা এবং যোয়ান, কর্পূর ও জায়ফল প্রত্যেকটী ঐ পাতার সম ওজনের লইবে। যে শঠির ভিতরটা হরিদ্রাভ তাহার রস দিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মাখনের ন্যায় পিষিয়া ৩টী বড়ি করিবে। ওলাউঠা রোগের সর্ব্বাবস্থায়, প্রত্যেক দাস্তের পর, ১টী করিয়া বটী, আতপ-চাউল ধোয়া

* এই ঔষধটীতে $\frac{1}{8}$ ভাগ আফিং অন্যান্য উপকরণের মত ভিজাইয়া রাখিয়া, দ্বিতীয় প্রকার ঔষধ হয়। স্বভাবতঃ মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে, রোগের চরম অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আফিং-ঘটিত ঔষধ পারত-পক্ষে ব্যবহার না করাই ভাল ; কেন না, মূলরোগ সারিলেও, মূত্ররোধে ২।৩ বা অধিক দিন বাদে রোগীর প্রাণত্যাগ ঘটিতে পারে। তবুও, প্রয়োজন জন্য দুই রকম ঔষধই প্রস্তুত থাকা বিধেয়। ইহার মাত্রা ৮।১০ ফোঁটা।—লেখক।

জলের সহিত গুলিয়া সেব্য। ৩টী মাত্র বড়ীতেই বেশীর ভাগ রোগী আরোগ্য হয়; ক্বচিৎ ২।১টা অতিরিক্ত লাগিতে পারে। কিন্তু, যদি লাগিবার প্রয়োজন হয়, মাত্র তখনই নূতন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। রোগীর বয়স অনুযায়ী পাতা নির্ব্বাচন করিবে। পুর্ণ বয়স্ক, কিশোর এবং বালকদের পক্ষে যথাক্রমে বড় মাঝারি ও ছোট পাতা লইবে।

ইহা দৈব ঔষধ বলিয়া প্রচারিত।

১০। হরিণের শিং পুটপাকে ভস্ম করিয়া ১ রতি মাত্রায় ।৷০ তোলা অপামার্গ মূলের রসের সহিত সেব্য। ইহাতে ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সবল থাকে। অতি চমৎকার নির্দ্দোষ ঔষধ।

খণ্ডিত শৃঙ্গ একটী দৃঢ় সরাতে রাখিয়া, আর একখানি সম আয়তনের সরা উপুড় করিয়া চাপা দাও। বেশ করিয়া দড়ি দিয়া বন্ধন কর। এঁটেল মাটী দিয়া সমগ্র যুগ্ম সরাটীকে আবৃত করিয়া ফেল, যেন কোথাও এতটুকু ফাঁক না থাকে এবং মাটীর প্রলেপ যেন তিন আঙুল পুরু হয়। রৌদ্রে উহা শুষ্ক কর। এক হাত গভীর একটী গর্ত্ত কর। ১০০ খানা বিল্-ঘুঁটে সংগ্রহ কর। সন্ধ্যার পর ঐ গর্ত্তে ৭০ খানি ঘুঁটে সাজাইয়া ঐ মাটী-লিপ্ত সরা তাহার উপর রাখ এবং বাকী ঘুঁটেগুলা উহার উপর সাজাইয়া অগ্নি সংযোগ কর। পরদিন প্রত্যুষে, সমস্ত ঠাণ্ডা হইলে, সরা বাহির করিয়া ঔষধ (শৃঙ্গ ভস্ম) সংগ্রহ করিবে। এই প্রক্রিয়াকে পুটপাক বলে। ঘুঁটে কমবেশী বা গর্ত্ত ছোটবড় হইলে, বিশেষ ক্ষতি নাই।

এই ঔষধ একমাত্রা সেবনের পর, ৫নং মুষ্টিযোগ এক মাত্রা ব্যবহার করিলে বেশ ফল হয়। ইহা পূর্ণমাত্রা।

১১। হরিতাল ভস্ম অর্দ্ধ যব মাত্রায়, ।৷০ তোলা অপামার্গ মূলের রসের সহিত একবার মাত্র সেব্য। ইহাতে নাড়ী কখনও দমিয়া যাইবে না এবং খাল ধরা প্রভৃতির যন্ত্রণা বিকটভাবে হইবে না। ইহা পূর্ণমাত্রা। গর্ভিনীকে সেবন করাইবে না।

হরিতাল প্রভৃতি উপরসকে কোনও আকারে ব্যবহৃত করিবার পূর্ব্বে শোধন করা প্রয়োজন। বংশপত্রী হরিতাল ছোট ছোট খণ্ড করিয়া এক সপ্তাহ চূণের জলে ফেলিয়া রাখিলে শোধিত হয়। ভস্ম করিতে হইলে, শোধিত হরিতাল ২।৷০ তোলার কম যেন লওয়া না হয়। যতটা হরিতাল তাহার ৩২ গুণ অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল এবং ঐ ছালগুলি ধরে এমন একটী শক্ত ভাঁড় বা কলসী সংগ্রহ কর। কলসীটার ৩ ভাগ অশ্বত্থ ছাল দিয়া পূর্ণ কর এবং তাহার উপর শোধিত হরিতালগুলি রাখিয়া বাকী ছালগুলি তাহার উপর চাপাইয়া দিয়া, একটী সরা দিয়া কলসীটার মুখ বন্ধ কর। মাটীর প্রলেপ দিয়া কলসী ও সরার সংযোগস্থল বায়ুবদ্ধ কর এবং শুকাইয়া লও। সুতীব্র অগ্নিতে দুই প্রহর অবিচ্ছিন্ন-ভাবে কলসীতে জ্বাল দাও। চুল্লী এবং কলসী প্রভৃতি শীতল হইলে, ঈষৎ হরিদ্রাভ হরিতাল ভস্ম সংগ্রহ কর।

১২।	জারিত অভ্র	...	২ ভাগ
	জারিত লৌহ	...	২ ,,
	ফট্‌কিরি	...	৪ ,,
	শোধিত বংশপত্রী হরিতাল		১২ ,,
	জারিত স্বর্ণ	...	১ ,,

হরিতাল ও ফট্‌কিরি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে আল্‌তা ভিজান জলে বেশ করিয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখ। পরদিন আবার আল্‌তার জলে

মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখ—এইরূপ ৭ দিনে ৭ বার ভিজাইবে এবং শেষ দিনে, সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পুর্ব্বে ঐ মিশ্রিত দ্রব্যটীতে একটী গোলক প্রস্তুত করিয়া শুকাইতে দাও। খুব শক্ত দেখিয়া দুইখানি বড় এক মাপের শরা লও। একখানি শরাতে, অর্দ্ধেক জারিত অভ্র রাখ এবং অভ্রের উপরে জারিত লৌহের অর্দ্ধেকটা রাখ। তৎপরে, ঐ চূর্ণের উপরে সেই গোলকটী রাখিয়া, জারিত লৌহের বাকী অর্দ্ধেক চাপাইয়া দাও ও তদুপরি জারিত অভ্রের বাকীটা ছড়াইয়া দাও। এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে গোলকটী যেন লৌহ-অভ্রের চূর্ণ দ্বারা সম্পূর্ণ আবরিত হয়। এক্ষণে, দ্বিতীয় শরাখানি সাবধানে উহার উপর উপুড় করিয়া চাপা দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া, ৩ আঙ্গুল পুরু এঁটেল মাটীর প্রলেপ দিয়া সমস্তটা বেশ করিয়া ঢাকিয়া ফেলিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ভিতরের গোলকটী যেন স্থানচ্যুত না হয়, তজ্জন্য খুব সাবধানে হস্ত-চালনা করা উচিত। মাটী লিপ্ত ঐ মুষাটী গজপুটে বিলঘুঁটে দিয়া পুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে মুষাটী সাবধানে বাহির করিয়া সন্তর্পণে খুলিবে। শরার গাত্রসংলগ্ন হরিদ্রাভ ঔষধটী সংগ্রহ করা, এক্ষেত্রে প্রয়োজন। ঐ হরিদ্রাভ ঔষধের সহিত সিকি ভাগ ওজনে জারিত স্বর্ণ বেশ করিয়া মিশাইয়া লইতে হইবে।

এই ঔষধ অর্দ্ধ যব মাত্রায়, ।০ তোলা আপাং মুলের সহিত (উত্তমরূপে পিষ্ট করিবার পর), শীতল জল সহ সেব্য। যতই বমি হউক এই ঔষধ কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া যায় না এবং যেটুকু থাকে তাহাতেই সুপ্রচুর কাজ হয়। এজন্য কোনও ক্ষেত্রেই এক মাত্রার বেশী ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই ঔষধ সেবনের পরেই ৫নং মুষ্টিযোগটী প্রয়োগ করিতে হয়। অবশ্য মুষ্টি-যোগটী বমি হইয়া উঠিয়া যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে, যাহাতে এক মাত্রা ঔষধ পেটে থাকে সেইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একটীমাত্র মাত্রা পেটে থাকিলেই, রোগীর মৃত্যুভয় সম্পুর্ণরূপে দূর হয়।

ইহা পুর্ণমাত্রা। গর্ভিনীকে এ ঔষধ দেওয়া নিষেধ।

পথ্য : মৌরীর জল লবঙ্গ ভিজান জল পুদিনা শাক (শুষ্ক) ভিজান জল, ডাবের জল, বার্লি প্রভৃতি তরল পানীয় সামান্য সামান্য পরিমাণে কিন্তু বারে অধিক চলিবে। মুত্রকর, সহজপাচ্য, বলকর, স্নিগ্ধ, বায়ু-উপশমকর গুণগুলির দিকে লক্ষ্য থাকিবে। এইগুলিও ঔষধের কাজ করিবে।

নিবেদনঃ (১) প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাটিতে ৮ ও ১০ নং ঔষধগুলি তৈয়ারী থাকা উচিত, (২) প্রত্যেক 'ইউনিয়ন্ বোর্ড' ও 'ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড'-এ ৮, ১০ ও ১১ নং ঔষধগুলি প্রস্তুত থাকা উচিত; কারণ খরচ কিম্বা হাঙ্গামা উহার বাবতে খুব বেশী নয়, অথচ উপকার প্রচুর, এবং (৩) গ্রামস্থ কোনও না কোনও কবিরাজ মহাশয়ের অন্ততঃ ১২নং ঔষধটী প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। গৃহস্থের দ্বারা এইটী প্রস্তুত হইবার আশা একরূপ অসম্ভব। অথচ, ঔষধটী তৈয়ার থাকিলে কবিরাজ মহাশয়ের সুযশ এবং অর্থলাভ দুইই হইবে। যে কোনও বিকারগ্রস্ত হতাশ রোগীকে ১ রতি মাত্রায় সমপরিমাণ মৃগনাভি যোগে উপযুক্ত সহপান সহিত প্রয়োগ করিলে, আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত, মুষার মধ্যে হরিদ্রাভ ঔষধ ছাড়া, কঠিন কৃষ্ণাভ যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহা কুষ্ঠ ও বাতরক্তের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।—লেখক।

চয়ন

এক রকম ছোট ছোট পোকা আছে, তারা Bacteria খেয়ে ফেলে এবং সব প্রাণির নাড়ি ভুড়ি মধ্যে থাকে, এগুলা এত ছোটো যে মাইক্রস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না। Dr. F. D'Herolle এই পোকাগুলোর নাম দিয়াছেন Bacteriophage, কেননা এরা Bacteria গুলিকে খেয়ে ফেলে। এক রকম আছে শুধু এক রকম Bacteriaই খায় কিন্তু অন্য গুল অনেক রকমই খায়।

পেটের কোন অসুখ, যেরকম টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদিতে Bacteriaর দ্বারা অনেক সারে।

এপিডেমিক এই রকম করে আরাম হয়ঃ—

কোন একটা লোকের দ্বারা একটা অসুখের জীবাণু এল, এইটা সকলের মধ্যে গেল এবং চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। প্রথম যার হয় তার পক্ষে এটা খুব খারাপ, তার পর একটা রোগী হয়ত সারলো, তার থেকে Bacteriophageটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেল এবং epidemic বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম করে যদি একজনের থেকে Bacteriophageটা ছড়িয়ে পড়ে তাতে epidemic সেরে যায়, এটা একটা গ্রামে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

মনের সঙ্গে ব্রেনের কি সম্পর্ক এই নিয়ে অনেক দিন থেকে Philosopherদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। এখন ঠিক করা হয়েছে যে মন আর ব্রেন দুটা আলাদা জিনিষ নয়, একই জিনিষ। ব্রেনের মধ্যে অনেক ছোট ছোট cells আছে, সেই cells গুলর কাজ হল মন। ইহাতে দেখা যাচ্ছে যে যার যত বড় ব্রেন হবে তার তত বেশী মনের জোর থাকবে, কিন্তু তা নয়, Napoleanএর Brain সাধারণ লোকের ব্রেনের চেয়েও ছোট ছিল।

ছোটে ছোট জিনিষ মনে রেখে কোন দরকার নাই, এতে ব্রেনের জোর শীঘ্র কমে যায়, তার চেয়েও দরকারি কথা মনে রাখা ভাল। এই ব্রেনের power অনেকটা Nerveএর উপর নির্ভর করে। খারাপ খাবার, মদ্য, তামাক, বেশী ঘুমান ইত্যাদিতে ব্রেনের শক্তি শীঘ্র কমে যায়, তাতে Blood pressure করে এবং শীঘ্র মানুষ বুড়া হয়ে যায়।

চা এবং কফি খাওয়াটা সকল লোকের পক্ষেই ভাল মনে হয় না, বিশেষ কোরে বৃদ্ধ লোকের পক্ষে, উহা ভয়ানক খারাপ Journal of the Iowa Stata Medical Society ব'লে একটি কাগজে এইটি লেখে। যখন লোকের বয়স হয় তখন চা ইত্যাদি খেলে নার্ভ শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।

Caffein হার্টের শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং এই রকম করে রক্তের চাপটা আরও বাড়িয়ে দেয়, এবং blood vesselএর ও অনিষ্ট করে।

বৃদ্ধদের চা ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করা উচিত, শুধু যে নার্ভ নষ্ট করে সে জন্য নয়, এরা blood pressureএরও অনেক খারাপ করে।

বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যায় কয়েকটী ঔষধ

আজ কাল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অতি সামান্য পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে। তাহাদের অবসাদ ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয় যে, তাহাদের দেহে প্রকৃত জীবনী শক্তি নাই। তাহাদের এই অবসাদের মূলে দেহের যে দীনতা আত্ম গোপন করিয়া রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করে কে? পরিপাকের অভাবে প্রায় সকলেরই শরীর ক্রমে ক্রমে এত জীর্ণ হইয়া পড়ে যে, অতি সাধারণ খাদ্যও তাহারা তখন হজম করিতে পারে না। ইহার ফলেই ক্রমশঃ অম্বল, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অবসাদ প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং দেহকে যৌবনেই জরাজীর্ণ করিয়া ধ্বংশের পথে নিয়া যায়। সচরাচর আমরা যাহা খাই তাহাতে "ভাইটামিন" থাকেনা বলিলেই চলে। বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে যাহাতে "ভাইটামিনের" পরিমাণ বেশীর ভাগ আছে, যেমন, দুগ্ধ, ঘৃত, জীবিত মৎস্য ইত্যাদি তাহা দৈনন্দিন খাদ্যে গ্রহণ করাও সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দেহকে পরিপুষ্ট রাখিতে হইলে "ভাইটামিন" নিতান্ত আবশ্যক। ইহার অভাবেই যত জটিল রোগের সৃষ্টি—হইয়া থাকে। এই কারণের বেঙ্গল ইমিউনিটি লেবরেটরীর বহুদর্শি চিকিৎসকগণ বহু গবেষণায় 'ভাইটামিন' পূর্ণ "রেডিয়েটেড্ মল্ট" নামক একটী উপাদেয় খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু। সর্ব্বাবস্থায় সকলেই উহা খাইতে পারে। ইহা মল্ট একষ্ট্রাক্ট, ইরাড্রিয়েটেড কলেষ্টারিণ, ইষ্ট প্রভৃতি সম্বলিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত শ্রেষ্ট ভাইটামিন খাদ্য।

যাহারা ভাইটামিনযুক্ত আহার্য্য গ্রহণে অক্ষম তাহাদের পক্ষে "রেডিয়েটেড মল্ট" (Radiated Malt) একান্ত ব্যবহার্য্য। ইহা শরীরের গ্লানি নিবারণ করে, এবং উপরোক্ত কারণে ক্ষয় প্রভৃতি যে সব দুরারোগ্য রোগ জন্মিতে পারে তাহাদের আক্রমন হইতে শরীরকে রক্ষা করে। শিশুদিগের এবং দুর্ব্বল মাতারও ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ 'ভাইটামিন' শুধু জননীকেই স্বাস্থ্যবতী করে না উপরন্তু রমনীর স্তন্যদুগ্ধের সহিত উহা শিশু শরীরে প্রবেশলাভ করিয়া তাহারও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে।

উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেহের শক্তি অন্তর্হিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই শক্তিহীন দেহ সংসার সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যায়। এই অভাব দূরীকরণার্থ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রমে 'ভাইনোমল্ট' (Vinomalt) নামক একটী উপাদেয় ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ব্যবহার করিলে দেহে শক্তি ও মনে আনন্দ উপস্থিত হয়।

সকল প্রকার গুরুতর রোগের পরিণামে রক্তহীনতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঠিক সময় মত ধরা না পড়িলে এই রোগ যখন ক্রমশঃ জটিল হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর কোন ঔষধেই কাজ করে না। সম্প্রতি এই লেবরেটরী "হিমো-লিভারেক্স" (Haemo-Liverex) নামক একটী ঔষধ বাহির করিয়াছে। বহু বিখ্যাত চিকিৎসকগণের অভিমত যে; রক্তহীনতায়, ইহা একটী অমোঘ ঔষধ।

রক্তহীনতা ও তৎসহ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বাল্যের খাদ্যাভাব জনিত ক্ষীণতা, দীর্ঘকালস্থায়ী ফুস ফুসের রোগ, বেরি বেরি ও খাদ্যাভাব জনিত দুর্ব্বলতা, কর্ম্মে অনাশক্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ প্রভৃতি অবস্থায় এই কোম্পানীর প্রস্তুত "রেডিও হিমোজেন" নামক ঔষধটী বিশেষ কার্য্যকরী।

বিবিধ

স্যার বসন্তকুমার মল্লিকের মৃত্যু

বিলাতের ২রা অক্টোবর তারিখের সংবাদ যে, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার বসন্ত কুমার মল্লিক হঠাৎ বিলাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্যার টমাস লিপটন—যাঁহারা চা খান তাঁহাদের নিকট লিপটনের নাম অপরিচিত নহে। সেই কর্ম্মবীর, যাঁহার চায়ের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য স্বরূপ পৃথিবীতে ৭০০ দোকান রহিয়াছে ও যিনি সুসজ্জিত দ্রুতগামী প্রমোদ-পোত (yacht). সম্পর্কীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন, মৃত্যুকালে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড (চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড) রাখিয়া গিয়াছেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মহাশয় মর্ম্মর প্রস্তর অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিমূর্ত্তির ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছেন; ইহা চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে প্রতিষ্ঠিত হইবে ও ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য কলিকাতার ভাস্কর স্যালসিকসিওনি কোম্পানির হাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা তামা ও টিন সংমিশ্রণে—'ব্রঞ্জ' নামক ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। উক্ত প্রতিমূর্ত্তির অনুকৃতি বা নমুনা একজন বাঙ্গালী ভাস্করের কৃতিত্ব। ইহা ইটালি হইতে প্রস্তুত হইয়া নবেম্বর মাসে আসিবে বলিয়া আশা করা যায় ও ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিমূর্ত্তিটী লর্ড ডাফারিন্‌এর প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবে।

মহাত্মাজীকে বিলাতে তাঁহার জন্মদিনোপলক্ষে ৫৭৫ পাউণ্ডএর একটি থলে দেওয়া হইয়াছে ও তিনি তাহা বয়ন কার্য্যে ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন।

সঙ্কটত্রাণ-সমিতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় অধীনে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে—এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তুলিয়াছেন।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ লীলাবতী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক গত বুধবার ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে বস্ত্রে কেরাসিন তৈল দিয়া অগ্নিসংযোগে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। ইনি ভারত শিল্পমন্দিরের ম্যানেজার শ্রীশচীনন্দন অধিকারীর স্ত্রী ও তিনটী সন্তানের মাতা।

উড্ডীয়মান স্বর্ণ—গত দুইমাসের ভিতর প্রায় সাত লক্ষ তের পাঃ স্বর্ণ বিলাতে রপ্তানি হইয়াছে। যাহাতে বেশী দেরী না হয় তজ্জন্য এই রপ্তানি বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার মূল্য দুই কোটী টাকার উপর ও আরও স্বর্ণ রপ্তানি করিবার কথা চলিতেছে।

জে, এম, সেনগুপ্তের ভিনিস্ যাত্রা— চিকিৎসকদিগের পরামর্শানুযায়ী জে, এম্, সেনগুপ্ত মহাশয় ভিনিস্ যাইবেন। তথা হইতে সুস্থ হইয়া বিলাত আসিবেন ও আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে মহাত্মা গান্ধীর সহিত ফিরিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ করুণা চট্টোপাধ্যায়— আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বেলগেছিয়ার কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজে ডাঃ করুণা কুমার চট্টোপাধ্যায় লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ক্লিনিকাল ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় অধ্যাপক হইয়াছেন। ডাঃ চাটার্জ্জি আমাদের একজন বড় দরের অস্ত্র বিশারদ ও ২৫ বৎসরের বেশী অস্ত্রশাস্ত্রে অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার গ্রীষ্মদেশ সংবলিত অস্ত্র বিদ্যা (Tropical Surgery) সম্বন্ধীয় পুস্তক ঐ বিষয়ের একটী অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। ছাত্রদের শিক্ষার যে বিশেষ সুবিধা হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

আশ্চর্য্যজনক অসামান্য ঘটনা

মজঃফরপুরের ঈশান দিকে ২০ মাইল দূরে বাজীদপুর গ্রামে একটী আশ্চর্য্যজনক ও অসামান্য ঘটনা চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে ঘটিতে খপর পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্রগ্রহণের সময় গভীর রাত্রে ক্ষুদ্র মজা নদীর বদ্ধ জল হইতে প্রায় ১০,০০০ মৎস্য উঠিয়া ৫০ফুট শুষ্ক ভূমি বাহিয়া 'বারেলা চর' নামক একটী প্রকাণ্ড স্বচ্ছ হ্রদে লাফাইয়া পড়ে। কোন মৎস্যটী পনের সের ওজনের কম নহে।

৩০ মাইল সন্তরণে প্রতিযোগীতা

১৭ জনের মধ্যে ১১ জন শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। প্রাতে ৭।১৬ মিনিটে আরম্ভ হয় ও তন্মধ্যে আহিরীটোলা ক্লাবের সুধীর কুমার ঘোষ ১।৫।৩০ সেকেণ্ডে পৌঁছায় ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ই, আই, আর) সুকুমার চন্দ্র ঘোষ (শশ্মানেশ্বর) শেখ সুলেমান (যুথভ্রষ্ট) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা

মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

"আমাদের দেশের উপর সবচেয়ে যে বড় শত্রু প্রভুত্ব করিতেছে, তাহা হইতেছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জাতিভেদের গোঁড়ামী ও ধর্ম্মের অন্ধতা। সমুদ্রপারের যে প্রভুত্ব বিদেশীদের মধ্য দিয়া আমাদের উপর শাসন করিতেছে, এই সমস্ত অজ্ঞতা ও সংস্কারের বিদ্বেষ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোরতর। এই সমস্ত অমঙ্গলের যতদিন মূলোচ্ছেদ না হইবে, ততদিন আমরা ভোটের অধিকার ও সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় যতই বিবাদ করি না কেন, প্রকৃত স্বাধীনতা আমরা কিছুতেই পাইব না। মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে এক নবতর জীবনের শক্তি এবং স্বাধীনতা লাভের এক দৃঢ়তর সঙ্কল্পের সাহস দিয়াছেন —আজ সেই গান্ধীজীর জন্মতিথিতে আমাদিগকে এই কথাগুলিই স্মরণ রাখিতে হইবে। অবশ্য আমরা অনুভব করিতেছি যে মহাত্মাজী তাঁহার ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঔদাসিন্য ও আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের পথে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা একান্তভাবে তাঁহারই সৃষ্ট আন্দোলন; তথাপি আমরা আশা করিতেছি যে, সমগ্র জাতির নিদ্রিত মনের এই জাগরণের ফলে

ভারতকে সমস্ত সামাজিক দুর্গতি হইতে উদ্ধারের সাহায্য করিবে এবং ভারতের পূর্ণতা লাভের পথে যে বাধা আছে, তাহা দূর হইয়া যাইবে।”

লণ্ডনে মহাত্মাজীর জন্মতিথি

মহাত্মাজীর জন্মতিথির প্রাক্কালে ইংলণ্ডস্থিত ভারতবাসীগণ মহাত্মাজীকে একটী জনসভায় অভিনন্দিত করেন এবং তাঁহাকে ৫৭৫ পাউণ্ড উপহার দেন।

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ভারতের জন সাধারণ ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কে কত সদস্যপদ পাইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে না। কি করিয়া তাহারা অনশনে মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় উহাই তাহাদের চিন্তার বিষয়।

বিবেকানন্দ মিশনের নবমন্দির-প্রবেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ, বিবেকান্দ মিশন ও বিবেকানন্দ লাইব্রেরী মিশনের নবক্রীত মন্দিরে, ৮।২নং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ (বাগবাজার ট্রাম ছাড়িবার পার্শ্বে রামকৃষ্ণ লেনের উত্তর সীমায়) ঠিকানায় শুক্রবার ১৫ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর স্থানান্তরিত হইয়াছে। মঠের ভক্তগণ, মিশনের সভ্যগণ ও বন্ধুবান্ধবগণ স্থান পরিবর্ত্তনটীর বিষয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক লক্ষ্য রাখিবেন।

স্বাধীনতার সঙ্কল্প

নিখিল ভারত কংগ্রেস লীগের অভিনন্দনের উত্তরে গান্ধীজী বলেন,—স্বাধীনতার সাধনায় ভারত তাহার শাসকদের রক্তপাত করিতে চাহে না। কিন্তু আমি একথা বলিবই যে, স্বাধীনতার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সে নিজের রক্ত ঢালিয়া গঙ্গানদী বহাইতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহাতে সভ্য গ্রহণ করা হইতেছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে বহুলোক সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। যদি কেহ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট ফরম পূর্ণ করিয়া এবং ৫৲ টাকা চাঁদা দিয়া সভ্য হইতে হইবে। ইহাদ্বারা জন্মোৎসব উপলক্ষে কতকগুলি সুবিধা ও সুযোগ লাভের অধিকারী হইতে পারা যাইবে।

সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার ফরম ও সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাইবে এবং উৎসবের কার্য্যক্রম সম্বলিত সচিত্র স্মারকলিপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে পাওয়া যাইবে :—

শ্রীযুত অমল হোম, যুগ্ম সম্পাদক “রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান পরিষদ” সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা।

মহাত্মাজীর উক্তি

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিপীড়ন করিবার অপরোধে আমি ভারতের দরিদ্রতম ধাঙ্গড়ের ও দরিদ্রতম অস্পৃশ্যের কাছে হাঁটু অবনত করিতে ইচ্ছুক। এমন কি আমি তাঁহার পায়ের ধুলা মুছিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি যুবরাজের কাছে দূরে থাকুক স্বয়ং মহামান্য সম্রাটের কাছেও দণ্ডবৎ

হইতে প্রস্তুত নহি। উহার একমাত্র কারণ এই যে তিনি ক্ষমতামদদৃপ্তের প্রতীক। আমি নিজে হস্তি-পদতলে পিষ্ঠ হইব, কিন্তু তাঁহার কাছে দণ্ডবৎ হইব না। তবে আমি যদি অজ্ঞাতে একটি পিপীলিকাকেও পিষ্ট করি তাহা হইলে আমি তাহার কাছেও দণ্ডবৎ হইতে প্রস্তুত আছি।

কাবুলে স্বাধীনতা দিবস

গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে কাবুলে চরম জুজরীতে আফগান স্বাধীনতা দিবস উৎসব হয়। আফগান-রাজ নাদির সা তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় জাসানের ইতিহাস বিবৃত করিয়া আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক অবস্থার আলোচনা করেন এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা সাধারণকে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বলি দিতে বলেন।

নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলন

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ৩০শে আগষ্ট রবিবার দিবস সকাল ৭ ঘটিকার সময় (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন।

ঐ দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মফস্বলের ও কলিকাতার বহু বাড়ী, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল।

শ্রীহট্টে বজ্রাঘাত

গত রবিবার সন্ধ্যায় রবির বাজারে (শ্রীহট্ট) ৮ জন লোক বজ্রাঘাতে আহত হয়। তন্মধ্যে ৪ জন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। অবশিষ্ট ৪ জনকে পৃথিমপাশা ডিস্পেন্সারীতে পাঠান হয়। তাহারা সেখানে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

১১ মণ ৭ সের ওজনের সাপ

এক পাহাড়ে সাপ সম্প্রতি বন্যার সময় পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া কান্দী হিজল বিলে এক আস্ত শৃগাল ভক্ষণ করিতেছিল। শৃগালের চীৎকারে লোক জড় হয় এবং শ্রীযুক্ত এম রায় গুলী করিয়া সর্পটিকে মারিয়া ফেলেন। প্রকাশ সাপটির ওজন ১১ মণ ৭ সের।

টাটানগরে ভারতীয় নিয়োগ

বাজার মন্দা পড়ায় জামসেদপুর টাটার কারখানায় ইউরোপীয় লোকদের স্থানে ভারতীয় নিয়োগ করার ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাত হইতে চুক্তি করিয়া আনা হইয়াছে এমন ২৪ জনকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রেলকর্ম্মচারীর আত্মবলী

শঙ্কর নামক একটা সামান্য রেলকর্ম্মচারী রেলের দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিত। মইমনসিংএ উক্ত কর্ম্মচারী যখন ষ্টেশনের বাহিরের ফটক বন্ধ করিয়া রেলগাড়ী আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল ইত্যবসরে একটা পঞ্চমবর্ষীয় বালক ফটক গলিয়া ইঞ্জিনের সম্মুখস্থ হয়; শঙ্কর তৎক্ষণাৎ নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া ঐ বালকটাকে রেল লাইন হইতে কোনপ্রকারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় ও বালকটার জীবন রক্ষা করে। বালকটাকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে রীতিমত ভাবে আহত হয় ও হাঁসপাতালে নীত হয়; হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়ার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ধন্য শঙ্কর! তুমি মরিয়াও আজ জগতের নিকট অমর।

পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 'বরণ'
প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ
'কেশরঞ্জন'
চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধালয়

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি

(সত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বটকৃষ্ণ পালের
এডওয়ার্ডস টনিক
য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল স্পেসিফিক।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

সম্পাদক — ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ., বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা

বাঙ্গলার সঙ্গীতবিষয়ক একমাত্র মাসিক

(৮ম বর্ষ—১৩৩৮)

সম্পাদক ঃ—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাঃ কালিদাস নাগ।

ঘরে বসিয়া বিনা ওস্তাদে সকল প্রকার গীতবাদ্য শিখিবার উপযুক্ত এমন মাসিক আর নাই। ইহাতে প্রতিমাসে সকল প্রকার যন্ত্রের শিক্ষোপযোগী বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল, তেলেনা, আখোর সহ কীর্ত্তনের পদাবলীর স্বরলিপি ও আধুনিক বাঙ্গলা গানের এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দী গানের তান, লয়, বাঁট, জাতি, ঠাট ও সময় প্রভৃতি নিরূপণ পূর্ব্বক স্বরলিপি নিয়মিতভাবে বাহির হইতেছে।

বার্ষিক মূল্য ৩৸৹ প্রতি সংখ্যা ।৶৹

কর্ম্মকর্ত্তা

৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

নবম বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৩৮। [১০ম সংখ্যা

শিশু-মঙ্গল

(রমেশ শর্ম্মা)

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সুমাত্রা, জাবা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ। এই সব দ্বীপের ঠিক দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া। এই অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিউজিলাণ্ড দ্বীপ। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ১০½ লক্ষ। ইহা ইউরোপীয় জাতীর একটী উপনিবেশ। এখানে শিশুদিগের লালনপালনের জন্য কিরূপ যত্ন লওয়া হয় আজ তাই বলিব। জাতির ভবিষ্যৎ গৌরব বর্দ্ধিত করিতে হইলে, শিশুর সর্ব্ব প্রকারে উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই দিকে বেশ লক্ষ্য পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এখনও ঐ বিষয়ে তেমন মনোযোগী হন নাই। সহরে দুই চারিটী বেবী ক্লিনিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী মাতাপিতাগণের সেই দিকে বিশেষ ঝোঁক নাই; পরন্তু কর্পোরেশন হইতে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে দেশবাসীগণের তেমন সুযোগও নাই।

নিউজিলাণ্ডে বালকবালিকাগণ যে কেবল মাতা-পিতার আদরের ধন, তাহা নহে, তাহারা দেশের, জাতির মহা মূল্যবান সম্পত্তি। এই জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি সবিশেষ মনোযোগী; শিশুর লালন পালন গবর্ণমেণ্টের একটী সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব।

আমাদের দেশের ন্যায়, সেখানেও শিশু জন্মিলে, আপীসে তাহাদের জন্ম তারিখ, মাতাপিতার নাম ইত্যাদি লিখিয়া রেজিষ্ট্রী করিতে হয়—এই নিয়ম বাধ্যতামূলক। সমগ্র নিউজিলাণ্ডে একটী প্রধান নারী এবং শিশু-মঙ্গল সমিতি আছে। ইহা ১৯০৭ খৃঃ স্থাপিত। দেশবাসী কর্ত্তৃক ইহা পরিচালিত। এই সমিতির অধীনে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে একটী প্রধান

শিশু-মঙ্গল নার্স (ধাত্রী) আছেন। কোন ডিষ্ট্রিক্টে শিশু জন্মিলেই, আপীস হইতে গোপনে ঐ প্রধানা নার্সের নিকট তাহার বিবরণ পাঠান হয়। সমস্ত শিশুর মাতাকেই এই নার্সের উপদেশ মত নিজ নিজ শিশুর লালন পালন করিতে হয়। আবশ্যক হইলে মাতা নিজ শিশুকে লইয়া, এই নার্সের উপদেশ লইয়া আইসেন। প্রধান সমিতি হইতে শিশুপালনের সব নিয়মাবলী ছাপা হইয়া বিতরিত হয়। সকলেই ঐ সব নিয়মমত শিশু পালন করেন। ঐ প্রধান সমিতি মাতাদিগকে বিশেষরূপ শিশু পালনের ব্যবস্থা শিক্ষা দেন ; যাহাতে শিশুগণ স্বাস্থ্যবান হয়।

তাঁহাদের প্রণালী অতি সরল।

১। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিশুগণকে খাওয়াইতে হইবে।

২। তাহাদিগকে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে দিতে হইবে।

৩। আত্মীয় স্বজন শিশুকে আদর সোহাগ করিয়া ঘাঁটিতে পারিবেন না। অনেক ঘাঁটা ঘাঁটিতে দুর্ব্বল শিশু আরও দুর্ব্বল হয়, সবল শিশুরও স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৪। মাই ছাড়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সমিতি মা এবং শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেন। শিশু এক বছরের হইলেই প্রায় মাই ছাড়ে।

তারপর পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। আমাদের দেশেও পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি দেওয়া হয়। স্কুলে, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক লেডি ডাক্তার এবং নার্স নিযুক্ত আছেন। শিশুগণের স্বাস্থ্য তাঁহারা পরীক্ষা করেন। স্বাস্থ্যবান শিশুও দাঁত, গলা, চক্ষু, নাক ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় ; কাহারও বা মেরুদণ্ড বাঁকা দেখা যায়। এই বিষয় শিশুর মাতাপিতাকে জানান হয় এবং তাঁহারা পারিবারিক চিকিৎসকের দ্বারা নিজ নিজ শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকাদি দেশে পারিবারিক চিকিৎসক থাকেন। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে তাঁহারা পরিবারের লোকদিগের স্বাস্থ্য এবং মনের ভাবের বিষয় জানিবার বিশেষ সুযোগ পান। নিত্য নূতন ডাক্তার গৃহের লোকের পূর্ব্ব স্বাস্থ্যের বিষয় কিছুই জানিতে সুযোগ পাইবেন কি করিয়া? এই জন্য বেশ উপযুক্ত চিকিৎসক প্রত্যেক পরিবারে ঠিক রাখা ভাল। আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহারা অন্য চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন।

বিশেষ পরীক্ষিত প্রণালীতে শিশুগণকে প্রত্যহ শরীর চালনা করিতে হয়। শিক্ষকগণ খেলা এবং ব্যায়াম বিষয়ে উপদেশ দেন।

নিউজিলাণ্ড বিষুব রেখার (Equator)এর ৪০° ডিগ্রির মধ্যে সুতরাং এখানে গ্রীষ্ম বেশী হইবার কথা। এখানে শীতকালে শিশুদিগকে, দুপুর বেলা গরম কোকো, দুধ বা সুপ (Soup) দেওয়া হয় ; কিন্তু চা, কফি দেওয়া হয় না ; কারণ এইগুলি অত্যন্ত ক্ষতিজনক পানীয়। চা পরীক্ষা করিয়া কি কি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে দেখ—

শতকরা ২ ভাগ—থিন (Theine)

,, ১৫ ভাগ--ট্যানিন্।

,, ৪ ভাগ—পাতলা তৈল পদার্থ (Volatile oil). থিন, কেফিনের ন্যায় একটী ক্ষার পদার্থ ; ইহা কেফিনের ন্যায় উত্তেজক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ জন্মায়।

ট্যানিক এসিড অত্যন্ত সংকোচক, অর্থাৎ

ইহার জন্যই চা পানকারীগণের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ হয়। ইহা পেপছিনকে উত্তেজিত করে এবং এলবুমেনকে ড্যালা পাকায়। মোট কথা ইহা হজম কার্য্যের ব্যাঘাত করে এবং রক্তহীনতা জন্মায়।

পাত্‌লা তৈল পদার্থ, ডিজিটিলিসের ন্যায় নিদ্রা নষ্ট করে।

কাফিও অত্যন্ত অনিষ্টকারী। ইহাতে—

শতকরা ৭৫ ভাগ কেফিন।

" ৫·০ ভাগ ট্যানিন।

" ১৩·০ ভাগ পাতলা তৈল পদার্থ (Volatile oil) আছে। ট্যানিন এবং পাত্‌লা তৈল জাতীয় পদার্থের অনিষ্টকারীতার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন কেফিনের কথা বলা যাউক। ইহা ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ কমাইয়া আনে। চা অপেক্ষা কাফিতে তিন গুণ বেশী পাতলা তৈল পদার্থ আছে। ইহা কেফিন অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী। এই জন্য চা অপেক্ষা কাফি অধিক ক্ষতিকারক। কাফি অধিক খাইলে, হজমশক্তি নষ্ট করে, মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, স্নায়বিক অস্থিরতা আনয়ন করে এবং অনিদ্রা আনে। ক্ষণিক উত্তেজনার পরই, দেহে অবসাদ আসে।

কোকোতে খাদ্যপদার্থ আছে এবং চা ও কাফির ন্যায় অনিষ্টকারী নহে। এইজন্য নিউজিলাণ্ডে ছেলেমেয়েদিগকে শীতকালে, চা, কাফি না দিয়া কোকো, দুধ বা সুপ দেওয়া হয়।

আমাদের পার্কে পার্কে আজকাল শারিরীক ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে; নিউজিলাণ্ডে বেশ শিক্ষিত ব্যক্তির অধিনে ছাত্রগণ খেলা ধূলা বা ব্যায়াম করে।

গ্রীষ্মের সময় সুদক্ষ মেয়ে ডাক্তার এবং নার্সের অধিনে ছাত্রগণ ১৫ দিন বাহিরে ক্যাম্পে কাটায়। এই সময় তাহাদিগকে গ্রীষ্ম ঋতুর উপযোগী বিশেষ খাদ্য দেওয়া হয়, শরীর চালনা করান হয় এবং রৌদ্র গ্রহণ করান হয় (Sun-bathing)। ইহাতে তাহাদের বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি দেখা যায়।

সুদক্ষ ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে স্কুল গৃহগুলি স্বাস্থ্যকর করিয়া তৈয়ার করা হয়। খোলা বাতাসে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল, তাহাতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য এত ভাল হইয়াছিল যে এখন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিভাগ খোলা বাতাসে স্কুলের বন্দোবস্তে মনোযোগী হইয়াছেন।

মনেপড়ে সেই ঋষিযুগের কথা তপোবনে, শান্ত শিষ্ট, সংযত, সুবিদ্বান আচার্য্যগণের সহবাসে ভারত-বাসী জ্ঞানে, গুণে, কর্ম্মে ও সচ্চরিত্রতায় কেমন পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিত।

আজকাল অস্বাস্থ্যকর গৃহে, বড় সহরে, ছাত্রগণ কি আর স্বাস্থ্যবান হইতে পারে?

ক্রমশঃ ছাত্রগণ বড় হইলে, শিক্ষক দৈনিক শরীর চালনার প্রণালী সব শিক্ষা দেন এবং ঐ সকলের উপকারিতা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রতি বৎসর ছাত্রগণের ওজন লওয়া হয় এবং তাহাদের উচ্চতা এবং বক্ষঃস্থলের প্রশস্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে ব্যায়াম দ্বারা কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং উহা খাতায় লিখা হয়। ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-হানীর বিশেষ কোন কারণ থাকিলে, শিক্ষক সে সমস্ত জানিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। ছুটীর সময় প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্টের ছাত্র-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণ, নানা ভাবে ছাত্রগণকে সৎশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে শিশুকাল হইতেই

শারিরীক উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি বিধানেরও অত্যন্ত প্রয়োজন।

মনে পড়ে সেই ভারতের গৌরবময় যুগের কথা যখন ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন, যম নিয়ম এক সঙ্গে সাধন করিতেন। এই ভাবেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইত।

সহরে ও গ্রামে কেমন করিয়া স্বাস্থ্যকর উপায়ে থাকিতে হয়।

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্।

(I) বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা—(CLEANLINESS OF HOUSE)

(১) বহির্ব্বাটীতে (Out-house) প্রত্যহ জল ছিটাইয়া, ঝাঁটা দিতে হয়। শুক্‌না আবর্জ্জনাগুলি—দূরে আঁস্তাকুঁড়ে ছাই চাপা দিয়া দিতে হয়; অথবা পোড়াইতে বা গর্ত্ত করিয়া প্রত্যহ পুতিয়া ফেলিতে হয়। পশু বাঁধা থাকিলে, নিত্য সে যায়গাটি একাধিকবার ধুইয়া, ফিনাইল ঢালিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। বাঁশ প্রভৃতি বাজে জিনিষগুলিকে—একটু যায়গা চৌরস করাইয়া, তাহার উপরে ইট বিছাইয়া, অথবা মাচা করিয়া, সেখানে সাজাইয়া রাখিবে।

আগাছা জন্মিলে, তাহা উপড়াইয়া, খানা-খোঁদল থাকিলে, তাহা ভরাট করিয়া, জমিটিকে সমতল করান কর্ত্তব্য।

(২) বাড়ীর পিছনাংশে—অথবা, অপরের ও নিজের বাড়ীর মধ্যস্থলে, সরু গলি বা নর্দ্দমা বা মেথর খাটিবার রাস্তাগুলি—সযত্নে ও নিত্য পরিষ্কার রাখিতে হয়। বাড়ীর পিছনাংশে—আঁস্তাকুঁড় করিতে ঘুঁটে দিতে, গোবর জমাইতে বা অদরকারি জিনিষ ফেলিয়া রাখিতে নাই।

(৩) অন্দরে (Zenana):—নিত্য, ঘরের আস্‌বাব ও দরজা-জানালা প্রভৃতির ধূলা মুছিয়া ঘর দালান প্রভৃতি (বিশেষ করিয়া, কোণগুলি), পরিষ্কার করান চাই। ধূলা বেশী থাকিলে, জলের ছিটা দিয়া ঝাঁট দেওয়া কর্ত্তব্য; পরে, ফিনাইলের জলে মেঝে মোছা উচিত। শয়ন গৃহ, পাকশালা ও ভাঁড়ার, প্রত্যেকটির জন্য, স্বতন্ত্র ঝাঁটা ও ঝাড়ন থাকা উচিত। ঘরের মেঝে-মোছা ন্যাতাটি মধ্যে মধ্যে সাবান জলে ফুটান আবশ্যক। ঘরের পাপোঁছ, বাড়ীর বাহিরে, দূরে লইয়া গিয়া, প্রত্যহ ঝাড়িয়া আনিতে হয়। সপ্তাহে একদিন, ঘর ও দালানের ঝুল ঝাড়া ও সকল ঘরের সমস্ত জিনিষ সরাইয়া, সেই সব যায়গা ঝাঁট দিলে মশার ও মাকড়সার উৎপাত থাকে না। মাসে একবার সমস্ত ঘর চুণকাম করান ভাল।

ঘরের দেওয়ালে বা মেঝেতে—থুথু, গয়ার ফেলিতে; বা তক্তাপোষ প্রভৃতির গায়ে—সিকনি

মুছিতে নাই। তক্তাপোষের নীচে, অথবা বাড়ীর পাশের গলিতে, অথবা জানালার ঠিক নীচেই, ফলের খোসা, এঁটো পাতা, পানের ছিবড়া প্রভৃতি যা' তা' ফেলিতে নাই। কচি ছেলেদিগকে বা পালিত জীব জন্তুকে যেখানে-সেখানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতে দিতে নাই। যেখানে-সেখানে নিজেরা আঁচাইতে বা প্রস্রাব করিতে নাই, এবং বাটীর ভিতরে কোথাও এমন কি ক্ষণেকের জন্যও, আঁস্তাকুঁড় করিতে দিতে নাই।

(II) বাড়ীর ময়লা ফেলা—
(REFUSE DISPOSAL)
(A) IN VILLAGES

(১) Dry Refuse—তরকারীর খোসা, মাছের কাঁটা, এঁটো প্রভৃতি "শুক্‌না" ময়লা, সদর বা খিড়কী দরজার পাশে জমাইলে, মাছির উৎপাত বাড়ে; কাক, কুকুর বা বিড়াল তাহা ছড়াইয়া দেয় এবং কতক কতক বাড়ীর ভিতরে আনিয়া ফেলে। এইজন্য বহুদূরে, একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে, ঐ আবর্জ্জনা ফেলাইয়া,—প্রত্যেকবার আবর্জ্জনার উপরে ছাই বা ঝুরা মাটী চাপা দিবে। অথবা নিত্য উহাদিগকে পোড়াইবে। গোবর ও চোণা বা অপর পশুর বিষ্ঠা—যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ী হইতে দূরে গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া, শুক্‌না মাটী বা ছাই চাপা দিবে।

যদি বারম্বার বাহিরে ময়লা ফেলিয়া আসিবার সুবিধা না থাকে, তবে বাড়ীর ভিতরে, একটা বালতিতে শুক্‌না ময়লা জমা করিয়া, বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে; পরে ঐগুলি পোড়াইবে বা পুঁতিবে।

(২) Sullage Water—বাড়ীর ভিতরের উঠানের মাঝখানটা উঁচু ও চারিপাশ ঢালু করিয়া বিলাতি মাটী দিয়া বাঁধাইয়া দিবে। বাড়ীর ভিতরে পাতকুয়া না থাকাই ভাল; যদি থাকে, তাহার চারিদিক ঢালু করিয়া বাঁধাইয়া দিবে। এরূপ করিলে বৃষ্টির, রান্নাঘরের, বাসনমাজা, কাপড় কাচা, স্নান করা প্রভৃতির জল, বাঁধান নর্দ্দামা দিয়া বাড়ীর বাহিরে সরকারী নর্দ্দামায় আসিয়া পড়িবে।

(৩) Kutcha Public Drains:—গ্রামের সরকারী কাঁচা নর্দ্দামাগুলির না থাকে ঢালুর ঠিক, না থাকে পাড় আস্ত। উহাদের গায়ে বা পাড়ে গাছ জন্মায়, ইন্দুর প্রভৃতিরা গর্ত্ত করে, এবং নর্দ্দমার তলায় পলি পড়ে। তাহা ছাড়া, লোকরা সেই সরকারী নর্দ্দমায় যাহা-তাহা ফেলে; কাজেই, ঐ নর্দ্দমাগুলি ভরাট হইয়া যায়, বা এলোমেলো ভাব ধারণ করে বলিয়া, তাহাতে স্রোত বহে না। কাযেই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ময়লা পচে ও মাটীতে শোষিয়া লোকদের বাড়ীর ভিতে বসে। প্রত্যেক গৃহস্থ, নিত্য নিজ বাড়ীর সম্মুখের নর্দ্দমায়, দু'চার ঘড়া জল ঢালিলে; এবং সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে, একবার নিজ নিজ মেথর দিয়া, তাহা হইতে আগাছা উপড়াইলে, ইন্দুর-গর্ত্ত ভরাট করাইলে ও "পাঁক" উঠাইলে, নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(৪) পায়খানা, Latrine, Privy:—মলত্যাগের জন্য পাড়াগাঁয়ে তিন রকমের ব্যবস্থা দেখা যায়:—

(অ) মাঠে মলত্যাগ।—মিউনিসিপ্যালিটি নাই, এমন গ্রামে, বাগানে বা ক্ষেতে মলত্যাগ করিতে হইলে, জলাশয় এবং বসত বাড়ীর বহুদূরে, ও পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক ছাড়িয়া, করা যাইতে পারে। এলোমেলো

ভাবে মলত্যাগ করিলে, দুর্গন্ধ ও মাছির উৎপাত হয় এবং ধূলার দ্বারা রোগ বিস্তার ঘটে। একারণ, একটি খায়গা ঘিরিয়া, তাহার ভিতরে, কয়েক হাত লম্বা, আট-দশ ইঞ্চি চওড়া ও এক হাত গভীর একটা গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহাতেই মলত্যাগ করিবে। এবং মলত্যাগান্তে, শুক্‌না মাটী গলে চাপা দিবে। একটি গর্ত্ত ভরাট হইয়া গেলে, তাহার পাশে আর একটি ঐ রকমের গর্ত্ত করিয়া, তাহাতেই মলত্যাগ করা যাইতে পারে। পরে, এই মাটী উঠাইয়া, ক্ষেতে সার স্বরূপ দেওয়া চলে। [রাত্রি কালে, কচি ছেলে ও পীড়িতদের মলমূত্র একটি আল্‌কাৎরা মাখান মাটীর অথবা পিতলের গামলায় ধরিয়া, ঘরের বাহিরে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পরদিন সকালে, সেই মলমূত্র বাটী হইতে বহুদূরে, একটি গভীর গর্ত্তে ফেলাইয়া, মাটী চাপা দেওয়াইবে।]

(আ) মেথর-"খাটা-পায়খানা।"—যে গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেখানে, পাতকুয়া ও পুকুর হইতে বহু দূরে, বাড়ীর পিছন দিকে, এক প্রান্তে, ইহা করিতে হয়। ইহার ছাদ করিবে; নতুবা বৃষ্টির জলে মেঝেতে ময়লা বসিবে। পায়খানার মেঝে, ও ময়লার গামলা থাকিবার যায়গা—এই দুইটি পাকা করিবে; নতুবা, মেঝেতে ময়লা ও জল বসিবে। মেথর খাটিবার দরজাটি—ভাঙ্গা অথবা খোলা থাকিলে, ইন্দুর, মাছি, শূকর, কুকুর প্রভৃতির উৎপাত বাড়ে। মল এবং মূত্র ও শৌচের জলের (sullage water) দুইটি স্বতন্ত্র, বড় গামলা রাখা উচিত, যাহাতে, কখনো দুইটির একটি গামলাও উপছিয়া না যায়। পায়খানার গামলার মল,—গাথায় করিয়া ঢাকা-বালতি সাহায্যে; অথবা, ঢাকা, ময়লা-ফেলা night soil cart দ্বারা মেথররা গ্রামের প্রান্তে, কোনও নির্দ্দিষ্ট মাঠের গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিবে। এরূপ মাঠকে trenching ground বলে। পরে, এই মাঠ বা মাঠের ঐ মাটী, চাষ-আবাদের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটির উক্তরূপ সুব্যবস্থা না থাকিলে গৃহস্থ কর্ত্তৃক, বাড়ী হইতে বহুদূরে, কোন ক্ষেতে সাররূপে ঐ ময়লা ব্যবহার করা যাইতে পারে; অথবা বহুদূরে গভীর গর্ত্ত করিয়া উহা পুঁতিয়া ফেলিতে হয়।

(ই) "কূয়া পায়খানা"কে—চিরস্থায়ী করিবার জন্য, অতিশয় গভীর করিয়া, কূয়ার আকারে, প্রস্তুত করা হয়। উহা পরিষ্কার করাও হয় না এবং উহাতে বায়ু চলাচলেরও সুবিধা কম, কাযেই, তাহার ভিতরের জল, মল ও মূত্র চুঁয়াইয়া, নিকটস্থ জলাশয়ে মিশ্রিত হয়; ও দুর্গন্ধে বাটী অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে।

(B) IN TOWNS.

বড় বড় সহরে, মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা দুই রকমে ময়লা স্থানান্তরিত হয়। প্রথম, ছোট সহরে, septic tank দ্বারা; দ্বিতীয়, খুব বড় সহরে, sewer দ্বারা।

(অ) SEPTIC TANK:—দুই কামরাযুক্ত একটি বিরাট, পাকা চৌবাচ্ছার উপরে, বহু পাকা পায়খানা নির্ম্মিত হয়। লোক সংখ্যার উপরে, চৌবাচ্ছার ও পায়খানার আয়তন নির্ভর করে। উপরের পায়খানায়—যতই মল, মূত্র ও শৌচের জল পড়ে, তাহা নিম্নস্থ চৌবাচ্ছায় পড়ে। বিশিষ্ট-জাতীয়-জীবাণু দ্বারা কঠিন-মল তরল করানই সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। এই জীবাণুরা, ব্যবহৃত হইতেছে, এমন সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের চৌবাচ্ছায় থাকে। এজন্য, অপর সেপ্টিক ট্যাঙ্কের জল, এই চৌবাচ্ছায় মিশাইতে হয়। যে জীবাণু দ্বারা কঠিন মল তরল হয়, তাহারা এই ট্যাঙ্কের সমস্ত মলকে আক্রমণ করে

এবং অল্প সময়ের মধ্যে, কঠিন-মল তরল জলে পরিণত হয়। কিন্তু এই চৌবাচ্ছায় চিরকাল মল ধরিবে, এমন আয়তন ইহার হইতেই পারে না। কাযেই, সেপ্টিক ট্যাঙ্কের আর একটি অংশ করিতে হয়—সেটি বড় বড় ঝামাপূর্ণ একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও অনাবৃত চৌবাচ্ছা, জলপূর্ণ চৌবাচ্ছার বাহিরে। যেমন-যেমন বন্ধ-চৌবাচ্ছায় জলীয়াংশ বেশী হয়, তেমনি-তেমনি তাহা উপছাইয়া, ঝামাপূর্ণ এই খোলা-চৌবাচ্ছায় পড়ে। বাহিরের রৌদ্র ও হাওয়া পাওয়ায়, ঐ জলটির দুর্গন্ধ ক্রমশঃ কমে ; ও ঝামার রাশির ভিতর দিয়া যাইবার কালীন, ময়লা-পানীয়-জল যেমন কলসীর ভিতরে ফিল্টার হয়, সেই ভাবে, সেপ্টিক ট্যাঙ্কের ঐ ময়লা-জল স্বচ্ছ, অনেকটা জীবানু-শূন্য ও দুর্গন্ধহীন হইয়া আসে ; তখন ঐ জল ক্ষেতে চালান যায়। যদি সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ঠিক মত কায করে, তবে ঐ জল অনেকটা নিরাপদ হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বড় বেয়াড়া জিনিস—ইহাকে ঠিকমত রাখা খুব বেশী ব্যয় ও শ্রমসাধ্য।

(আ) SEWER—কলিকাতার মত দুই একটি বড় বড় সহরে, মাটীর ভিতরে, একমানুষ বা তদপেক্ষা নীচে, এবং তাহার ভিতর দিয়া হেঁট হইয়া মানুষ চলিতে পারে এমন, খুব বড় বড়, ইটের গাঁথনী-করা পাইপ তৈয়ারি করা আছে। এই নলগুলিকে সূয়ার বলে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর পায়খানায়, syphon pan নামক কাচকড়ার তৈয়ারি গামলা বসান আছে ;—ঐ panএর উপরাংশে, সর্ব্বদাই জল থাকে (water seal) ; ও উহার গাত্র অতীব মসৃণ। কাযেই, মল পড়িবামাত্রেই, উক্ত panএর জলে পড়ে। তাহার পরে, প্রত্যেক পায়খানায় যে জল ঢালিবার cistern (বা ময়লা জলের চৌবাচ্ছা) উপরে বসান থাকে, তাহার হাতল ধরিয়া টানিয়া ছাড়িয়া দিলে, সমস্ত গামলাটি উহার জলে অতীব সুন্দর ভাবে ধৌত হয় ; ময়লাটি বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ panএর নিম্নাংশে আবার খানিকটা জল জমে। উক্তরূপে, বিতাড়িত পায়খানার ময়লা, পরপর সংলগ্ন পাইপের সাহায্যে, সরাসরি ঐ সূয়ারে যাইয়া পড়ে। বাড়া-ঘর ধোয়ানি জল (sullage water), স্নানের ও রান্নার প্রভৃতি জলও (slop water), নর্দ্দমা দ্বারা সরাসরি সূয়ারে পড়ে। এই ভাবে, গৃহস্থের বাড়ীর সকল ময়লাই, সক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সূয়ারে পড়ে। রাস্তায় জল পড়িলে, তাহাও রাস্তার ঝাঁঝরির সাহায্যে, সূয়ারে যায়। সূয়ারে যাতায়াত কালীন কঠিন-মলগুলি অনেকটা তরল হয়। পরে, কলিকাতার এই সমস্ত সূয়ারের ময়লা, বিদ্যাধরী নদী-গর্ভে, পাম্পের সাহায্যে, ফেলান হয়। কলিকাতার রাস্তার ও গৃহস্থের বাড়ার "শুকনা" ময়লা রাস্তার দু-পাশে গাঁথা-চাতালের উপরে টবে (dust binএ) ফেলা হয়। পরে, ঐ শুষ্ক ময়লা-গুলি, ময়লার গাড়ীতে উঠাইয়া, কলিকাতার উপকণ্ঠে ধাপা নামক জলাজমিতে ঢালিয়া, তাহা ভর্ত্তি করান হইতেছে।

III. বস্তি, BUSTEE

যেখানে বহু লোক বাস করে, তাহাকেই বস্তি বলা যায় ; কিন্তু, সাধারণতঃ, কাঁচা-ঘরের সমষ্টিকেই বস্তি বলে। বস্তিগুলিতে গরীব ও বেশীর-ভাগ নিরক্ষর লোকরা থাকে বলিয়া, সেগুলি অত্যন্ত নোংরা হয়। এই জন্য, কি ভাবে বস্তি প্রস্তুত

করিলে, সেগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। —(১) জলা জমি, নিম্নভূমি, পলিপড়া জমি বা পুকুর-বুজান জমিতে বস্তি করিতে নাই। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুষ্ক ভূমিতে বস্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। (২) নিয়ম করিয়া, লাইনবন্দী করিয়া, ঘর উঠাইবে। (৩) প্রত্যেক দুইটি বাড়ীর মধ্যে, অন্ততঃ দশ ফিট যায়গা খোলা রাখিতে হইবে ; এবং প্রত্যেক সারের বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিকে, পনর-ফিট চওড়া পাথরের বা পাকা রাস্তা করিতে হইবে। (৪) মল ও তরল ময়লা নিকাশের জন্য সমস্ত চাকলাটিতে মাটীর নীচে পাকা ড্রেন (sewer) করাইয়া দিতে হইবে ; এবং শুক্‌না-ময়লা জমাইবার জন্য, পাকা-চাতাল করাইয়া ঢাক্‌নি দেওয়া dust bin রাখিতে হইবে। প্রত্যহ, মেথররা এই dust binএর ময়লা উঠাইয়া লইয়া যাইবে। যদি অর্থে বা সামর্থ্যে না কুলায়, তবে রাস্তার দু'পাশে, ড্রেন (এমন কি, কাঁচা-ড্রেন) করাইয়া দিতে হইবে। এমন অবস্থায়, পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে, প্রত্যেক গৃহস্থকে ময়লা পুঁতিয়া বা পুড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) বস্তির এক প্রান্তে, কয়েকটি পাকা (অভাবে, খাটা) পায়খানা ও পশুশালা রাখা যায়।

বেগ-ধারণ

(আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ)

রোগ উৎপত্তির যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে বেগ-ধারণ অন্যতম। যে সকল ভাব আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে তাহাদের প্রবৃত্তিকে বেগ কহে। বেগ উপস্থিত হইলে যেগুলিকে দূর না করিলে শরীর অসুস্থ হয়, তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক নর-নারীর কর্ত্তব্য। নতুবা শরীরে নানা ব্যাধি প্রবেশ করিয়া শরীরকে নষ্ট করিতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যত প্রকার বেগ আছে, তাহাদের মধ্যে মূত্র, পুরীষ, অধঃবায়ু, শুক্র, বমন, হাঁচি, উদ্গার, জৃম্ভন, (হাই উঠা), ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু, নিদ্রা ও শ্রমজনিত শ্বাস এই ত্রয়োদশ প্রকার বেগ-ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের সঞ্জাত বেগ ধারণ করিলে শরীরে নানা প্রকার রোগের উদ্ভব হয়। কোন্ বেগ ধারণে শরীরের কীদৃশ অপকার হয় এবং তাহার প্রতিকার কি তাহা জানিতে পারিলে আত্ম-হিতপরায়ণ ব্যক্তিগণ বেগ ধারণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে বেগ ধারণ করা হয় তাহা হইলে, যে পন্থা অবলম্বন করিলে বিপদ না আইসে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। স্বাস্থ্য রক্ষণ বিষয়ে বেগধারণ একটি সামান্য বিষয় নহে। এই উদ্দেশ্যে 'স্বাস্থ্য' পত্রিকায়

এতদ্ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। আত্ম-হিত-কামী ব্যক্তিগণ বেগধারণের অপকার জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে পরিশ্রম সফল হইবে।

(১) মূত্র—মূত্রের বেগ ধারণ নিষিদ্ধ। শরীর রক্ষণের নিমিত্ত আমরা যে সকল দ্রব্য পান করি তাহার সারাংশ শরীরে গৃহীত হয়, অবশিষ্ট অসারাংশ মূত্ররূপে বহির্গত হইয়া থাকে। খাদ্য পানীয়ের অসার জলীয়াংশকে মূত্র বলা হয়। আমাদের শরীরে যে তৈজস ক্রিয়া চলিতেছে তাহার ফলে শারীর ধাতুগুলি নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, এই দহনের ফলে শারীর ধাতু হইতে ক্লেদ নির্গত হয় এবং এই ক্লেদকে মূত্র শরীর হইতে লইয়া মূত্র মার্গ দিয়া বহির্গত হয়। মূত্রের এবম্বিধ কার্য্যের ফলে শরীরের মধ্যে উৎপন্ন সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ বহির্গত হইতেছে। যদি মূত্র এই প্রকার কাজ না করিত তাহা হইলে উৎপন্ন ক্লেদের দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠিত এবং জীব সকল বাঁচিতে পারিত না। মূত্র শরীর প্রদেশ হইতে বস্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে বেগের দ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে। মূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে যদি মূত্র ত্যাগ না করা হয় তাহা হইলে, বেগ-বিঘাত জন্য বায়ুর যে প্রতিঘাত উৎপন্ন হয় তাহাতে বস্তিদেশে, কুচ্‌কিতে, লিঙ্গে, কোষে ও নাভি প্রদেশে তীব্র শূলবৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং শিরঃশূল উৎপন্ন হইতেও দেখা যায়। রোগী যন্ত্রণায় সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে (বিনাম=ক্রোড়নত)। কুচ্‌কি দুইটী টানিয়া ধরার ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব করে। কিছু কাল মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া পরে প্রস্রাবের বেগ দিলে মূত্র বহির্গত হইতে বড়ই কষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় যদি মূত্র বহির্গত হইতে না পারে তাহা হইলে, প্রতিহত বায়ু মূত্রকে পুনরায় ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত করে। তাহার ফলে মূত্র-বস্তি ত্যাগ করিয়া পুনরায় শরীরে ফিরিয়া যাইতে থাকে এবং শরীরের যে বিষ মূত্রের সহিত বহির্গত হওয়া উচিত ছিল তাহা বহির্গত হইতে না পারিয়া পুনরায় শরীরে প্রবেশ করে। শরীরে নিরন্তর এই প্রকার যে বিষ উৎপন্ন হইতেছে তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরকে বিষাক্ত করিয়া ফেলে। তখন শিরোবেদনা, আক্ষেপ, শ্বাস ও অচৈতন্য ভাব পর্য্যন্ত আসিতে পারে। এই বিষাক্ত ভাব যদি বাড়িতে থাকে তাহা হইলে, রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

চিকিৎসা—রোগীর বস্তিদেশে (Kidney, ureter and bladder) কোন বাতঘ্ন তৈল যথা—বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল, প্রশারণী তৈল প্রভৃতির অন্যতম তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ দিলে বেদনার শান্তি হয়। কুচ্‌কিতেও এই ক্রিয়া অবলম্বন করিলে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা দূর হয়। রোগীকে ব্যত্যাশ ক্রমে (alternately) গরম জল ও ঠাণ্ডা জলের টবে বসাইলে যন্ত্রণা দূর হয় এবং প্রস্রাব হইতে পারে।

২ তোলা কাঁজির সহিত ৵০ আনা ওজনের সোরা মিশাইয়া খাওয়াইলে যন্ত্রণা দূর হয় এবং মূত্র নির্গমনের যে বাধা তাহাও বিদূরিত হইয়া থাকে। কাঁকুড় বীজ ॥০ তোলা ও সৈন্ধব ⁄০ আনা একত্রে বাটিয়া গরম জলের সহিত খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পাথর কুচি পাতার রস ২ তোলা ও মধু ।০ আনা একত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীর আক্ষেপ উপস্থিত হইলে সর্ব্বাঙ্গে ত্রিসতী প্রশারণী তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ দেওয়া

এবং রসরাজ রস নামক আয়ুর্বেবদীয় ঔষধ গোক্ষুর বীজ ও মিশ্রী ভিজান জল সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীকে তালের রসের তাড়ি দিলে উপকার পাওয়া যায়। অচৈতন্য ভাব দেখা দিলে অর্দ্ধ তোলা মদ্যের সহিত বড় এলাচের চূর্ণ ৩ রতি, কর্পূর ১ রতি মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োজ্য। রোগীকে ইক্ষু-রস, ডাবের জল, কিস্‌মিসের ক্বাথ, আমলকীর রস ও মধু পান করিতে দিতে হইবে। তিসি বা কুলথ কলায়ের ক্বাথও এক্ষেত্রে উপকারী।

(২) পুরীষ—আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, পাচক পিত্তের দ্বারা তাহা পরিপাক-প্রাপ্ত হয়। এই পরিপাক-প্রাপ্ত দ্রব্য হইতে এক প্রকার দ্রবাংশ শরীরে শোষিত হয়। শোষণের পর স্থূলাংশ যাহা থাকে তাহাই পরিপিণ্ডিত হইলে পুরীষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্যক-পক্ক পুরীষ প্রকৃতির নিয়মে বহির্গত হয়। পুরীষ বাহির হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার বেগ আইসে। এই বেগকে রোধ করিলে বায়ু প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার লক্ষণ উৎপাদন করে। পুরীষ বেগ-ধারণ জন্য পেটে বায়ুর সঞ্চার হয় এবং সেই বায়ু শরীরে সংক্রমিত হইয়া গা-হাত-পা কামড়ানি, শিরঃশূল উৎপাদন করে। পেটটী ফাঁপিয়া উঠে এবং পেটে নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়। রোগীর হাত-পায়ে জ্বালা থাকে। মল ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইলেও সহজে মল নিঃসরণ হইতে পারে না। বায়ুর প্রতিঘাত জন্য পুরীষকে বিপরীতা-ভিমুখী করিয়া উপর পেটে আনয়ন করিতে পারে এবং বমির বেগের সহিত পুরীষ নির্গত হয়। মল-মূত্রের বেগ ধারণ যাঁহাদের স্বভাব তাঁহারা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন।

চিকিৎসা—পেটে বাতঘ্ন তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ দেওয়া, বর্ত্তি প্রয়োগ (Suppository), বস্তি কর্ম্ম (Anaemtia), বায়ুর অনুলোমকর ঔষধ যথা, হিঙ্গাষ্টক-চূর্ণ, নারাচ-চূর্ণ, বজ্রক্ষার এবং বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মুখমার্গে বিষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

(৩) অধঃবায়ু—পরিপাক ক্রিয়ার ফলে যখন সারাংশ পাকাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময় পুরীষের সহিত অল্প বিস্তর বায়ুও উৎপন্ন হয়। ঐ বায়ু পুরীষের সহিত, কখন বা স্বতন্ত্র ভাবে বহির্গত হয়। স্বতন্ত্র ভাবে বহির্গত হইবার কালে যদি বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে, অধঃ প্রতিহত হইয়া সর্ব্ব দেহে বিক্ষোভ উপস্থিত করে। শিরঃগত হইয়া শিরঃশূল, কোষ্ঠগত হইয়া বাত-মূত্র পুরীষের অবরোধ ও শূল, আধ্মান (পেট-ফাঁপা), আমাশয় গত হইয়া উদ্গার, হিক্কা, বিবমিষা, বমি, কণ্ঠ ও উরঃগত হইয়া কাস-শ্বাস, সন্ধিগত হইয়া বেদনা ও সন্ধি শৈথিল্য এবং সর্ব্বদেহগত হইয়া ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে।

চিকিৎসা—উদরে ও শরীরের অন্যান্য দেশে বাতঘ্ন তৈল মালিশ এবং স্বেদ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর অনুলোম করান উচিত। বায়ুর অনুলোমের জন্য চিন্তামনি চতুর্ম্মুখ এলাচের চূর্ণ ও মৌরী ভিজান জল সহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মৃদু বিরেচন যথা—কিস্‌মিস্‌-সিদ্ধ-দুগ্ধ, সোঁদালের আঠা দুধে গুলিয়া, ত্রিফলারক্বাথে কিংবা এরাণ্ড তৈল রোগীকে সেবন করান উচিত।

যে ত্রয়োদশ প্রকার বেগ ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে এই তিনটীই প্রধান এবং সাধারণতঃ লোকে অজ্ঞতার ফলে এই তিনটীর বেগ ধারণ করিয়া থাকে। এই জন্য এই তিনটী বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইল। অবশিষ্ট দশ প্রকার বেগ সম্বন্ধে যথাবসরে পরবর্ত্তী মাসে সাধারণ ভাবে বলা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শিশুদের খাদ্য

(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, M. B.)

শিশু যে ক্রমশঃ বড় হ'য়ে বালক বা যুবক হয় তা কেবল আমরা যা কিছু খাই সেই খাবারগুলি থেকে সংগ্রহ করা জিনিষ থেকেই হয়।

আমাদের দেশের শিশুরা অন্য অন্য দেশের শিশুদের চেয়ে কিসে খারাপ ভাবলে দেখা যায় যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় হাজার করা যত শিশু জন্মায় তার মধ্যে ৭০।৭৫টি ১ বৎসর হবার পূর্ব্বেই মারা যায় কিন্তু আমাদের দেশে গড়ে ঐ ১,০০০ শিশুর মধ্যে প্রায় তিন শত জন এক বৎসর বয়স হবার আগেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

তারপর আমাদের দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের দাঁত বড়ই খারাপ—প্রায়ই পোকা ধরে কনকন করে, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত প'ড়তে দেখা যায়।

তোমরা সকলেই দেখেছ যে সাহেবদের ছেলেরা যেমন হৃষ্ট পুষ্ট, হাসিমুখে লাফালাফি ক'রে বেড়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই রোগা কাঁদুনে, আর ভয়ে ভয়ে থাকে মনে হয়। দুর্ব্বলতা স্ফূর্ত্তির অভাব, দাঁত খারাপও বেশী মৃত্যু কারণ, খুজতে গেলে দেখা যায় যে প্রধানতঃ আমাদের খাবারগুলিই এর জন্য দায়ী—আর দায়ী আমাদের সমাজের বহুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত কতকগুলি নিয়ম।

আমাদের খাবারের দোষগুলি কি—তাই বুঝতে চেষ্টা করি। এই দোষ জানতে হ'লে আমাদের জানা দরকার যে খাবারের প্রয়োজনিয়তা কি? কেন আমরা খাই, আর কেনই বা অনেক রকম জিনিষ খাই। সব কথা বলতে গেলে প্রবন্ধটি বড্ড বড় হ'য়ে যাবে সম্পাদক মহাশয়—অতটা জায়গা আমাকে দেবেন না, কাজেই মোটামুটি বলি।

আমাদের খাওয়ার দরকার প্রধানতঃ (১) বাঁচিয়া থাকিবার জন্য—জ্যান্ত মানুষের অনেক যন্ত্র সর্ব্বদাই কাজ করে যেমন নিশ্বাস ফেলা ও নেওয়া, হৃদপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭০।৭৫ বার দবদব ক'রে রক্ত চলাচল করায় শরীরের অন্ত্রগুলির রস বাহির করে ইত্যাদি।

(২) শরীর বৃদ্ধি করা ও কাজ করতে শরীরের যে ভাগ ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করা—

ছোট্ট ছেলেটি ৴৩ তিন সের আন্দাজ ওজন নিয়ে মার পেট থেকে পড়ে ক্রমশঃ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তার ওজন হয়ে দাঁড়ায় ১মণ ১০।১২ সের। এই গেল সাধারণ রকম ওজনের কথা, চেষ্টা করলে, ব্যায়াম ক'রলে ওজন ঢের বেশী বাড়ান যেতে পারে। তাহ'লে তোমরা বুঝছ যে যা কিছু আমরা খাই তাহা আমাদের শরীর গঠনে ও আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে কত দরকারী উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারেঃ—

শরীরের যন্ত্রগুলিকে কার্য্যক্ষম ক'রে, বাচিয়া রাখার জন্য যে জিনিষটি দরকার হয় তাকে বলে শর্করা জাতীয় উপাদান—এইগুলি পাওয়া যায় প্রধানতঃ চাল, ডাল, গম, যব, চিনি গুড়, আলু ও শাক সব্জী থেকে।

আমাদের শরীরে আছে হাড়, (দাঁতও একরকম হাড়) মাংস, মেধ, রক্ত ইত্যাদি। হাড় তৈয়ারী করতে লাগে—(Calcium) ক্যালসিয়ম, ফসফরাস ইত্যাদি ধাতব জিনিষ। মাংস ও মেধ তৈয়ারী হয় আমরা যা জীব জন্তুর দেহ থেকে তৈয়ারী খাবার খাই, তাই থেকে বেশী (যথা মাছ, মাংস, দুধ, ছানা) ও কিছু কিছু ডাল জাতীয় খাবার থেকে এই দুরকম খাবারেই নাইট্রোজেন আছে—এ'কে ইংরাজীতে প্রোটিণ্ড খাদ্য বা ছানা জাতীয় খাদ্য বলে—রক্ত তৈয়ারী হ'তে অন্যান্য জিনিষের ভিতর লৌহ (iron)ই প্রধান কাজে লাগে। শরীরের চরবী আমরা যে ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি খাই তা'থেকেই তৈয়ারী হয়।

এখন মোটা মুটি তোমরা বুঝলে যে বেঁচে থাকতে গেলেও শরীরের বৃদ্ধি ও অবয়বগুলি ঠিক ভাবে তৈয়ার করবার জন্য আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দরকার—নইলে শরীর ঠিক ভাবে গ'ড়ে উঠে না, দুর্ব্বল বা নিয়মিত তৈয়ারী না হওয়া শরীর সহজেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়—আবার একবার অসুখ হলে শরীরের গঠন উপযুক্তভাবে দিনকতক হয় না, সেই জন্য এই দুর্ভাগ্য শিশুটি বিনা দোষে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ক্রমশঃ দুর্ব্বল, রুগ্ন ও পরে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যায়।

তা'হলে দেখ্‌চো, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পেতে হলে আমাদের চাই—

(ক) বেচে থাকবার জন্য শর্করা জাতীয় উপাদান প্রভৃত খাদ্য, যথা—

চাল, গম, যব, গুড়, চিনি, দুধেও এক প্রকার চিনি আছে।

(খ) শরীর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য প্রোটিণ্ড বা ছানা জাতীয় উপাদান যথা—মাছ, মাংস, দুধ (ছানার অংশ) ডাল ও মাখন, ঘৃত (দুধ থেকে তৈয়ারী) তৈল, চরবী ইত্যাদি।

(গ) হাড়, দাঁত, রক্ত ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য **প্রাকৃত পদার্থ**—ক্যালসিয়ম (চুণ) লৌহ, ফসফরাস—সেগুলি পাওয়া যায় ডাক্তারখানায় নয় আমরা যে সব সাক সব্জী ফলমূল খাই তাই থেকে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে বেশী পাতাবিশিষ্ট তরি তরকারীতে যথা—কপি, বাঁধাকপি পালং, পুঁই, নটে, ডেঙ্গো কুমড়া, লাউ, পলতা, শুসুনি (Lettuse) লেটুস, (Spinach) স্পাইনাক, ইত্যাদি শাকে— পেঁয়াজ, ঝিঙে, পটল, উচ্ছে বেগুন, চিচিঙ্গে, ধুধুল, মূলা, গাজর, ঢেড়স, বীট ইত্যাদি তরকারীতে। আম, কাঁঠাল, নেবু, আনারস ইত্যাদি ফলে কি মজা! আমরা যা কিছু খাই যে গুলিই আমাদের কাজে লাগে, কোনও জিনিষে আমাদের শরীর গঠন হয় কোনও জিনিষ আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

পূর্ব্বে আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশের শিশুদের গঠনে কতকগুলি দোষ দেখতে পাওয়া যায় সেই জন্য তারা

(১) দুর্ব্বল হয় ও প্রায় রোগে ভোগে।

(২) অন্য দেশের শিশুদের চেয়ে বেশী মারা যায়।

(৩) তাদের দাঁত ভাল হয় না।

(৪) তাদের সাহেবদের ছেলেদের মত চটপটে ও স্ফূর্ত্তি, তেজ (lively) দেখা যায় না।

আমরা যখন প্রয়োজনীয় সব উপাদানগুলিই খাই তা'হলে অন্য দেশের শিশুদের চেয়ে আমরা দুর্ব্বল ও কোনও কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট কেন? হয়

আমরা ঠিক পরিমাণ মত সবরকম খাদ্য খাইনা, নয়, যা আমরা খাই তার গুণ ঠিক থাকে না। যাহারা গরীব তাহারা অভাবের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাবার না পেতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের গরীব বড়লোক, জমীদার, ব্যবসাদার, উকিল, ডাক্তার, কেরাণী সকলের ছেলেদেরই দুর্ব্বল, দাঁত খারাপ বা শরীরে অন্য দোষ যুক্ত দেখা যায় কাজেই বলতে হবে যে খাবারের পরিমাণ কম হয় ব'লে আমাদের শরীর খারাপ নয়—আমাদের খাবারের গুণ গুলির অভাবেই আমরা ভুগ্‌চি।

আমরা খাই :—

ভাত—সিদ্ধ চালের ভাত, ফেন ফেলে দিয়ে

ডাল—অনেক জলে সিদ্ধ ক'রে পাতলা, এতে জলই থাকে বেশী।

মাছ—অতি অল্প একআধ টুকরা—

পূর্ব্ব-বঙ্গে মাছ প্রচুর পাওয়া যায় সেখানকার লোকেরা মাছ বেশী খায়, তারা পশ্চিম বঙ্গের লোকদের চেয়ে সবল, তেজী ও কর্ম্মঠ।

মাংস—অল্পই খাওয়া হয়।

তরকারী—ভেজে বেশীক্ষণ সিদ্ধ করে তাতে ঘৃত, তৈল, মসলা ইত্যাদি দিয়া পাতাযুক্ত তরকারী অর্থাৎ শাক তো আমরা খুবই ভেজে খাই

ফল—খুব কমই ব্যবহার করি

দুধ—অনেকেই পান করে না, অভাবে, যাঁহারা দুধ ব্যবহার করেন ভাল, টাটকা দুধ পান না। গয়লা বাড়ীর ময়লা জল, রেলের ধারে জমা দূষিত জল মেশান দুধই শত করা ৯০ জন ব্যবহার করেন।

আমাদের খাদ্যে রকম আছে অনেক—ভগবান আমাদের দেশেতে কোনও জিনিষ দিতেই কার্পণ্য করেন নি—নিতান্ত কুড়ে ও বেহিসাবী ছাড়া না খেতে পেয়ে বাঙ্গালা দেশে কেহই মরে না আমাদের খাবার তৈয়ারীর নিয়ম, রাঁধার পদ্ধতি, ও খাবার প্রথার জন্যই আমরা ভুগি তার প্রতিকার করা দরকার—

আমাদের প্রয়োজনীয় খাবারের একটি তালিকা আমি করে দিচ্ছি তাতে আমাদের শরীর গঠন উপযোগী সব উপকরণই আছে :—

প্রাতে ৬।৬॥ টায় দুধ এক পোয়া

৭।৭॥—ভিজা ছোলা (কল্ বের করা হলেই ভাল হয়) সময়ের ফল

১০ টার কাছাকাছি আতপ চালের ফেন না গালা ভাত, শাক সামান্য সিদ্ধ বা কাঁচা নুন দিয়া, (ভাজা কখনই নয়)

মাছ—ঝোলের সিদ্ধ মাছ (তেলে ভাজা মাছ ছোট ছেলেদের পক্ষে হজম করা সহজ নয়)

ডাল—থক থকে সিদ্ধ ডাল (খুব খানিক জলে কয়েকটি দানা নয়)

বিকাল ৪টা আন্দাজ—

ফল—সময়ের ফল, কমলা লেবু, বাতাবী লেবু, আনারস, আম, কলা, আপেল, নাসপাতী, কুল, জাম, জামরুল

কাঁচা সবজী—শশা, কাঁকুড়, গাজর, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি।

রুটী, লুচি, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি।

রাত্রে ৭।৭॥

রুটী—লাল ভুষি ওয়ালা আটা ২।১ ঘণ্টা ভিজাইয়া তা'হতে গড়া রুটী গরম গরম সহজ পাচ্য ও সুস্বাদু, ইহাতে মাখন বা ঘৃত মাখাইলে খুব

ভাল হয় তরকারী তৈল বা ঘৃতে না ভাজিয়া শুধু সিদ্ধ করে রাঁধা।

মাছ বা মাংস—অল্প আঁচে কম মসলা দিয়া সিদ্ধ।

ডিম—১টী সিদ্ধ (ভাজা নয়)

বিকালে স্কুল থেকে আসার পরই বেশী খাওয়া ভাল তা'হলে দুপুরে শ্রম জনিত ক্ষুধাও নিবারিত হয় ও এই খাবার পর খেলা ধূলা করার দরুণ খাদ্যগুলি পরিপাক সহজেই হ'য়ে যায়। গৃহস্থ এই রকম ব্যবস্থা করলে শিশুদের খাদ্য তাঁহাদের প্রয়োজন মত হয় ও বিজ্ঞান সম্মত হয়। যদি এরূপ করা হয় তা'হলে ৪টার সময়েই ৪টা ও রাত্রি ৭।টার খাবারের সকল রকম খাদ্য গুলি রাখিয়া রাত্রে ফল ও দুধ বা এক আধ খানা রুটী খাওয়া যাইতে পারে। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে খাদ্য রৌদ্র থাকিতে যত শীঘ্র হজম হয় রাত্রে তত সহজে হজম হয় না ও এই পাকস্থলীস্থিত খাদ্যগুলি নিদ্রার ব্যাঘাত করে। এই সকল কথা ভাবিলেই বোঝা যায় যে আমাদের উচিৎ আমাদের শিশুদের এই বৈকালিক আহারটিকে প্রধান করিয়া তোলা।

আমি গোড়ায়ই ব'লেচি যে, আমাদের শিশুদের অন্য দেশীয় শিশুদের চেয়ে দুর্ব্বল হবার কারণ—আমাদের 'খাদ্য' সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও কতকগুলি অভ্যাস। উপরের খাদ্যর তালিকা থেকেই সহজেই বোঝা যায় যে, আজকালকার বিজ্ঞান সম্মত মতে খাওন হলে খাদ্য সহজে হজম হয়—খাদ্যগুলির হতে প্রাপ্য সব জিনিষগুলিই শরীরের কাজে লাগে।

সময়ের ফল ও সিদ্ধ না করে কাঁচা খাওয়া শাক সব্জীর কথা খাদ্য তালিকাতে দেওয়া হয়েচে অনেক বার। আজকাল সকলেই জানেন যে এই কাঁচা জিনিষ খাবার জন্য সকল দেশেরই শিক্ষিত লোকদের কি রকম আগ্রহ হয়েচে—বিজ্ঞানিকেরা দেখেচেন ও প্রমাণ করেচেন যে কাঁচা খাবারের মধ্যে একটি জিনিষ থাকে যাকে তাঁহারা ভাইটামিন (vitamin) বা খাদ্যপ্রাণ নাম দিয়েচেন খাদ্য দ্রব্যের এই গুণটি আমাদের অনেকগুলি রোগ থেকে বাঁচায়, যথা—বেরিবেরি, রিকেট, চক্ষু রোগ ইত্যাদি, আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দেয়, তার মানে যদি সমান স্বাস্থ্যবান দুই জন লোক—যার মধ্যে একজন কাঁচা তরিতরকারি ইত্যাদি খাদ্যপ্রাণযুক্ত জিনিষ বেশী ব্যবহার করে আর একজন সাধারণ ভাবে রাঁধা খাদ্য খায়—কোনও যায়গায় যায় যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, বসন্ত বা অন্য সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে—তাহ'লে ঐ রোগ যে লোক খাদ্যপ্রাণযুক্ত জিনিষ খায় তাকে সহজে ধরতে পারে না—আমাদের দেশে সাধারণ লোক যে একবার দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পেটের অসুখ, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগে সহজেই আক্রান্ত হয় ও মারা যায় তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের খাবারের তালিকায় এই কাচা খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকা—কল্ বাহির করা ছোলাতে এই 'খাদ্যপ্রাণ' খুব বেশী আছে সেই জন্য এই কল্ বের করা ছোলা প্রত্যহ সকালে ব্যবহার করা উচিৎ।

আমাদের মায়েরা সব তরকারি ও মাছ মাংস ইত্যাদি সুস্বাদু করাবার জন্য যে আগে ভাল করে তেলে বা ঘৃতে ভেজে রাঁধেন—সেটাতেও খাবারকে দুষ্পাচ্য করা হয়—খাবারের মধ্যের ধাতব জিনিষগুলি বিকৃত হয়ে যায় আর আমাদের শরীরে সেগুলি কাজে লাগে না—আমাদের রাঁধবার এই নিয়মটিকে যত শীঘ্র বদলান যায় ততই আমাদের মঙ্গল হবে।

ধান, গম, যব, ডাল ইত্যাদি যে সমস্ত শস্য

আমরা খাই সে সমস্তর যতদূর সম্ভব খোলা রেখে খাওয়া দরকার—এই খোলাতে বেশী পুষ্টিকর কতকগুলি উপাদান থাকে আর এই খোলারই ঠিক নীচে উচ্চ আধারের "খাদ্যপ্রাণ" পাওয়া যায়—সিদ্ধ চালের ভাতে চালের ভিতরের খাদ্যপ্রাণ তো নষ্ট হয়েই যায় উপরন্তু প্রায় সিকি ভাগ পুষ্টিও নষ্ট হয়ে যায়—আমরা যদি না পালিস করা (ঢেকিতে অল্প ছাঁটা) আতপ চালের ভাত ফেন না গেলে খাই তাহ'লে চালের সমস্ত গুণগুলিই আমরা কাজে লাগাতে পারি এখনকার সিদ্ধ চালের ফ্যান বাহির করা ভাত খেয়ে আমরা প্রায় চালের সিকি গুণ ফেলে দি- ও তাহার খাদ্যপ্রাণটিকে তো কাজেই লাগাই না। বাঙ্গলা দেশের ৫ কোটী লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই দুবেলা ভাত খায় তারা যদি প্রত্যহ গড়ে ১ সের চালের ভাত খায়—ও চালের দাম যদি ৪৲ চার টাকা মণ ধরা যায় তাহ'লে এই গরীব দেশের লোকেরা বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকার দামের পুষ্টিকর জিনিষ কেবল সিদ্ধ চালের ফ্যান বাদ দিয়ে নষ্ট করে—এই সিদ্ধ চাল খাওয়ার ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোনও খানেই নাই—আমাদের উচিৎ এই বদ্ অভ্যাস যতশীঘ্র হয় ত্যাগ করা।

রাঁধবার নিয়মের ভিতর সিদ্ধ ছাড়া আজকালকার বিজ্ঞানিকরা ভাতে (steam) সিদ্ধ করা ও ও "বেক্" (Bake) করা এই প্রথায় রাধা ভাল বলেন—'বেক' করার কথা নীচে জানাচ্চি।

কোনও ভিজা খাদ্য (যাহাতে জল আছে, যথা—আলু, মাখা-আটা, মাছ, মাংস) এমন একটি পাত্রে রাখিতে হইবে যাহা উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখা যায় ও ঢাকিয়া রাখিলে কোনও রকমে হাওয়া না ঢুকতে পারে—এই পাত্রটি চারিদিকে আগুন দিয়া গরম করিলে ভিতরের স্থিত মাছ, মাংস, সর্জ্জা ইত্যাদির জলীয় ভাগ গরম হইয়া উঠিবে ও তাহাতেই ঐ খাদ্যটি সিদ্ধ হইয়া খাওয়ার উপযুক্ত হইবে ইহাকে 'বেক' করা বলে। এইরূপে রাঁধা খাদ্যতে ঐ খাদ্যের সকল জিনিষগুলিই এমন ভাবে থাকে, যাহাতে শরীরের পক্ষে উহা পরিপাক করিয়া লওয়া সহজ হয়—খাইতে ঐ রকমে রাঁধা খাবার উপাদেয় হয়—ইহাতে "খাদ্যপ্রাণ" গুলিও ঠিক থাকে কারণ বেক্‌এর ভিতরে উত্তাপ ১০০° ডিগ্রী বেশী হয় না।

খাদ্যর ব্যবহারের বিষয় আর একটি কথা ব'লে প্রবন্ধ শেষ করবো—খাদ্য উত্তমরূপে চিবাইয়া আস্তে আস্তে খাওয়া উচিৎ দাঁত দিয়ে চিবাবার সময় মুখের লালা খাবারের সঙ্গে মিশিয়া গেলে তবে ঐ খাদ্য ভাল রকম পরিপাক হয়—আমাদের আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে উত্তমরূপে চিবাইয়া খাওয়া শিশুদের অভ্যাস করান দরকার তাহ'লে উহাদের পেটের অসুখ বদহজম ইত্যাদি রোগে ভুগিতে হইবেনা।

খাবার রুচিকর হওয়া দরকার, খাবার সময় কোনও রকমে উত্তেজিত হওয়া ভাল নয়।

দিনের মধ্যে ৪।৫ গেলাস জল খাওয়া বিশেষ দরকার। শিশুদের চা কফি ইত্যাদি কদাচ পান করান উচিৎ নয় তাহাদের তিন পোয়া হইতে এক সের দুধ প্রত্যহ ব্যবহার করান অভ্যাস করা চাই।

আমার বিশ্বাস এই প্রবন্ধে লেখা ব্যবস্থামত চলিলে আমাদের দেশের শিশুরা সুস্থ সবল দেহ পাইবে ও বড় হইয়া দেশের ও দশের কাজে যশ লাভ করিবে।

এই প্রবন্ধ বার্ষিক শিশু সাথীতে বাহির হইয়াছে।

অপ্রিয় সত্য

(শ্রীবিমলচন্দ্র রায়)

যদিও আমার নামটী বিশেষণে বিভূষিত একটী লম্বা বি, এস, সি ; এম, বি ; গোল্ড মেডেলিষ্ট ডিগ্রীতে অলঙ্কৃত, তবুও কার্য্যক্ষেত্রে ডিগ্রীটী শুধু পৃষ্ঠের উপর জাঁতিয়া বসিয়া দেহকেই মুব্জ করিতেছে। কোন প্রকারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছি। 'কলে'র ঝঞ্ঝাট নাই, শুধু চুপচাপ সাহেব সাজিয়া নিজের বৃহৎ ডিস্‌পেনসরিতে বসিয়া থাকি। পিতা বেশ কিছু অর্থও রাখিয়া গিয়াছেন ; সেই জন্য নিজের ডিগ্রীর সম্মান রাখিবার জন্য সমস্ত প্রকার জাক-জমকের অভাব রাখি নাই। আমার বৃহৎ ডিস্‌পেন-সরিটী কেবল হরেক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ ও অন্যের প্রেস্‌ক্রিপসনের ঔষধ জোগায় ; আর আমি বসিয়া কেবল তাহার শোভাই বর্দ্ধন করিয়া যাই।

সারাদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে বাত ধরিবার উপক্রম হইয়াছে, তাই সন্ধ্যায় প্রায় দিনই সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের দলে যোগদান করিতে যাই। আজ সন্ধ্যাবেলায় আড্ডাস্থলে ঢুকিতেই ধীরেশের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ কর্ণে ঢুকিয়া মনটাকে যেন একটু বিচলিত করিয়া দিল। ধীরেশও আমাদেরই সমবয়সী ; ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে আর পড়ে নাই ; দেশে গিয়া জমি-জমা চাষ-আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যত দিন আমরা জলের ন্যায় অর্থ ঢালিয়া উচ্চ উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ততদিনে সে ব্যবসাতে প্রচুর লাভবান হইয়া নিজের শোচনীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, ধীরেশকে আমার একটু ভয় করে। তাহার মত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, উত্তম কর্ম্মী খুবই অল্পই দেখা যায়। স্পষ্ট কথা মিষ্ট করিয়া শুনাইতে সে সিদ্ধ-হস্ত। আজ যদিও শিক্ষাতে তাহার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে উঠিয়াছি, তথাপি তাহার নিকট হইতে সকলেই অনেক যুক্তি, পরামর্শ, উৎসাহ পাই, এবং তাহার সে উপদেশও অকাট্য যুক্তিকে আমাদের লম্বা লম্বা ডিগ্রী উপহাস ভরে বা নিজের বিদ্যার বলে ঠেলিয়া দিতে পারে না, অবনত মস্তকে শুনিয়া যায়। কার্য্যবশে সে কলিকাতায় প্রায়ই আসে এবং আমাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করে, নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেককে তাহার ধরণের কাজ করিতে উৎসাহ, উপদেশ দেয়। দেশের একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মী সে, শুনিয়াছি ইতিমধ্যে সে নিজের পল্লীর অনেক সংস্কার করিয়াছে। গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া সকলের বহুদিনের পরিত্যক্ত জঙ্গলাবৃত জমি চাষ-আবাদের উপযোগী করিয়া নানাদ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে এবং উৎপন্ন দ্রব্য দেশ বিদেশে পাঠাইয়া নিজের ও গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা অনেকটা লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ধীরেশের গলা শুনিয়া ঘরের দরজার পার্শ্বে

তাহার বক্তব্য শুনিবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। শুনিলাম ধীরেশ বলিতেছে,—

"রেখে দাও তোমার অজয় বোস, সুশীল গুপ্তের কথা, এ সমস্ত দেশনেতাকে আমার বেশ জানা আছে! লেকচার দেবার সময় দরিদ্র দেশ-বাসীদের দুঃখে বেদনা জানান, নাকে কেঁদে, বিলাসিতা ছাড়তে বলেন—বিদেশী 'বয়কট' করতে উপদেশ দেন, কিন্তু বাবা, ট্রেনে চেপে চলার সময় ত' দেখি সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়া পাদমেকং যান না। কেন বাবা, থার্ড ক্লাশ ইনটার ক্লাশে গেলে বুঝি সম্মানের লাঘব হয়—কেমন? দেশের দুঃখ কষ্ট যার প্রাণে বেজেছে, দরিদ্র, ক্ষুধিত ভাইবোনদের বাঁচাবার জন্য যে জীবন উৎসর্গ করেছে, সেকেণ্ড ক্লাশে না গেলে কি তার সম্মান থাকে না? দেশবাসী কি তাঁর বাইরের জাকজমক না দেখ্‌লে তাঁর পূজা কর্‌বার অনুপযুক্ত মনে করে? যে প্রকৃত পূজ্য পাত্র, সে কি বাইরের আড়ম্বরের জন্য পূজিত হয়? তাহ'লে মহাত্মা গান্ধী ভিখারীর মত জীবন যাপন ক'রেও আজ পৃথিবীর পূজ্য হতেন না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের লোক পর্য্যন্ত তাঁর সেই নগ্নমূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে অনুনয় বিনয় জানাতো না। কটিবাস পরিহিত গান্ধীকে দেখ্‌বার জন্য লণ্ডনের আবালবৃদ্ধবণিতা পথের গাড়ী চলাচল রোধ ক'রে দাঁড়াত না—তাঁর মুখের দু'টী কথা শুনবার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করত না। দেশ-নেতা হ'তে হ'লে তোমাকে দেশের অবস্থা মাথা পেতে নিয়ে বইতে হ'বে, তোমার দেশের লোক এক বেলা পেটপুরে খেতে পায় না, অথচ তুমি তাদের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে মূল্যবান সাজসজ্জায় বেড়াও—রাজভোগ খাও—সম্মান দুরন্ত রাখবার জন্য মটর হাঁকিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াও—ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড ক্লাশে ভ্রমণ কর; তাহ'লে দেশবাসী কি তোমাকে আপনার বলে ভাব্‌তে পারে? না তুমি তাদের পূজ্য বলে সকাল সন্ধ্যায় পূজা পাবার আশা কর? তুমি তোমার নিজের জন্য বাজে খরচের পয়সাটা দেশের জন্য ব্যয় করলে কি দেশের উপকার হ'ত না? স্বীকার করি দেশের জন্য তুমি অনেক কিছু করেছ,—নিজের অনেকটা স্বার্থ দেশের জন্য বলি দিয়েছ, কিন্তু একটু অন্তরদৃষ্টিতে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই তোমার সেই সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের মধ্যে একটা বড় স্বার্থ লুকান আছে। সে স্বার্থ হচ্ছে—সুনাম; দেশনেতা, দেশের ভাগ্যবিধাতা ব'লে পূজ্য হ'বার জন্য তোমার ঐকান্তিক চেষ্টা তার মধ্যে জড়ান আছে। আজকালকার এ সমস্ত নেতাদের জয়গান আর আমার কাছে ক'রো না। তাঁরা অনেক হিত-কার্য্য কর্‌ছেন সত্য, সে জন্য আমার নমস্য তাঁরা, ব্যস্, আর কিছু করতে ব'লো না। আজকালকার বাঙ্গলার নেতাদের নাম ক'রে বাঙ্গলাকে আর অপদস্থ করো না। "দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে বাঙ্গলাও মরে গেছে।"

কিছুক্ষণের জন্য গৃহখানি নিস্তব্ধ হইল; এই অবসরে আমি ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর গমন করিলাম। আমাকে দেখিয়াই ধীরেশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"এই যে বিশল্যকরণী এসেছেন। হায়—হায়। আপনার অভাবে যে আমরা শেল-বিদ্ধ প্রাণীর মত হতচেতন হ'য়ে প'ড়ে কমল—হনুমানকে ডেকে আনতে পাঠিয়েছি। যাক্, এখন নিশ্চিন্ত। তারপর আজকাল "কল-টল" কিছু পাচ্ছ—না 'ভ্যাগাবানডাইজ' ক'রে বেড়াচ্ছ? শরীরটাও ত দেখছি খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। বলি

দু'টী বৎসর ডাক্তারী পড়্‌লে অথচ শরীরটার প্রতি যত্ন নেবার উপকারিতা জান না। তোমাদের আদর্শেই আবার দেশের লোক নষ্টস্বাস্থ্য ফিরে পাবে—এ কথা ভাবতে গেলে 'হাসিও পায়, দুঃখও ধরে'। বুঝ্‌লে হে শঙ্কর, আমাদের এ হতভাগা দেশের চিকিৎসকদের গুণপণা লিখ্‌লে একখানা দ্বিতীয় মহাভারতের সৃষ্টি হ'ত। কি বল্‌ব পেটে যে বোমা মারলেও বিদ্যে বেরুতে চায় না।"

ভীতচিত্তে আমি বলিলাম—"আবার আমাদের রাশিতে ভর কর কেন বাপু? দেশনেতাদের নিয়ে হোচ্ছে, তাই 'ফুল স্পীডে' চালাও। বল' ত' এক ডোজ ওষুধ দিচ্ছি, তিন ঘণ্টা ধরে সমানতালে গলাবাজি করলেও 'উইক' হবে না।

কে জানিত যে আমার কথা কয়টী ঘৃতসদৃশ জ্বলন্ত অগ্নিতে পড়িবে! তাহা হইলে কি স্বেচ্ছায় হাতে করিয়া বিষ ভক্ষণ করি! আমার কথায় সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল—"হাঁ, তোমরা শুধু ওই একটা কাজেই দক্ষ, সেটা হ'চ্ছে ডোজ চালাতে, ডোজ চালিয়েই আজ তোমরা সর্ব্বনাশ করছ।"

বলিলাম,—"কেন হে, তোমার প্রতি কেউ ডোজ চালিয়েছিলেন নাকি? হঠাৎ এ নিরপরাধী বেচারীদের প্রতি তোমার অত আক্রোশ কেন?"

ধীরেশ বলিল—"ভগবানের আশীর্ব্বাদে যে দেহটী পেয়েছি, তা'তে ভগবান করুন যেন তোমাদের ডোজ কণ্ঠনালী দিয়ে নামাতে না হয়। তোমাদের জিনিষ তোমরাই পূরাদমে চালাও" বলিয়া সে নিজের পেশী বহুল, দৃঢ় শরীরটীর প্রতি হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

আমি বলিলাম—"তা' ঠিক, তোমার মত মুগুরে শরীরের জন্য আমাদের ডোজের সৃষ্টি হয় নি।"

ধীরেশ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"ঠিক কথা, সুস্থ, সবল দেহকে সুস্থ রাখ্‌বার জন্য এদেশে তোমাদের আবির্ভাব হয় নি—তোমাদের ওষুধের সৃষ্টি হয় নি। অসুস্থ দেহটীকে মরণের পথে পৌঁছে দেবার জন্যই বোধ হয় তোমাদের ওষুধের সৃষ্টি—কেমন? আর তোমরা সুস্থ লোককে অসুস্থ করবার—মরণাপন্নকে যমের ঘরে শীঘ্র পৌঁছে দেবার যন্ত্র মাত্র।"

ব্যঙ্গচ্ছলে হরেণ বলিল—"কেন হে, শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর নাকি মধ্যে ভয়ানক অসুখ হোয়েছিল? তিনি কি 'গতা' হোয়েছেন?—নইলে ডাক্তার বেচারীদের ঘাড়ে হঠাৎ চাপ্‌লে কেন?"

হাসিয়া ধীরেশ বলিল—"না হে, তাকে ডাক্তার দেখানোর দরকার হয় নি,—হ'লে তাকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে পেলেও চিকিৎসকের হাত থেকে ফিরিয়ে পেতাম কিনা সন্দেহ।"

বিরক্ত হইয়া অজিত বলিল—"কেন বাবা, আবার তুমি অনলের ঘাড়ে চাপ্‌লে? চিকিৎসকদের করুণায় আজ দশজন মরণের কোল থেকে পুনরায় ভবের মুখ দেখ্‌ছি। কোথায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হ'বে না কুষ্টিকাটা আরম্ভ কোরেছ! সেবারে আমার স্ত্রী ত—"

অজিতের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ধীরেশ বলিল—"অন্যান্য দেশের লোক চিকিৎসকদের করুণায় অকালে ভবের মায়া কাটিয়ে যায় না বটে, কিন্তু এ হতভাগা দেশে একদিকে চিকিৎসকের অভাবে অন্যদিকে চিকিৎসকের করুণায় বহু ব্যক্তি জীবন হারায়। দৃষ্টান্ত চাও? হাজার গণ্ডা দিতে পারি। এই সেদিনকার আমাদের গ্রামেরই একটা ঘটনা বলছি শোন। গ্রামের একজন বিশিষ্ট

ব্যক্তির শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমায় যেতে হোয়েছিল। আমার পার্শ্বেই বিখ্যাত ভোজনদক্ষ ভট্টাচার্য্য মশায় বসেছিলেন তাঁর বম্বে মেলের ইঞ্জিনের বয়লার সদৃশ ভুঁড়িটী নিয়ে, আবার তাঁরই পার্শ্বে বসেছিলেন অস্থিপঞ্জরসার দেহটী নিয়ে আমার পরিচিত একজন ডাক্তার,—ঠিক যেন পর্ব্বতের পার্শ্বে মুষিকটী। ভট্টাচার্য্য মশায় "সুশীল বড় সুবোধ ছেলে; যা পায়, তাই খায়" এই নীতি অবলম্বনে তাঁর ভোজন সারছিলেন। "ওটী আর দিও না" এই কথাটুকু অনেক আশা ক'রেও শুনতে পাই নি। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মশায়ের চেয়েও সেই মরণপথের পথিক ডাক্তার বাবুটীর আহারের পরিণাম দেখে আমি একেবারে 'থ' মেরে গেলাম। তিনিও বম্বে মেলের সঙ্গে তালে তালেই চলতে লাগলেন। আমি এখনও বুঝতে পারিনি যে ডাক্তার বাবুর ওই পেটের ভিতর অতগুলি জিনিষ স্থান পেল কি ক'রে ?"

বিজ্ঞের ন্যায় নব্য উকিল অসিত বলিল— "বুঝলে না হে, সে যে ডাক্তার; গিলছে কি হজম করছে।"

সবাই হাসিয়া উঠিলাম, ধীরেশ বলিল,—"শোন তার পরের ব্যাপারটা। আহারের শেষ মুহূর্ত্তে এল রসগোল্লা। ভট্টাচার্য্য মশায় নির্ব্বিকার চিত্তে ২০টী গলাধঃকরণ ক'রে হাত গুটালেন। ডাক্তার বীরপুঙ্গব অতিকষ্টে একটী ক'রে মুখে পূরে এক মিনিট ক'রে চিবিয়ে ২০টী এতে পৌঁছুলেন। শেষে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আর একটী জান কবুল ক'রে নামিয়ে তিনি ভট্টাচার্য্য মশায়কে অপদার্থ ব'লে উপহাস করতে লাগলেন; কেন না তিনি ২১ পৌঁচুছেন! ভট্টাচার্য্য মশায়কে অম্লানবদনে পরাজয় স্বীকার করতে দেখে আশ্চর্য্য হোলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন 'দেখ হে, একেবারে অতগুলো খেলেই ত' হয় না, হজম করা চাই ত ? তা' ছাড়া কাল মিত্তিরদের বাড়ীতে আমার আর একটা বড় খ্যাঁট্ আছে।' এতক্ষণে তাঁর মনের কথা বুঝলাম। ডাক্তারবাবু তাঁর কথা শুনে দন্ত বিকশিত ক'রে বললেন—হজম ? হা হা ডাক্তার হোয়েছি কি জন্যে হে ? পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে যদি জীর্ণই না করতে পারলুম, তবে চারটী বৎসর ক্যাম্বেলে পয়সা দিয়ে পড়েছি কেন ? এক ডোজ বুঝলে হে—এক ডোজ ব্যস্, ও বেলাতেই চোঁ চোঁ ক'রে ক্ষিধে লাগবে।' ডাক্তারের কথায় ভট্টাচার্য্য মশায় সোৎসাহে বললেন 'বটে হে, তা' হ'লে আমাকেও একডোজ দেবে ত ? ওরে এদিকে রসগোল্লার হাঁড়িটা নিয়ে আয় ত ?' ডাক্তার বাবু বললেন—'কুচ পরোয়া নেই, চালাও—যেও আমার ডিস্‌পেনসরির উপর।' আসপাশের ছেলেপেলেগুলো চীৎকার ক'রে বলল—'ডাক্তারবাবু আমাদেরও এক ডোজ দেবেন ত ?' দাতাকর্ণ স্বীকৃত জেনে তারাও যে যত পারল চালাল।"

আমরা হো—হো শব্দে গৃহখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম এতক্ষণে করিয়াছি। আমার হাসিতে ধীরেশের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল, তীব্রকণ্ঠে আমাকে বলিল,—"তোর লজ্জা করে না হাসতে ? চিকিৎসকগণই হোচ্ছেন দেশবাসীর মেরুদণ্ড। প্রত্যেকের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় আইন-কানুন মেনে চলতে উপদেশ দিয়ে অশিক্ষিত দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা করা তাঁদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব'লে আমি মনে করি। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই রোগব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা করান ত' দূরের কথা, কোন ষ্টেপ্ পর্য্যন্ত নেয় না। তাদের এর পরিণাম বুঝিয়ে দিয়ে

প্রত্যেক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা গুলো জানিয়ে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত নয় কি? যেখানে একজন চিকিৎসক সাধারণকে বলেন—'হজম? এক ডোজ, বাস্, ও বেলাতেই চোঁ-চোঁ করে ক্ষিধে লাগ্‌বে', সেখানে জন সাধারণ কিরূপ শিক্ষা পায়? আর তার ফলাফলই বা কি দাঁড়ায় ভাব্‌তে পার?"

অসিত বলিল—"তুমি একজনের দোষ, ত্রুটী দেখিয়ে সকলকেই দোষী করছ,—এ তোমার খুবই অন্যায়। অনলকে গো-বেচারী পেয়েছ, তাই প্রাণ খুলে ঝাড়ছ।"

ধীরেশ বলিল—"শুধু একজনের দোষ দেখাব কেন—কত চাও? সেবারে দূরসম্পর্কীয় একজন বিখ্যাত চিকিৎসক আত্মীয়ের নিকট দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—'কাকা, কেমন আছেন? তিনি মুখখানি পিঁয়াজ বেচা ক'রে বল্‌লেন—'ভাল আর কোথায় বাবা, এবারকার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। রোগব্যাধির প্রকোপ এবারে নেই বল্লেই হয়—রোগী-পত্তর মোটেই নেই; দেখ দেখি কি মহৎ মনোবৃত্তি!"

অসিত বলিল—"তা' বাপু চিকিৎসকদের ব্যবসাই হোচ্ছে রোগভোগ দেখে টাকা ঘরে আনা, রোগব্যাধি না থাক্‌লে সেটা ত' তাঁদের পক্ষে শোচনীয় সময় বটেই, সে আক্ষেপ তাঁরা করলে আমি কোন দোষ দেখি না। বরং রোগীর অসুখ 'তিল' হ'লে তাকে 'তালে' পাকিয়ে অনেকদিন ধ'রে চিকিৎসা ক'রে পকেট ভারী করাই আমি যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করি, কি বল হে অনল?"

অসিত আমার দিকে একবার আড়নয়নে চাহিল।

শিশির বলিল,—"অসিত ঠিক কথাই বলেছে, ও নিজেও একজন ব্যবসাদার কিনা! তবে অনল যেমন বাক্যায় ফেঁপে উঠেছে, ও বেচারীরও সেই অবস্থা. শুধু কোর্টে যায় আর আসে। তোমার আমার মত বাপের জমান টাকার ধ্বংশ করে মাগ-ছেলে সমেত। সে ঘটনাটী বুঝি তোমরা শোন নি? সেবার ওদের দেশের দুটো লোকের সঙ্গে কোন কারণে পরস্পর ঝগড়া হোয়েছিল। শেষে সেই ঝগড়া মাথা ফাটা ফাটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। নূতন পাশ করা উকিল অসিত একজনের পক্ষ নিয়ে তাকে মকর্দ্দমা করতে উস্কিয়ে দিল, বল্‌ল যে তার মকর্দ্দমা চালাতে ও এক পয়সাও নেবে না। শেষে যখন মোকর্দ্দমা ঘোরালভাবে জমে উঠ্‌ল, তখন চাঁদ প্যাঁচ দিলেন, বল্‌লেন যে ফি না দিলে মোকর্দ্দমা চালাবেন না। সে গরীব বেচারী তখন চোখে গোলক ধাঁধাঁ দেখে মায় ঘটী বাটী বিক্রী ক'রে ওর ফি চালায়। অসিত নাকি তাতে বেশ কিছু পেয়েছিল। না হে অসিত?"

ক্রমশঃ

কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও তাহার চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীঅতুল রক্ষিত, বি, এসসি, এম, ডি (চিত্তরঞ্জন সেবা সদন)

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি কেউ না কেউ কোষ্ঠ কাঠিন্যে ভুগছেন। এই সামান্য ব্যাপার যতই পুরাতন হ'তে থাকে ততই গুরুতর হয়ে উঠে ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। সব রোগের মূলে এই ব্যাপারটাই দেখা দেয় সুতরাং আমাদের এইটাকে তাড়ান একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিচ্যুতির নামই কোষ্ঠ-বদ্ধতা। ভুক্তাবশেষ ময়লা, অন্ত্রনালীর অনেক জীবাণু স্বাভাবিক ক্রিয়ায় নির্গত হয়। মনে করুন একটা গ্রামের মধ্যে যখন চারিদিকে ময়লা, আবর্জ্জনায় ড্রেন বন্ধ হয়ে যায় তখন সে জায়গায় যারা থাকেন তাদের বড় কষ্ট হয়—আমাদের শরীরেও ঠিক তেমনি যখন ময়লা নিঃসরণের পথ বন্ধ হ'য়ে যায় তখন শরীর মধ্যস্থ রক্তের মধ্যে সেই ময়লা ছড়িয়ে পড়ে ও রোগের সৃষ্টি করে। অন্যান্য রোগ সারাতে হ'লে এই শরীর মধ্যস্থ দূষিত রক্ত পরিষ্কার থাকা দরকার এবং যতক্ষণ কোষ্ঠ সম্পূর্ণ মুক্ত না হয় ততক্ষণ পরিষ্কারের আশা খালি দুরাশা-মাত্র। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাক্‌লে পাকস্থলীস্থ খাদ্যের নিঃসরণের পথরোধ হয় ও তাহাতে অজীর্ণ প্রভৃতি দেখা দেয়। ভালরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখতে হ'লে ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ ২ বার পাইখানা যাওয়া দরকার অবশ্য যদি খাওয়া স্বাভাবিক ও সরল হয়।

স্বাভাবিক মল একটু পীতাভ, একটু নরম এবং কোন গাঁট কিংবা গোল রকমের থাকবে না—ওজনে প্রায় ১ পোয়াটাক আন্দাজ হওয়া চাই। যে সব লোক অনেকদিন থেকে ভুগছেন তাদের অন্ত্রের ক্রিয়া বড় স্বাভাবিক থাকে না। এইবার আমি খাদ্যের অসার কেমন ক'রে মলরূপে নির্গত হয় তাহার কিছু কিছু বলব—

চর্ব্বন—বেশ ভাল করে খাবার চিবিয়ে খেলে লালার সহিত মিশ্রিত হয়, লালা খাবারটাকে নরম করে—এই খাবারের শ্বেতসার ভাগ (Starch) লালার দ্বারা বেশ জীর্ণ হয়। এই লালা একটা ক্ষার জাতীয় পদার্থ কিন্তু পাকস্থলীর রস অম্লবিশেষ। খুব তাড়াতাড়ি না চিবিয়ে গিলে খেলে খাবার হজম হয় না ও পরে কোষ্ঠের গোলমাল উপস্থিত হয়।

তারপর ৮ ইঞ্চি লম্বা খাদ্যনালীর মধ্য দিয়া গিয়া খাবার পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

পাকস্থলী ইহার দ্বারা বিশেষরূপে মাংস ও ডাল জাতীয় খাদ্য জীর্ণ হয় (Protin) পাকস্থলীর স্বাভাবিক আকুঞ্চন ও প্রসারণের মধ্যে খাবারটা পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হয়। পূর্ব্বেই বলেছি পাকস্থলীর রস একটু অম্ল বিশেষ। ইহার কাজ শেষ হ'লেই ছোট অন্ত্রনালীর মধ্যে খাবার গিয়ে পড়ে।

ছোট অন্ত্রনালী—ইহার মধ্যে তিন রসের প্রক্রিয়ায় খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়। একটা যকৃত মধ্য

হইতে পিত্তরস, একটা Pancreas অর্থাৎ ক্লোম হইতে আনে এবং শেষটা অন্ত্রনালীর মধ্যস্থ স্বাভাবিক রস। এইখানেই খাবার জীর্ণ শেষ হ'ল এবং তৎপরে ধীরে ধীরে রক্তের সহিত মিশিয়া পড়ে। ছোট অন্ত্রনালীটা প্রায় ১৫ হাত লম্বা।

বড় অন্ত্রনালী—ইহারই মধ্যে খাদ্যের অসার অংশ মলরূপে প্রস্তুত হয় ও একটা থলির মতন জায়গায় জমা থাকে। যখন একটু বেশী জমিয়া যায় তখন স্নায়ু দিয়া মস্তিষ্কে সাড়া যায় এবং তারই তাড়নার ফলে শেষে কোষ্ঠ মুক্ত হয়। অন্ত্রের মধ্যে একটা ঢেউ সৃষ্টি করে (Peristalois) ও তাহাই ক্রমশঃ বাহির পথে আনিবার সহায়তা করে। এই প্রকার ঢেউয়ের সৃষ্টি করতে হ'লে অন্ত্রের মাংশপেশীর সবল ও কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকা দরকার। শরীরের মধ্যে যে নালাশূন্য গ্রন্থি আছে (Endocrine organs) তাহাদের রসও অনেক সাহায্য করে।

এই রাস্তাগুলি যদি সরল না থাকে কোন বাধা প্রাপ্ত যদি হয় তাহ'লে স্বভাবতঃই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, যাহারা সহরে বাস করেন তাহারা এমনভাবে আধুনিক সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া যান ও এমন খাদ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে তাহাতে খাদ্যের সার অংশ ক্রমশঃ কমিয়া যায় ও অসার অংশ বহির্গমনের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিতে থাকে। তাঁহাদের মতে যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাহারা ইহার আক্রমণে কমই পড়েন। আমরা দেখতে পাই সহরতলীর লোকই কোষ্ঠকাঠিন্যে অধিক কষ্ট পান। স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ সময়ে ইহাতে কষ্ট বেশী পান কারণ সভ্যসমাজের স্ত্রীলোকদের পরিশ্রমের অভাব হেতু পাকস্থলীর ও উদরের মাংসসমূহ দুর্ব্বল হইয়া থাকে; পুনঃপুনঃ প্রসব হেতুও এই প্রকার দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে। তাহা ছাড়া সময়ে মলত্যাগের ইচ্ছা থাকিলেও অকারণে লজ্জা হেতু অনেক ক্ষেত্রে অন্ত্রের কার্য্যকরী ক্ষমতা শিথিল প্রাপ্ত হয়।

কারণসমূহ এইবার আলোচনা করা যাক—

(ক) সাধারণ কারণ সমূহ (খ) স্থানীয় কারণ সমাজ

সাধারণ কারণ —

১। সাধারণ দুর্ব্বলতা—শরীরস্থ সাধারণ দুর্ব্বলতা ও তথাকথিত অন্ত্রস্থ মাংসপেশীর দৌর্ব্বল্য মল নিকাশের সম্পূর্ণ শক্তির অভাব।

২। বংশজ কোষ্ঠকাঠিন্য—অর্থাৎ পিতা—সন্তান পুরুষ পরম্পরা কখন কখন দেখা যায়।

৩। খাদ্য—মোটামুটি কোষ্ঠ পরিষ্কার করার মত খাদ্যের অভাব। অজীর্ণতা কিংবা সারাংশবর্জ্জিত খাদ্যসমূহ অর্থাৎ সাদা ময়দা, সাদা চিনি, সাদা চাল, ভেজাল তেল, ঘি, ঝাল, মসলা ইত্যাদির লোপ। খুব উদরভর্ত্তি করে খাওয়া কিংবা একেবারে কম খাওয়া তাহাতেও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়। অত্যধিক মাংসজাতীয় খাদ্যের ব্যবহারেও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। খাদ্যের মধ্যে জলীয় ভাগ যদি কম থাকে কিংবা কোন ফলমুলের ব্যবহার যদি বন্ধ থাকে। অসময়ে এবং অনিয়মে খাওয়া—চা, সুরা ইত্যাদি শরীর ক্ষয়কারী খাদ্যের প্রচুর অপচয়ে।

৪। প্রকৃতি যাহারা কিছু কাজকর্ম্ম করেন না প্রায়ই শুইয়া, বসিয়া কাটিয়ে দেন ও প্রচুর সুখাদ্য বা মস্‌লাযুক্ত খাদ্যের ব্যবহার করেন তাহাদের অন্ত্রনালীর পরিসর বৃদ্ধি পায় ও কালে কোষ্ঠবদ্ধতা অচিরে দেখা দেয়।

দেশীয় মল্ট ঘটিত ঔষধ।

—:*:—

মরূ মল্ট (Morrhu Malt) : এ যাবত ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র জন্য কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাজারে সাধারণতঃ যে কডলিভার অয়েল বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নহে। এবং তাহাতে ভাইটামিনের পরিমাণও কম, বিশেষতঃ কডলিভার অয়েল বিস্বাদ বলিয়া ইহা ব্যবহার করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ কডলিভার অয়েলের সহিত "বি" ভাইটামিনযুক্ত মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত করিয়া মরূ মল্ট প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে কডলিভার অয়েলের দুর্গন্ধ নাই, খাইতে সুস্বাদু, এবং ভাইটামিন 'এ' 'বি' ও 'ডি' তিনটীই রহিয়াছে বলিয়া বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা ক্ষয় ফুসফুসের রোগ প্রভৃতিতে আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়।

মল্ট লেসিথিন ফস্‌ফেইট (Malt Lecithin Posphate), ইহাতে মল্ট একষ্ট্রাক্টের সহিত কডলিভার অয়েল, লেসিথিন, গ্লিসারো ফসফেইট, ষ্ট্রীকনিন ইত্যাদি মিশ্রিত আছে। উহা ব্যবহারে শরীরের পরিপুষ্টির অভাব, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ ও ক্ষয়, স্নায়বিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অতি শীঘ্র নিবারিত হয় এবং অচিরাৎ স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরিয়া আসে।

মল্ট হাইপোফস্‌ফাইট কোঃ (Malt Hypophosphites Co.) : ইহাতে Malt একষ্ট্রাক্ট এবং কডলিভার অয়েলের সহিত কুইনাইন, ষ্ট্রীকনীন, ক্যালসিয়াম, পটেসিয়াম, আয়রণ এবং ম্যাঙ্গানিজ হাইপোফসফাইট্‌স্ মিশ্রিত আছে। শেষোক্ত ঔষধগুলি অতি বিস্বাদ কিন্তু মল্ট একষ্ট্রাক্টের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়াশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে অথচ উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। যক্ষ্মা, শ্বাসকাশ, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ অতিশয় কার্য্যকরী!

মল্ট ইষ্টন (Malt Easton) : লৌহ ও ষ্ট্রীকনীন-ঘটিত ইষ্টন সিরাপ স্বভাবতঃই তিক্ত ও বিস্বাদ, মল্ট একষ্ট্রাক মিশ্রিত ইষ্টন সিরাপ সুস্বাদু ও অতিশীঘ্র উপকার দর্শায়, বিশেষতঃ মল্টের পুষ্টিকারক গুণ থাকাতে Malt Easton উৎকৃষ্ট টনিকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, রক্তহীনতা, বাত ইত্যাদিতেও ইহা অশেষ হিতকারী।

ভাইনো মল্ট (Vino Malt) : (মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত ওয়াইন (মদ্য) পেপসিন, গ্লিসারো ফসফেইট্‌স্ ইত্যাদি) এই উপাদানগুলিই ভাইনো মল্টের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে ইহার কার্য্যকারিতা নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। সুস্থ শরীরে অল্পমাত্রায় ব্যবহারে ইহা মন প্রফুল্ল রাখে, শরীরকে শ্রান্ত, ক্লান্ত হওয়ার অবসর দেয় না, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতায় এবং অবসাদগ্রস্ত নিরাশ জীবনেও পরিপূর্ণ সুস্থতা ও শক্তি আনিবার জন্য ইহা আদর্শ আবিষ্কার। দশাগ্রস্ত রোগীতে এবং বার্দ্ধক্যের জরাতে ভাইনো মল্ট অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চালন করে।

রেডিয়েটেড মল্ট (Radiated Malt) : ইহা মল্ট একষ্ট্রাক্ট, ইর‍্যাডিয়েটেড কলেষ্টারিণ, ইষ্ট প্রভৃতি সম্বলিত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ ভাইটামিন খাদ্য। যাহারা ভাইটামিনযুক্ত আহার্য্য গ্রহণে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে রেডিয়েটেড মল্ট একান্ত ব্যবহার্য্য। ইহা শরীরের গ্লানি নিবারণ করে এবং উপরোক্ত কারণে ক্ষয় প্রভৃতি যে সব দুরারোগ্য রোগ জন্মিতে পারে, তাহাদের আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করে। শিশুদিগের ও দুর্ব্বল মাতারও ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক, কারণ ভাইটামিন শুধু জননীকেই স্বাস্থ্যবতী করে না উপরন্তু জননীর স্তন্য দুগ্ধের সহিত উহা শিশু শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে।

ম্যারো মল্ট (Marrow Malt) : অস্থি ও মজ্জার যথাযথ পরিপুষ্টি না হইলে, এবং শিশুদের শরীর গঠনের পক্ষে, ইহার উপকারিতা অসাম। বাল্যাবস্থায় ম্যারো মল্ট ব্যবহারে বার্দ্ধক্যের অবসাদ ও জরা হইতে বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়

———

৫। যথাসময়ে মলের বেগ আসিলে তাহা রোধ করিবার চেষ্টা কিংবা অধিকন্তু অকারণ লজ্জা-বশতঃ নিয়মের ব্যতিক্রমে। ঠিক নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের বাসনা না থাকিলে

স্থানীয় কারণ সমূহের উল্লেখ—

১। পেটের মধ্যে কোন অর্ব্বুদের চাপ।

২। অন্ত্রের সংকোচন কিংবা পরস্পর জোড়া লাগিয়া যাওয়া।

৩। কোন রোগের পর যথা—টাইফয়েড, পেটের ক্ষয় রোগ ইত্যাদি।

৪। মলদ্বারে কোনও ক্ষত কিংবা অর্শ।

৫। পিত্তের নিঃসরণ কমিয়া যাওয়া কিংবা ভিতরস্থ গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ার ব্যাঘাত।

৬। মেরুদণ্ড মধ্যস্থ স্নায়বিক ব্যাধিতে মস্তিষ্কের ব্যারামে।

৭। মলনালী স্বাভাবিক স্থান হইতে একটু নামিয়া গেলে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্যের লক্ষণবিশেষ—কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকলে মেজাজ সর্ব্বদাই খিটখিটে হয়—কিছুই ভাল লাগে না খালি অলসের মত বসিয়া থাকতে ইচ্ছা করে খাবার কোন ইচ্ছা থাকে না ও পেটটা বেশীর ভাগই ভার বোধ হয়। কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে স্বতঃই শরীরে বিষ উৎপন্ন হয় ও তাহাতে মাথা ভার বোধ হয়, অপরিস্কার জিহ্বা দেখা যায়, মুখ দিয়া দুর্গন্ধ নির্গত হয়। গা হাত বড় রুক্ষ মনে হয় ও একটা ক্লান্তি এবং অবসাদ ভাব এসে পড়ে। ঘুমেরও ব্যাঘাত হয়। ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখা কিংবা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠা এসব ইহারই ফলে। আমরা যাকে পেট গরম বলি সে এই কোষ্ঠ-কাঠিন্যরই কারণ, তাতে পেটে বায়ু হয়, গড়্‌গড়্‌ ক'রে আওয়াজ হয় ও বড় অস্বস্তিভাব বোধ হয়। মুখে ব্রণ, মেচেতা বা চোখের কোলে কাল দাগ দেখা যায়। মেয়েদের ঋতুর গোলমাল কিংবা কোমরে ব্যথা এই সব কারণই হয়। ছোট ছেলেদের তড়কা হয়। শরীরের রক্তের জোর কমিয়া যায়।

আজকাল প্রায়ই ভদ্রলোকদের মধ্যে Blood press বলিয়া একটা রোগ দেখা যায় যাহাতে রক্তের চাপ বড় বেশী বাড়িয়া যায়, এ সমস্ত শরীর মধ্যস্থ রক্তের ময়লারাশি মল দ্বারা সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না ব'লে তাই বেড়ে যায়। মানুষের অকাল বার্দ্ধক্য এসে পড়ে।

বাতব্যাধি এই কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে।

কোষ্ঠ পরিস্কার না হওয়ার ফলে—অন্ত্র মধ্যস্থ চাপের প্রয়োগে অনেক ব্যাপার দেখতে পাই—

১। অন্ত্রনালী ফুলিয়া যায়।

২। বেশী মল কঠিন হইলে অর্শ বা বলী দেখা দেয়।

৩। অন্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইতে পারে বা অন্ত্রের প্রদাহ হয়।

৪। অন্ত্রের প্রদাহ যদি বেশী হয় এবং ক্রমশঃ সেটা সারিয়া যায় তাহ'লে অন্ত্রের খানিকটা অংশ সঙ্কুচিত হয় ও তাহার মধ্য দিয়া মল অল্প পরিমাণে যাইতে পারে।

৫। কখন মলদ্বার ফাটিয়া শোষ কিংবা নালী ঘা উৎপন্ন হয়।

৬। অতিরিক্ত কুন্থনের ফলে মলদ্বার স্বস্থান হইতে নামিয়া যায় ও কষ্টদায়ক হয়।

৭। যকৃতের দুর্ব্বলতা আসে ও কামলা অর্থাৎ ন্যাবা দেখা দেয়।

৮। কখন কখন পেটে আম উৎপন্ন হয় ও অসহ্য যাতনা হয়।

(ক্রমশঃ)

—পুরাতন গল্প—

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্বেবদশাস্ত্রী, এল্, এ, এম, এস]

ঠাকুরদা'র বৈঠকখানা।

দুই বন্ধুতে তর্ক হইতেছে। আর সবাই বসিয়া আছে, কেউ বা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে—আর কেউ বা তর্কের মাঝে দু'এক কথা বলিতেছে যেন তার এ বিষয়ে কত জ্ঞান না জানাইলে নয়। আর আমাদের ঠাকুর দা সেই যে হুঁকাটি লইয়া টানিতেছেন তো টানিতেছেনই। তর্কের বিষয় হইতেছে—দেশ উদ্ধার নহে। কে অ-রোগী ? কে রোগ ভোগ করে না, তাই।

তর্ক অনেক দূর চলিয়াছে।

একজন বলিলেন, যে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলে সেই অ-রোগী। সবাই অমনি এক সুরে বলিয়া উঠিলেন তা বটে, তা বটে। দ্বিতীয় বন্ধু ছাড়িবার পাত্র নহে, তিনি বলিলেন সে কিরূপ ?

বন্ধু অমনি বলিয়া উঠিলেন—আর এও বোঝ না! সবাই অমনি বলিলেন—ওহে স্বাস্থ্যরক্ষা পড়নি ?

দ্বিতীয় বন্ধু—না ভাই, সে সব মনে নেই! বল তো ভাই স্বাস্থ্য বিধিটা কি ?

প্রথম বন্ধু তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন—আগেকার লোকে স্বাস্থ্য বিধি মানিয়া চলিত তাই তারা দীর্ঘজীবী হইত, আর এখন আমরা সে সব মানি না তাই তো এত রোগে ভুগি—মাঝখান থেকে দ্বিতীয় বন্ধু বলিলেন ওহে থাম, থাম, তোমার স্বাস্থ্য বিধিটা কি তাই বল, আগেকার কথা আমি শুনতে চাই না।

প্রথম বাবু চটিয়া যাইলেন—ওই তো তোমাদের দোষ, আগেকার কথা শুনতে চাই না ব'লেই তো এত দুঃখ পাচ্ছ। তা স্বাস্থ্য বিধি মানিয়া চলা মানে—খুব সকালে উঠে কিছুক্ষণ মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, খালি-পেটে চা না খাওয়া—তা তোমরা তো শুনবে না, আচার্য্য দেবও তো তাই সেদিন বলেছেন চা পান না বিষ পান। সকালে ছোলা ভিজা খাওয়া—হাঁ, বেণ্টলি সাহেব তো জোর করেই বলেছেন অঙ্কুরিত ছোলা ভিজায় যথেষ্ট ভাইটামিন আছে। বাঙ্গালী ভিজা ছোলা খায় না, তাই এত রোগে ভোগে, ভাইটা-মিন না খাইলে রোগ প্রতিষেধক শক্তি আসিবে কোথা থেকে ? খালি পেটে চা খাবে তা শক্তি পাবে কোথায়, বুঝলে ?

দ্বিতীয় বন্ধু বলিলেন, না ভাই কিছু তো বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সবাই অমনি একবাক্যে বলিয়া উঠিল, বাঃ এ তো সোজা কথা—জলবৎ তরলং; এ বুঝলে না!

ঠাকুরদা' এতক্ষণ বুঝি নিঝুম মেরেছিলেন, একবাক্যে সকলকে চীৎকার করতে দেখে তাঁর বোধ হয় সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি এইবার গম্ভীর স্বরে বল্লেন, ওহে একটা গল্প বলি শোন। সবাই যেন এতক্ষণ এরই জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই তারা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ঠাকুরদা' বল্‌তে লাগলেন

একদিন স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির মনেও এই প্রশ্ন জাগে "কোহরুক"। কে অ-রোগী? বৈদ্যরাজ গভীর চিন্তায় মগ্ন, এ প্রশ্নের সমাধান যেন আর হইতেছে না, এমন সময় এক পাখী ডাকিয়া উঠিল "কোহরুক"। ঋষিরও চমক লাগিল, তবে কি এ পাখীরও মনে এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে কোহরুক? স্বর্গবৈদ্য ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি তাঁর মনে উদিত হইল,—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্!

বৈদ্যরাজ যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন মনে করিলেন এমন সময় পাখী আবার ডাকিল কোহরুক? বৈদ্যরাজ তখন ভাবিলেন তবে কি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাই নাই? ঋষি আবার ধ্যানস্থ হইলেন, তাঁহার মনে পড়িল —

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদগামী বাম শায়ীচ ॥

অর্থাৎ—পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে পর হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া শ্রমশীল ব্যক্তি যদি আহারের পর শত পদ ভ্রমণ করিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করেন তবে সে অ-রোগী থাকিবে।

সবাই এতক্ষণে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, এমন সময় প্রথম বন্ধু বলিলেন হাঁ ঠাকুরদা' তুমি বল্‌তে জান বটে।

ঠাকুরদা' বলিলেন, ভায়া হে, দাঁড়াও আমাকে শেষ করতে দাও। যখন কথাটাই পেড়েছ তখন শোন ভলে করে শোন।

বৈদ্যরাজ তখন ভাবিলেন হাঁ, আমার প্রশ্নের কি যথার্থ উত্তর পাইয়াছি—এমন সময় পাখী আবার কোহরুক কোহরুক ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। ঋষির তখন মনে পড়িল না, উত্তর যথার্থ হয় নাই। তখন ঋষির মনে পড়িল

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদগামী বাম শায়ীচ ॥
অবিজীত মূত্র পুরীষি খগেন্দ্র।
সোহরুক সোহরুক সোহরুক ॥

অর্থাৎ হে খগেন্দ্র! যে ব্যক্তি জীর্ণান্তে হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় আহার করতঃ শ্রমশীলভাবে জীবন অতিবাহিত করে, আর আহারের পর শতপদ পরিভ্রমণ করতঃ বাম পার্শ্বে শয়ন করে এবং কখনও মলমূত্রের বেগধারণ করে না সেই নিরোগী। সে কখনও রোগ ভোগ করে না।"

ঠাকুরদা বলিলেন বুঝলে ভায়া ঋষির এই উপদেশই আয়ুর্ব্বেদের পাতায় পাতায়, তাই আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসার কথা ভিন্ন এই যাকে তোমরা বল Prevention is better than cure এই কথাই বার বার লেখা আছে।

এমন সময় ঘড়িতে ঠং করিয়া নয়টা বাজিল। তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল চল ভাই চল বাড়ী যাওয়া যাক, কাল ছেলেটাকে পড়িয়েছি Go to bed at 9 নিজে যদি না মানি ছেলেটা মানবে কেন?

একে একে সবাই তার অনুসরণ করিল।

—আজ-কাল।

দেশীয় ঔষধের প্রয়োজনীয়তা

(শ্রীননীগোপাল নিয়োগী)

দেশ আজ স্বাধীনতার পথে চলেছে। কিন্তু স্বাধীনতা ব'লতে শুধু বৈদেশিক প্রভুত্বের হাত হ'তে মুক্তি পাওয়া নয়, সর্ব্বতোভাবে পরনির্ভরশীলতার হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার নামই স্বাধীনতা। তাই শিল্পকলা, ব্যবসায়-বাণিজ্য—সকল দিক দিয়াই দেশের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেছে।

এই হিসাবে আয়ুর্ব্বেদীয় জগতেও একটা বিশেষ রকম নাড়া-চাড়া প'ড়েছে। নাড়া-চাড়া পড়েছে অর্থাৎ জাগরণের প্রেরণা এসেছে একথা আজ আমাকে অতি দুঃখের সহিতই ব'লতে হচ্ছে। কেননা, এমন দিনও গেছে, যখন ভারত কবিরাজ ভিষকেরই রাজ্য ছিল। আজ সেই আয়ুর্ব্বেদের স্থানে বিদেশী চিকিৎসা ভারত জুড়ে ব'সেছে। আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোকের পক্ষে রঙ্গের নেশায় মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সেই প্রাচীন পৌরাণিক যুগের মানুষের চেয়ে আজ যে মানুষ বেশী বাঁচতে পেরেছে ব'লে আমার কোন নজীরই এখনও পাইনি।

আজকাল শিশুরা পেট থেকে প'ড়েই এই বিদেশী ঔষধ গলাধঃকরণ ক'রে ক'রে প্রাণান্ত হ'য়ে ওঠে—কিন্তু সেদিনও তারা একটু তুলসী পাতার রস ও মধু খেয়ে ব্রঙ্কাইটিজ রোগের হাত থেকে অনায়াসে আরোগ্য হয়েছে, যে রোগের নামে আজ-কাল বিলাতী চিকিৎসা মহলে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে যায়। অথচ এর জন্য কবিরাজ ভিষক বা আজকালের লম্বা চওড়া উপাধিধারী চিকিৎসকদিগের সাহায্যও দরকার হ'ত না; বাড়ীর মেয়েরাই তাদের শৈশব কালটা সকল প্রকার রোগের হাত থেকে আগুলিয়া রাখত। এই রকম সাধারণ গাছ-গাছড়ায় কত মহা মহা রোগ যে সেরে যায় তার ইয়ত্তা নেই।

আজ আমি একথা স্মরণ ক'রেও আনন্দ পাই যে, এই গাছ-গাছড়াই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ এবং ইহা ভারতের জাতি-ধর্ম্মোপযোগী পবিত্র এবং বিশুদ্ধ। ইহার প্রমাণ আমরা অনেক পাই। এখনও দেশে বহুলোক আছেন যাঁরা কবিরাজী ঔষধ না পেলে মরতে রাজী আছেন তবুও বিদেশী ঔষধ খেতে রাজী নন। ইহা অবশ্য প্রশংসার বিষয় নহে। কারণ যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহা হইলে দেশী ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধও খাওয়া দরকার। আর একথা মহর্ষি চরকও ব'লেছেন যে, সেই দ্রব্যই ঔষধ যাহাতে রোগ আরোগ্য হয়। মহর্ষি চরকের মত যে কত উদার ছিল তাহা বলিবার নয়। তাই আমি ততটা গোঁড়া নই বা বিলাতী ঔষধের উপর আমার বিদ্বেষ বা কবিরাজী ঔষধের প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি কোন দিন ছিল না, কিন্তু আজ দেশের হাওয়ায় আমাকে একথা বলতে বাধ্য করেছে—শুধু আমাকে কেন অনেক লোককেই ক'রেছে নইলে দেশীয় ঔষধের

প্রতি লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে চলেছে কি ক'রে? পূর্ব্বে যদি মানুষ সজাগ থাকত তাহ'লে আমাদের যা ছিল আজ নেই কেন? মহাত্মা গান্ধী ব'লেছেন—"সভ্যতার আতিশয্যে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেরূপ জটীল হ'য়ে পড়েছে তাতে ক'রে আবার তাদের সেই প্রাচীন যুগের অনাড়াম্বরতার মধ্যে ফিরে যেতে হবে—তবে যদি তারা সুখ পায়।"

ডাঃ ওয়াজি বলেন—"আজ যদি দেশে চরকের চিকিৎসার প্রচলন হয় তাহা হইলে দেশ হইতে শব-বাহকের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে।" এইরূপ মত আজকাল অনেক বিদেশী চিকিৎসকেরও।

যে চরকা—অসভ্যতা বলে মানুষ ত্যাগ করলে স্বাধীনতার আদর্শ হ'ল আবার তাই গ্রহণ করা; কাজেই আবার সব একে একে ফিরে আসতে আরম্ভ ক'রেছে—History repeats itself এর মত।

মহাত্মা জী একথাও ব'লেছেন,—"ভারতের—সর্ব্বপ্রকার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি কামনা ক'রতে হ'লে **"আয়ুর্ব্বেদ ও আমাদের নজর এড়াবে না।"**

যাঁরা মনে প্রাণে হিন্দু তাঁরা দৃঢ়ভাবে হিন্দু শাস্ত্রের অনুপন্থী। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও পৌরাণিক যুগের মুনি ঋষি—যাঁরা ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে-বিচারে আমাদের জীবনকে নীতির বাঁধনে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখে গেছেন, তাঁদেরই তৈরী। সুতরাং তার প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হ'তে পারে না। তবে সময়ের ফেরে মানুষের রুচির বিপর্য্যয়ে যে টুকু পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে, সময়ে আবার ফিরে আসবে।

আজ আগেকার কথা মনে হ'লে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যায়। মাঝে মাঝে যে দুটো একটা 'শিউলি ফুলের' গাছ দেখতে পাই তার ফুল দেখে প্রাণের কবিত্বই শুধু জেগে ওঠে। সেদিন একটা গ্রাম্য লোককে জ্বর বন্ধ করবার জন্য 'শউলি' পাতার রস পান করতে দেখে, গেঁয়ো ব'লে ঠাট্টা ক'রে বলিছি—"বোকারাম কুইনিন খেতে পারনা? ৪টে বড়ির দাম তিন চার আনা।"

সে বললে—"ভয়ানক মাথা ধরে যন্ত্রণা হয় যে?"

বললুম—"গরম গরম আধসের টাক দুধ খাও—দাম আটটা পয়সা বইত নয়?"

সে হেসে বললে "তাহ'লে আমাকে বোকা ব'লে প্রমাণ করতে পারলে না, কারণ আমি যে ওষুধ খেলুম তার এক পয়সাও দাম নেই সুতরাং বিষয়-বুদ্ধি হিসাবে তুমিই বরং বোকা।"

তারপর সে আরও বললে যে,—"আমাদের দেশে যত বন গাছ দেখছ যাহার উপকারিতা আমরা জানিনে ব'লে আগাছা মনে করি, ওগুলো সবই ঔষধের গাছ; ওদের সম্বন্ধে যাঁরা বেশী জানেন তারা হলেন কবিরাজ ভিষক; যখন আমাদের ক্ষমতায় কুলোয় না তখন আমরা তাঁদের কাছেই যাই। কারণ আমার ত মনে হয় যেদেশের প্রাণী সেই দেশের ঔষধেই তার রোগ সেরে থাকে, কি কাজ বাপু, জ্বর বন্ধ করতে অন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়া? আমাদের দেশে আগে এত রোগ ছিল না এত রোগের নামও কেউ শুনিনি, কে জানে বিদেশী ঔষধ খেয়ে খেয়ে এই সব রোগ হচ্ছে কিনা?"

তার যুক্তি শুনে মনে মনে লজ্জা পেলুম। মনে হ'ল আমাদের দেশের গৌরব বুক দিয়ে গ'ড়ে কেউ যদি টেনে ধরে থাকে তা ওরাই—ঐ অসভ্য পল্লীর

লোকেরা। আমাদের নষ্ট করিবার কিছুই নেই — আমরা শুধু সভ্যতার দোহাই দিয়ে সব নষ্ট করতেই বসেছি।

তাই এখন সদাই মনে হয়—ভগবান দেশের গৌরবের জিনিষ যা, তা'কে বুদ্ধির দোষে হেয় মনে ক'রে যে অপরাধ করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।

বিবিধ

পরলোকে ডাঃ বিনয়কুমার মজুমদার—৫২ বৎসর বয়সে ডাঃ বিনয়কুমার মজুমদার তাঁহার কলিকাতাস্থ স্কটলেনস্থ বাটীতে প্রায় বৎসরাবধি কর্কটরোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছেন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটী কৃতি ছাত্র। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পর ইহাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ পদক ও স্কলারসিপ ছাত্রকালীন্ ইনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ইনি মেডিসিনএর অধ্যাপক ছিলেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এডিসনাল ফিজিসিয়ান হইয়াছিলেন। কলিকাতায় সুচিকিৎসক বলিয়া ইহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইহাঁর একটী পুত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক সংবাদ—১লা নবেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এটর্নি শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত ৬৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি এটর্নির ব্যবসা বন্ধ করেন। বাঙ্গালীকে উন্নত ধরণের কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য তিনি দেওঘর রিখিয়াতে অনেক জমী লইয়াছিলেন ও এজন্য তিনি বহুটাকা ব্যয় করেন। ঐ সমস্ত জমী তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু—রিপন কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুতে শিক্ষাবিভাগের একটী অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আজ শিক্ষাগগন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী কৃতী ছাত্র। বহুপূর্ব্বে ইনি ভাগলপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া স্বর্গগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে রিপন কলেজে লইয়া আসেন ও বহুদিন যাবৎ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

ভারতবর্ষ হইতে সোনা উধাও—ইতিপূর্ব্বে প্রায় দুই কোটী টাকা মূল্যের সোনা এদেশ হইতে বিলাতে রপ্তানি

হইয়াছে। গত ২৪শে অক্টোবর যে জাহাজ বিলাত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে তাহাতেও প্রায় দেড় কোটী টাকা মূল্যের সোনা ও মোহর বিলাতে পাঠানো হইয়াছে। গত ৩১এ অক্টোবর 'চিত্রল' নামক জাহাজে করিয়া ১২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা ও মোহর বিলাতে চালান হইয়াছে। কলিকাতার বণিকগণের অনুচরগণ বাঙ্গালার পল্লীতে যাইয়া সরল পল্লীবসীগণকে সোনার গহণা বিক্রয় করিতে প্ররোচিত করিতেছে বলিয়া শুনা যায়।

বৃন্দাবনে ম্যালেরিয়া—বৃন্দাবনে প্রায় দেড় মাস যাবত ভীষণরূপে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। এরূপ ম্যালেরিয়া বৃন্দাবনে খুব কমই দেখা গিয়াছে। এদিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়িলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুমাত্র কমিতে দেখা যায় নাই।

১৯৩২ সালের ক্রিকেট খেলা—উত্তর ভারত ক্রিকেট সঙ্ঘের সমিতি ৫ই অক্টোবর তারিখের সভায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার দরুণ বিলাতে ক্রিকেট খেলার আয়োজন ও দেশব্যাপী ভ্রমণ পরিত্যাগ করেন। বোম্বাই ও বাঙ্গলা এইরূপ অভিযানের সম্পূর্ণ বিরোধী বিশেষতঃ অর্থসঙ্কট হেতু এইরূপ ক্রীড়ার জন্য বিদেশ ভ্রমণ একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই চলে। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা এতদ্ সম্পর্কে ৪০,০০০ টাকা চাঁদা দিয়া অনেক পরিমাণে অর্থাভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

উত্তর ভারত ক্রিকেট সঙ্ঘের সমিতি যদিও অর্থ-সঙ্কট জন্য ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হেতু উক্ত ক্রিকেট খেলার পক্ষপাতী ছিলেন না তথাপি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমর্থন পাইলে সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতবর্ষ এম্, সি, সিকে আতিথেয়তা দেখাইতে কখনও অস্বীকার করে নাই কিন্তু উক্ত এম্, সি, সি, সঙ্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ একটী ক্রিকেট খেলার দল পাঠাইতে পারেন নাই।

হকি খেলা সম্বন্ধে নানাদেশ-ব্যাপী ভ্রমণ—মিঃ এ, এম্, হেমান ও তাহার সহকর্ম্মীগণ হকিখেলা সম্বন্ধে ভারতের প্রাধান্য দেশবিদেশে যাহাতে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে তজ্জন্য অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে বিশেষ যত্নশীল তাঁহার মতামত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। তিনি বলেন গতবার এই খেলা সম্পর্কীয় দেশ ভ্রমণে ৪৩,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এ বৎসর যখন 'ল'স এঞ্জিলোস' এই ক্রিড়ায় কেন্দ্র বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, তখন প্রায় ৬০,০০০৲ টাকা দরকার হইবে ও তাহার মধ্যে যাতায়াতের ভাড়া অনুমান ৩০,০০০৲ টাকা লাগিবে। ইহা দ্বারা যদি অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড আমাদের দৌড়ের ভিতর ধরা হয় তাহা হইলে অধিক ২০,০০০৲ টাকা লাগিয়া যাইবে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হকি সমিতি আমাদের থাকিবার ও খাইবার খরচ বহন করিবে ও উপরন্তু সাপ্তাহিক ৫০ পাউণ্ড ও যতগুলি খেলা হইবে তাহাতে খরচ খরচা বাদে লভ্যাংশের তাহার এক দশমিক ভাগ দিতে রাজী আছে যদি ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ তাহাদের একটী হকিখেলার দলকে সেই অনুপাতে আতিথেয়তা দেখাইতে প্রস্তুত থাকে। এপর্য্যন্ত ডুর্যাণ্ড ফুটবল সমিতি একদিনের আয় ৩৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ম্যাডান এণ্ড কোং ৩১৮৲ দিয়াছেন; কলিকাতার

[মোহন]বাগান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন ৬০০০৲ টাকা [দি]য়াছেন। একজন ভদ্রলোক ৩০০০৲ টাকা কিছু কিছু করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গলা হকি এ্যাসোসিয়েশন বেশ মোটাগোছের দান করিয়াছেন। [উ]ইবেরস্‌ কোং হকিষ্টিক্‌গুলি ও বল্‌গুলি অমনি দিতে [স্বী]কার করিয়াছেন। এ যাবৎ কেবল ২১,০০০৲ [টা]কা উসুল হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক হকি এসোসিয়েশনগুলি বেশ মোটাগোছের কিছু দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন; দিল্লী হকি এসোসিয়েসনএর সভাপতি ৪০০০৲ টাকা হইতে ৫০০০৲ টাকা অবধি দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাবে আশা করা যায় যে আরও ২০,০০০৲ টাকা তোলা যাইবে। আপাততঃ আমাদের আর ২০,০০০৲ টাকা বিশেষ দরকার এবং বঙ্গদেশব্যাপী করিতে হইলে ৪০,০০০ টাকার দরকার।

গামার বিলাতে যাবার কথা—

বিশ্ববিশ্রুত কুস্তিগীর গামা ও তাহার ভ্রাতা ইমাম [বক্‌]সকে শীঘ্রই বিলাতে নিমন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনা [দে]খা যায়। ইংলণ্ডে কতকগুলি কুস্তির বন্দোবস্ত [ক]রা হইয়াছে ও তাহাতে যোগদান করার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। কতকগুলি এ্যামেরিকান উদ্যোক্তা দ্বারা এইরূপ আয়োজন সম্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে ষ্টেইনস্‌লাওস্‌ জিবাইজকো নামক পোলিশ এ্যামেরিকান যিনি ভারতে আসিয়াছিলেন ও রুস্তম হিন্দের নিকট পরাজিত হন তিনিও একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও উক্ত কুস্তি প্রদর্শনীর অন্যতম।

যোগীর অদ্ভুত ক্ষমতা—

মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত অন্ধ্রদেশের নরসিংহ স্বামী নামক জনৈক যোগী ৩০শে নবেম্বর সোমবার কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানাগারে তাঁহার অলৌকিক যৌগিক ক্ষমতা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সর্‌ সি, ভি, রমন ও অন্যান্য খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি বিষাক্ত পটাসিয়াম সায়ানাইড মিশ্রিত গাঢ় এ্যাসিড ও তৎসহ কাচখণ্ড, পেরেক ও অপর বিষ অধিক পরিমাণে অনায়াসে গলাধঃকরণ করেন ও তাহাতে শরীরের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের সন্দেহ নিবারণার্থে রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে যথার্থই তিনি উক্ত বিষাক্ত পদার্থগুলি করিয়াছেন ও তাহারা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতে অবাক হইয়া সর্‌ সি. ভি, রমন বলেন যে বিজ্ঞানের বাহিরেও এমন ক্ষমতা আছে যাহা বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে অসমর্থ।

পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 'বরণ'
প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ
'কেশরঞ্জন'
যথাশাস্ত্রীয় আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধালয়
নগেন্দ্র নাথ সেন

"স্বাস্থ্যের" নিয়মাবলী।

স্বাস্থ্যের অগ্রম বার্ষিকমূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। ফাল্গুন হইতে মাঘ পূর্ণ এক বৎসরের মূল্য লওয়া হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "স্বাস্থ্য" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোন উত্তর দিতে অসমর্থ

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ও হিন্দি সংস্করণ স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি
(স্বত্বাধিকারী

কার্য্যালয় ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C 1434.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

HEALTH.

(Bengali)

পৌষ—December.

স্বাস্থ্য

প্রতি সংখ্যা ।০

বার্ষিক ২৲

Ananta

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক —শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ, বি. এল

কার্য্যালয়—১০৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্টীট, কলিকাতা।

সূচী

নবম বর্ষ] পৌষ—১৩৩৮। [১১শ সংখ্যা

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, M. B., ভিষগশাস্ত্রী

আজকাল অনেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উহার গুরুত্ব বুঝিতেছেন। অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ স্কুল, কলেজ, ব্যায়ামাগার, কুস্তির আখড়া ইত্যাদিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে বা এদিকে চেষ্টা হইতেছে. অনেক শিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। আমার মনে হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ঐরূপ পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি মনে রাখা নিতান্ত দরকার নতুবা পরীক্ষিত ব্যক্তিদের কেবলমাত্র দোষ দেখাইলে কোনও ফল হয় না। অভিজ্ঞ ডাক্তার যিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষায় রত হইয়াছেন তাঁহার নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

১। চক্ষু, দাঁত, নাক, গলা, অঙ্গ-বিন্যাস (Posture) প্রভৃতির দোষ খুঁজিয়া বাহির করা।

২। প্রারম্ভ মুখে (Initial) লক্ষণ দ্বারা ক্যানসার (cancer) ইত্যাদি রোগ ধরা। যদিও হাতুড়েরা ইহাকে রক্ত দোষ জন্য হয় ঐরূপ বলেন। সকলেই জানেন যে ক্যানসার বা কর্কট রোগ দোষের জন্য বা কোন প্রণালীর বা যন্ত্রের দোষ জনিত রোগ নহে। ক্যানসার নির্দিষ্ট যায়গায় আরম্ভ হয় এবং যদি প্রথম অবস্থার সময় রোগ নির্ণিত হয় বা ঐ রোগ হবার সম্ভাবনা সন্দেহ করা যায়, ও রোগ ছড়িয়ে পড়বার আগে ধরা পড়ে তাহা হইলে ঐ ক্যানসারটি অস্ত্রোপচার দ্বারা বা চিকিৎসা দ্বারা নিশ্চয়ই সহজে আরোগ্য করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্যানসার প্রথম অবস্থায় কোনও কষ্ট দেয় না ও সেই জন্য প্রায় কেহই চিকিৎসকের কাছে এই রোগের প্রথম অবস্থায় পরামর্শ লইতে যায় না। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় অভিজ্ঞ পরীক্ষক ক্যানসার বা ঐরকম রোগ প্রারম্ভেই

ধরিতে পারেন ও [illegible]বিধারী ব্যক্তিরা এই উৎকট রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

৩। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষক তাহার পরীক্ষার সময় স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি যাহাতে সকল পরীক্ষিত ব্যক্তিই গ্রহণ করেন সেবিষয় উপদেশ দিতে পারেন ও এই গুলির গুরুত্ব বুঝাইতে পারেন। অভিজ্ঞ পরীক্ষক হয়তো পরিক্ষার্থীর শরীরে কোনও দোষ বা রোগ দেখিতে পান নাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই, তাহাদের খাওয়ার, ব্যায়ামের, বা বিশ্রামের বিষয় -দোষ, বা কুঅভ্যাস দেখিতে পাইবেন। সময় মত এই দোষগুলির কথা ও তাহাদের প্রতিকারের বিষয় পরীক্ষিত ব্যক্তিদের বুঝাইয়া দিলে—তাঁহারা সে সকল বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন ও ফলে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের শতকরা ৯৯ জনের খাদ্য বিষয়ে ধারণা অতি অল্প। মোটর চলার জন্য যেমন পেট্রোল, তেল, জল ইত্যাদি সকল রকম উপকরণ থাকিলেও 'কারবুরেটর" (Carburetor) নামীয় নিয়মিত হাওয়া ও পেট্রোল মিশাইবার যন্ত্রটি ঠিক কাজ না করিলে (মোটর) চলেনা—সেইরূপ আমাদের খাদ্য তালিকাভুক্ত সকল রকম খাদ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহার বিভিন্ন উপাদানগুলির, ঠিক ঠিক গুণ ও পরিমাণ না হইলে শরীর পুষ্ট হয় না—এই বিষয় জ্ঞানের অভাবে এদেশে বহুমুত্র রোগ (Diabetes) যক্ষ্মা (Phthisis) যকৃত রোগ (Cirrhosis of liver), সোথ (Brights disease) রক্তের চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি রোগের উপদ্রব শিক্ষিত লোকেদের এত বেশী সহ্য করিতে হয়। এই সকল বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান—এই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় [illegible] দিতে পারেন—আর কেহই পারেন না। ইহা দ্বারা সুধু যে পরীক্ষিত ব্যক্তিদের আয়ু বাড়ান যেতে পারে তা হয় তাঁহাদের জীবনে আনন্দ বৃদ্ধি করেও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। আমি ইহা বলিতে চাহিনা যে, এই সকল বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আদর্শস্থানে পঁহুছিয়াছে—তবে শরীর তত্ত্ববিদেরা তাঁহাদের জ্ঞান ক্রমশঃই বাড়াইতেছেন ও গত ৫।৭ বৎসরের ভিতরে অনেক বিস্ময়কর, অশ্রুতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। সকলের উচিত ঐ জ্ঞানগুলির দ্বারা উপকৃত হওয়া।

৪। (Margin of safety) ঠিক করা স্বাস্থ্য পরীক্ষকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আপনারা সকলেই জানেন যে সাধারণ শিশুর দৈহিক উপাদান (tissue) গুলি তাহার প্রয়োজনের অনেক বেশী দৈহিক শক্তি (vitality) লইয়া জন্মায়। জন্মাবার সময় শিশুর মুত্রকোষ (kidney) তাহার প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার প্রায় ৮ গুণ বেশী কার্য্য করিতে সক্ষম থাকে। আহার অন্যান্য দৈহিক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়গুলিরও ঐরূপ বহুল পরিমাণ সঞ্চিত (reserve) ক্ষমতা থাকে। এই সকল অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলিই প্রায়ই ডিপথিরিয়া (Diphtheria) ক্ষয় রোগ (Tuberculosis) টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বা অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগিয়া বা সাধারণ জীবনের পেষনে ও চাপে কমিয়া যায়; ক্রমশঃ সকল লোকই তাহার যন্ত্রগুলির কোনও না কোনওটির (Margin of safety) গণ্ডী বিপদজনক সীমায় উপস্থিত হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষকের উচিৎ যাঁহারা তাঁহার কাছে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছেন—তাঁহাদের উত্তমরূপে এই সকল সীমার কথা বুঝাইয়া দেওয়া, "তামাদির" পূর্ব্বে জানিতে পারিলে অনেক শিক্ষিত লোকই সাবধান

হইতে পারেন ও তাহাদের পরমায়ু যাহাতে বৃদ্ধি হয় সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। যে যে যন্ত্রগুলি ভাল আছে তাহাদের নিকট হইতে কি প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত, দুর্ব্বল যন্ত্রগুলির কার্য্য যতদূর সম্ভব আদায় করিবার ব্যবস্থা। কিন্তু চিকিৎসকের দেওয়া উচিত যাহাতে পরীক্ষার্থী নিজের শরীরের বিষয় সঠিক বুঝিয়া নিজের কার্য্য প্রণালী ঠিক করিয়া সাবধান হইয়া সুস্থ শরীরে ও মানসিক শান্তিতে সুখে থাকিতে পারে।

৫। পরিশেষে যদি পরীক্ষক মহাশয় কোনও রূপ দোষ না পান, তাঁহার মতে রোগীর সকল যন্ত্র গুলিরই কার্য্য করিবার শক্তির যথেষ্ট অংশ সঞ্চিত আছে—তিনি পরীক্ষার্থীর পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে জোর করিয়া বলিতে পারেন যে "আপনি আর এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন—আপনার শরীরে এখনও কোনও দোষ নাই" এইরূপ সাহস পাইলে সকলে নিশ্চয়ই মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শান্তি পায় ও তাহার জীবন যে নিরাপদ, বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাজ করিতে পারেন।

চক্ষু

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, L. M. S.

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু বলিতে আমরা শোভা সৌন্দর্য্য ও দৃষ্টিশক্তি বুঝি। বৈজ্ঞানিক হিসাবে চক্ষু শুধু দ্রষ্টব্যের উপাদানগুলি স্নায়ু দ্বারা চালিত করিয়া মস্তিষ্কে দর্শন কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেওয়ায় আমাদের প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি আইসে ও আমরা দেখিতে পাই। অনেকের বাহির হইতে চক্ষু দুইটী সাধারণ ভাবে শোভা সম্পাদন করিতে বিরত না হইলেও দৃষ্টিশক্তি সম্যকভাবে দান করিতে অপারগ ইহা দেখা গিয়াছে। রোগের জন্য হউক বা অন্য কোন কারণ বশতঃ—দর্শনকেন্দ্র যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে এইরূপ ঘটে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নানা রহস্যের ভিতর অক্ষিগোলক একটী মহা জটিল রহস্য। সৃষ্টির বিশালতা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়া স্রষ্টার উদ্দেশ্য সম্যক পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত মানবের দৃষ্টিশক্তির আবশ্যক হওয়াতে চক্ষুর উৎপত্তি। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ অনুযায়ী যেমন মানব সর্ব্ব বিষয়ে এবং সর্ব্ব রকমে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত; সেইরূপ চক্ষুও দৃষ্টি বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিজ্জগতে ও প্রাণিজগতে আমরা দেখিতে পাই নিম্নশ্রেণীর এককোষবিশিষ্ট (unicellular organisms) প্রাণিরা ও গাছগুলি তাহাদের সম্পূর্ণ অবয়ব দ্বারা আলোক উপলব্ধি পূর্ব্বক তদপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দ্বারা দৃষ্টিশক্তির পরিচয় দেয়; কিন্তু যখন আমরা বহুকোষবিশিষ্ট (multicellular) এবং নানা জাতীয় যন্ত্রপাতির সমাবেশ উচ্চশ্রেণীর প্রাণিদিগের (highly organised animals) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন দেখি যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কোষের সংমিশ্রণে যে পদার্থ গঠিত হইয়াছে

ও যাহার কার্য্য শুধু "দর্শন" সেই দৃষ্টিশক্তি সাধক পদার্থটী "চক্ষু"। মানুষের শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক যন্ত্রপাতি এইরূপ বিশেষ বিশেষ কোষের সমষ্টি ও তাহাদের পরিণতি। যেমন, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কোষের সমষ্টি ও তাহার পরিণতিতে হৃৎপিণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ এক-জাতীয় কোষের সমবায়ে [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু যখন মুকুরিকাতে কোন পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে তখনও তাহা বিশেষ বিশেষ একজাতীয় কোষেরই সম্মিলন। এক্ষণে চক্ষুর গঠন ও আলোকের ধর্ম্ম জানিলে কিভাবে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া আমরা স্পষ্ট দেখি তাহা বুঝা যাইবে। আলোকের ধর্ম্ম এই যে, যে কোন পদার্থ হইতে নিঃসৃত হইলেই ইহা সরল রেখায় [illegible] কিন্তু উহা যখন কোন তরল পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত ঘন পদার্থ বা ঘন কাচ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ঘন পদার্থের ভিতর দিয়া গমনাগমন করে তখনই সেই আলোকের গতি বক্র হইয়া যায়; এই প্রক্রিয়াকে আলোকের তির্য্যকগতি বা রেখা বক্রীকরণ বা রেখা ভঙ্গিকরণ (Refraction) প্রণালী কহে। আমরা যখন যে পদার্থটী দেখি বা প্রত্যক্ষ করি সে পদার্থটীর ছবি দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু বাহিয়া আলোকরশ্মি চক্ষুর ভিতরকার মুকুরিকা নাম্নী পদার্থে অঙ্কিত করে ও সেই প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত পদার্থটীর অবিকল ছাঁচ উঠায় তদ্রূপ ছাঁচ উঠার দরুণ সেই পদার্থটীর যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই এবং অপর একটী পদার্থের সহিত আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈষম্য ও সুসাদৃশ্য কোথায় এবং কিভাবে নিহিত তাহাও বুঝিতে পারি। প্রত্যেক বস্তু যে আলোকের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় একথা ভুলিলে চলিবে না।

চক্ষুর গঠন তাহার "অক্ষিগোলক" এই নামে কতকটা বুঝা যায়। ইহার আকার প্রায় গোল। এই গোলকের অধিকাংশ ভাগ অক্ষিকোটর মধ্যে অবস্থিত। আমরা সচরাচর শুধু ইহার সম্মুখের অংশ দেখিতে পাই।

চক্ষুর যথার্থ অর্থ বলিতে গেলে ও উহার কার্য্য বুঝিতে হইলে এই বিশেষ স্নায়ুটী, "দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু" (Optic nerve) ও মুকুরিকা নাম্নী পাতলা পর্দ্দার (Retina) কার্য্য বুঝায়। অন্যান্য জিনিষ যাহারা চক্ষু গঠনে সাহায্য করে তন্মধ্যে কেহ আবরণ, কেহ রক্ষণ এবং কেহ বা আহার যোগায়; এইরূপে অক্ষি-গোলকের সৃষ্টি।

চক্ষুর পরিচ্ছদ বা আবরণ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ভ্রূ, নেত্রপক্ষ্ম ও অক্ষিপত্র মিলিয়া চক্ষুর বাহ্য পরিচ্ছদ গঠিত হইয়াছে। ইহারা বাহিরের ধূলিকণা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে চক্ষুকে কতক পরিমাণে রক্ষা করে। অক্ষিপত্রের অভ্যন্তরভাগ কোমল পেশীতন্ত্রের সংযোগত্বক (conjunctiva) দ্বারা ও চক্ষুপত্র-নেত্র-নিমীলনী (orbicularis oculi) পেশীদ্বারা গঠিত। এই পেশী চক্ষুর চারিদিকে রেখার ন্যায় থাকে ও এই পেশীর সঙ্কুচন দ্বারা অক্ষিপত্র বন্ধ হয়। অক্ষিপত্র খুলিবার জন্য নেত্র-নিমীলনী পেশী (Levator Palpebrœ Superior and inferior) নেত্রপ্রান্তে অবস্থিত আছে।

সংযোগত্বক চক্ষু পত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ নেত্র-নিমীলনী পেশীর ভিতরের আবরণরূপে এবং অক্ষি গোলকের শ্বেতমণ্ডল (Sclerotic coat) আবরণের বহির্ভাগ আবৃত করিয়া আছে; ইহাতে সামান্য আঘাত লাগিলেই চক্ষু ফুলিয়া লাল হয় ও অনেক

সময় টস্ টস্ করিয়া জল পড়ে। অক্ষিপত্রের প্রান্তভাগে দুই স্তরে সজ্জিত কেশপংক্তি রহিয়াছে। এই সকল কেশপংক্তির মূলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি-সমূহ আছে ; এই গ্রন্থিগুলি হইতে একপ্রকার রস বাহির হয় ও ঐ রসদ্বারা চক্ষুর পাতা ও কেশপংক্তি-গুলি তৈলাক্ত ও মসৃণ থাকে।

মুখ মণ্ডলের পাত্‌লা অস্থি নির্ম্মিত অক্ষি-কোটরে (orbit) পুরু মেদনির্ম্মিত কোমল গদির উপর অক্ষিগোলক বিরাজ করিতেছে। অক্ষি-গোলকের উপর আঘাত লাগিলে উক্ত মেদ বহুল গদি স্প্রীংএর কার্য্য করে। অক্ষিগোলক অক্ষিকোটরে এরূপভাবে আছে যে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে ও যাহাতে শুষ্ক না হয় তজ্জন্য "অশ্রুস্রাবী গ্রন্থী" (Lachrymal gland) আবশ্যক মত অশ্রু নিঃসৃত করিয়া অক্ষিগোলককে ও আঁখি পল্লবের আবরণ গুলিকে ভিজা রাখে। বেদনা, বিস্ময়, অতিশয় আনন্দ বা গভীর শোকে কোন বিশেষ স্নায়ুর উত্তেজনায় এই গ্রন্থি উত্তেজিত হয় ও অতি মাত্রায় অশ্রু নির্গমন করে। এই অশ্রুর কতকাংশ চক্ষুর ক্রোড় দিয়া গড়াইয়া গালের উপর আসিয়া পড়ে ও বাকীটা "নাসাশ্রুবাহিকা নলী" (naso-lachrymal duct) ভিতর দিয়া নাসাকোটরের মধ্যে প্রবাহিত হয়। সেইজন্য ক্রন্দনের সময় নাসারন্ধ্র হইতে জল বাহির হয়।

চক্ষু বা অক্ষিগোলক। চক্ষু একটা মার্বেল বা কপোত ডিম্বের ন্যায় বড় ও পর পর তিনটা আবরণ বা আস্তরণ দ্বারা গঠিত। এই তিনটী পাত্‌লা পর্দ্দা বা স্তর (tunic) ভিতরের পদার্থ সকলকে আবৃত ও অবরুদ্ধ রাখে। এই পর্দ্দা অবস্থান বিশেষে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়া ভিন্ন যন্ত্ররূপে পরিচিত হইয়াছে। এইবার এক একটী আবরণের উল্লেখ করিব। নিম্নের চিত্র দেখিলে সবিশেষ বুঝা যাইবে।
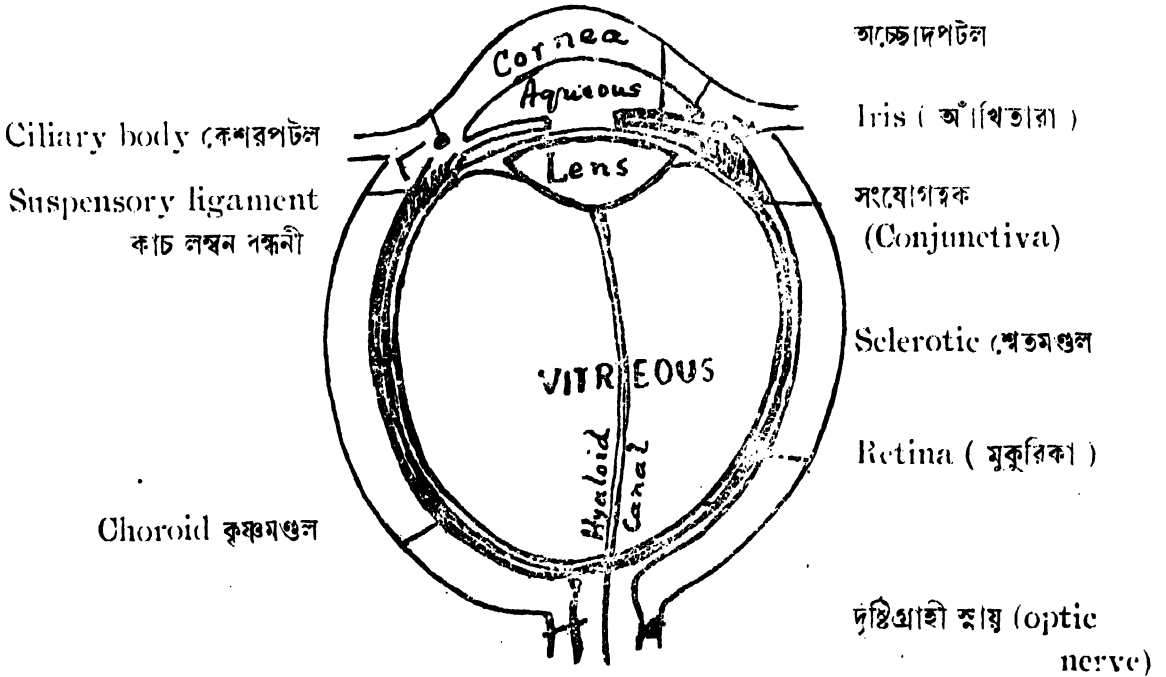
চক্ষু বা অক্ষিগোলক।

১। প্রথম বা বহিরাবরণ—শ্বেতমণ্ডল ও অচ্ছোদপটল দ্বারা গঠিত। ইহা দৃঢ় ঘন সন্নিবিষ্ট সূত্রাকার তন্তু (Fibrous tissues) ও চিক্কণ স্থিতিস্থাপক তন্তুসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত শ্বেতবর্ণ গোলাকার পদার্থ বিশেষ। ইহার প্রধান কার্য্য চক্ষুর ভিতরকার পর্দ্দাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা। অচ্ছোদপটলের উপরিভাগ একটী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucus membrane) দ্বারা আবৃত বলিয়া ইহা এত উজ্জ্বল দেখায়। ইহা চক্ষুমণ্ডলের সম্মুখের পাঁচ ভাগের একভাগ অধিকার করিয়া থাকে। ইহা মুক্ত একটী চুয়ানি আয়তনের ঘড়ির কাচের ন্যায় উপুড়ভাবে বসান। এই স্বচ্ছ গবাক্ষ দিয়া দ্বিতীয় আবরণের কৃষ্ণমণ্ডল দেখা যায়। ইহার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার কারণ প্রধানতঃ রক্তবহা নাড়ীর অভাব। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্ভাগের প্রায় চতুর্থ-পঞ্চমাংশ এই আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বহিরাবরণের কাঠিন্যের দুই স্থানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; যেখানে দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছে ও যেখানে শ্বেতমণ্ডল কঠিনতর-তন্তু বিশেষে (lamina cribrosa) পরিণত হইয়াছে। অচ্ছোদপটল স্বচ্ছতার দরুণ আলোকরশ্মি মুকুরিকাতে প্রবেশ করায় ও রশ্মিপ্রতিভঙ্গ (Refraction) ব্যাপারে সাহায্য করে। এই বহিরাবরণের কাঠিন্যের পোষকতার (nutrition) জন্য বাহিরের সাহায্য দরকার হয় না। শ্বেতমণ্ডল নিজের কতকগুলি রক্তবহা নাড়ী দ্বারা পুষ্ট হয় ও শ্বেতমণ্ডল অচ্ছোদপটলের সংযোগস্থল অচ্ছোদপটলের সন্ধিস্থলে যে সমস্ত রক্তবহা নাড়ী আছে তদ্দ্বারা পুষ্ট।

২। দ্বিতীয় বা মধ্যাবরণ (uvea)—আঁখিতারা কেশরপটল ও কৃষ্ণমণ্ডল দ্বারা সংগঠিত। ইহাও অক্ষিগোলকের গর্ভদিকে শ্বেতমণ্ডলে সংলগ্ন হইয়া চতুর্থ-পঞ্চমাংশ ব্যাপিয়া থাকে। অচ্ছোদপটলের পশ্চাতে এই দ্বিতীয় আবরণ কলারের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া "কেশরপটল" নির্ব্বাচন করে। ইহার মধ্য হইতে পর্দ্দা আকারে বিস্তৃত হইয়া "আঁখিতারা" গঠন করে (ইহা ফটো তুলিবার যন্ত্রের "ডায়াফ্রাম" সহিত তুলনীয়)। আঁখিতারার মধ্যের ছিদ্রটীকে "কনীনিকা" (Pupil) বলা হয়। এই কৃষ্ণমণ্ডল (choroid) ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন বর্ণের কোষ দ্বারা নির্ম্মিত; কাহারও বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও ঈষৎ নীলবর্ণ কাহারও বা ধূসরবর্ণ। এই রঙ্গীন কোষেরা আলোক রশ্মিকে বিকীর্ণ হইতে দেয় না।

আঁখিতারা সঙ্কুচিত বা বিস্ফারিত হইয়া কনীনিকাকে ছোট বড় করে। অন্ধকারে কনীনিকা যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হইয়া বাহির হইতে ক্ষীণতম আলোকরশ্মিটুকু আপনার মধ্যে সংহৃত করিবার চেষ্টা করে ও খুব উজ্জ্বল আলোকে ইহা সঙ্কুচিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোক রশ্মিকে প্রতিরোধ করে আঁখিতারায় নিবদ্ধ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী কনীনিকা ব্যাসের হ্রাস বৃদ্ধি নিয়োগ করে।

আঁখিতারার পশ্চাদ্দিকে কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ থাকে বলিয়া বাহিরের আলোক ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে না পাইয়া কনীনিকার মধ্য দিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দুই পার্শ্বস্থিত আঁখিতারার মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র তাহাকে কনীনিকা (Pupil) কহে। এই ছিদ্র নানা কারণে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। আঁখিতারার চক্রকার পেশীসূত্র দ্বারা কনীনিকা কুঞ্চিত হয়। এতদ্ব্যতীত ক্লোরোফরম্ সুরা প্রভৃতির মত্ততায় প্রথমাবস্থায় এবং অহিফেন, মর্ফিয়া ও কেলাবারবীন প্রভৃতি দ্বারা কনীনিকা কুঞ্চিত হয়। আঁখিতারার বিস্তারণশীল পেশী,

সমূহের কুঞ্চনে ও দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ুর উত্তেজনার হ্রাস হইলে কনীনিকা প্রসারিত হয়। চক্ষুর আভ্যন্তরিক রস বিশেষের (lymph) বহির্নিরোধ হেতু চক্ষুর ভিতরকার চাপ (intraocular pressure) বৃদ্ধি হইলে, শ্বাসরোধকালে, পেশীসমূহের অতিরিক্ত সঞ্চালনে, সুরা প্রভৃতির মত্ততার শেষাবস্থায় এবং এট্রপিন প্রভৃতি ঔষধের দ্বারা কনীনিকা প্রসারিত হয় (dilatation)। চক্ষুতে আলোক পড়িলে যে চক্ষুর কনীনিকা কুঞ্চিত হয় তাহা প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া (Reflex act) উক্ত ক্রিয়ার কেন্দ্র medulla (মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা), চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু (sensory) মুকুরিকা ও দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু এবং সঞ্চালকস্নায়ু (motor) তৃতীয় স্নায়ু (3rd nerve)।

অন্ধকারে যে কনীনিকা প্রসারিত হয় তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়াও উক্ত প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়ার কেন্দ্র সিলিও স্পাইন্যাল স্নায়ু, চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু মুকুরিকা ও দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু এবং সঞ্চালক স্নায়ু সিম্পাথেটিক্।

চক্ষুর স্নায়বিক অংশের পুষ্টিসাধন এই দ্বিতীয় আবরণ দিয়াই হয়। উক্ত আবরণে অনেক রক্তবহা নাড়ী প্রবেশ করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করে। মুকুরিকার রক্তবহা নাড়ী সমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হইয়া (anastomosis) পৃথকভাবে থাকায় রক্ত সঞ্চালনে কোনরূপ ব্যাঘাত বা ব্যত্যয় ঘটিলে মুকুরিকার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; কৃষ্ণমণ্ডলে ক্ষতির সম্ভাবনা অতি অল্প যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন রক্তবহা নাড়ী পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এতদ্ব্যতীত এই মধ্যাবরণের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কার্য্যও দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুরিকায় যে সমস্ত ছবি অঙ্কিত হয় তাঁহাদের স্পষ্টতা উৎপাদনে আঁখিতারা এবং কেশর-পটলের মাংসপেশী সমূহ সাহায্য করে।

Iris (আঁখিতারা) গোলাকার ও কুঞ্চনশীল পেশী বিশেষ; ইহা বীক্ষণ কাচের সম্মুখে অবস্থিত। ইহার বহির্ভাগে আচ্ছাদপটল, শ্বেতমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডলের সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান ও অন্তর্ভাগ কনীনিকা নির্ম্মাণ করে। এই কনীনিকা আঁখিতারার ঠিক্ মধ্যস্থলে স্থিত একটী গোলাকার ছিদ্র বিশেষ। আঁখিতারার পেশীদ্বারা চক্ষু মধ্যে পরিমিত আলোক প্রবেশ করে এবং ইহা আলোকরশ্মিকে বিপথে যাইতে দেয় না (corrects spherical aberration of the lens)

Ciliary body (কেশর-পটল) আঁখিতারা ও কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত ও প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণমণ্ডলের সম্মুখের অংশ। ইহা আঁখিতারার ন্যায় মিশোব্লাষ্টিক ও এপিব্লাষ্টিক দুই ভাগে বিভক্ত। মিশোব্লাষ্টিক অংশ সিলিয়ারি পেশীদ্বারা গঠিত ও শ্বেতমণ্ডলে সংযুক্ত; ইহা অনৈচ্ছিক পেশীসূত্রে (unstriped muscular fibre) নির্ম্মিত। ইহার পেশীসমূহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে পরিচালিত। কতকগুলি লম্বভাবে বিস্তৃত (longitudinal)। ইহার পেশীসূত্রগুলি পশ্চাদ্দিকে কৃষ্ণমণ্ডলে মিলিত হইয়াছে; কতকগুলি পেশীসূত্র বক্রভাবে অবস্থিত (oblique) ও সম্মুখস্থ পেশীসূত্রগুলি চক্রাকারে (circular) অবস্থিত। লম্বদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি সম্বলিত (hypermetropic) চক্ষুতে এই চক্রাকার পেশীসূত্রগুলি অধিকতর গোলাকার হয় ও নিকটদৃষ্টিসম্পন্ন (myopic) চক্ষুতে লম্বভাবে বিস্তৃত সূত্রগুলি অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত। সিলিয়ারি পেশী কুঞ্চিত হইয়া সিলিয়ারি প্রোসেস ও কৃষ্ণমণ্ডলকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণের ফলে বীক্ষণ কাচ বন্ধনী (suspen-

sory ligaments) শিথিলভাবাপন্ন হয় ; বীক্ষণ-কাচ-বন্ধনী শিথিল হওয়ায় বীক্ষণ-কাচ (lens) সূত্রগুলি (fibres) শিথিলভাব ধারণ করে ও অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপকতা গুণে বীক্ষণ কাচটী অধিকতর কূর্ম্ম পৃষ্টাকার (convex) ধারণ করে বিশেষতঃ সম্মুখ দিকে ও অচ্ছোদপটলের নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া আমরা সম্যকভাবে দেখিতে পাই—ইহাকে চক্ষুর নিকট দর্শনোপযোগী ক্রিয়া (act of accommodation) বলা হয়। কেশর-পটলের এপিক্লাষ্টিক অংশ সম্মুখদিকে কুঞ্চিত ভাবাপন্ন হইয়া সিলিয়ারি প্রোসেস (ciliary processes) নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; এই অংশে রক্তবহা নাড়ীসকল প্রবেশ করে। এই অংশের বহির্ভাগ কালরংয়ের কোষগুলির দ্বারা ব্যাপ্ত এবং এই কালরংয়ের কোষগুলি (Black Pigment) অাখিতারা ও মুকুরিকার কালরংয়ের কোষগুলির সহিত অব্যাহতভাবে সংযুক্ত (continuous)। কৃষ্ণমণ্ডল ভিতর দিকে ঘুরিয়া গিয়া সিলিয়ারি প্রোসেস নির্ম্মাণ করে।

Choroid (কৃষ্ণমণ্ডল) uveaর পশ্চাদংশ যাহা কেশর পটলের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত তাহাকে কৃষ্ণমণ্ডল বলা হয়। মুকুরিকার কালরংয়ের কোষ-সংযুক্ত পর্দ্দার (Pigmentary layer) পোষণের অভাবঘটিত কৃষ্ণমণ্ডল দোষযুক্ত বা পীড়িত হইলে মুকুরিকাও সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট বা পীড়িত হয়। কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতমণ্ডলের সহিত দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ুর প্রবেশ পথে বিশেষভাবে সংলগ্ন ; অন্যান্য স্থানে ইহারা আলগাভাবে সংশ্লিষ্ট। যে সকল আলোক-রশ্মি মুকুরিকা ভেদ করিয়া যায় ও যাহাতে তাহারা পুনরায় না প্রতিফলিত হইতে পারে তন্নিবারণার্থে—ইহার কৃষ্ণার্ণ কোষগুলি কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পেচক প্রভৃতি নিশাচর প্রাণীদিগের কৃষ্ণমণ্ডল না থাকায়, উজ্জ্বলালোকে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি স্ফুরিত হয় না। শরীরের লোম ও ত্বকের কৃষ্ণার্ণ কোষগুলির আধিক্য থাকিলে কৃষ্ণমণ্ডলেও ঐ সকল কোষের বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে যাহারা দেখিতে সুন্দর তাহাদের চক্ষু কটা ও যাহারা শ্যামবর্ণ তাহাদের চক্ষু ভ্রমরকৃষ্ণ।

৩। তৃতীয় বা ভিতরাবরণ (Retina)—এই অধিষ্ঠানভূমি অক্ষিগোলকের তৃতীয় বা নিম্ন আস্তরণ এবং ইহার নাম মুকুরিকা। ইহা প্রকৃতপক্ষে রূপবহা বা দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ুর বিস্তৃতি ; দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ করণান্তর অক্ষাভ্যন্তরে মুকুরিকা নামে ব্যাপ্ত। ইহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চরম প্রান্তিকা দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র জালবৎ আস্তরণ। মুকুরিকার কেন্দ্রস্থলে 'পীতবিন্দু' (Yellow spot or Macula Lutea) নামে একটী অত্যন্ত সংবেদনশীল (Sensitive) বিন্দু বর্ত্তমান ; এই বিন্দুতে কোন পদার্থের প্রতিমূর্ত্তির (image) অঙ্কিত হইলে সম্যক্ স্পষ্টরূপে দর্শন হয়। এই পীতবিন্দুর ভিতর দিকে যেখানে দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করে সেখানে সূক্ষ্মদণ্ডাকৃতি কোষ ও মোচাকৃতি কোষগুলির (Rods and Cones) অভাববশতঃ কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহাকে অন্ধ বিন্দু (Blind Spot) কহে। ইহার সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ৮টী সুচিক্কণ স্তর বা পর্দ্দা আছে। যথা, ১। স্নায়ুসূত্র, ২। স্নায়ুকোষ, ৩। আভ্যন্তরিক আণবিক স্তর (internal molecular layer) ৪। আভ্যন্তরিক কেন্দ্রীয় স্তর (internal unclear layer) ৫। বাহ্য আণবিক স্তর External molecular layer) ৬। বাহ্য কেন্দ্রীয় স্তর (External nuclear layer) ৭। সূক্ষ্মদণ্ডাকৃতি ও মোচাকৃতি স্তর (layer of Rods and Cones) ৮। কৃষ্ণবর্ণ কোষ নির্ম্মিত স্তর (Pigment layer)।

(ক্রমশঃ)

জান্তব ও উদ্ভিজ্জাহার। (Animal vs. Vegetable Food)

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌ এম্‌ এস্‌।

যাঁহারা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুদের দেহের আকৃতির তুলনায় শক্তির কথা ভাবেন; বা যাঁহারা মাংসভোজী পাশ্চাত্যদিগের প্রভুত্ব ও কর্ম্ম-কুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হন, তাঁহারা মনে করেন যে, উদ্ভিদভোজীরা অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল, খর্ব্বাকার ও রোগ-প্রবণ। এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা উঠে। প্রথমটি এই—উদ্ভিজ্জাহার ও জান্তব খাদ্যাহারের তুলনায় কোনটি ভাল? কোষ্টকাকারে ইহাদের পরস্পর গুণাগুণ বলিতেছি—

ANIMAL FOOD

গুণ—১। রক্তের ফাইব্রিন্‌, কণিকা ও ফস্‌ফেটের মাত্রা বাড়ায়; ফলে, দেহের জীর্ণাংশ মেরামত ও নূতনাংশ সহজে গড়ে। ২। মাংসপেশীকে দৃঢ় ও কর্ম্মঠ করে। ৩। দেহে মেদবাহুল্য ঘটাতে দেয় না; থাকিলে, তাহা কমায়। ৪। রোগ প্রতি-রোধক শক্তি বাড়ায়। ৫। দেহের অক্সিজেনের অভাব বাড়ায় বলিয়া, লোককে চঞ্চল ও পরিশ্রমী করে। ৬। পেটের খোল ও ভুঁড়ি বাড়ায় না। ৭। স্বল্প রন্ধনেই সুপাচ্য হয়—কম চিবাইলেও হজম হয়। ৮। ইহারা সহজেই absorbed হয়।

দোষ—১। দেহে ইউরেট, ফস্‌ফেট্‌, সালফেট ও ইউরিয়ার মাত্রাধিক্য হয় বলিয়া, কিডনীর কায বাড়ে। ২। কোষ্ঠবদ্ধতা আনে। ৩। রক্তের ক্ষারধর্ম্ম কমায়। ৪। উদরে নানা রকম কৃমি ও জীবাণু প্রবেশের পথ করিয়া দেয়। ৫। খাদ্যের মূল্য বেশী পড়ে। ৬। বাত, পাথরী প্রভৃতি ব্যারাম সৃষ্টি করে। ৭। ক্রোধ ও কামোদ্দীপক। ৮। দমকা জোরের কায করিবার শক্তি দেয়, কিন্তু দীর্ঘকাল কায করিবার শক্তি তত দেয় না।

Vegetable Food

গুণ—১। সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি ও প্রস্রাব হয়। ২। সস্তা ও সুলভ। ৩। রক্তের ক্ষার ধর্ম্ম বাড়ায়। ৪। উপবাস করিবার ও ধীর ভাবে অধিকক্ষণ কায করিবার শক্তি দেয়।

দোষ—১। শরীর তাদৃশ বলাধান করে না এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি সামান্য কমায়। মাংসপেশীকে তাদৃশ দৃঢ় করে না। ২। দেহে মেদ বাহুল্য ও উদরে অম্লরস ও বায়ু বাড়ায়, ভুঁড়ি বাড়ায়। ৩। Arteryদের গায়ে চূণ জমে (atheroma), পাথরীর ব্যারাম আনে। ৪। রাঁধিলেও অনেকক্ষণ না চিবাইলে সুপাচ্য হয় না। এবং সাধারণতঃ পরিপাক হইতে দেরী লাগে। ৫। লোককে শ্রমবিমুখ করে। ৬। উদরে কৃমি আনে।

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশবাসী আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের পক্ষে উদ্ভিজ্জাহারই ভাল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে, ভুলিলে চলিবে না যে, উদ্ভিজ্জাহারীদের পক্ষে, দুধ ও দুধজাত খাদ্যের খুব

প্রচলন আছে—অর্থাৎ তথা-কথিত এদেশের উদ্ভিজ্জাহারীরাও মিশ্রভোজী।

যদি উদ্ভিজ্জাহারীর খাদ্য হইতে দুধ ও ছানা বাদ দেওয়া যায়, তবে পূরা vegetarian ও mixed eaterএর খাদ্যের মধ্যে বোঝাপড়ার কথা থাকে সুধু প্রোটীনকে লইয়া। তাহা হইতে প্রশ্ন উঠে,—জান্তব ও উদ্ভিজ্জ প্রোটীনে তফাৎ কি? এই কথার উত্তর এই :—

১। পরিপাক হইয়া, প্রোটীন, নানা জাতীয় অ্যামিনো আসিডে পরিবর্ত্তিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড্ দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাযে লাগে। জান্তব-প্রোটীনে যত রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড আছে উদ্ভিজ্জ প্রোটীনে তাহা নাই; কাযেই, তাহা পাইতে হইলে, অনেক রকমের ও বেশী বেশী উদ্ভিজ্জাহারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; তাহাতে অজীর্ণ ব্যারাম শীঘ্র জন্মায়। এই তালিকায়, সব-চেয়ে-কম কতটুকু কোন্ জাতীয় প্রোটীন খাওয়া দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা দেখিলেই উপরের উক্তির সার্থকতা বুঝা যায় :

মাংসের	প্রোটীন্—	৩০	গ্রাম
দুধের	,,	৩১	,,
চাউলের	,,	৩৪	,,
আলুর	,,	৩৮	,,
সুঁটির	,,	৫৪	,,
পাঁউরুটির	,,	৭৬	,,
ভুট্টার	,,	১০২	,,

২। প্রোটীন্কে quick fuel বলে—অর্থাৎ, দেহে সবচেয়ে সহজে ও আগে প্রোটীনের ধ্বংস হয়। এ হিসাবে, উদ্ভিজ্জ-প্রোটীন্ জান্তব-প্রোটীনাপেক্ষা সরেস।

৩। জান্তব-প্রোটীন্কে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, স্বতন্ত্র করিয়া, আবশ্যকমত পরিমাণে খাওয়া যায়। কিন্তু উদ্ভিজ্জ-প্রোটীন্কে স্বতন্ত্র করা দুরূহ। কাযেই, যথাযথ পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রোটীন্ ভক্ষণ করিতে হইলে, বহুল পরিমাণে উদ্ভিজ্জাহার করিতে হয়; কারণ, উদ্ভিদ্ মাত্রেই প্রোটীনের ভাগ কম। এক শত ভাগ কোন্ কোন্ খাদ্যে কতটা প্রোটীন্ পাওয়া যায়, দেখ :—এতশত ভাগ মাংসে ৮৯ ভাগ, খুব বেশী চর্ব্বিযুক্ত মাংসে ৫১ ভাগ, সুঁটী চূর্ণে ২৭ ভাগ, গমে ১৬ ভাগ, চাউলে ৭ ভাগ।

৪। আমাদের দেহে জান্তব-প্রোটীন্ যতটা গৃহীত হয় উদ্ভিজ্জ-প্রোটীন্ তত হয় না। নিম্ন-লিখিত তালিকায় কোন্ খাদ্যের প্রোটীনাংশ শতকরা কতটা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা দেখ।—মাংসের ২·৩ ভাগ, ডাইলচূর্ণের ১০·৫ ভাগ, সুটি-চূর্ণের ১৭·০ ভাগ, ময়দার ৩০·৩ ভাগ, আলুর ৩২·০ ভাগ, গাজরের ৩৯·০ ভাগ, ও রাঁধা ডাইলের ৪০·০ ভাগ।

(৫) মাংসপেশীরা আমাদিগকে কর্ম্ম করিবার শক্তি (power) দেয়, কিন্তু আমাদের স্নায়ুরা কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় (energy) ; মাংসপেশীরা শর্করা পাইলেই খাটিতে পারে, স্নায়ুরা প্রোটীনের উপর নির্ভর করে। কাযেই, বর্ত্তমান সময়ে, জগতে যে জাতিরা প্রবল, তাহারা প্রায় সকলেই মাংসভোজী। শিশুর পক্ষে, প্রোটীনের অভাবে, তাহার দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি পুরা হইতে পায় না বলিয়াই, সকল শিশুর খাদ্যেই, প্রোটীন্ প্রচুর থাকে।

(৬) পেট ভরিয়া উদ্ভিজ্জাহার করিলেই আলস্য আসে; পেট ভরিয়া মিশ্রাহারের ফলে, শরীর বেশ তাজা বোধ হয়—যেহেতু প্রোটীন টিস্যু-উত্তেজক।

তদ্ব্যতীত, প্রোটীনাহারে দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ে।

মানুষের দৈহিক কতকগুলি যন্ত্র (যেমন দাঁত, অন্ত্র প্রভৃতি) দেখিয়া বোধ হয় যে, মানুষ মিশ্রভোজী হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। মাংস, ডিম এদেশে খাওয়া চলে, এবং দুগ্ধের অভাবে, উচিতও; কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে, ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের পরে, ঐগুলি কিছু কমান ভাল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি—বাঙ্গালীরা দৈনিক যথেষ্ট নাইট্রোজেন খান কি? (পাশ্চাত্যমতে, পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির প্রত্যহ শতকরা ১৬—২০ ভাগ নাইট্রোজেন —১০০—১২৫ গ্রাম প্রোটীন খাওয়া উচিত)। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, আমরা আবশ্যকের কম নাইট্রোজেন খাই বলিয়া, আমরা দুর্ব্বল রোগ-প্রাণ, স্বল্পায়ুঃ ও খর্ব্বাকৃতি এবং এই জন্যই আমরা জীবনসংগ্রামে হঠিয়া যাইতেছি; এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কলে-মাজা চাউল খাইয়া, দুধ বা ছানা ও প্রচুর মাছ খাইতে না পাইয়া, ও ডাইলের মূল্য না বোঝায়, আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমাদের উচিত একবেলা আতপ ঢেঁকি-ছাটা চাউল, অপর বেলা, হাতে-ভাঙ্গা আটার রুটি, লুচি বা পরেটা এবং তৎসহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও খোসাসুদ্ধ পাঁচ-মিশালী ডাইল, পর্য্যাপ্ত মাছ এবং দুধ ও ছানা ও তরকারী খাওয়া।

অধিক মাংসাদি খাওয়াও যত দোষের, নিরবচ্ছিন্ন শাকান্ন খাওয়া, তত দোষের। মধ্যপন্থাই শ্রেয়ঃ; অর্থাৎ, মিশ্রাহারী হওয়াই ভাল। তবে মিশ্রাহারী দুই রকমে হওয়া যায়; মাংস, মাছ, ডিম ও তরি-তরকারী খাইয়া চলে; অথবা, পর্য্যাপ্ত দুগ্ধজাত ছানা-মাখন ও বাকীটা বাছিয়া বাছিয়া উৎকৃষ্ট ও টাট্‌কা উদ্ভিজ্জাহার করিয়াও চলে। ইহাদের মধ্যে, আমাদের দেশে, শেষোক্তটিই ভাল।

রোগের কারণ

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ বেদের এই ছয়টী অঙ্গ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জগতের প্রাকৃতিক অবস্থা, কোন্ সময়ে কোন গ্রহ কোথায় আছেন এবং সেই স্থানের অবস্থান দ্বারা প্রাণীগণের শুভাশুভ ফল, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, ধর্ম্মকার্য্যাদির সময় যেরূপ আমরা অবগত হইতে পারি, সেইরূপ অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি, গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু বিশেষে দেহের অবস্থাগত বৈষম্যও উপলব্ধি করিতে পারি। চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিকটতম সম্বন্ধ আছে ইহা যেমন ভারতীয় চিকিৎসক ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্বীকার করেন সেইরূপ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মানেন। Medical Astrology সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চিন্তা প্রসূত। অস্মদীয় পণ্ডিতগণও জ্যোতিষশাস্ত্রে রোগ নির্ব্বাচন ও প্রকৃতিগত স্বভাব, গ্রহের রোগাদি সম্বন্ধে বহু বহু তথ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন চিকিৎসকেরা পূর্ব্বে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। তাই তাঁহারা রোগ নির্ব্বাচনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এখনকার কবিরাজদের গুরুস্থানীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক পুস্তক আছে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যে কোন্ ব্যক্তির কিরূপ প্রকৃতিগত স্বভাব হইবে কোন্ জাতীয় রোগে আক্রান্ত হইবে, কতদিন তাহার ভোগকাল থাকিবে ইত্যাদি অভ্রান্তরূপে জানা যায়।

প্রাচীন চিকিৎসকেরা বলেন—গ্রহ প্রতিকূল হইলে ঔষধ প্রয়োগেও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিরুদ্ধ গ্রহ তেজস্কর ঔষধাবলীরও শক্তি হ্রাস করিয়া থাকে।

রোগের তত্ত্ব নির্ব্বাচনে জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশেষ

সহায়ক। গ্রহভেদে রোগ নির্ব্বাচন করিয়া রোগ নাশের ব্যবস্থা করিলে সমূলে রোগ নাশ হইয়া থাকে। যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের জানা আবশ্যক রবি পিত্ত প্রকৃতির, চন্দ্র বাত শ্লেষ্ম প্রকৃতির, মঙ্গল পিত্ত প্রকৃতির, বুধ কফ পিত্ত বায়ু ধাতুর, বৃহস্পতি ও শুক্র কফাশ্রিত ধাতুর, শনি বায়ু ধাতু সম্পন্ন। এই সমস্ত গ্রহের মধ্যে যখন যে গ্রহ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হন, তখন সেই ধাতুর বৈষম্য ঘটে এবং সেই ধাতুর বৈষম্যে যে রোগ হওয়া স্বাভাবিক তখন সেই রোগ আক্রমণ করে। অতএব জানা যায় গ্রহকোপ রোগের কারণ।

যাহারা রস লইয়া আলোচনা করেন তাহাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক—রবি কটুরসের, চন্দ্র লবণ রসের, মঙ্গল তিক্ত রসের, বুধ মিশ্র রসের, বৃহস্পতি মধুর রসের, শুক্র অম্ল রসের, শনি কষায় রসের অধিপতি।

প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা কমিয়া আসিয়াছে। পঠন, পাঠন ও গবেষণার ও অভাব যে অনেক তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি সাধারণে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িতেছেন। জ্যোতিষ হিন্দুদিগের একটী শ্রেষ্ঠ দান—জ্যোতিষ বেদাঙ্গ—সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই শাস্ত্রের আলোচনা করিলে অনেক তথ্য নির্ণীত হইবে সন্দেহ নাই। অনেকে এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রণিধান সহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে জন্মপত্রিকা বিচার দ্বারা রোগ নির্ণয় সম্ভব। কোন্ গ্রহের প্রকোপে কি, রোগ হইতে পারে তাহা আলোচিত হইতেছে।

রবি গ্রহের রোগ

হৃৎকম্পন, দৃষ্টিহীনতা, পিত্তবৃদ্ধি, মস্তকের বিকৃতি, পেটফাঁপা, গলার ভিতরে অসুস্থতা, যকৃৎদুষ্টি। হজম শক্তির অল্পতা। রক্তের উত্তেজনা।

চন্দ্র গ্রহের রোগ

পক্ষাঘাত, পিত্তাধিক্য, অন্ত্ররোগ, পাথুরি, রক্ত আমাশয়, ঠাণ্ডা লাগিয়া বাতের আক্রমণ, গা ম্যাজম্যাজে ভাব, বসন্ত, শোথ, মৃগী রোগ, হিস্টিরিয়া।

মঙ্গল গ্রহের রোগ

মহামারী জনক জ্বর, কার্ব্বঙ্কল, ঘা, দাঁদ, ফোঁড়া, প্রভৃতি রক্তদুষ্টি জনিত রোগ, বায়ুবৃদ্ধি, জননেন্দ্রিয়ের রোগ, মন্দাগ্নিজ পীড়া, অর্শ ও অন্য গুহ্যরোগ, মস্তকের বিকৃতি। দাঁতের পীড়া, সূতিকা জ্বর।

বুধ গ্রহের রোগ

পেশীর আক্ষেপ, হাঁপানি, জিহ্বার ঘা, স্বর বিকৃতি, সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি, পা ও হাতে গিটে বাত, ঋতু বন্ধ ও হিস্টিরিয়া।

বৃহস্পতি গ্রহের রোগ

অন্ত্রের রোগ, সন্ন্যাস, নিমুনিয়া, বাম কর্ণের রোগ, পৃষ্ঠ বেদনা, টনশিলের রোগ, অতিভোজন জন্য পেট ফাঁপা।

শুক্র গ্রহের রোগ

শুক্র ঘটিত পীড়া, জরায়ুর রোগ, দেহের কোন কোন সন্ধিস্থলে ফুলিয়া যাওয়া, একশিরা, পৃষ্ঠ ও কোমরের বেদনা, হৃৎকম্পন, গর্ভকোষের বিশৃঙ্খলা, ইউরিমিয়া প্রভৃতি।

শনি গ্রহের রোগ

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, দাঁতের বেদনা, বায়ুবৃদ্ধি, কুষ্ঠব্যাধি, বাত, অর্শ, ক্ষয় রোগ, শিরঃপীড়া, যকৃতের

পীড়া, ডিপ্‌থিরিয়া, হাঁপানি। একাঙ্গে পক্ষাঘাত।

রাহু গ্রহের রোগ

জ্বর, বায়ুবৃদ্ধি, বক্ষঃস্থলে কম্পন, রক্তদুষ্টি ও নেত্রপীড়া।

কেতু গ্রহের রোগ

বুদ্ধি ভ্রংশ, মূত্র কৃচ্ছ্র, দাঁতের পীড়া, জ্বর ও কাস।

নেপ্‌চুন্‌ গ্রহের রোগ

পৈশাচিক রোগ, শোথ, চিত্তোন্মাদ, গলায় বিষিয়ে যাওয়া।

উরেনস্‌ গ্রহের রোগ

হৃদ্‌যন্ত্রের আক্ষেপ, মুখে পক্ষাঘাত, হাতে ও কাঁধে টান ধরা, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য ও বায়ুর খেঁচুনি।*

---

*এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কাহারও কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে লেখকের সহিত "জ্যোতিষ গবেষণা ভবন"—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় ডাক টিকিট সহ পত্র ব্যবহার করিবেন।—সম্পাদক।

দেশী খেলা ও ব্যায়াম

মুন্‌-খাপ্‌সী খেলা

(কলিকাতা নেবুতলা কপাটী ক্লাব)—[এস্কেবি লিখিত]

আভাস।

মাঝে সটান্ সরু পথ, আর তা'র দু'ধারে দু'সারি ঘর, ঠিক রুজুরুজু সাজানো। ঐ ঘরগুলো আবার গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে' নেই,—তা'দের মাঝেও ঐ রকমই সরু রাস্তা পড়ে' থাকে। উদ্দেশ্য, এক ঘর থেকে খেলা আরম্ভ করে', সব ঘরগুলো বেড়িয়ে, গোড়ার ঘরে ফিরে আসা। এই ফিরে আসাটা কিন্তু সহজ নয়; কেন না, ঘর থেকে বা'র হবার সময় থেকেই, ঐ সব রাস্তায় বাধা পাবার প্রচুর আয়োজন থাকে। কিন্তু, যদি বৈধ উপায়ে, সেই সকল বাধা অতিক্রম করে' পূর্ব্বের ঘরে ফিরে আস্‌তে পারা যায়, তা' হোলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে জয়'-এর প্রশংসা লাভ হয়ই।

পরিভাষা।

মুন্‌-খাপ্‌সি খেলা ঃ—এই বিবরণে লিখিত বিধি নিষেধের অধীনে যে খেলার অনুষ্ঠান হয়, তা'কে **মুন্‌-খাপ্‌সি খেলা** বলে।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে এই খেলাটী পরিচিত, যথা; হিঙে-দাঁড়ি', 'শির-গিজো' ইত্যাদি।

কোর্ট্‌ ঃ—মুন্‌-খাপ্‌সি খেলার নিয়মে রেখা-বদ্ধ চতুষ্কোণ স্থানকে **কোর্ট্‌** বলে।

এই কোর্ট্ ৫৬৷৷০ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত ৪ মুষ্টি প্রস্থ মাপের হয়। হাত বল্‌তে ইংরাজী ১৮ ইঞ্চি এবং মুষ্টি বল্‌তে ইংরাজী ৩ ইঞ্চি বুঝতে হবে।

কোট্‌টী এই রকম ভাবে আঁক্‌তে হয়।—

ধাপ্‌সী ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	শির-ঘর
	চি		চি	শির-চিক্	চি	বা	চি	বাঁশ	চি		চি	
মুন্ ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ধর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	জিরেন ঘর	[illegible]	শির ঘর

৭।০ হাত ব্যবধান রেখে, ৫৬।।০ হাত লম্বা দু'টা সমান্তরাল সরল রেখা টান্‌তে হয়। ঐ দু'টার যে কোনও একটা থেকে ৪ মুষ্টি দূরে তৃতীয় একটা রেখা ঐ রকম দীর্ঘ করে'ই সমান্তরালে টান্‌তে হয়; এবং এই তৃতীয় রেখা থেকে ৭।।০ হাত তফাতে চতুর্থ আর একটী অনুরূপ রেখা টান্‌তে হয়,—অবশ্য এই চতুর্থ রেখাটী প্রথম রেখা দু'টার অপর পার্শ্বে টানা হয়।

এখন, ৪টী রেখার একান্তভাগ, ১৫ হাত ৪ মুষ্টি লম্বা একটা সরল রেখা দিয়ে যোগ কর্‌তে হবে। এই নতুন রেখাকে 'প্রস্থ-রেখা' বলে।

তারপর, ঐ প্রস্থ-রেখা থেকে ৭।।০ হাত দূরে ওরই সমান্তরালে দ্বিতীয় রেখা টান্‌তে হয় এবং এই দ্বিতীয় রেখা থেকে ৪ মুষ্টি দূরে তৃতীয় একটা অনুরূপ রেখা কাট্‌বে। এই রকম করে' পর্য্যায়ক্রমে একবার ৭।।০ হাত ও একবার ৪ মুষ্টি দূরে পর পর প্রস্থ-রেখা টেনে, সেই ৫৬।।০ হাত দীর্ঘ রেখা ৪টাকে পূরিয়ে ফেল্‌বে।

ঐরূপে কোট্‌টীর মধ্যে ৭ জোড়া চার-চৌকা ঘর ও টী সরু পথ তোয়ের হয়। এই ৭টী সরু পথের মধ্যে ৬টী প্রস্থের দিকে ও বাকীটী দৈর্ঘ্যের দিকে থাকে।

দড়ীতে চূণ মাখিয়ে রেখা টানা চলে; কিম্বা, সরু লোহার শলা দিয়ে সিকি ইঞ্চি আন্দাজ চৌড়া খাঁজ মাটীতে কাট্‌লে, চমৎকার কোট্ কাটা যায়।

সীমানা ঃ কোট্-এর চতুর্দ্দিকের সীমা-রেখাকে **সীমানা** বলে।

ঘরঃ— কোট্-এর মধ্যে অবস্থিত রেখাবদ্ধ চার-চৌকা স্থানগুলোকে **ঘর** বলে।

যা'দের খেলাবার পালা থাকে, ঘরগুলো তা'দের অধিকারে আসে।

ধাপ্‌সি-ঘর ঃ যে ঘর থেকে খেলা আরম্ভ কর্‌তে হয়, তা'কে **ধাপ্‌সি-ঘর** বলে।

কোট্-এর লম্বাদিকে দাঁড়ালে, ডান দিকের প্রান্ত ভাগস্থ নীচের ঘর থেকে খেলা আরম্ভ হয়।

এই ধাপ্‌সি-ঘরকে 'তিড়ে-ঘর', গিজো-ঘর'ও বলে।

মুন্-ঘর ঃ—ধাপ্‌সি-ঘরের উপর দিকে রুজু-রুজু যে ঘর থাকে, তা'কে **মুন্-ঘর** বলে।

শির্-ঘর ঃ কোট্-এর লম্বাদিকে দাঁড়ালে বামপ্রান্তে রুজুরুজু যে দু'খানা ঘর থাকে, সেই দু'টোকে **শির্-ঘর** বলে।

শির-ঘর দু'টা ধাপ্‌সি ও মুন-ঘরের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। ও দু'টোকে 'বাঁশ-ঘর', 'বুমু-ঘর' ইত্যাদিও বলে।

জিরেণ-ঘর ঃ—১৪টী ঘরের মধ্যে ধাপ্‌সি, মুন্‌ ও শির্‌-ঘর দু'টা বাদে বাকী ঘরগুলাকে **জিরেণ-ঘর** বলে।

চিক্‌ বা **দাঁড়** ঃ—কোটের মধ্যে অবস্থিত অল্প পরিসর যে দীর্ঘ পথগুলি ঘরগুলাকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখে, সেগুলাকে **চিক্‌** বা **দাঁড়** বলে।

খেলিতে অধিকারী দলকে বাধা দেবার পালা যাদের তা'রা এই দাঁড়গুলো দখল করে। প্রত্যেক চিক্‌ একজন মাত্র লোকের অধিকার থাকে।

শির্‌-চিক্‌ ঃ—দু'সারি ঘরের মধ্যকার সুদীর্ঘ চিক্‌কে—যা' দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত থাকে—**শির্‌-চিক্‌** বলে।

এইটীকে 'বাঁশ', 'বম্বু' ইত্যাদিও বলে।

বুক্‌-চিক্‌ ঃ—কোটের প্রস্থ-দিকে লম্বিত যে সব চিক্‌, শির্‌-চিক্‌কে লঙ্ঘন করে বিস্তৃত থাকে, তা'দের **বুক্‌-চিক্‌** বলে।

বুক্‌-চিক্‌কে 'খুটা'ও বলে।

দল ঃ—খেলোয়াড়ের সমষ্টিকে **দল** বলে।

পক্ষ ঃ—সমস্বার্থে মিলিত দলকে **পক্ষ** বলে।

বিপক্ষ ঃ—কোনও পক্ষের বিরুদ্ধ পক্ষকে **বিপক্ষ** বলে।

দৌড়দার ঃ—যে পক্ষ খেলিতে অধিকার পায় তাদের দৌড়দার পক্ষ বা সংক্ষেপে **দৌড়দার** বলে।

পাল্লাদার ঃ—যে পক্ষ দৌড়দারদের বিরোধিতা করে, তাদের পাল্লাদার পক্ষ বা সংক্ষেপে **পাল্লাদার** বলে।

শিরুচে ঃ—পাল্লাদারদের যে খেলোয়াড় শির্‌-চিক্‌ আগ্‌লাবার ভার পায়, তাকে **শিরুচে** বলে।

আড়্‌চে ঃ—পাল্লাদারদের যে সব খেলোয়াড় বুক্‌-চিক্‌ আগ্‌লাবার ভার পায়, তাদের **আড়্‌চে** বলে।

পাকা-আড়্‌চে ঃ—আড়্‌চেদের মধ্যে যে ধাপ্‌সী ও মুন্‌ ঘরের পাশের বুক-চিক্‌ দখল করে, তাকে **পাকা-আড়্‌চে** বলে।

মারা ঃ—পাল্লাদারদের যে কোনও লোক বিপক্ষের কা'কেও স্পর্শ করতে পারলে তা'কে **মারা** বলে।

কোট্‌ দেওয়া ঃ—দৌড়দারদের কোন খেলোয়াড় বৈধভাবে কোটের সকল ঘর বেড়িয়ে ধাপ্‌সি-ঘরে ফিরে 'ধাপ্‌সী' বলে হাঁক দিতে পারলে তাকে **কোট্‌ দেওয়া** বলে। কোট্‌ দিতে পারলে খেলায় জিৎ হয়।

খেলা

কোন্‌ পক্ষ আগে খেল্‌বে তা' স্থির করবার জন্য 'পিঠ' পাড়া'তে হয়। 'পিঠ' পাড়া'তে যাদের জিৎ হয়, তা'রা প্রথম খেল্‌তে পায়। তাদের সকলে গিয়ে ধাপ্‌সী-ঘরে জমায়েৎ হয়। তাদের বিপক্ষরা এক এক জন একটী করে' চিক্‌ অধিকার করে। ধাপ্‌সি-ঘরের সম্মুখে দাঁড়ায় শিরচে, আর পাশে দাঁড়ায় পাকা আড়্‌চে। এরা হাত দিয়ে ঐ ঘরটা ঘিরে থাকে, যা'তে দৌড়দারদের কেউ অন্য ঘরে যেতে না পারে। দৌড়দাররা ঘরের মধ্যে এমন ভাবে থাকে, যেন শিরচে বা পাকা-আড়্‌চে তাদের মারতে অর্থাৎ ছুঁতে না পারে; কেন না, মারতে পারলেই—সে ঘরের মধ্যে অবস্থান সময়েই হোক বা ঘর থেকে বেরোবার সময়েই হোক—তাদের খেল্‌বার অধিকার

নষ্ট হয়। এবং তখন, পাল্লাদাররা খেল্‌তে অধিকারী হয় ও তাদের বিপক্ষরা পাল্লাদার হয়।

দৌড়দাররা ছল কৌশল করে' ধাপ্‌সি-ঘর থেকে যে কোন অন্য ঘরে আস্‌বার চেষ্টা করে। ধাপসি-ঘরের তিন কোণ দিয়ে তিন জন দৌড়দার যুগপৎ চেষ্টা করে, শিরচে ও পাকা-আড়চের হাত এড়িয়ে বেরুতে। **বেরিয়ে আসতে পারলে ক্রমান্বয়ে বাকী ঘরগুলো বেড়িয়ে,** পুনরায় ধাপ্‌সি-ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করে। ঐ অন্য ঘরগুলোতে যাবার সময় অন্য আড়চেরা তাদের বুক-চিকে দৌড়াদৌড়ি করে' ক্রমাগত বাধা দিতে ও মার্‌তে চেষ্টা করে।

দৌড়দারদের যে কোন খেলোয়াড় ঐ ধাপ্‌সি-ঘরে বৈধভাবে পুনঃপ্রবেশ করতে পারলে, তাদের এক কোট জিৎ হয় এবং তারা আবার খেল্‌তে পায়। কিন্তু ঐ পুনঃপ্রবেশের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়, যদি—

(অ) শির-ঘরে যাবার পরে কোনও ঘরে যেতে ভুল হয়,

(আ) শির্‌-ঘর দু'টোতে পর পর না যাওয়া হয়,

(ই) নুন্‌ ঘরে যাবার পরই ধাপ্‌সি-ঘরে যাওয়া হয় এবং

(ঈ) ধাপ্‌সি-ঘরে এমন একজনও খেলোয়াড় থাকে যে আদৌ সে ঘর থেকে বা'র হতে পারে-নি। সুতরাং এই ক'টী বিষয় মনে রাখা একান্ত দরকার, যে—

(অ) শির্‌-ঘর থেকে বা'র হয়ে, সব ক'টী ঘরই যাতে ঘোরা হয়,

(আ) শির্‌-ঘরের একটাতে গেলেই পরবর্ত্তী কার্য্য হোচ্চে দ্বিতীয় শির্‌-ঘরটীতে যাওয়া,

(ই) নুন্‌ ঘরে যাবার পর, অন্ততঃ একটা জিরেন-ঘরে যাওয়া, এবং

(ঈ) যা'তে সকল খেলোয়াড়ই ধাপ সি-ঘর থেকে বেরুতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করা।

ঐ সাহায্য করবার একটা বিশেষ উপায় আছে। যে কোনও দৌড়দার এক শির্‌-ঘর থেকে দ্বিতীয় শির্‌-ঘরে উত্তীর্ণ হবার সময়, শির্‌-চিকে দাঁড়িয়ে 'শিরচে' বলে' হাঁক্‌লে, শিরচে তখন তার কাছে এসে থাকে। এই অবসরে ধাপ্‌সি-ঘরের অবশিষ্ট দৌড়দাররা অন্য ঘরে যাবার সুযোগ পায়; আর, শিরচে কাছ বরাবর এলে সেই দৌড়দারও শির্‌-চিক্‌ ছেড়ে দ্বিতীয় শির্‌ ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু, এক দফা খেলার মধ্যে, শিরচে প্রথম ডাকে একবার মাত্রই এসে থাকে; তারপর, আর সে আস্‌তে বাধ্য নয়।

পাল্লাদারদের মধ্যে শিরচে, পাকা-আড়চে ও যে আড়চে শির-ঘরের পার্শ্বস্থ বুক-চিকে থাকে—এই তিন জন খুব হুঁসিয়ার লোক হওয়া দরকার।

খেলাটী পরিচালনের জন্যে একজন মধ্যস্থ ও ৬ জন বা অভাব পক্ষে ৩ জন সহকারীর দরকার হয়। মধ্যস্থ সহকারীদের সুবিধামত জায়গায় স্থাপন করে' খেলাটী সুশৃঙ্খলায় পরিচালন করেন।

সকল খেলোয়াড় মধ্যস্থের নির্দ্দেশ, বিনা আপত্তিতে, মান্‌তে বাধ্য।

খেলাটী ৫০ মিনিট চলে' থাকে; তার মধ্যে কোন বিশ্রাম-অবসর নেই।

১। দৌড়দারদের কোন খেলোয়াড় কোনও নিয়ম লঙ্ঘন কোরলে, তাদের খেলার অধিকার নষ্ট হয়। তখন বিরুদ্ধ পক্ষ খেল্‌তে অধিকার পায়।

২। পাল্লাদারদের কোন খেলোয়াড় কোনও

নিয়ম লঙ্ঘন কোর্‌লে, তার সেই সময়কার সেই কাজের ফল, তার অনুকূলে আসে না,—বিপক্ষের অনুকূলে যায়।

৩। কোটের বাইরে যাওয়া নিষেধ।

৪। খেলার সময়ে, বাঁকাভাবে দাঁড়াবার সময়, যদি কোমর সীমানার বাইরে যায় আর সেই সময়ে কোন পায়ের কোন অংশ মাটী থেকে একটুও উঠে যায়, তা'হোলে সে খেলোয়াড় বাইরে গেছে বলে' অনুমান করা হয়।

৫। সকল খেলোয়াড়ের পক্ষে কোটের সকল রেখা স্পর্শ করা নিষেধ।

৬। পদতলের একাংশ মাটী স্পর্শ কোরে থেকেও যদি অন্য অংশ রেখার উপরিস্থ আকাশে আসে, তা'হোলে রেখা স্পর্শ করা হোয়েচে বলে' অনুমান করা হয়।

৭। একটী চিকে একজনের বেশী লোক দাঁড়াতে পার্‌বে না ও সেই চিক্‌ ছেড়ে অন্য চিকে বা কোন ঘরে যেতে পার্‌বে না।

৮। নিজ চিকের মধ্যে দাঁড়িয়ে দৌড়দারদের এমনভাবে মারতে হয় যা'তে তাদের আঘাত না লাগে।

৯। মার্‌বার সময় হাত মাটীতে পড়ে' গেলে, সে মার্‌ অগ্রাহ্য হবে।

১০। দৌড়দারদের মার্‌বার জন্যে তাড়া দেবার সময়, পাল্লাদার ঘরের কোণ ডিঙ্গুতে পার্‌বে না।

১১। দৌড়দারদের কা'কেও মারতে পার্‌লে, পাল্লাদাররা খেল্‌তে পার্‌বে।

১২। শির-ঘরে পৌঁছবার সময় 'শির্‌-ও' বলে' হাঁক্‌তে হবে; নচেৎ শির্‌-ঘরে আসা মঞ্জুর হবে না। সেক্ষেত্রে, কোনও জিরেন-ঘরে ফিরে গিয়ে আবার শির্‌-ঘরে আস্‌তে ও হাঁক্‌তে হবে।

১৩। যে কোনও ঘরে যতবার ইচ্ছা দৌড়দাররা যেতে পার্‌বে।

১৪। 'শির্‌-ও' বলে হাঁক্‌বার পর সব ক'টী ঘরে বেড়িয়ে (১৭ নং নিয়ম দেখ) শেষে ধাপ্‌সি-ঘরে গিয়ে 'ধাপ্‌সি' বলে হাঁক্‌তে হবে; নচেৎ কোট দেওয়া মঞ্জুর হবে না। সেক্ষেত্রে, সেই খেলোয়াড় ধাপ্‌সি-ঘর থেকে আদৌ বা'র হোতে পারে-নি বোলে অনুমান হবে এবং তা'কে গোড়া থেকে খেল্‌তে হবে।

১৫। ধাপ্‌সি-ঘরে 'ধাপ্‌সি' এবং প্রথম শির-ঘরে 'শির্‌-ও' হাঁকা ছাড়া, অন্য ঘরে ঐ রকম হাঁক্‌লে দৌড়দারদের খেলা নষ্ট হবে; বিরুদ্ধ পক্ষ খেল্‌বে।

১৬। শির-ঘর দু'টোতে পর পর যেতে হবে; অন্য সব ঘরে ইচ্ছামত যাওয়া চল্‌বে।

১৭। নুন্‌-ঘরে, যখন ইচ্ছা যাওয়া চল্‌বে অর্থাৎ 'শির্‌-ও' হাঁক্‌বার পূর্ব্বে বা পরে গেলেও চল্‌বে। যদি আগে যাওয়া হোয়ে থাকে, 'শির্‌-ও' হাঁক্‌বার পরে আবার না গেলেও হবে। কিন্তু, নুন্‌-ঘরে যাবার পরই ধাপ্‌সি-ঘরে এসে 'ধাপসি' হাঁকা নিষেধ। তা'তে খেল্‌বার অধিকার নষ্ট হয়।

১৮। সব ক'জন খেলোয়াড় ধাপসি-ঘর থেকে বা'র হবার আগেই 'ধাপসি' হাঁক্‌লে, খেলা নষ্ট হয়।

১৯। দু'টী শির্‌ ঘরের মাঝে শির-চিকে দাঁড়িয়ে কোনও দৌড়দার 'শির্‌চে' বলে' হাঁক্‌লে, শির্‌চে প্রথম একটীবার মাত্র তা'র কাছে যেতে বাধ্য।

২০। অভদ্র ব্যবহার ও অশ্লীল কথা সম্পূর্ণ নিষেধ।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও তাহার চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীঅতুল রক্ষিত বি. এসসি., এম. ডি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
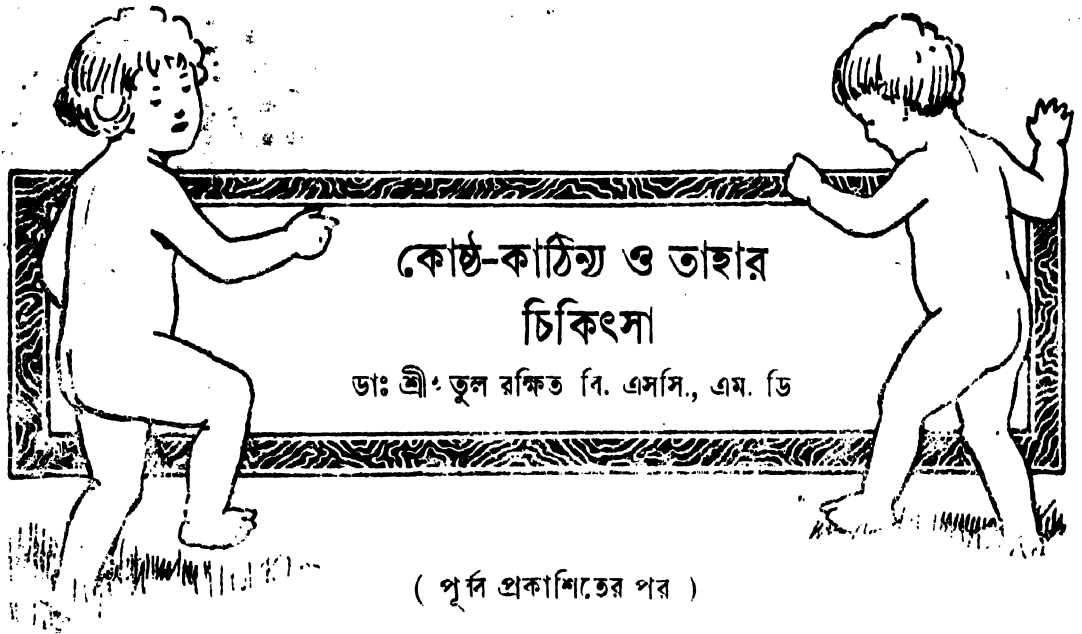
কোষ্ঠ-কাঠিন্য নির্ণয়—

মলের রং পরীক্ষা—১টা capsuleএর ভিতর ১০গ্রেণ কারমাইন খেতে দিলে উহা মলের সহিত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাহির হইয়া আসবে ও মলের রং পরিবর্ত্তন হইবে। যদি গ্রহণের ৭২ ঘণ্টা পরে বাহির হয় তাহা হইলে কোনও রোগের জন্য আবদ্ধ হইতেছে বুঝিতে হইবে।

বৈদ্যুতিক রশ্মি সাহায্যে—Barium মিশ্রিত খাদ্য খাইয়া দিলে পাকস্থলী ও অন্ত্রনালী সমূহের একটা ছায়া দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ৪৮ ঘণ্টা পরে আর কোন ছায়া দেখা যায় না কারণ তখন সব Barium বাহির হয়ে যায় কিন্তু এমন দেখা গিয়াছে যে ৪।৫ দিন পরেও তখনও ছায়া পড়ে এবং খাবারটী বাহির হয় নাই—তখন বুঝিতে হইবে যে ইনি কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগিতেছেন।

এই প্রকার রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া অনেক সময় Indican পাওয়া যায় এবং এই-ই কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ।

চিকিৎসা—আমাদের সর্ব্বপ্রথমে নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস রাখা উচিত। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর অল্প একটু লবণ সংযোগে ১ গ্লাস শীতল বা ঈষদুষ্ণ জল পান করা উপকারী। প্রাতঃ-ভ্রমণ কিংবা একটু শারীরিক ব্যায়াম প্রয়োজনীয়। সামান্য কিছু দৌড়ান যতক্ষণ না হাঁপিয়ে পড়া যায় বেশ ভাল। ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে Rope Skipping কিংবা অন্য খেলাধুলা শরীরের পক্ষে ভালই।

পেটের বিশেষ ব্যায়াম আমাদের কিছু কিছু জানা দরকার। তাতে পেটের স্থূলতাও অনেক কমে যায়।

চিকিৎসা—যাতে ফুসফুসের ক্রিয়া ভাল হয় অর্থাৎ খুব গভীর প্রশ্বাস নিয়া আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়িয়া দাও এরকম প্রাতঃকালে অন্ততঃ ১৫ বার করিয়া করিলে ভালই হয়।

পেটে মালিশ—পেটের মাংসপেশীসমূহ মালিশ করিয়া দিলে নিয়মিত রক্তসঞ্চালনের ফলে বেশ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে—দক্ষিণ হইতে বামে চক্রাকারে মালিশ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ১০ মিনিট করিয়া করিলেই চলে।

/২ সের কিংবা /২॥ সের একটী ছোট ধাতুর বল পেটের উপর দিয়া ঘুরাইলেও বেশ হয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে পেটের উপর Electric Vibrator চালাইলেও মাংসপেশী কার্যকরী হয়।

বৈদ্যুতিক চিকিৎসা—বড় পিতলের দুইখানি পাত একটা পেটে এবং একটা কোমরে রাখিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলে পেটে বেশ একটা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারে বেশ সুফল হয়।

জল চিকিৎসা—

হিপ্ বাথ কিংবা সিট্জ বাথ—কোমর পর্যন্ত জল একটা টবের মধ্যে রাখিয়া তাহাতে দৈনিক ১৫ মিনিট কাল বসিয়া থাকা। জলটী ঈষদুষ্ণ হলে ক্ষতি নাই।

এক্র ডুস—গরম এবং শীতল জল একটার পর একটী পর্য্যায়ক্রমে দুইটী সরু রবারের নলের মধ্য দিয়া পেটে লাগাইলে, যাহাতে সামান্য একটু বেগে পড়ে—দেখা যায় বেশ উপকার হয়।

এনিমা—২।৩ পাঁইট ঈষদুষ্ণ সাবানের জল ৩ ফুট উচ্চে রাখিয়া এবং রোগীকে বামদিকে শোয়াইয়া ডুস দিয়া অন্ত্র উত্তমরূপে ধৌত করাইয়া সমস্ত ময়লা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কখন মল খুব কঠিন হলে Olive Oil or Castor Oil ইহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া যেতে পারে। জানু এবং স্কন্ধ মাটীতে স্পর্শ করিয়া উপু হইয়া বসিলে Enemaর সমস্ত জল ভিতরে যাইয়া উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া বাহির হয়।

কম্প্রেস—কাপড় ঠাণ্ডা জলে নিংড়াইয়া পেটের মধ্যে রাত্রে জড়িয়ে রাখতে হয় এবং তার উপর ১খানা ফ্লানেল জড়াতে হয়—কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার হয়।

গ্লিসারিণ পিচকারী—গরম জল এবং গ্লিসারিণ কিংবা Olive oil এবং গ্লিসারিণ পিচকারী সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়।

গ্লিসারিন বাতি বা Suppository দিয়া—ছেলেদের অনেক সময়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করা হয়।

খাদ্য—নিয়মিত সময়ে এবং নিয়মিত মাত্রায় সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অধিক মশলা-যুক্ত কিংবা তৈল ও ঘৃত-সংযুক্ত খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা মোটেই উচিত নহে। খাদ্য যাহা খাইব তাহা ভাল ক'রে চিবান দরকার। মাঝে মাঝে পেট ভার থাকলে কিংবা খাবার অনিচ্ছা থাকলে উপবাস দেওয়া খুব ভাল। প্রতি মাসে দুই দিন উপবাস শরীরের ময়লা বাহির ক'রে দেয়। মোটামুটি ফলমূল, দুধ, সিদ্ধ তরকারী বেশ উপকারী। তরকারীর মধ্যে মটর, সিম, কপি, মূলা, বিং বেগুন, পিঁয়াজ, গাজর, বিট, ওলকপি, শশা কুচি কুচি করে কুটিয়া একটু লেবুর রস ও লবণ দিয়া কাঁচা খাওয়া খুব ভাল এবং তাতে বেশ ভিটামিন পাওয়া যায়।

কমলালেবু, পেঁপে, আনারস, আপেল, আঙ্গুর, বেদানা আম, বেল, পিচ, খেজুর, আখরোট, ডুমুর বাদাম প্রভৃতি কোষ্ঠ পরিষ্কারে সাহায্য করে।

মধু, গুড়, চিঁড়া, মুড়ি, ভিজান ছোলা, নারিকেল, দুধ, দধি এ সকল'ত বেশ পুষ্টিকর খাদ্য এবং খাওয়া কর্ত্তব্য।

ঢেঁকিছাটা চাউল এবং লাল আটার রুটী আমাদের ব্যবহার করা দরকার।

ডাবের জল, ঘোল, লেমনেড এ সকলও খাওয়া খারাপ নয়। ছোট ছেলেদের বেশী মিষ্টি খেতে দেওয়া উচিত নহে, যথা চিনি, চাটনি, খুব অল্পই,

ব্যবহার ক'রতে হ'বে। সব সময়েই সকলের সঙ্গে খাইতে দেওয়া উচিত নয়—তাতে পেট ভার হয় এবং ফলমূলের ব্যবস্থা থাকাই ভাল—যতটা সম্ভবপর। আমাদের দেশে মায়েরা বেশী ফল খেতে চান না কারণ তারা ভাবেন যে তাদের শিশু যদি ঐ স্তন পান করে তাহ'লে শিশুর ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা, কিন্তু এ কুসংস্কার আমাদের দূরীভূত ক'রতে হবে।

ঔষধ ব্যবস্থা—

খনিজ তৈল Liquid Paraffin, Petrolagar, Agarol, Calol জাতীয় ঔষধ ½ আন্সউ—১ আউন্স মাত্র সেব্য—রাত্রে শয়ন কালে খাইলে প্রাতঃকালে কোষ্ঠ নির্ম্মুক্ত হয়।

উদ্ভিজ্জ তৈল—Castor oil, Olive oil ১ আউন্স মাত্রায় পূর্ব্ব রাত্রে অল্প কমলালেবুর রস মিশাইয়া সেবন বিধেয়।

লবণ জাতী জোলাপ—Salt Hepatica, Andrew's Liver Salt, Kruschen Salt, Kutnow's powder, Effervescent Fruit Saline, Eno's Fruit Salt, Tartulax, Seidlitz powder প্রভৃতি বাজারে এই জাতীয় পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধের মূলেই Mag. Sulph. আছে।

দেশীয় জোলাপ—ইসবগুল, ত্রিফলা, বেল, সোনামুখীর পাতা।

খনিজ জলের ব্যবহার Carlsbad, Rubinal's mineral water, Lithia, Vicley, Soda water—২ আউন্স করিয়া ব্যবহার করা যায়।

Bed pill বাজারে যথেষ্ট প্রচলন—Purgen, Blue pill, Mycol, Chocolax, Laril.

পিত্তঘটিত জোলাপ—পিত্তির নিঃসরণে অন্ত্রের গতিবিধির সহায়তা করে Calomel, ox-gall.

প্রচুর জল নির্গমনকারী জোলাপ—শোথ রোগে এই জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয় যেহেতু শরীর মধ্যস্থ জল ইহা অনেক পরিমাণে নিকাশ করে। Pulv. Talap Co, Croton oil, Colocynth Podophyllum.

অন্যান্য ঔষধাবলী Rhubarb, Cascara, (Cascar-Evacrant) Phenolphthallen Aloes, Sinna, (Sinna pod, Sinna leaves, Inf. Sinna Co. Pulv. Glycerine Co.)

অন্ত্রের মধ্যে বাধা উৎপন্ন হইয়া অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং তাহাতে পেটের মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। এই বাধা অনেক কারণে হইতে পারে যথা—নিকটবর্ত্তী অন্ত্রে পরস্পর জোড় লাগিতে পারে, কিংবা অন্ত্র সঙ্কুচিত হতে পারে, তখন মল কোনরূপে নির্গত হয় না ও রোগীর বড় কষ্ট হয়। এ সব ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত এবং অবিলম্বে কোন নিকটস্থ চিকিৎসকের সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

প্রফেসর রামমূর্ত্তি

বি. মুখার্জ্জি

প্রফেসর রামমূর্ত্তি নাইডুর নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার অদ্ভুত শক্তি জগদ্বিখ্যাত। এখন তিনি বহুকাল ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মহাপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া এখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। একবার ডাক্তার পাণ্ডার সহিত তাঁহার কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়, ডাক্তার পাণ্ডা তাহা ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড পত্রিকায় প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্যের পাঠক-পাঠিকার নিকট তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি উপদেশগুলি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে কিরূপ শারীরিক ব্যায়াম আপনি পছন্দ করেন ?

উত্তর—আমি তাহাদের দেশীয় ব্যায়াম প্রথা অবলম্বন করিতে বলি।

প্র—আপনি সেগুলি বুঝাইয়া দিবেন কি ?

উ—আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় মনে হয় আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা যেরূপ প্রথা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যথা—

(১) প্রাণায়াম, অশন, মুদ্রা সূর্য্য নমস্কার ইত্যাদি।

(২) সন্তরণ, কুস্তি, লাঠি বা তলোয়ার খেলা, হাডুডু, ডন বৈঠক ইত্যাদি।

প্রথমকারগুলি শরীর লঘু করে মন প্রফুল্ল করে সংযমশক্তি বৃদ্ধি করে। অবশিষ্টগুলি শরীরের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে অবসাদগ্রস্ত মাংশপেশী শরীরে স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে।

প্র—আপনার মতে কি প্রথমকারগুলি ছাত্রদের পক্ষে প্রশস্ত ?

উ—না। আমি ১৫ বৎসর বয়স্কের কম বালকদিগকে এইগুলি করিতে নিষেধ করি। প্রাণায়াম অভ্যাস কোনও সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে হয় না, এইগুলি যদি যথাযথরূপে করিতে পারা যায় তাহা হইলে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয় এবং সকল প্রকার ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

প্র—বিদ্যালয়ে আজকাল যে প্রকার খেলাধুলা বা ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলির সম্বন্ধে আপনার মত কি? সেগুলি কি কোনও উপকারে আসে ?

উ—না, কোনও মতে নহে। ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, পিংপং ইত্যাদি ব্যয়সাধ্য খেলাগুলি কোনও উপকারে আসে না, এইগুলি কেবল সময় কাটাইবার অবলম্বন মাত্র। বিলাতি কোনও প্রকার খেলা বা ব্যায়ামপ্রথা আমাদের উপযোগী নহে। এগুলিতে প্রকৃত মাংসপেশীর ব্যায়াম হয়ই না উপরন্তু উদরের মাংসপেশী সমূহের ও পাকস্থলী বা পাচনক্ষম যন্ত্রগুলির কোনও গঠনের সাহায্য হয় না।

প্র—আমাদের ছাত্রদিগের উপযুক্ত খাদ্য কি প্রকার?

উ—আমার মতে নিরামিষ আহারই ছাত্রদিগের উপযুক্ত। ফলমূল, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা ইত্যাদিতে যে পরিমাণ সার পদার্থ আছে তাহা শরীর ও মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট।

প্র আমিষ আহার সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উ—মৎস্য, মাংস মানুষকে শক্তিশালী করে বটে কিন্তু আবার সেই পরিমাণে হিংস্রকও করে। যোদ্ধাদিগের পক্ষে এরূপ আহার প্রয়োজন। আমাদের দেশে ঋষিরা ক্ষত্রিয়ের জন্য আমিষ আহার ও ব্রাহ্মণের জন্য নিরামিষ আহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

প্র—বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার [illegible]াহ্মণেরা মাছ মাংস খায় কেন?

উ উহাদিগের খাইবার কারণ আছে, ঐ দেশে মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ও সুলভে পাওয়া যায়, সেই জন্য শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উহারা মাছ খায়।

প্র—আপনি পূর্ব্বে কি প্রকার আহার করিতেন?

উ—ভাত, রুটি, দাল, ঘি, দুধ, ফলমূল ও একটু একটু স্বর্ণভস্ম।

প্র—আপনি কি কোনও প্রকার উত্তেজক দ্রব্য যথা, মদ্য পান করিতেন?

উ—না।

প্র—চা, কফি বা সিগারেট?

উ—হাঁ, এখন খাই বটে কিন্তু অল্প বয়সে কখনও খাই নাই এবং আমি সকলকেই ঐগুলি খাইতে নিষেধ করি। ঐগুলি আমাদের শরীর ও মনের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

প্র—আপনি কি বিবাহিত?

উ—না।

প্র—কেন?

উ—আমি পুরা দস্তুর স্বাধীন থাকিতে ইচ্ছা করি বলিয়া।

প্র—আমার মনে হয় আপনি কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াই এত বলশালী হইয়াছেন কিন্তু আপনি কি সকলকেই ঐরূপ হইতে বলেন?

উ—না—বিবাহিত লোকও ইচ্ছা করিলে এইরূপ বলশালী হইতে পারে। অল্প বয়সে বিবাহ করা উচিত নয় এবং নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই চলিবে। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা পালন করাই কর্ত্তব্য। ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই বিবাহিত কিন্তু—তাঁহারা কিরূপ শক্তিশালী ছিলেন।

প্র—ভারতবর্ষে কোন্ জাতী সর্ব্বপেক্ষা বলবান?

উ—পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ বাসীরা।

প্র—মনে হয় উহাদের খাদ্য অতিশয় পুষ্টিকর?

উ—হাঁ তাছাড়া উহাদের কাঠামোই ঐরূপ গঠিত এবং উহারা ব্যায়াম করে।

প্র—সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি কোন গুলি?

উ—গুজরাটী, বাঙ্গালী ও উড়িয়া, উহারা জন্মাবধিই দুর্ব্বল এবং উহারা কোনওরূপ ব্যায়াম করিয়া শারীরিক ক্ষমতার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে না।

প্র—আপনি কত বয়সে ব্যায়াম আরম্ভ করেন?

উ—সাত বৎসর বয়সে।

প্র—কে শিক্ষা দিয়াছিল?

উ—কেহই নহে। শিশুকাল হইতে আমার উচ্চাকাঙ্খা ছিল যে আমি একজন ক্ষমতাবান পুরুষ হইব। এবং সেই উচ্চাকাঙ্খাই আমাকে সাফল্য গৌরব ভূষিত করিয়াছে।

অনেকে আমার শরীর চর্চ্চায় মনোযোগ দেওয়াতে তিরস্কার করিয়াছেন এবং পড়াশুনায় মন দিতে বলিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহাদের অবাধ্য হইয়াছিলাম। আমার মনে হইত ভীম, হনুমান প্রভৃতি বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই কিন্তু তাহা সত্বেও তাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন অতএব আমিও শিক্ষিত না হইয়া ঐরূপ প্রসিদ্ধ হইব এবং আমি বড়ই আনন্দিত যে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি।

প্র—আপনার পিতামাতা কি আপনার ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন ?

উ—না, সাধারণ লোকের ন্যায়ই ছিলেন।

প্র—তাঁহারা কি ধনী ছিলেন ?

উ—না।

প্র—আপনার প্রিয় শিষ্য কে কে ?

উ—গামা, বরকত আলি প্রভৃতি।

প্র—আপনি যে সব আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি প্রদর্শন করান তাহাতে লোকে মনে করে আপনি কোনও রূপ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ?

উ—না সেরূপ কিছুই নহে।

প্র—তাহলে কিরূপে ঐ গুলি করেন ?

উ—সাধনা। যে কোনও ব্যক্তি সাধনার ফলে এরূপ করিবে।

প্র—আপনি কি কিছু লুকাইতেছেন ?

উ—না, আমার লুকাইবার কিছুই নাই।

প্র—ব্যায়ামের নিয়মগুলি কি আপনি বাল্যকাল হইতেই জানিতেন ?

উ—না। আমি হিমালয়ের ঋষি, সিদ্ধ পুরুষের কথা জানিতাম। তাঁহাদিগের নিকট গিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলাম।

প্র—আপনার জীবনে কোনও দুর্ঘটনা হইয়াছিল কি ?

উ—হাঁ, ১৯০৭ সালে একবার ৬০০০ পাউণ্ড ওজনের পাথর আমার বুকের উপর ভাঙ্গা হইতেছিল। সে বার ঘটনাক্রমে একখণ্ড প্রস্তর আমার নাকের উপর পড়িয়া যায়।

প্র—আপনার দৈর্ঘ্য, ওজন ও ছাতির মাপ কত ?

উ—দৈর্ঘ্য—৫ ফুট ৬½ ইঞ্চি ওজন—১৯৫ পাউণ্ড, ছাতি—সাধারণ অবস্থায়—৪৮ ইঞ্চি, স্ফীত অবস্থায়—৫৭ ইঞ্চি।

প্র—আপনার হৃদ্ যন্ত্র ও ফুসফুস্ কি কখনও পরীক্ষা করাইয়াছেন ?

উ—হাঁ। একবার পাটনা মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসররা Cardiograph যন্ত্রে আমার হৃদ্ যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু—তাঁহারা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, যন্ত্রটী আমার হৃৎপিণ্ডের উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন ছিল না।

প্র—আপনার নিজের মধ্যে কিছু অসাধারণ আছে কিনা আপনি জানেন ?

উ—না।

প্র—এখন কি প্রকার ব্যায়াম আপনি করেন ?

উ—শাস্ত্রীয়মতে প্রাণায়াম, অশন ও সূর্য্য নমস্কার।

প্র—আপনার কি মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই ঐরূপ যোগাভ্যাস করিতে পারি ?

উ—নিঃসন্দেহে। কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত ঐ গুলি অভ্যাস করা সঙ্গত নহে কারণ ভুল হইলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

অপ্রিয় সত্য

শ্রীবিমল চন্দ্র রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অসিত অপ্রস্তুতের ন্যায় মাথা নীচু করিল এবং পাছে ধীরেশ তাহার উপর গড়ায়, ইহা ভাবিয়া যে শঙ্কিত না হইল তাহাও নহে। কিন্তু প্রাতঃকালে আমি কাহার মুখদর্শন করিয়া উঠিয়াছি জানিনা,—ধীরেশ অসিতের প্রতি গড়াইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না, বলিল,—

"দেখ হে, আমাদের এই রোগব্যাধি প্রপীড়িত দেশে চিকিৎসকগণ কোন দায়ীত্ব ঘাড়ে নিয়ে চিকিৎসক নাম গ্রহণ করেন না। যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁদের অধিকাংশেরই চরম লক্ষ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণ যে তাঁদের করুণার অনেকটা ভিখারী—তা জান? তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লে দেশের বহু উপকার কর্‌তে পারেন। মানুষের বেঁচে থাক্‌বার প্রধান অবলম্বন স্বাস্থ্যকে তাঁরা ফিরিয়ে দিতে পারেন। অশিক্ষা কুশিক্ষার জন্য দেশের শতকরা ৭০টী লোক অকালে মারা যায়, তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লে এদের বাঁচিয়ে দিতে পারেন।"

নিশি বলিল,—"চিকিৎসকরা ত' বাপু মৃতদেহে প্রাণ দান কর্‌তে পারেন না, তা' হ'লে না হয় বল্‌তে পার্‌তে যে কেন মৃত দেশবাসীকে তাঁরা বাঁচান না।"

বিরক্তির সহিত ধীরেশ বলিল,—মারা গেলে বাঁচাবার কথা বল্‌ছি না হে গর্দ্দভ! বল্‌ছি যে মরার পূর্ব্বেই তাঁরা চেষ্টা কর্‌লে শতকরা কমপক্ষে ৫০টীকে বাঁচাতে পারেন। সেরূপ বাঁচাতে হলে মৃত্যুকালে দু'ডোজ ওষুধ দিয়ে রোগীর রক্ত জল করা পয়সা পকেটস্থ ক'রে মটর বা গাড়ী হাঁকিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লে চল্‌বে না। ডাক্তার যিনি, তিনি যদি বিদেশী ওষুধ গিলাবার যন্ত্র বলে নিজেকে মনে করেন,—তা'হলেও চল্‌বে না। অজ্ঞ দেশবাসীকে রোগের কারণ এবং তারসঙ্গে প্রতীকারের পন্থাগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে। সাধারণ রোগ ব্যাধিগুলোর অন্ততঃ প্রাথমিক চিকিৎসা তারা নিজেরাই যাতে কর্‌তে পারে, সে বিষয়ে তাদের উপদেশ দিয়ে তৈরী কর্‌তে হবে। দেশবাসীর শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা তাঁদের কর্‌তে হবে। চিকিৎসকরা যদি শুধু স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি করেন তা'হলে আমাদের বাঁচবার উপায় সত্যিই থাক্‌বে না। তাঁদের মনে রাখতে হবে যে দেশের বল, ভরসা, প্রাণ তাঁরাই;—দেশবাসীর জীবন মরণ অনেকটা তাঁদের উপরই ন্যস্ত। (ক্রমশঃ)

চয়ন

শব্দ।

British Medical Associationএর একটা সভায় ঠিক হয়েছে যে, রাত্রে যে সব শব্দ হয় সে শব্দ মৎস্যের পক্ষে অনিষ্টকর, এবং ঠিক হয়েছে যে মটরের হর্ণ এবং হাওয়া না ভরা রবারের টায়ার ব্যবহার করা উচিত নয় কেন না ওতে শব্দ হয়।

মটর সাইকেলের বিষয় একজন চিকিৎসক ব'লেছেন যে মটর সাইকেল চলাটাও রাত্রে বন্ধ করা উচিত।

"ব্রেন কখনও পুরান হয় না, কিন্তু তার কাজ বন্ধ হয়ে যায় কোন অসুখ করলে" এই কথাটা Dr. Fredrick Tilney, Neurologyর Professor, Columbia University তে ব'লেছেন, যে পুরান ব্রেন বোধ্লে কোন জিনিষ নাই, বৃদ্ধ লোকের ব্রেন খারাপ দেখা যায়, কিন্তু সেটা—ব্রেনটা যে পুরান হয়ে গেছে সে জন্য নয়, হয়ত কোন অসুখে খারাপ হয়ে গেছে। এমন লোক আছে যার বয়স হয়ত পঁচানব্বই বৎসর হয়ে গেছে কিন্তু তার ব্রেনটার বয়স হয়নি, সে সব কাজই এখন করতে পারে। অনেক সময় ব্রেনটার কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেটা—ব্রেনটার বয়স হয়েছে বোলে নয়, কোন অসুখ হ'য়ে ব্রেনটার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা জন্তু কতদিন না খেয়ে থাক্তে পারে প্রথমত তার দেহের উপর নির্ভর করে।

যে সব প্রাণির রক্ত গরম তারা ৪০ per cent ওজন কমে গেলেই মারা যায় কিন্তু যাদের রক্ত ঠাণ্ডা তারা অর্দ্ধেকের বেশী ওজন কমে গেলেও বেঁচে থাকে। বড় বড় জন্তুরা ছোটোদের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে এবং মোটা মানুষ রোগা মানুষের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে। একটা কুকুর না খেয়ে ৬০ দিন থাকতে পারে, কিন্তু একটা ইঁদুর ৫।৬ দিন না খেলেই মরে যায় এবং একটা পায়রা ১১ দিনেই মরে যায়।

ম্যোকস্যুইনি (McSwinney) নামক একজন আইরিস লোক না খেয়ে ৭৫ দিন বেঁচে ছিল এবং স্বদেশহিতৈষী যতিন্দ্রনাথ দাসও জেলেতে না খেয়ে মারা গিছলেন, Catti নামে একজন Italian ৬০ দিন না খেয়ে ছিলেন। একটা ব্যাঙ ১ বৎসর না খেয়ে থাকতে পারে আর একটা ছারপোকা ৬ বৎসর না খেয়ে থাকতে পারে।

তরল দন্তধাবন।

দারুচিনির তৈল	... ...	১০ ফোটা
লেবুর তৈল	... ...	১০ ,,
হোয়াইট কাষ্টাইল সোপ	...	২ আউন্স
রেক্‌টিফাইয়েড স্পিরিট	...	৮ ,,
ডিষ্টিল ওয়াটার	... ...	৮ ,,
লিকুইড কচিনিল	... ...	৮ ,,

প্রথমে কাষ্টাইল সাবানকে টুকরা টুকরা জলে দিয়া মৃদু জ্বালে গালাইয়া ফেলিতে হইবে, তারপর দারুচিনির তৈল ও লেবুর তৈলকে রেক্‌টি-

ফায়েড স্পিরিটে গালাইয়া লইয়া ঐ দ্রবিভূত সাবানের সলুইশনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিয়া তাহার পর কচিনিল দিলেই গোলাপী রং হইবে, তাহার পর যেরূপ গন্ধ প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা মিশাইয়া দিবে।

ইহা একটী উৎকৃষ্ট দন্তধাবন। মুখের দুর্গন্ধ, অশক্ত দাঁতের গোড়ার এবং মাড়ীর রোগ ইহাদ্বারা বিদূরিত হয়। মুখে সুগন্ধ হয় এবং উহা অনেকক্ষণ থাকে।

ঘড়ির তৈল।

একটী শিশির মধ্যে জল্পাইয়ের তৈল রাখিয়া কতক পরিমাণে সীসার গুড়া দিবে, যেন শিশির তলদেশ ঢাকা পড়ে। শিশির মুখ ছিপি বন্ধ করিয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত সূর্য্যতাপে রাখিলে শিশির নিম্নে সর পড়িবে। সেই অংশ বাদ দিয়া অতি সাবধানে উপরের তৈল ঢালিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে ঘড়ির তৈল প্রস্তুত হয়।

শিরীষ কাগজ।

কয়েকখানি শিরীষ শীতল জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া নরম হইলে উহা একটী পাত্রে রাখিবে। পরে ঐ পাত্রের তলায় একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া সেই পাত্রটীকে উনুনে চড়াইয়া জাল দিবে। উত্তপ্ত জলের গরম বাষ্পে শিরীষ গলিবে। শিরীষ গলিয়া বেশ পাতলা হইলে, গরম থাকিতে থাকিতে একখানা মোটা কাগজে মাখাইয়া তাহার উপর কাচ চূর্ণ ছড়াইয়া শুকাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট শিরীষ কাগজ প্রস্তুত হইবে। রৌদ্রের চেয়ে ছায়াযুক্ত বাতাসে ইহা শীঘ্র শুকায়।

Human Telepathy.

আগেকার দিনে লোকেরা কি রকম উপায়ে খুব কম সময় এবং অনেক দূর দেশে সংবাদ প্রেরণ করিত সেটা একটা খুবই আশ্চর্য্য বোলে মনে হয়। Indian Mutinyর সময় তারা কত অল্প সময়ে কত 'শ মাইল দূরের দেশে খবর পাঠাতো, কিন্তু তখন টেলিগ্রাম নামে কোন জিনিষই ছিল না।

South America, Australia বা Africa বাসীরাও এই রকম উপায়ে খবর পাঠাত। অনেক সময় মেঘের অবস্থা দেখে সংবাদ ভাল কি খারাপ বোঝা যায়, আর ঢাক বাজিয়ে খবরও একটা দেশ থেকে আর এক দেশ আগেকার লোকেরা দিতো। কিন্তু এর মধ্যে কোনটাই খুব সন্তোষজনক মনে হয় না।

Australiaর লোকেদের যখন কোন দূরদেশে খবর পাঠাতে হোত তখন তার মন থেকে অন্য সব চিন্তা দূরকোরে শুধু যে কথাটী বোঝাতে হবে সেই কথাটীই একমনে ভাবতো, এবং যাকে মনে করে ভাবছে, কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হত তাকে যেন কেউ ডাকছে, এবং সেও ঐ উপায়ে ভাবতো, এবং কিছু বাদে সে সংবাদটা পেত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এইরূপ সংবাদ বেশী পাওয়া যাইত।

প্রত্যেক ছোট ছেলেমেয়ের একটা অবসর সময় থাকা দরকার যে সময়ে সে নিজে কি চায় সেটা ভেবে ঠিক করতে পারে। July মাসের Hygiaতে Ruth L. Franbel "Child Leisure, a Modern Problem" বলে একটা প্রবন্ধে এইটি ছিল।

সাধারণ ছেলেমেয়েরা এসব ভাববার মোটেই

সময় পায় না, তাদের মা বাপেরা ছেলেমেয়ের জন্য ঠিক মেপে মেপে সময় ঠিক করে দিয়েছে, পড়ার সময়, স্নান করিবার সময়, ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এই রকম ক'রে তার আর নিজে ভাববার সময় মোটেই হয়না, যদিও বা হয় তো সে সময়টা cinema, theatre দেখে কাটায়! এই ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে সম্পূর্ণ নিজের মতে যখন চলবে, তখন সে ছেলেবেলার স্বভাব বদলাতে পারবেনা, সে শুধু খেলা, গল্প ইত্যাদি করবে, কাজের কিছুই তাদের দ্বারা হবেনা। কাজেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের একটা সময় দেওয়া উচিত, যে সময় সে নিজে কি চায় সেটা ভেবে দেখতে পারবে।

বিবিধ

মুলতানের একটী সংবাদে প্রকাশ,—ষাট বৎসরের এক বেনিয়ার সহিত ১২ বৎসরের কন্যার বিবাহ দিয়া বালিকার পিতা অনুতাপে আত্মহত্যা করিয়াছে। বালিকা আপত্তি করিয়াও এই বিবাহ নামক কন্যা-বিক্রয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার পায় নাই। অর্থ বিনিময়ে বৃদ্ধের নিকট বালিকাকন্যা বিক্রয় করিয়া অনুতপ্তও হয় না—আত্মহত্যাও করে না এমন নরপশু পিতা বা অভিভাবক আমাদের বাঙ্গালী সমাজেও বিরল নহে এবং এই শ্রেণীর বিবাহে যোগ দান, আমোদ-আহ্লাদ করিবার জন্যও বাঙ্গালী সমাজে লোকের অভাব হয় না। অভ্যস্ত পাপ সম্পর্কে যেমন ব্যক্তির, তেমনি সমাজের আত্মচৈতন্য থাকে না! কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনুষ্যপ্রকৃতি সংস্কারজনিত ও লোভের মোহ হইতে মুক্ত হয়,—এই হতভাগ্য বৃদ্ধ আত্মহত্যা করিয়া সমাজকে সেই শিক্ষা দিয়া গেল; কিন্তু সমাজ তাহা মনে রাখিবে কি?

মহাত্মাজীর ভারতীয় যক্ষ্মারোগীর সহিত কথাবার্ত্তা

মহাত্মা গান্ধী খ্যাতনামা শান্তিকামী মিঃ এদম্ প্রিভার সহিত লেঁসেঁপ নামক গ্রামটী পরিদর্শন করিতে যান। সেখানে তিনি কৃষকদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী লক্ষ্য করেন। কৃষক পরিবারের নিজগৃহে সূতা কাটা মহাত্মার অত্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে গান্ধীজী লেস্যাঁর যক্ষ্মানিবাসটিও পরিদর্শন করেন। এই যক্ষ্মানিবাসের রোগীদের মধ্যে একজন ভারতীয় আছেন, মহাত্মা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন।

চন্দ্রশেখর বলেন, মানুষের জীবনে দৈব বলিয়া একটা জিনিস আছে। বীমা বিজ্ঞানের কার্য্য হইতেছে দৈব সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অনিষ্টকর ফল দূর করা। বীমার দ্বারা মানুষ যমকে প্রতারিত করিতে এবং যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে পত্নী, সন্তান প্রভৃতি তাহার পোষ্যবর্গকে

এমন অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারে, যাহা বীমা ব্যতীত সম্ভবপর হইত না।

বীমার আর একটা দরকারী দিক আছে। বীমা একটা বিরাট জাতীয় সম্পদ। ইহা শুধু ব্যক্তি-বিশেষ বা তাহার পরিজনবর্গের সংস্থান করে না,—ইহা একটি জাতীয় ভাণ্ডারের সৃষ্টি করে, যাহা জাতির উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে প্রয়োজন হইলে আইনের দ্বারা ভারতে ব্যবসাকারী বীমা কোম্পানী সমূহকে বাধ্য করা উচিত যে, বীমার উদ্বৃত্ত তহবিল ভারতবর্ষের মধ্যে খাটাইতে হইবে। তিনি বৈষম্যের কথা বলিতেছেন না—উহার সহিত রাজনীতিকদের সংস্রব তিনি তাঁহার দেশকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতে অভিপ্রায় করেন, সেই হেতু উদ্বৃত্ত অর্থ ভারতে খাটানো উচিত বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন।

বেঙ্গল ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটী

বেঙ্গল ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটীর অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য স্থানীয় ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদনুযায়ী ফ্যাকালটীর সদস্য ডাঃ কেদারনাথ দাস, সুশীল মুখার্জ্জী ও কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট ইনষ্টিটিউট পরিদর্শনার্থ অদ্য এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাথমিক তদন্ত কার্য্য শেষ করিয়াছেন। এখানে ফ্যাকালটী পরীক্ষার একটী কেন্দ্র স্থাপন জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুলও পরিদর্শন করিবেন, কারণ ফ্যাকালটীর অন্তর্ভুক্ত তিনটী মেডিকেল স্কুল বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে এবং উহার কার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে।

—ফ্রী প্রেস

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম সত্যাগ্রহের উদ্বোধন করেন, তখন যিনি স্বীয় ব্যবসা ও বিত্ত পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মীরূপে মনুষ্যত্ব ও জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন —সেই নিরভিমানী সত্যের সাধক, ইমাম সাহেব আবদুল কাদের উজীর, সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী একজন অকৃত্রিম বান্ধব হারাইলেন ভারতবর্ষ একজন নিষ্ঠাবান কর্ম্মী হারাইয়া দরিদ্র হইল। আজীবন নিষ্ঠার সহিত দারিদ্রব্রত গ্রহণ করিয়া স্বদেশ সেবার যে তুলভ আদর্শ ইমাম সাহেব রাখিয়া গেলেন তাহা বর্ত্তমান যুগের নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করুক। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং সবরমতী আশ্রমের শোকসন্তপ্ত নরনারীবৃন্দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ওস্‌লো, ১০ই ডিসেম্বর,—১৯৩১ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজটি তুই জনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম :—(১) জেন এডামস্ (ইনি বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্টরূপে কাজ করিতেছেন) এবং (২) ডাঃ নিকোলাস মুরে বাট্‌লার (ইনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট)।

লণ্ডনে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের বক্তৃতা

লণ্ডন, ১২ই ডিসেম্বর, অদ্য ভিক্টোরিয়া হলে প্রবাসী ভারতীয়দের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত এক দীর্ঘ বক্তৃতায়

চট্টগ্রাম এবং হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেস তদন্ত কমিটীর তদন্ত ফল বিবৃত করেন এবং যে সমস্ত ভারতীয় লোক কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে সত্যের সম্মুখীন হইতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন এই সমস্ত সমালোচক তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভারতে আসিয়া পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সহায়তা করিতেছেন।

সভার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলী হিজলী চট্টগ্রামের নিহত ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ নীরবে দণ্ডায়মান হন।

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরও ধারণা যে, যদি ইউরোপ ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে জনমতের নৈতিক চাপে প্রতিকারোপায়ের সাফল্যের পথ অনেক সুগম হইবে। কথাটা অসার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ইহার মধ্যে মনুষ্য প্রকৃতির একটা সত্য নিহিত আছে। অন্যায়-পীড়িত মানুষ মনুষ্যত্বের নিকট চিরদিনই সহানুভূতি কামনা করিয়াছে — কামনা নিষ্ফল হইলেও মানুষ নিরাশ হয় নাই। যেমন মানুষ বা জাতি ঈশ্বরের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া, প্রতিকার না পাইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায় না, তেমনি মানুষ মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস হারাইতে পারে না। তাহা হইলে হয়ত সভ্যতা, নীতি, ধর্ম্ম বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

স্যর চার্লস টেগার্টের নূতন পদ।

নয়াদিল্লী, ১০ই ডিসেম্বর।

ভারতীয় পুলিসবাহিনীর সার চার্লস টেগার্ডকে ভারত-সচিব ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

—এ, পি

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী।

দুই কোটী টাকার উপর।

বোম্বাই, ১২ই ডিসেম্বর।

স্বর্ণের দর বাড়িয়াছে তাই ভারতবর্ষ হইতে ক্রমাগত স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই সপ্তাহের ডাক-জাহাজে প্রেরণ করিবার জন্য গতকল্য পর্য্যন্ত দুইকোটী পাঁচলক্ষ টাকার স্বর্ণ জমা হইয়াছে। অদ্য আরও কয়েক লক্ষ টাকার সোনা আসিবে।

—ফ্রী প্রেস

নূতন সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচালক ডাঃ আর, বি, খাম্‌বাটা, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস, ডি, পি, এইচ, ডিরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। ইহা পূর্ব্বে আই, এম, এস, পদবীধারীদের একচেটিয়া ছিল। ডাঃ বেণ্টলী সাহেব আই, এম, এস, না হইয়া এই পদে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি আই, এম, এস, ছিলেন না তথাপি ইংরাজ ছিলেন। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই পদ প্রথম। ইনি উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইলেও ভারত সরকার বিশেষতঃ মন্ত্রী বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় প্রশংসাহ ও ধন্যবাদার্হ। পূর্ব্বে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি তাহাদের দক্ষতা সত্বেও উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই; আজ মন্ত্রী মহাশয় ভারতবাসীকে এরূপ একটা উচ্চ পদে নিয়োগ করিয়া ডাঃ খাম্‌বাটাকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, নিজেও কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়াছেন।

ডাঃ প্রেমাঙ্কুর দে—মন্ত্রী বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের আর একটী কীর্ত্তি ডাঃ প্রেমাঙ্কুর দেকে ফিজিওলজির অধ্যক্ষ পদে বরণ করা। এই পদেও পূর্ব্বে আই, এম, এস অফিসার নিযুক্ত হইত। শেষ অধ্যক্ষ লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল ম্যাক-নিল ক্রাইষ্ট ছিলেন। ইনিই প্রথম ভারতবাসী যাঁহাকে উক্ত ফিজিওলজির অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

HEALTH.

(Bengali)

মাঘ—January. ৯ম বর্ষ

সম্পাদক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম. এ., বি. এল

কার্য্যালয়—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউক্যালিপ্টাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতু উদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ
ইউক্যালিপটীন
ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যথায় "জ্বরতর"
শিশি ১৵ মাঃ ।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

সূচী

নবম বর্ষ] মাঘ—১৩৩৮। [১২শ সংখ্যা

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য

(রমেশ শর্ম্মা)

জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে, ছাত্রগণের শরীর সুস্থ এবং মন পবিত্র থাকা চাই। এই জন্য ছাত্র জীবনেই সব বিষয়ে বিশেষ শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শরীর যন্ত্রকে নিয়মিতরূপে চালাইতে হইলে, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি প্রতিদিন পালন করিতে হইবে। আবার মনকেও সৎভাবে পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যহ কিছুক্ষণ আত্মহিত চিন্তা আবশ্যক। শরীর এবং মনকে একসঙ্গে পবিত্র, সবল এবং তেজঃপূর্ণ করিতে হইবে।

নানা ধর্ম্মে, নানা মত। এই জন্য ছাত্রজীবনে নীতি-পথ, সত্য-পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। নচেৎ অহিংসা, সত্য, প্রেম ইত্যাদি সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে।

প্রার্থনা, কৃপা ভিক্ষা, ধর্ম্মের দোহাই—এসব কেবল গোঁড়ামীর ভাব এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বৃদ্ধি করে। ঐ সব দ্বারা সত্যের, সরলতার, উদারতার ভাব কলুষিত হয়; ধর্ম্মের নামে, অন্ধ-বিশ্বাসের দোহাই দিয়া, লোক সংকীর্ণমনা হয়, হিংসা করিতে শিক্ষা করে।

এই জন্য ছাত্রজীবনে, সত্য, প্রেম এবং পবিত্রতার সাধনাই মঙ্গলজনক; তাহা হইলে, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ছাত্রগণের হৃদয় উদার হইবে, সত্যের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিবে, জগৎ এবং জগৎবাসীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং সমপ্রাণতা আসিবে। এইরূপ সুগঠিত ছাত্রজীবন, জগতে এক শুভ যুগ আনয়ন করিবে।

এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইলে, শরীর এবং মনকে শুদ্ধ, সবল, তেজঃপূর্ণ করিতে হইবে।

শরীর অসুস্থ হইলে, কিছুই ভাল লাগে না; কুৎসিত ভাব ও চিন্তায় চিত্ত কলুষিত হইলে, ছাত্র-জীবনকে ধ্বংশের পথে লইয়া যায়। মন স্থির না

থাকিলে; জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায় না; কারণ একাগ্রতার অভাব হয়।

একটীমাত্র কুভাব প্রবল হইলেই মানুষকে অস্থির করিয়া ফেলে এবং সেই দুর্ব্বলতার জন্যই, জ্ঞান ধ্বংশ হয়।

জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে, ছাত্রগণকে আলস্য শূন্য হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী, এবিষয় একরকম নিশ্চেষ্ট। আজ কাল ছাত্রগণ বড় বড় পরীক্ষায় পাশ করিতেছে সত্য; কিন্তু সময়মত শয্যা ত্যাগ দাঁত মুখ ধোয়া, ব্যায়াম করা, এবং আর আর সব শারীরিক নিয়ম পালনে এবং প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সত্য, পবিত্রতা, অহিংসা—ইত্যাদি সৎগুণ সাধনে তাহারা নিশ্চেষ্ট।

কেবল পরীক্ষায় পাশ করিলেই কি আর মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়? সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সংযম অভ্যাস না করিলে, সংসারের ভীষণ প্রলোভনময় কর্ম্মক্ষেত্রে, পদে পদে ঠেকিয়া, ঠকিয়া, প্রলুব্ধ হইয়া, পাপে ডুবিয়া জীবন বিপন্ন হয়।

এই জন্যই, ছাত্রজীবনে, ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম এবং প্রধান আবশ্যকতা।

ভোগবাদিগণ সংযম এবং ত্যাগকে, মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভোগ বিলাস যে ক্ষয় এবং ক্ষতির পথ তাহা যে তাঁহারা না বোঝেন এমন নহে। সঞ্চয় এবং মিতাচারই বৃদ্ধির, বিকাশের উপায়; অমিতব্যয়িতা কেবল অভাব এবং দারিদ্রই আনায়ন করে। ভোগের হেতুবাদ অসার—প্রবঞ্চিতের প্রবঞ্চনা, মোহমুগ্ধের ছলনা, ভোগীর উচ্ছৃঙ্খলতা ঢাকিবার হীন প্রচেষ্টা মাত্র।

শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়াও ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সৎপথে অগ্রসর হইবে, তাহা হইলেই তাহারা জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

সাধারণ সংক্রামক রোগসমূহ এড়াইবার নিয়ম

শ্রীভোলানাথ চাটার্জ্জী, B. Sc.

কোন রোগী কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে সন্দেহ হইলেই তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্য-বিভাগে সংবাদ দেওয়া উচিত। নিম্নে কয়েকটী সংক্রামক রোগের কথা বলা হইল :—

Chicken Pox (পানি বসন্ত)

যে বাটিতে এই রোগ হইয়াছে সেই বাটিতে একখানি বিজ্ঞাপনে "সাবধান" কথাটী লিখিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। রোগীর চামড়া যতদিন না সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কার হয় ততদিন রোগী একাকী থাকিবে। ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করাইয়া দেখা উচিৎ যে রোগীর বসন্ত (Small Pox) হইয়াছে কিনা। যে সমস্ত দ্রব্যাদি রোগীর নিকট থাকিবে কিম্বা রোগী স্পর্শ করিবে তাহা প্রত্যেক দিন সংশোধন

কারী ঔষধে কিম্বা অন্য উপায়ে বিশেষভাবে সংশোধন করিতে হইবে। যে বাটিতে এই রোগ হইয়াছে সেই বাটির বালকবালিকা ও বয়স্থ লোকেদের যদি পূর্ব্বে পানি বসন্ত হইয়া থাকে তাহাদের বাটির বাহিরে অন্য কাহারও সঙ্গে মিশিতে বাধা নাই। কিন্তু ছেলেদের যদি এই রোগ পূর্ব্বে না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের, রোগীর প্রথম গুটি বাহির হইবার ১২ দিন হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত স্কুলে যাওয়া কিম্বা অন্য কাহারও সহিত মেশা একেবারে নিষিদ্ধ।

ডিপথীরিয়া

যে বাটিতে রোগ হইয়াছে, সেই বাটিতে quarantine বিজ্ঞাপন মারিতে হইবে। এই বিজ্ঞাপনে বাহিরের কোন লোককে বাটিতে প্রবেশের এবং সেই বাটির কাহারও বাটির বাহিরে যাইবার নিষেধাজ্ঞা থাকিবে। রোগী সম্পূর্ণ একাকী থাকিবে এমনকি বাহিরের লোক রোগীর বাটিতে প্রবেশ করিবে না এবং রোগীর বাটির অন্য লোক স্বাস্থ্য-বিভাগের বিনা অনুমতিতে বাহিরে যাইতে পারিবে না। যত দিন না রোগী পরীক্ষিত হইয়া বোঝা যাইবে যে তাহার শরীরে আর ডিপথীরিয়া জীবাণু নাই ততদিন রোগী এই অবস্থায় থাকিবে। রোগ হইবার নয় দিনের মধ্যেই রোগীকে প্রথম পরীক্ষা করা উচিত। যতদিন রোগী একাকী থাকিবে ততদিন রোগীর সংস্পর্শে যে কোন দ্রব্য আসিবে তাহা সংশোধন করিতে হইবে। রোগী আরোগ্য-লাভ করিলে তাহার ব্যবহৃত ঘর সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

রোগীর সহিত যাহারা থাকিবে, তাহাদের, গয়ার ও শিকনি পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে তাহাতে রোগের জীবাণু নাই তাহা হইলে তাহারা যে কোন স্থানে থাকিতে পারে। শ্রমজিবীরা, যদি রোগীকে স্পর্শ না করে কিম্বা তাহাদের কর্ম্মে, যদি তাহারা, শিশু কিম্বা দুগ্ধের সংস্পর্শে না আসে তাহা হইলে তাহারা, রোগীর বাটির বাহিরে গমনাগমন করিতে পারিবে। শিশুদের শরীরে রোগের জীবাণুর অস্তিত্ব না থাকিলে, তাহারা যে কোন স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু যদি তাহাদের শরীরে রোগের জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তাহা হইলে তাহাদের পরীক্ষা করাইতে হইবে কিম্বা রোগীর ন্যায় সাত দিন একাকী রাখিতে হইবে। পরীক্ষায় যদি তাহাদের গয়ার ও শিকনিতে ডিপথীরিয়ার জীবাণু দেখা যায় তাহা হইলে তাহাদের রোগীর ন্যায় একাকী রাখিয়া রোগীর ন্যায় স্নান করিতে হইবে। আর তাহারা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত থাকিলে যে কোন স্থানে থাকিতে তাহাদের বাধা নাই। Negative Schick Test নামক একটী পরীক্ষার দ্বারা কাহারও শরীরে ডিপথীরিয়া জীবাণু আছে কিনা জানা যায়।

যদি কোন ডিপথীরিয়া রোগী স্কুলে যাইয়া থাকে, তাহা হইলে স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষক রোগীর সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলা এবং নাক পরীক্ষা করাইতে হইবে অথবা সাত দিন রোগীর ন্যায় একাকী নির্জ্জন অবস্থায় থাকিতে হইবে। রোগীর সংস্পর্শে আসিবার সাতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিনই তাহাদের পরীক্ষা করাইয়া দেখিতে হইবে যে ডিপথীরিয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি না। মোটের উপর রোগীর বাটির যে কোন লোক তাহাদের রোগ হউক আর নাই হউক, তাহাদের

১৪দিন* পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাটিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।

আমাশয় Dysentry—Bacilary

রোগ হইবামাত্র স্বাস্থ্য বিভাগে সংবাদ দিতে হইবে। রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মল এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংশোধন করিতে হইবে।

Erysepelas

এই রোগ হইলেই স্বাস্থ্য বিভাগে সংবাদ দিতে হইবে। রোগী সম্পূর্ণরূপ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত একাকী থাকিবে।

Influenza

মড়কের সময়ে প্রত্যেক রোগীর সংবাদ স্বাস্থ্য বিভাগে পৌঁছান উচিত। সম্পূর্ণ নিরাময় পর্য্যন্ত রোগী একাকী নির্জ্জন ঘরে থাকিবে।

Measles হামজ্বর

হামজ্বর হইয়াছে সন্দেহ হইলেই স্বাস্থ্য বিভাগে সংবাদ দেওয়া উচিত। বাটিতে "সাবধান" লিখিত বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত রোগী একাকী থাকিবে। অন্ততঃ সাতদিন রোগীকে নির্জ্জন ঘরে রাখিতে হইবে। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তার থুতু, গয়ার, শিকনি প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসিবে তাহা প্রত্যেক দিন বিশেষরূপে সংশোধন করিতে হইবে। বয়স্থ লোক যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে তাহাদের বাটির বাহির হইতে বাধা নাই এবং রোগীর বাটির যে সকল ছেলেদের পূর্ব্বে কখন হাম জ্বর হইয়াছে তাহাদেরও বাটির বাহির হইতে নিষেধ নাই, কিন্তু যে সকল ছেলেদের এই রোগ কখনও হয় নাই, তাহাদের সাতদিন পর্য্যন্ত স্কুল কিম্বা অন্য কোথাও যাইয়া কাহারও সহিত মেশা একেবারে নিষিদ্ধ।

Cerebro-Spinal Fever

ইহা একটী মড়ক রোগ। কোথাও এই রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া মাত্রই স্বাস্থ্য বিভাগে সংবাদ দিতে হইবে। প্রত্যেক রোগীর বাটিতে quarantine বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। রোগীকে অন্ততঃ ১৪ দিন পর্য্যন্ত quarantined অবস্থায় নির্জ্জনে রাখিতে হইবে। কোন সরকারী পরীক্ষাগারে রোগীর আশ পাশের লোককে পরীক্ষিত হইতে হইবে। রোগীর quarantined অবস্থায় রোগীর কিম্বা তাহার পরিত্যক্ত মল, মূত্র, থুতু, গয়ার ইত্যাদির সংস্পর্শে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আসিবে তাহা প্রত্যেক দিন বিশেষরূপে সংশোধন করিতে হইবে। রোগী quarantine অবস্থা হইতে মুক্ত হইলে তাহার ব্যবহৃত ঘর বিশেষরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে। রোগীর বাটির অন্য লোককেও অন্ততঃ ১৪ দিন পর্য্যন্ত কোথাও যাওয়া আসা নিষেধ। শ্রমজিবীরা যদি রোগীকে না স্পর্শ করে কিম্বা তাহাদের কর্ম্মে যদি তাহাদের শিশুদের সঙ্গে মিশিতে অথবা খাদ্য ও দুগ্ধ স্পর্শ করিতে না হয়, তাহা হইলে তাহারা বাটির বাহিরে যাওয়া আসা করিতে পারে। রোগীর বাটির অন্য লোকেদেরও রোগীর ন্যায় quarantine অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং রোগী সুস্থ হওয়া পরও ১৪ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের স্কুল, অফিস কিম্বা অন্য কোথাও যাওয়া নিষেধ।

Scarlet fever

এই রোগ হওয়া মাত্রই স্বাস্থ্য বিভাগে সংবাদ পৌঁছান চাই। বাটিতে quarantine প্ল্যাকার্ড

মারিতে হইবে। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২১ দিন পর্য্যন্ত একাকী quarantined অবস্থায় থাকিবে। রোগীর quarantine অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে পালনীয় নিয়ম ডিপথারিয়া রোগের ন্যায়। রোগীর বাটির অন্য সকলেরও পালনীয় নিয়ম ডিপথীরিয়া রোগের ন্যায়।

Septic Sore Throat

রোগীর সংবাদ স্বাস্থ্য বিভাগের গোচরে আসিবে। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত একাকী থাকিবে। রোগী এমন কাজ করিবে না যাহাতে তাহাকে দুগ্ধ এবং খাদ্য দ্রব্যাদি ছুঁইতে হয় এবং যে বাটিতে দুগ্ধ কিম্বা আহার্য্য দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় সে বাটীতে থাকিতে পারিবে না।

Small Pox বসন্ত

বসন্ত রোগ হওয়া মাত্রই স্বাস্থ্য বিভাগে সংবাদ দিতে হইবে। রোগীর বাটিতে quarantine "প্ল্যাকার্ড" দিতে হইবে। রোগীর গুটীর খোলস ছাড়া একেবারে বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে একাকী quarantine অবস্থায় থাকিতে হইবে। তাহার ব্যবহৃত প্রত্যেক দ্রব্য প্রতিদিন সংশোধন করিতে হইবে। রোগীর বাটির অন্য লোক যে রোগীর সংস্পর্শে আসিবে যদি তাহার কখনও বসন্ত হইয়া থাকে কিম্বা যদি পাঁচ বৎসরের মধ্যে টিকা লইয়া টিকা ভালরূপে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে, বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিবে। যে সকল লোকের কখন বসন্ত হয় নাই কিম্বা পাঁচ বৎসরের মধ্যে টিকা লয় নাই অথবা টিকা লইয়া তাহা ভালরূপে উঠে নাই, তাহাদের তৎক্ষণাৎ টিকা লইতে হইবে এবং বাটিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, বাটির বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিবে না। টিকা লইয়া যদি তাহাদের টিকা উঠে তাহা হইলে টিকা লইবার ১২ দিন পরে তাহারা quarantine অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে অর্থাৎ তখন তাহারা বাটির বাহিরে যে কোন স্থানে যাইতে পারিবে। রোগীর বাটির টিকা লইতে কোন আপত্তি করিলে তাহার বাটিতে রোগ হওয়ার পর ১৭ দিন পর্য্যন্ত একাকী বাটিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। যাহারা টিকা না লইয়া quarantine অবস্থায় থাকিতে রাজী হইবে তাহাদের quarantine অবস্থার হইতে মুক্তির পরও ১৭ দিন পর্য্যন্ত একাকী থাকিতে হইবে।

বাটির অন্য লোক যাহারা রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে না তাহাদের পাঁচ বৎসরের মধ্যে টিকা না হইলে তৎক্ষণাৎ টিকা লইতে হইবে। তাহাদের টিকা উঠিলে টিকা লইবার ১২ দিন পর তাহারা বাটির বাহিরে যাইতে পারিবে। টিকা লইতে আপত্তি করিলে রোগ হইবার পর ১৭ দিন পর্য্যন্ত বাটীতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। অন্যান্য পালনীয় নিয়ম ডিপথীরিয়ার ন্যায়।

ঔপসর্গিক মেহ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

কবিরাজ শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা 'ঔপসর্গিক মেহ' গণোরিয়ার নামের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিলাম। কেন এ নাম গ্রহণ করিলাম সে কথা আজ থাক। তবে এই মাত্র বলি, পূর্ব্বে এ নাম বহু-খ্যাত-নামা আয়ুর্ব্বেদ মতাবলম্বী চিকিৎসক গ্রহণ করিয়াছেন। মিহ ধাতুর অর্থ ক্ষরণ। এই অর্থ লইয়া 'ঔপসর্গিক মেহ' নামকরণ করা হইয়াছে মাত্র। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, বিংশতি প্রকার প্রমেহের সহিত আর এক প্রকার মেহ জুড়িয়া দেওয়া হইল। মাত্র উপরিলিখিত নাম গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমাদের পবিত্র দেশে এ ব্যাধি ছিল না। ছিল না বলিয়া যে তাহার চিকিৎসার কোন অসুবিধা হইবে এরূপ নহে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔপসর্গিক মেহ চিকিৎসা করিলে উত্তম ফল লাভ করা যায়। ঋষিগণ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, সংযমের অভাবে এরূপ কদর্য্য ব্যাধি তাঁহাদের সন্তানগণের হইবে। আজ বড়ই দুঃখের বিষয় এই কদর্য্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু নর-নারী কষ্ট পাইয়া থাকেন। নিজেদের ত' কষ্ট আছেই, সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, কন্যাগণের অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ করিয়া তুলেন তাহা চিকিৎসকগণ এবং ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।

এই রোগ এক প্রকার ক্রিমি সম্ভূত। যাহাকে পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ 'গণোককাস' নাম করণ করিয়াছেন। দুঃখের কথা কি বলিব দেখুন Osler তাঁহার বিখ্যাত Practice of Medicine নামক গ্রন্থে এই রোগের নিদান সম্বন্ধে কি বলেন :—

"The disease is seen in men and women as a result of impure sexual intercourse, in the new-born from vaginal contamination, and in older children by accidental infection." ইত্যাদি।

এই যদি কারণ হয় তাহা হইলে, ইহার প্রতিষেধ নিমিত্ত একটু সংযম রক্ষা করিলে ক্ষতি কি? বুঝি না পুরুষ নারীর কাছে কি চায়!

যদিও ঋষি প্রণীত সংহিতা গ্রন্থাদিতে এই রোগের উল্লেখ নাই তথাপি মহামতি ভাবমিশ্র তাঁহার বিখ্যাত ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র এই রোগের নিদান সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোইয়ঞ্জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিনোইঙ্গ সংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ।
ব্যাধিরাগন্তুজোহ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ॥"

—ভাবপ্রকাশ

উল্লিখিত শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই কদর্য্য ব্যাধি আমাদের দেবভূমি ভারতবর্ষের নহে। পাশ্চাত্য জাতি সকল এ দেশে আসিবার সাথে সাথে গণোরিয়া ও সিফিলিস নামক দুইটী ব্যাধি এদেশে আইসে। মহামতি ভাবমিশ্র বাহ্য, আভ্যন্তরজ ও বাহ্য-আভ্যন্তর এই তিন প্রকার ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ভিতর আভ্যন্তরজ ফিরঙ্গ রোগই গণোরিয়া বলিয়া অনেক খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত চিকিৎসক নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সহজ চিকিৎসা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঔপসর্গিক মেহ একটি কদর্য্য ব্যাধি। এই ব্যাধি একবার মানব শরীরে প্রবেশ-লাভ করিলে সহজে যাইতে চায় না। এই ব্যাধি প্রকাশ পাইলেই সুচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সত্বর নিরাময় হইবার আশা করা যায়। এই ব্যাধি হইতে বাত পর্য্যন্তও দেখা দিতে পারে। (গণোরিয়াল রিউমাটিজম)।

(১) রোগীর প্রত্যহ প্রাতঃকালে সাদা চন্দন ঘসা ১ তোলা, কাবাব চিনি চূর্ণ /০ আনা ও কর্পূর ১ রতি একত্র মিশাইয়া সেবন করা উচিত। রোগী যতদিন না নিরাময় হন ততদিন ইহা সেবন করিতে হইবে।

(২) প্রস্রাব যাহাতে সরল থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অনেক সময় আভ্যন্তরজ ক্ষতের স্ফীতির জন্য প্রস্রাব আটকায়। এ জন্য সোরা /০ আনা, যজ্ঞডুমুরের পাতার রস অর্দ্ধ তোলা সহ প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে রোগীকে সেবন করিতে দিতে হইবে।

(৩) বৈকালে স্বর্ণ গৈরিক চূর্ণ ২ রতি মাত্রায় কাঁচা হলুদের রস সহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রস্রাবে জ্বালা থাকে তাহা হইলে তেজপাতার ডাঁটা ও মিশ্রী একত্র ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিতে দিতে হইবে। গঁদ ও ইসপগুল ভিজান জল ও এক্ষেত্রে উপযোগী।

(৫) যদি এই ব্যাধি পুরাতন হইয়া বাত দেখা দেয় তাহা হইলে, অশ্বগন্ধা ২ তোলা ৵৷০ সের জল সহ পাক করিয়া /৴০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

(৬) যদি আভ্যন্তরজ ক্ষত ধোয়ানর প্রয়োজন হয় তাহা হইলে, বাবলার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ছাঁকিয়া পিচকারীতে পুরিয়া ধৌত করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

যে সকল মুষ্টি-যোগ বলা হইল তাহা বিশেষ-ভাবে পরীক্ষিত। ঐ ভাবে মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে হরিদ্রা ও শ্বেত বর্ণের স্রাব বন্ধ করিয়া সত্বর আরোগ্যের পথে লইয়া যায়।

পথ্য

এই রোগে কাম প্রবৃত্তি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক রোগীর এই ব্যাধি হইতে নিরাময় হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমেই কাম প্রবৃত্তির দমন করিতে হইবে। এই ব্যাধিতে স্ত্রী সহবাস নিষেধ। লঙ্কার ঝাল, ডিম, পেঁয়াজ, রসোন, কচু, আলু, আদা এই ব্যাধিতে সেবন নিষেধ।

ভবিষ্যতে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনার বাসনা রাখিলাম। তখন প্রত্যেক উপসর্গ এবং চিকিৎসার সকল বিষয় বলা যাইবে। এ জন্য আজ এইখানেই শেষ করা হইল।

চক্ষু

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, L. M. S.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে উপরি উক্ত আবরণত্রয় কি কি পদার্থ আবৃত করিয়া রাখে তাহা বলিতেছি। চক্ষুকে দুইভাগ করিলে ইহা বুঝাইবার সুবিধা হয়। সম্মুখ ভাগটী অচ্ছোদপটলের তলদেশের গহ্বরে (Anterior Chamber) অতি সামান্য মাত্রায় এক প্রকার লবণাক্ত স্বচ্ছ জলীয় পদার্থ সংবদ্ধ থাকে। এই তরল পদার্থটাকে তেজোবারি (Aqueous Humour) বলা হয়। পশ্চাদ্ভাগটী উজ্জ্বল ও ঘনকাচ সদৃশ পদার্থ (Crystalline lens) এবং পিচ্ছিল পটল (Vitreous Humour) দ্বারা অধিকৃত।

Vitreous Humour (পিচ্ছিল পটল) চক্ষুমণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগের অধিকাংশ স্থান যাহা আঁখিতারা ও বীক্ষণ-কাচের পশ্চাতে অবস্থিত— ইহা দ্বারা পূর্ণ। আসল অক্ষিগোলকটী একটী স্বচ্ছ পাতলা ঝিল্লীময় গোলাকৃতি থলি বিশেষ—মধ্যস্থল পিচ্ছিল-পটল নামক অর্দ্ধ কঠিন আঠালো নির্ম্মল ঘন ও চক্‌চকে বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার সম্মুখে বীক্ষণ-কাচের পশ্চাদংশ থাকিবার জন্য একটু খোদল (depression) আছে; পিচ্ছিল পটলের অবশিষ্টাংশ কেশরপটল ও মুকুরিকার অভ্যন্তরে সংলগ্ন। আলোকরশ্মি অচ্ছোদপটল ভেদ করিয়া তেজোবারির মধ্য দিয়া আঁখিতারার উপর পড়ে; তথা হইতে কনীণিকার ভিতর দিয়া বীক্ষণ-কাচের গাত্রে লাগে। বীক্ষণ-কাচ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া এই পিচ্ছিল পটল ভেদ করিয়া দৃষ্টিগ্রাহী অধিষ্ঠানে, অর্থাৎ মুকুরিকায় আসিয়া পৌঁছায়।

Crystalline Lens (বীক্ষণ-কাচ) আঁখিতারার পশ্চাতে বীক্ষণ-কাচ সংবদ্ধ হইয়া আছে। অনেকটা ক্ষুদ্র স্ফটিকের চাক্‌তির ন্যায়। ইহা কতকটা জিওল

গাছের আঠার ন্যায় দৃঢ় চট্‌চটে এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম-স্তরে গঠিত। বীক্ষণ-কাচের ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চির তিন ভাগের একভাগ। ইহা সম্মুখে পশ্চাতে মধ্য-বর্ত্তুলাকার বা কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার (bi-convex) তন্মধ্যে সম্মুখাংশ ঈষৎ চাপা। সূক্ষ্মতম কাচলম্বন বন্ধনী (Suspensory ligament) দ্বারা বীক্ষণ-কাচ কেশরপটল হইতে দোদুল্যমান। বীক্ষণ-কাচ অক্ষিগোলককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে—ক্ষুদ্র সম্মুখাংশ যাহাতে তেজোবারি অবস্থিত ও বৃহৎ পশ্চাদংশ যাহা পিচ্ছিলপটল নামে অভিহিত। বীক্ষণ-কাচের চতুর্দ্দিকে একটী পাত্‌লা আবরণ থাকে যাহা ক্যাপসুল (Capsule) নামে অভিহিত। এই ঘন স্বচ্ছ কাচের ও তাহার ক্যাপসুলের যৎসামান্য আহার্য্য যাহাদ্বারা তাহারা শুষ্কতা প্রাপ্ত না হয় ও পুষ্ট হয় এবং আহার্য্য সম্মুখস্থ লবণাক্ত অথচ নির্ম্মল জলবৎ পদার্থ ও পশ্চাদ্ভাগস্থ আঠার মত ঘন পদার্থ হইতে বীক্ষণ-কাচ গ্রহণ করে। অচ্ছোদপটলের ন্যায় বীক্ষণ-কাচ কতকগুলি সূক্ষ্ম-স্তরে গঠিত; এই সূত্রগুলি অচ্ছোদপটলের সূত্রের ন্যায় অধিক পরিমাণে জল শোষণ করিতে পারে ও স্ফীত এবং অস্বচ্ছ-ভাবাপন্ন হয়। এই বীক্ষণ-কাচটী ঈশ্বরের অপূর্ব্ব দান তাহা চোখে ছানি পড়িলে বিশেষভাবে বোঝা যায়। ছানি (Cataract) পড়িলে বীক্ষণ-কাচটী ধীরে ধীরে অস্বচ্ছভাবাপন্ন হয় ও ইহার ভিতর দিয়া আর কোন আলোক-রশ্মি প্রবেশলাভ করিতে পারে না ও ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। এতদবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা বীক্ষণ-কাচটীকে নিষ্ক্রামণ করণান্তর বাহির হইতে একটী চশ্‌মা (Lens) পরাইয়া দিয়া থাকি। এই বাহিরের Lens বা কাচ কতক পরিমাণে আমাদের চক্ষুর ভিতরকার কাচের কার্য্য করিয়া থাকে। এইখানেই মানুষের কাচ ও ঈশ্বরের কাচের কতকটা প্রভেদ তাহা বুঝা যায়। মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার কাছে কোথায় হারাইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। পিচ্ছিল পটল সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখন তেজোবারি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

Aqueous Humour (তেজোবারি)—তেজোবারি আঁখিতারারূপ ঝিল্লীদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত; সম্মুখ অংশকে পূর্ব্ব-কোটর (Anterior Chamber) ও পশ্চাদংশকে পশ্চিম-কোটর (Posterior Chamber) বলে। পূর্ব্ব-কোটর অচ্ছোদ-পটল ও আঁখিতারার মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিম-কোটর আঁখিতারার পশ্চাতে এবং বীক্ষণ-কাচের ক্যাপ-সুলের সম্মুখস্থ সাস্পেন্সটা বন্ধনীর মাঝখানে থাকে। তেজোবারি সর্ব্বদা সমভাবে গভীর নহে। এমনকি সুস্থ শরীরেও ইহার গভীরতার প্রভেদ দেখা যায়। নিকটে দেখিবার সময়ও বৃদ্ধ লোকদের ইহা অগভীর। নিকট দৃষ্টিশালী (myopic) ব্যক্তিদের দূরদৃষ্টিশালী (Hypermetropic) ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গভীর।

নিম্নলিখিত কারণে চক্ষুর কণীনিকা কুঞ্চিত হয়:—

১। আলোক ২। নিকট বস্তু দর্শন ৩। চক্ষুর আভ্যন্তরিক ঘূর্ণন ৪। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ৫। নিদ্রা বিশেষতঃ গভীর নিদ্রা ৬। মর্ফিয়া, নিকোটিন, পিলোকার্পিন, এসেরিন্ ঔষধগুলি দ্বারা।

নিম্নলিখিত কারণে চক্ষুর কণীনিকা প্রসারিত হয়:—

১। অন্ধকার ২। দূরবস্তু দর্শন ৩। অত্যন্ত বেদনা ৪। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ৫। এট্রোপিন, হায়ো-সিয়ামিন্, ড্যাটুরিন্, ষ্ট্রীকনিন্, ক্যুরারী ও অতিরিক্ত কুইনাইন দ্বারা।

এইবারে উপরের চিত্র সাহায্যে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

প্রথম বা বহিরাবরণ। সম্মুখ পঞ্চমাংশ অচ্ছোদ-পটল এবং পশ্চাৎ চতুর্থ পঞ্চমাংশ শ্বেতমণ্ডল দিয়া গঠিত।

দ্বিতীয় বা মধ্যাবরণ যাহা ইউভিয়া (uvea) নামে অভিহিত—আঁখিতারা, কেশরপটল ও কৃষ্ণ-মণ্ডল দ্বারা গঠিত। তৃতীয় বা ভিতরাবরণ—মুকুরিকা। এই আবরণত্রয় ব্যতীত আমরা আর কি কি দেখিতে পাই। (৪) 'বীক্ষণ কাচ' নামক উজ্জ্বল ঘন কাচ সদৃশ একটী স্বচ্ছ পদার্থ দেখিতে পাই যাহা অক্ষিগোলককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, (১) ক্ষুদ্র সম্মুখাংশ যাহাতে লবণাক্ত অথচ নির্ম্মল জলীয় পদার্থ—'তেজোবারি' আছে এবং (২) বৃহৎ পশ্চাদংশ যাহাতে আঠার মত নির্ম্মল ও ঘন রসের ন্যায় পদার্থ—'পিচ্ছিল পটল' আছে। (৫) বীক্ষণ-কাচের সম্মুখে আঁখিতারার মধ্যস্থল-স্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র যাহা 'কণীনিকা' নামে অভিহিত দেখিতে পাই। (৬) 'দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু' যাহা অক্ষি-গোলকের ভিতর প্রবেশ করে ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া 'মুকুরিকায়' পরিণত হয়। (৭) সর্ব্বোপরি ও সর্ব্বসম্মুখে অচ্ছোদ-পটলের উপর দিয়া চোখের দুইটী পাতার ভিতর বাহিয়া এবং অক্ষিমণ্ডলের শ্বেতমণ্ডল আবরণের বহির্ভাগ আবৃত করিয়া সংযোগ-ত্বক বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংযোগত্বক ও তাহার প্রদাহ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে 'দৃষ্টি ক্রিয়া' কিরূপে সম্পন্ন হয় তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে চক্ষু দিয়াই আমরা দৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা আদৌ দৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি না। আলোক সাহায্যে বহির্জ্জগতের বস্তু সমুদয়ের যে চিত্র বীক্ষণ-কাচ ও পিচ্ছিল-পটলের মধ্য দিয়া মুকুরিকায় প্রতিবিম্বিত হয় তাহা দৃষ্টিগ্রাহী স্নায়ু বা দ্বিতীয় মাগজিক স্নায়ু মস্তিষ্কে দৃষ্টিকেন্দ্রে লইয়া যাওয়ার আমাদের প্রকৃত দর্শন ঘটে; সুতরাং কার্য্যতঃ মস্তিষ্কই প্রত্যেক রূপের দ্রষ্টা চক্ষুদ্বয় কেবল তাহার উপলক্ষ। চক্ষুর মধ্য হইতে রূপের সংজ্ঞা মস্তিষ্কের ভিতর বহন করিতে এক সেকেণ্ডের অনেক কম সময় লাগে।

সংযোগ ত্বক (Conjunctiva)

ইহা একটী শৈষ্মিক ঝিল্লি যাহা চক্ষু পত্রাবলীর ভিতরদিকে ও প্রান্তভাগে সংলগ্ন থাকে। পত্রাবলী হইতে ইহা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অচ্ছোদপটল ও শ্বেতমণ্ডলের সংযোগস্থলে (limbus) অচ্ছোদ-পটলের সম্মুখস্থ এপিথিলিয়াম (anterior epi-thelium) সহিত একীভূত হইয়া যায়। সংযোগ-ত্বক সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত:—পত্রাবলী সম্বন্ধীয় (palpebral) এবং অক্ষিগোলক সম্বন্ধীয় (ocular)। পত্রাবলী সংলগ্ন হইয়া প্রত্যাবৃত্ত পূর্ব্বক যখন অক্ষিগোলকের উপর আসিয়া পড়ে তখন palpebral হইতে ocular নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

সংযোগত্বকের প্রদাহ—Conjunctivitis—ইহা রোগের অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের। এক প্রকারের প্রদাহ হইতে দেখা যায় যাহা রোগজনিত নহে—ইহা কোন উত্তেজক দ্রব্যের আঘাতে যেমন ধূলা, বালি, ধোঁয়া, শীতল বায়ু, লবণাক্ত জল, বিজলী আলো বা বরফ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা hyperæ-mia বলিয়া পরিচিত ও Conjunctivitisএর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে অক্ষিগোলকস্থ সংযোগ-

ত্বকের বাহিরের অংশ বেশী রক্তবর্ণ হয় ও সেরূপ প্রদাহতে পিঁচুটি পড়ে না। যে সব চক্ষুতে জোর করিয়া দেখিতে হয় অর্থাৎ চশমার দরকার সত্বেও যেখানে চশমা ব্যবহার করা হয় না বা যাহারা অনেকদিন যাবৎ সুরা সেবন করিয়া আসিতেছে কিম্বা বাত রোগে অনেকদিন ধরিয়া ভুগিতেছে তাহাদেরও এইরূপ রক্তবর্ণ চক্ষু (blood shot eyes) দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রদাহ সম্বন্ধে কিছু বলিব—

১। সাধারণ প্রদাহ (simple conjunctivitis)—চোখ্ করকর্ করে, জল পড়ে, উত্তাপ বোধ হয়, পাতাগুলি ভারি ভারি বোধ করে, আলোর দিকে চাইতে কষ্ট হয়, পাতাগুলি জুড়িয়া যায়, চক্ষু লাল হয়, সামান্য ফুলিয়া উঠে ও চক্ষু চুলকায়। পাতার ভিতরদিক লাল ও খসখসে হয়। অক্ষিগোলকের শ্বেত অংশের শিরাগুলি লাল হয়। ইহাতে বেদনা বা দৃষ্টির ব্যাঘাৎ হয় না ও প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হয়।

২। শ্লৈষ্মিক প্রদাহ (catarrhal conjunctivitis)—ইহাতে প্রায় দুই চক্ষু আক্রান্ত হয় ও ইহার প্রাদুর্ভাব বসন্তকালেই অধিক দেখা যায়। ইহাতে সাধারণ প্রদাহের লক্ষণগুলি অধিক পরিমাণে থাকে ও যন্ত্রণা অধিক হয় এবং আলোর দিকে আদৌ দৃষ্টি চলে না। সমস্ত চক্ষুটা রক্তবর্ণ, স্ফীত এবং ঈষৎ বেগুণি আভাযুক্ত হয়। প্রথমে চক্ষু হইতে আঠার মত চটচটে শিক্নির ন্যায় (mucus) জলীয় পদার্থ নির্গত হয় ও পরে খুব অধিক পরিমাণে লিম্ফ (lymph) বা ঘন পুঁজ বাহির হয়। কখন কখন পত্রাবলী এত স্ফীত হয় যে চোখ খোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা সচরাচর হাম বা ইনফ্লুয়েঞ্জাঘটিত ও ইহাতে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন খুব কমই ঘটে। ইহা যখন পুরাতন আকার ধারণ করে (chronic) তখন বিশেষ কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। চক্ষু দুইটী খুব আক্রান্ত ও উত্তেজিত মনে হয় বিশেষতঃ প্রান্তভাগে খুব বেশী জল পড়ে না কিন্তু অল্প পরিমাণে যে জল পড়ে তাহা শুষ্ক হইয়া পিঁচুটির ন্যায় চক্ষুর কোনে ও চক্ষুর পক্ষগুলিতে লাগিয়া থাকে। সদ্য প্রদাহের লক্ষণগুলি কমবেশী পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। জীবাণুঘটিত প্রদাহ ব্যতীত অক্ষিগোলক যদি রশ্মিভঙ্গ জনিত দোষযুক্ত (errors of refraction) হয় যেমন লম্বদৃষ্টিসম্পন্ন (hypermetropic) ও astigmatic কিম্বা সম্যকরূপে দৃষ্টিশক্তিহীনতার (faulty accommodation) যেমন বৃদ্ধবয়সে (Presbyopia) দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা কোন রোগ সংক্রান্ত হইলে যেমন বাত বা অম্লপিত্তাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে সংযোগত্বকের প্রদাহ হইতে দেখা যায়। ইহা নাকের বা নাসাশ্রুবাহিকা নালীর রোগ হইতেও হয় এবং অতিরিক্ত ঔষধ যেমন Eserine বা Atropine চোখে প্রয়োগ করিলেও হইয়া থাকে।

৩। পুঁজ সংযুক্ত প্রদাহ (Purulent Conjunctivitis—ইহা সংক্রামক ও প্রায় দুই চক্ষুতেই আক্রমণ করে। চক্ষুর শ্বেত অংশ অতিশয় লাল হয় ও ফুলিয়া উঠে। বালি পড়ার ন্যায় কর্করানি, পিঁচুটি পড়া, পাতা লাল ও ভারি হওয়া এবং পাতা ফুলিয়া উঠে। এই রোগীকে পৃথক ভাবে রাখা দরকার নচেৎ ইহা অপরের মধ্যে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়।

৪। পত্রাবলীর দানাযুক্ত প্রদাহ (Follicular Conjunctivitis)—ইহা ছোঁয়াচে নহে; ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূসর বর্ণের দানা নিম্নকার পাতার ভিতর দিকে হইতে দেখা যায়। কখনও উপরের পাতার ভিতরেও হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বালকবালিকাদের এই রোগ হয় ও বিশ বৎসরের পর বড় একটা দেখা যায় না। একস্থানে অধিক সংখ্যক বালকবালিকা একত্রে থাকাতে এই রোগ হয়—যেমন ছাত্রাবাস ইত্যাদি। ইহার লক্ষণ একটুতেই চক্ষু ক্লান্ত হওয়া ও বেশী লেখা পড়ার পর পাতাগুলি ভারি বোধ হওয়া, চোখে জলপড়া এবং আলোর দিকে চাইতে না পারা। এই দানাগুলি নানা রকমের আকৃতি বিশিষ্ট ও পৃথক পৃথক ভাবে পাতার কিনারার সঙ্গে সমরেখানুবর্ত্তী শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। ইহার কারণ অজ্ঞাত ও বিশেষ কষ্টদায়ক; মাসাধিক ধরিয়া এমনকি বৎসরাবধিও ইহা পীড়াদায়ক হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। পত্রাবলীর পুরাতন দানাযুক্ত প্রদাহ (Granular lids বা Trachoma)—ইহাতেও ছোট ছোট দানা হয় ও খুব স্থায়ী হয় এবং সহজে আরোগ্য হয় না। ইহা অতি সংক্রামক। Follicularএ চোখের নিচেকার পাতার ভিতরদিকে দানাগুলি সচরাচর হইয়া থাকে, ইহাতে উপরকার পাতার ভিতর দিকে দানাগুলি হইয়া থাকে। রোগীর গামছা, তোয়ালে বা কাপড় চোপড় ইহা সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই রোগ বিদ্যালয়ের ছাত্র, কারখানার মজুর ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা একবার সারিয়া গিয়াও পুনরায় হয় এবং বারম্বার আক্রমণের ফলে দানার ঘর্ষণে কর্ণিয়ার প্রদাহ উপস্থাপিত করে; ক্রমে সেখানে ক্ষত হইতে দেখা যায় ও কর্ণিয়া ঘোলা হইয়া যায় ও সরের ন্যায় একটী পর্দ্দা পড়ে। ক্রমশঃ দৃষ্টি কমিয়া যায় ও অনেকে অন্ধ হইয়া যায়। ক্ষত হইয়া কর্ণিয়া ঘোলা হওয়া ও সরের ন্যায় পর্দ্দা পড়াকে পানাস্ (Pannus) বলে।

৬। অক্ষিগোলক সংযোগত্বকের দানাযুক্ত প্রদাহ (Phlyctenular Conjunctivitis)—অক্ষিগোলক সম্বন্ধীয় সংযোগত্বকে (Ocular conjunctiva) একটী কিম্বা ২।৩টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা হইতে দেখা যায় ও অল্প সীমাবদ্ধ প্রদাহ দানাগুলিকে ঘিরিয়া থাকে। দানাগুলি সারিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদাহ পরিষ্কার হইতে দেখা যায়। যদিও ইহার সম্যক্ কারণ নির্দ্ধারিত হয় নাই তথাপি দেখা যায় যে খাদ্য সম্বন্ধীয় গোলমাল হইতে এবং হাম, হুপিং কাশি ও এডিনয়ড্স (adenoids) ইত্যাদি রোগে ভুগিতেছে—এইরূপ বালকবালিকাদের মধ্যে সচরাচর এইরূপ চক্ষুরোগ হয়। সাধারণ প্রদাহের লক্ষণও ২।১ দানা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহা ব্যতীত আর কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না।

৭। প্রমেহ ঘটিত প্রদাহ (Gonorrhœal Conjunctivitis)—ইহা অতি ভয়ানক রোগ ও ইহার দ্বারা চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। এই রোগে সদ্যোজাত শিশুও জন্মান্ধ হইয়া জন্মে। ইহা জন্মগ্রহণের প্রায় তৃতীয় দিবস হইতে দশম দিবসের মধ্যে দেখা দেয় এবং পিতামাতার প্রমেহ হইতে শিশুর চক্ষু আক্রান্ত হয়। মাতৃযোনি গহ্বরের এই বিষ শিশুর চক্ষুকে আক্রমণ করিতে পারে কিম্বা প্রসব কালীন ইহা আক্রান্ত হয়। ইহা প্রায় দুটী চক্ষুকেই আক্রমণ করে ও প্রথম হইতে রীতিমত চিকিৎসা

না করিলে কর্ণিয়ার স্ফীতি হয় বা আঁখিতারার প্রদাহ হয় বা ছানি পড়ে কিম্বা সমস্ত অক্ষিগোলকের প্রদাহ (Panophthalmitis) হইয়া চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়।

বয়স্কদিগেরও ঐরূপ প্রদাহ অধিকাংশস্থলে প্রমেহকারী জীবাণুদ্বারা সংঘটিত হয় ও কয়েক ঘণ্টা হইতে তিন দিনের মধ্যে পুঁয হইতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রায় একটী চক্ষু আক্রান্ত হয় কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ আর একটী চক্ষুও ও আক্রান্ত হইতে পারে যদি কোনও কৃত্রিম উপায়ে তাহা রক্ষা না করা হয়। প্রথমে সাধারণ প্রদাহের লক্ষণগুলি দেখা যায়; পরে পুঁয দেখা দেয়, পাতাগুলি অধিকতর ফুলে ও তাহাদিগকে খোলা যায় না। বলপূর্ব্বক খুলিতে গিয়া চক্ষু গলিয়া নষ্ট হইতে দেখা যায়। যথামত চিকিৎসা করিলে দুই সপ্তাহ মধ্যে সারিয়া যায় নচেৎ কর্ণিয়ার পার্শ্বে ঘা হয় এবং এত গভীর হয় যে কর্ণিয়া ছিন্ন হইয়া ভিতরকার আঁখিতারা বাহির হইয়া পড়ে—(Prolapse of Iris); বাহির হইবার দরুণ ইহা বিষাক্ত হইয়া উঠে ও সমস্ত অক্ষিগোলকের প্রদাহ হইয়া চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়।

৮। সংযোগত্বকের বাসন্তিক প্রদাহ (Spring Conjunctivitis বা Vernal Conjunctivitis) বালকবালিকাদের মধ্যে এ জাতীয় প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনও বা বেশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়—এই ভাবে বহু বৎসরাবধি কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সারিয়া গিয়া আবার বসন্তের প্রারম্ভে দেখা দেয় বলিয়া ইহাকে বাসন্তিক প্রদাহ বা Spring Catarrh বলা হয়। Granular lidsএর দানাগুলি অপেক্ষা ইহার দানাগুলি বৃহত্তর এবং নিম্নস্থ পাতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। Granular lidsএ যেমন কর্ণিয়ার উপর সরের ন্যায় পর্দ্দা পড়ে ও ঘোলা হইয়া যায় ইহাতে সেরূপ কিছু হয় না। এই দানাগুলির উপরকার ও কর্ণিয়ার স্কেরোটিকের সন্ধিস্থলের (limbus) উপরকার সংযোগত্বক ঈষৎ নীল শ্বেত (bluish-white) আভা ধারণ করে। বাসন্তিক প্রদাহ ব্যতীত এরূপ আভা আর কোথাও দেখা যায় না।

Pinguecula—ত্রিংশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের প্রায়ই কর্ণিয়ার ভিতর দিকে অর্থাৎ নাকের দিকে অথবা কর্ণিয়ার বহির্ভাগে অর্থাৎ রগের দিকে সংযোগত্বক্ মুড়িয়া একটী পীতবংএর পর্দ্দা প্রস্তুত করে। চোখের পাতাগুলি অনবরতঃ খোলাতে ও বন্ধ করাতে এইরূপ সংযোগত্বক মুড়িয়া যায় ও Pingueculaর সৃষ্টি করে।

সংযোগত্বকের পক্ষাকৃতি বৃদ্ধি (Pterygium) প্রবল বায়ু, ধুলা, ধূম ইত্যাদি চক্ষুতে লাগিয়া উত্তেজনা আনয়ন পূর্ব্বক যে সামান্য প্রদাহ উপস্থিত করে তাহা হইতে এই পক্ষাকৃতি বৃদ্ধি আস্তে আস্তে ঘটিয়া থাকে। চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের উপর আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ অচ্ছোদপটল অবধি বিস্তৃত হয়। ইহা প্রথমে মাংস বৃদ্ধির মত দেখায় এবং একদিক হইতে আরম্ভ হয় ও ক্রমশঃ ত্রিকোণাকার ধারণ করে। গোড়া, চক্ষুর বাহির দিকে এবং চূড়া অচ্ছোদপটলের দিকে অবস্থিত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ইহা অচ্ছোদপটলকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস করে। চক্ষু সংরক্ষণ চশমা দ্বারা চক্ষুকে রক্ষা করাই ইহার প্রতিষেধ। অচ্ছোদপটল আক্রমণ করিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক।

সংযোগত্বকের শুষ্কতা (xerosis)—অনবরতঃ চক্ষু খোলা থাকার দরুণ ও বন্ধ করিতে না পারিলে যেমন Ectropion রোগে (পাতায় টান পড়িয়া খুলিয়া থাকে এবং চক্ষু বন্ধ করিলেও পাতা ঠিক স্থানে আইসে না) বা Lagophthalmos হইলে (সপ্তম স্নায়ুর রোগে অর্বিকুলারিস্ পেশীর অক্ষমতায় চক্ষু বন্ধ করিলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না); দানাযুক্ত প্রদাহে (trachoma) বা সংযোগত্বকের পোড়া বা ঝলসান হইতে অথবা ছেলেদের দূষিত পেটের রোগে বা অন্য কোন জাতীয় ক্ষয় রোগে যেমন tubercular meningitis বা keratomalacia হইতে। এই সব কারণে সংযোগত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয় ও সম্পূর্ণ শুখাইয়া যায় এবং তাহাতে শ্বেত বা ধূসর রংএর ছোপ পড়ে। এ শুষ্কতা অশ্রুতেও নষ্ট হয় না বা কোন রকম অশ্রুতে আর্দ্রতা আনিতে দেখা যায় না ও ক্রমশঃ চামড়ার মত শক্তভাবাপন্ন হয়। ইহাতে চক্ষুর জলের ক্ষরণ কম হইয়া যায়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিসকল যাহারা এই রস ক্ষরণ করে তাহাদের অকর্ম্মণ্যতায় এইরূপ হয়। চক্ষুর ভিতর খসখসে হয়, করকর করে, চক্ষু প্রায়ই লাল হয় ও প্রদাহযুক্ত হয় ও খুব রগড়াইবার ইচ্ছা হয়। এই অবস্থা পুষ্টির অভাব হইতে হয় (deficiency diseases).

সংযোগত্বকের আঘাত (Injuries of conjunctiva)—(১) বাহিরের বস্তু যেমন ধুলা, বালি, কয়লার গুঁড়া, লোহার কুচি, ইটের গুঁড়া প্রভৃতি চক্ষুর ভিতর পড়িতে পারে এবং বেশী ভিতরে গিয়া যদি আবদ্ধ না হয় তবে অশ্রুতে ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যায়। চক্ষু উঠার যে যে লক্ষণ সেই সেই লক্ষণ হয়।

(২) কোন যন্ত্রাদির দ্বারা ছিন্ন সংযোগত্বক আপনা আপনি সারিয়া যায় যদি ক্ষত অল্প হয় নচেৎ সেলাই করিতে হয়।

(৩) পোড়া বা ঝলসান—চূণ, গরমজল, গলিত ধাতু, এ্যাসিড বা ক্ষার জাতীয় (alkalies) বস্তু দ্বারা এইরূপ হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহা যত্ন সহকারে চিকিৎসা না করিলে নানারূপ বিপত্তি হইতে পারে।

সংযোগত্বক সম্বন্ধে যাহা বলিবার একরকম বলা হইয়াছে—এক্ষণে চক্ষুর পল্লব বা পত্রাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিব (Eyelid)। এই সঙ্গে প্রকৃতিগত কারণে চক্ষুর যে সমস্ত রোগ হয় তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল।

প্রখর আলোক—প্রখর সূর্য্যালোক বা সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত আলোক চক্ষুতে যাহাতে না লাগে তজ্জন্য ধুঁয়ারংয়ের চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক (Eye-preserver)। এইরূপ প্রখর আলোকে চক্ষু হইতে জল পড়ে, লাল হয়, চক্ষুর পাতার ভিতর ছোট সাগুদানার মত দানা জন্মায় দৃষ্টি কমিয়া যায় ও চক্ষুতে বেদনা হয়। মরুদেশে ও তুষারাবৃত স্থানে সূর্য্যরশ্মি অধিকতর ভাবে প্রতিফলিত হইয়া সেখানকার অধিবাসীদিগের প্রায়ই চক্ষু রোগ ও দানাসংযুক্ত প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানা ও পশ্চিম প্রদেশগুলিতে অতিরিক্ত গরমের জন্য চক্ষু রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী।

সূর্য্য গ্রহণ—খালি চোখে সূর্য্যের দিকে তাকাইলে বা সূর্য্যগ্রহণ দেখিলে, রশ্মিসকল কেন্দ্রায়িত (focussed) হইয়া মুকুরিকায় পড়ে ও অধিকক্ষণ তাকাইবার ফলে মুকুরিকার কেন্দ্রায়িত স্থানটী পুড়িয়া যায় ও দৃষ্টি শক্তির হানি করে।

শৈত্য—যেরূপ উত্তাপে চক্ষুপ্রদাহ হয়, সেইরূপ

ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু দুর্ব্বল, লাল এবং জলযুক্ত হয় ও দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে; চক্ষুর আবরণগুলি কোমল সুতরাং উত্তাপে বা শৈত্যে সমভাবে পীড়িত হইয়া থাকে।

প্রবল বায়ু—প্রবল বায়ু প্রবাহ চক্ষে লাগিলে যেমন মোটর গাড়ী রেলগাড়ী প্রভৃতি চড়া—চক্ষু প্রদাহ হইয়া থাকে।

ধান্য বা শস্যাদির কণা—চক্ষুতে লাগিয়া আঁচড় লাগে ও প্রদাহ উৎপন্ন করে; সেইজন্য ধান্যাদি ঝাড়িবার সময় একটী চক্ষুরক্ষক রঙ্গীন্ চশমা ব্যবহার করা দরকার। চক্ষুতে শস্যাদি পড়িবামাত্র তাহা তুলাইয়া ফেলা দরকার। স্তন্যপায়ী শিশু সময় সময় প্রসূতির চক্ষু আঁচড়াইয়া তাহাতে বেদনা, জলপড়া ও আলো সহ্য করিতে না পারার অবস্থা করিয়া দেয় ও চক্ষুর প্রদাহে যে যে লক্ষণ তাহা ক্রমশঃ দেখা দেয়।

চক্ষু হইতে জলপড়া ইহা অনেক সময় স্বাভাবিক; বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা বা গরম লাগিলে চক্ষু হইতে জল পড়িয়া থাকে ও তাহা সংযোগত্বকের প্রদাহ জন্য হয়। এই জল অশ্রুবহা নালী দিয়া সম্পূর্ণ নির্গত না হইয়া গণ্ডদেশের উপর দিয়া বহিয়া যায়। অতিরিক্ত জল পড়িলে সত্ত্ব সত্ত্ব প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার নচেৎ অশ্রুবহা নালীর প্রদাহ উপস্থিত হইয়া এই পথ বন্ধ হইয়া যায় ও ফলে নেত্রনালী বন্ধ জনিত স্ফোটক হয় (Lachrymal Abcess.)

বেগ-ধারণ

(আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক কবিরাজ—শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
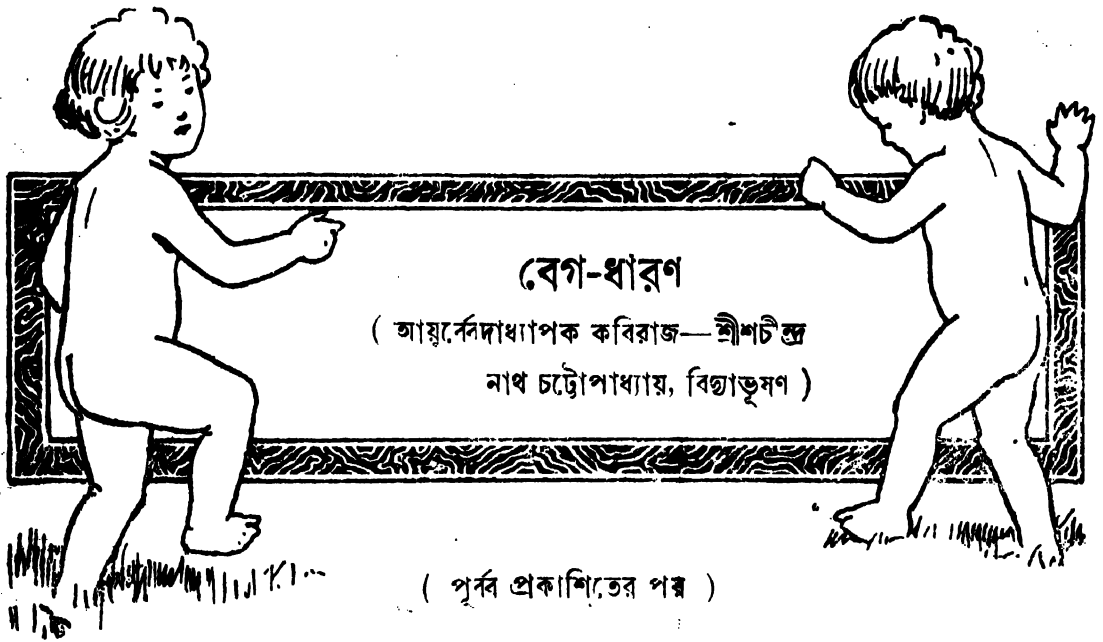
(৪) শুক্র—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শুক্রের বেগ-ধারণ নিষিদ্ধ হইলেও এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, কাম-প্রবৃত্তি উপস্থিত হইলেই তাহার চরিতার্থ করিতে হইবে। আহার, স্বপ্ন ও ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটীকে শরীরের উপস্তম্ভ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্র-রক্ষাই শরীর রক্ষণে অন্য প্রকার স্ত স্বরূপ। ধর্ম্ম শাস্ত্রেও 'মরণং বিন্দুপাতেন' কিংবা 'ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠানাৎ বীর্য্যলাভঃ' এইরূপ বলা হইয়াছে। স্মৃতি-শাস্ত্রে সন্তান উৎপাদনের জন্য শুক্র ত্যাগের বিধান আছে। 'ঋতৌ ভার্য্যাং উপেয়াৎ'। ঋতু-কালে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত একদিন মাত্র সহবাসের বিধান আছে। যদি সে ঋতুতে স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয় তাহা হইলে ঐখানেই ব্যাপার চুকিয়া গেল। নতুবা প্রতি ঋতুতে একবার করিয়া গর্ভ-জননার্থ (কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত নহে) সহবাসের ব্যবস্থা আছে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে এবং হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে সকলের প্রকৃতি সমান নহে। কেহ কেহ অতিমাত্রায় কামুক থাকিতে পারে। তাহাদের সহজেই কামের উত্তেজনা আইসে। সেই সময় যদি সহবাস করিতে না পায় এবং প্রবৃত্তি যদি প্রবলা হয় তাহা হইলে শুক্র আপনা হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যদি কোন লোকের শুক্র বহির্গত না হয় অথচ প্রবৃত্তি দমন করিবার সামর্থ্য না থাকে কিংবা যদি কেহ এমন কোন বীর্য্যস্তম্ভক ঔষধ সেবন করে যাহাতে শুক্র বহির্গত না হয় এইরূপ অবস্থাকে শুক্রবেগ-ধারণ কহে। এই অবস্থা ঘটিলে লিঙ্গ ও কোষে বেদনা, শূল, গা-হাত-পা কামড়ানি, হৃদয়ে বেদনা ও মুত্রের বিদ্ধতা (যন্ত্রণার সহিত অল্প অল্প প্রবৃত্তি) উপস্থিত হয় এবং সহবাস স্পৃহা বলবতী থাকে।

চিকিৎসা—লিঙ্গ, কোষ ও বস্তিদেশে বাতঘ্ন তৈলের অভ্যঙ্গ, রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলের টবে বসান উচিত, কুক্কুট-মাংস ও দুগ্ধ সেবন এক্ষেত্রে উপকারী। এই অবস্থায় সহবাসও হিতকর।

(৫) বমন—বমন বলিতে উদরস্থ দ্রব্যের মুখমার্গে বাহিরাগমন বুঝায়। ইহা কোন রোগের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও মনের প্রতি দ্রব্য দর্শন কিংবা মক্ষিকা প্রভৃতি বমন-কারক দ্রব্য উদরস্থ

হইলে বমন হয়। রোগের উপদ্রবরূপে যেখানে বমি হয় সেখানে বমন-নিবারক চিকিৎসা করিতে হইবে। বীভৎস দর্শন জন্য কিংবা বমন-কারক দ্রব্য সেবন জন্য যেখানে বমি হয় সেইখানেই বমন নিরোধ করা উচিত নহে। পরন্তু যেখানে পিত্ত শ্লেষ্মা প্রভৃতি কোষ্ঠে সঞ্চিত হইয়া বমন বেগ-উৎপাদন করে সেখানে যাহাতে দুষিত পিত্ত শ্লেষ্মাদি কোষ্ঠে সঞ্চিত হইতে না পারে তৎপক্ষে যেমন চিকিৎসার আবশ্যক অন্যদিকে সঞ্চিত পিত্ত শ্লেষ্মা যাহাতে বহির হইয়া যায় তাহার সহায়তা করা উচিত। সেখানে বমনে বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু রোগীর যদি বমন-বেগ অধিক হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলে বমন রোধ করিতেই হইবে। নিষিদ্ধস্থলে বমন বেগ রোধ করিলে পাকস্থলীর একপ্রকার কুণ্ঠা উপস্থিত হয় তাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। পেট ভার হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা বিবমিষা ও প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা) বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে বমন করান এবং বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(৬) হাঁচি—হাঁচির বেগ ধারণ করিলে ঘাড়ের স্তব্ধতা, শিরঃশূল, আধকপালে মাথাধরা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মস্তকে তৈল মাখান, স্বেদ দেওয়া, ধুমপান, নস্য গ্রহণ এবং আহারের অব্যবহিত পরেই ঘৃত পান হিতকর।

(৭) উদ্গার—উদ্গারের বেগ ধারণ করিলে হিক্কা, কাস, অরুচি, উদরের গুরুত্ব ও বেদনা, পেট ডাকা এবং বায়ুর অপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় পেটে বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মালিশ করিয়া স্বেদ দেওয়া হিতকর এবং হিঙ্গাষ্টক চূর্ণ, বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

(৮) হস্তা (হাই-উঠা)—ইহার বেগ-ধারণ করিলে প্রকুপিত বায়ুর লক্ষণ দেখা যায়। সেরূপ অবস্থায় বায়ুর চিকিৎসাই বিধেয়।

(৯) ক্ষুধা—ক্ষুধার বেগ-ধারণ করিলে তন্দ্রাভাব, গা-হাত-পা কামড়ানি, অরুচি, ভ্রম, দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্নেহবহুল, উষ্ণ ও লঘু গুণ বিশিষ্ট অন্ন ভোজন বিধেয়।

(১০) পিপাসা—পিপাসার বেগ-ধারণ করিলে কণ্ঠ ও মুখ শুকাইয়া যায়। রোগী কানে কম শুনে এবং শ্বাস উপস্থিত হইতে পারে। শ্রম ও হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। শরীরের জলীয়াংশ যাহাতে পূর্ণ হয় তজ্জন্য সরবতাদি পান করান উচিত।

(১১) অশ্রু—অশ্রুবেগ ধারণ জন্য নাক দিয়া কফ স্রাব, চক্ষু ভার হওয়া, বুকের ভিতর যন্ত্রণা ও অরুচি উৎপন্ন হয়। নিদ্রা ও মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা ইহার চিকিৎসা।

(১২) নিদ্রা—নিদ্রা বেগ ধারণ জন্য হাই উঠা, গা-হাত-পা কামড়ানি, মাথার যন্ত্রণা, নেত্রের গুরুত্ব ও শরীরের জড়তা উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় নিদ্রা, গা-হাত-পা টেপান এবং দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিতে হইবে।

(১৩) শ্রমজনিত শ্বাস—পরিশ্রম জন্য যে দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া চলিতে থাকে তাহাকে যদি রোধ করা যায় তাহা হইলে বুকের ভিতর যন্ত্রণা এবং ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। বিশ্রাম ও বাতঘ্ন ক্রিয়া এরূপ অবস্থার প্রয়োজন এবং রোগীকে মাংস রস সেবন করান আবশ্যক।

এই ত্রয়োদশ প্রকার বেগ-ধারণের ফল এবং তাহার চিকিৎসা বর্ণিত হইল। কিন্তু এমন কতক-

গুলি বেগ আছে, যাহার বেগ-ধারণ করা উচিত। না করিলে শরীর ও মন বিকৃত হয়।

(১) সাহস, অর্থাৎ নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম্ম সম্পাদনের চেষ্টা। ইহাতে উরঃক্ষত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

(২) লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ, মান, পরনিন্দা, নির্লজ্জতা, বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্তি, পরস্ব প্রাপ্তির লালসা এই সকল মানস-বেগ-ধারণ করা উচিত। এই সকল বেগ-ধারণ না করিলে নিজের ও অপরের মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।

(৩) পরুষ, অর্থাৎ অপরের যাহাতে উদ্বেগ জন্মায়, আবশ্যকাতিরিক্ত, সূচক, অর্থাৎ পরের অনিষ্ট-জনক, মিথ্যা ও অকালযুক্ত, অর্থাৎ যেখানে যাহা বলা উচিত নহে এবম্বিধ বাক্য-বেগ ধারণ করা উচিত।

(৪) যে সকল কার্য্য করিলে পরের পীড়ন হয় সেই সকল কার্য্য, অত্যধিক স্ত্রী-সম্ভোগ, চৌর্য্য ও অবৈধ জীব-হত্যা এই সকল কায়িক বেগ-ধারণ করা উচিত।

বেগ-ধারণ বিষয়ে যে সকল বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসরণ করিলে ইহকালে শারীর ও মানস স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় এবং পর-কালেরও মঙ্গল হয়।

বাঙ্গালীর খাদ্যের দোষ-গুণ

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্.

সকল দেশেই, জলবায়ু ও দেশের অবস্থানুসারে, ও লোকের সহজ-সংস্কার বশে, খাদ্য নির্ণীত হয়। ব্যক্তির ও জাতির উপরে, খাদ্যের প্রভাব খুব বেশী। বাঙ্গালীর খাদ্য যে দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী ছিল, তাহার প্রমাণ, এক শতাব্দী পূর্ব্বে, বাঙ্গালী পরিশ্রমী, হৃষ্ট, পুষ্ট ও দীর্ঘজীবী ছিল। কিন্তু বহু বৎসর, নানা রকম বিদেশীর সংঘর্ষে আসিয়া, খাদ্য সম্বন্ধেও শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার বৈশিষ্ট রক্ষা করিতে পারে নাই ; তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীর চেয়ে, অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ও গরীব বাঙ্গালীরা মোটা আঁছাটা চাউল, যথেষ্ট পরিমাণে সদ্যোসংগৃহীত শাকশব্জী খোসাসুদ্ধ পাঁচমিশালী ডাইল, চিড়া, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি খাইয়া, বেশ্ স্বাস্থ্য রাখিয়াছে। আর মোগলাই-ইংরেজী-খানা-বিলাসী, কলে-মাজা, ধবধবে চাউল, রোলার-মিলের ধবধবে ময়দা, অধিক-মসলা-যুক্ত অল্প তরকারী, ও ময়রার দোকানের মিষ্টান্ন ভোজী হইয়া, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী দেহে ও মনে পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা জীবন্ত মাছ ও গোয়াল ভরা গাভী ছিল। এখন শিক্ষিতদের সহজ সংস্কার নষ্ট হইয়াছে

রুচির বিকার ঘটিয়াছে, দৈন্যের তাড়নায় খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচনের শক্তি কমিয়াছে। জাতি হিসাবে, বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি, মেধা ও আয়ুঃ কমিয়াছে। বিদেশীয়দের সভ্যতার সংঘর্ষে, আপনার বৈশিষ্ট হারাইয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার কতিপয় দুর্দ্ধর্ষ জাতি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া আসিয়াছে; পক্ষান্তরে, জাপানীরা খাদ্য বদলাইয়া, দৈর্ঘ্যে কিছু বাড়িয়াছে ও মেধা ও শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে।

বাঙ্গালীদের খাওয়ার দোষ ঃ—

(১) ভাত।—কলে-মাজা, সিদ্ধ চাউলের ভাতের ফেন গালিয়া খাওয়ায়, অনেকটা ভাইটামীন্ নষ্ট হয়। বেশী পরিমাণে এই ভাত খাইয়া, অম্ল ও অজীর্ণ ব্যারাম, কোষ্ঠবদ্ধ, বহুমূত্র ও বেরি-বেরি হয়।

(২) ডাইল।—খোসা বাদ দেওয়া, সামান্য পরিমাণে এক রকমের ডাল খাওয়া ও ডালে-প্রস্তুত অন্য খাদ্য অল্প খাওয়া হয়।

(৩) তরকারী—বাসি করিয়া, ভাজিয়া ও খোসা বাদ দিয়া খাই। তাহা ছাড়া, আমরা তরকারী খুব সামান্য মাত্রাই খাই।

(৪) মাছ—সামান্য মাত্রায় ও বাসি খাই।

(৫) দুধ—খুব কমই খাই এবং সময়ে সময়ে ক্ষীর করিয়া খাই।

(৬) খাঁটি ঘি, মাখন—আজ বাঙ্গালীর নাগালের বাহিরে।

(৭) যাঁতায় ভাঙ্গা "আটা" না খাইয়া, কলের "ময়দা" ও দোলো চিনি ও গুড় না খাইয়া, বিলাতি চিনি, মিছরী খাই।

আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

(১) কলে মাজা ও সিদ্ধ-চাউল, কলের ময়দা, বিলাতি চিনি—একদম্ ভাইটামীন্ শূন্য বলিয়া, ত্যাজ্য। তৎপরিবর্ত্তে,—ফেন সুদ্ধ, ঢেঁকী ছাঁটা চাউল ও যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, দোলো-চিনি ও গুড় স্বাস্থ্যকর।

(২) ডাইল—প্রত্যহ, (খেঁসারী বাদে) পাঁচ-মিশালী; খোসাসুদ্ধ ও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার্য্য।

(৩) তরকারী—টাটকা ও পরিমাণে প্রচুর হওয়া চাই। খোসাসুদ্ধ রাঁধিয়া, চর্ব্বণান্তে, ইচ্ছা হইলে, সিটাটা ফেলিয়া দেওয়া যায়; চর্ব্বণকালে, সিটার ভাইটামীন্ ও লবণাংশ উদরস্থ হয়।

(৪) মাছ, মাংস, ডিম—যথাসাধ্য টাট্‌কা হওয়া চাই।

(৫) দুধ।—নিরামিষাশীদের পক্ষে প্রচুর এক-বলকের দুধ প্রশস্ত। ঘৃত, মাখন, ননী, দৈ—সব-গুলিই কিন্তু খাওয়াও ভাল। অর্থাভাবে, সর্ষের তৈল, বাসি নারিকেল তৈল, ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট—ব্যবহার না করিয়া, সৎসাহস দেখাইয়া টাটকা চর্ব্বি ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

চোখের কথা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ

বামে বালিগঞ্জ পার্ক ডা'নে এভিনিউ
মাঝখানে—"লভ লজ" সুন্দর ভিউ,
বাড়ীর যেদিকে চা'বে—স্প্রিং ও গার্ডেন
প্রেমিকের মনে পড়ে এনক্-আর্ডেন
বাড়ীতে মিসেস্ কেহ, আনকোরা মিস্
এটিকেটে গুরু, কেহ শিক্ষা নবীস্,
ফ্যামেলি'র সবাকার চশ্মা চোখে
কতনা তারিফ করে পাড়ার লোকে,
একদিন কার্ড এলো কবি'র হাতে
রিকোয়েস্ট, খেতে হবে তাঁদের সাথে,
মিস্ নিলী দিয়েছিল এ'বার বি. এ.
রেজাল্ট আউট্ কিনা, ভোজ তা নিয়ে,
ডিনারেতে ছিল যত অসার খানা,
মেন্যু দেখে ফ্রুট্ ছাড়া করিনু মানা,
খাদ্যের আলোচনা হ'লো সে-হ'লে
আরব্যের 'পন্যাস দাঁড়ালো ফলে,
স্বাস্থ্যের কথা যত মিসেস্ শুনে
টী পার্টিতে ডাকে রোজ স্পেশাল গুণে

খাদ্যে দৃষ্টি নাই, তাই "দৃষ্টি রোগে"
কুষ্টি ব্যাধি সৃষ্টি ক'রে সবাই ভোগে
"চক্ষু রোগ তত্ত্ব" শুনে—মিষ্টার খুসী,
দু'বেলায় ভুরি ভোজ সেথায় ঠুসি,
একদা লিজার দিনে হইলে সুযোগ
মিস্ কহে, কেন হয় চক্ষুর রোগ ?
হাসিয়া কহিনু, ব'লি সর্টে কিছু
সর্ব্বস্ব হারাই মোরা মোহের পিছু
পারা যদি দেহে থাকে ঐ রোগ হয়
বাপ-মার রক্ত দোষে ব্যাধির উদয়,
পুষ্টি খাদ্য না খাইলে বিপদ ভারি
সিনেমায় রোজ গেলে এ'রোগ তা'রি,
হায়েস্ট পাওয়ার ও'লা বিজলী আলো
কোন মতে আমাদের না জ্বালা ভালো,
চারুশিল্প কাজ আর সেলাই হাতে
লেডিরা কখনো যেন না করে রাতে,
সন্ধ্যা হ'লো গল্প আজ রহিল পেণ্ডিং
রাতে যেন কোরোনাকো আলেখ্য পেণ্টিং !

অধ্যাপক সার রাধাকৃষ্ণের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সভায় অভিভাষণ

সার্ রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় অভিভাষণকালে বলেন যে "স্বরাজ লাভ হইলেই যে সমাজের ও দেশের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইল ও ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোকই যে-মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে সেই মুহূর্ত্ত হইতে সুখ ও শান্তির অধিকারী হইল" এইরূপ চিন্তা করা নিতান্ত ভ্রম। আমরা ফরমাইস দিয়া আদর্শ রাজনীতি শাসিত কল্পিত দ্বীপ বিশেষ গঠন করিতে পারি না। তাঁহার মতে সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই সামাজিক শৃঙ্খলা সত্য, সাম্য ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সংসার ধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হন তাঁহারা এই সামাজিক ইমারতের মিস্ত্রী ও উপকরণ ও তাঁহারা যদি সততা, সাহস, অন্তর্দৃষ্টি ও অসমসাহসিকতা গুণে ভূষিত হন তবেই "নব ভারত" যাহা এখনও জন্ম-গ্রহণ করে নাই তাহার অভ্যুদয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন।

পুরাকালে বৃদ্ধেরা (Ancients) উচ্চ শিক্ষাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মশালের সহিত তুলনা করিতেন ও বলিতেন যে ঐ মশাল পুরুষানুক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। উক্ত মশাল ঈশ্বরের একটী ভয়াবহ দান। তাহা একদিকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে যেমন উন্নত করে ও অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যায়—অপরদিকে জ্বালা যন্ত্রণা, অশান্তি ও বিপ্লব বহন করিয়া আনে। যদি কেহ এই অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে ভীত হন ও তাহার ফলে সামাজিক অর্থনীতি সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক সম্বন্ধীয় ওলটপালটে সন্ত্রস্ত হন তাহা হইলে তাঁহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকটে না গিয়া যাহাতে তাহা বন্ধ হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

উচ্চশিক্ষার দ্বারা আমাদের অভাব অভিযোগ যদি আমরা বুঝিতে পারি এবং নূতন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সম্যক্‌রূপে পারি তাহা হইলে পুরাতন শিক্ষা বা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদর্শিত প্রথার দ্বারা তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যৌবনোচিত উৎসাহই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। যে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বার্থপর, ভীতু ও পুরাতন পথ ও মতাবলম্বী রক্ষণশীল মানুষ প্রস্তুত করে সে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রকৃত নামের উপযুক্ত নয়। মানুষের কর্ত্তব্য অগ্রসর হওয়া। মানুষ জন্ম হইতেই অসমসাহসীক।

আমাদের যুবকেরা স্বাধীন চিন্তানিরত ও কর্ত্তৃত্বের এবং পূর্ব্বপুরুষ প্রদর্শিত পথের বন্ধন বিচ্যুত হইয়া নূতন ভাব প্রণোদিত হইয়া নূতন কার্য্যানুসরণে ব্যস্ত এই যে সাধারণের ধারণা তাহা ভ্রান্ত। আধুনিক মন শিক্ষকের ও অধিনায়কদিগের উপদেশ পালনে

বদ্ধপরিকর। ইহাকে যাহা কেন বলা হউক না ইহা সব বিশ্বাস করে কারণ ইহারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ভীত নহে। ভয় বিহ্বলতা ও রক্ষণশীলতা মানসিক অভ্যাসের কুফল এবং সমাজের পরম শত্রু। গ্রীস্ রাজ্যের গৌরব উক্ত স্নায়বিক দুর্বলতার ফলে ঘটিয়াছে ইহা সকলেই জানেন। রাজনৈতিক অশান্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে যদিও ইংরাজ শাসন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া বিদেশী পীড়ন হইতে সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করে তথাপি বিদেশী শাসন ফলে আত্মসম্মানে ও মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আধুনিক মানসিক ও নৈতিক ধ্বংস যাহা জাতির উপর আসিয়া পড়িয়াছে তাহার মূলে পরাধীনতা ও অর্থ সম্বন্ধীয় অস্বচ্ছলতা বর্ত্তমান। দেশীয় মহসভা বলুন আর যে কোন রাজনৈতিক সভা ও সমিতি বলুন সর্ব্বত্র স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহা যে আজ উদ্দীপনাময়ী মানসিক উত্তেজনায় পরিণত হইয়াছে তাহার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে প্রধান কারণ দেশের দারিদ্র, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কর্ম্মশূন্যতা, অল্পসংখ্যক লোকের বিদ্যাবত্তা অধিক মৃত্যুসংখ্যা, ব্যয়বহুল অসামরিক রাজশাসন, সামরিক ব্যয়বাহুল্য ও মহাযুদ্ধ। এমন কোন ইংরাজ, যে নিজেকে ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়, বিলাতে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না যে ভারতবর্ষের ভারতবাসী দ্বারা শাসন হইবার দাবী অস্বীকার করে।

আমার মতে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধিতা দেশের সমূহ বিপদ সূচনা করিয়াছে। আমাদের বিপদ ও ক্ষতি যুদ্ধের জন্য বা জাতীয় অর্থশূন্যতার জন্য নহে কিন্তু আভ্যন্তরিক অসন্তাব জনিত। এই সকল বিজাতীয় শক্তিসমূহ নবভারত যাহা আমরা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। আজ আমাদের জাগ্রত মুহূর্ত্তে আমরা দেখিতে পাই যে যাহাতে আমাদের বন্ধন দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন থাকে তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে তদনুরূপ শক্তিসমূহ আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সমাধান ব্যর্থ হওয়ায় গভীর বিপদ উপস্থিত। বিশ্বাস, নির্ভরতা ও আশার পরিবর্ত্তে নূতন সন্দেহ, নূতন চিন্তা ও নূতন অনিশ্চয়তা আসায় উন্নতিশীল জাতির উন্নতিকল্পে যে সাহসিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তি থাকে তাহা আজ আমরা হারাইয়াছি। অতীতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রভূত পরাক্রান্ত জাতিসমূহ পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের পরিচালিত করিতে না পারায় ধ্বংশ হয়য়াছে। ইতিহাস তাহার উন্নতিশীল অগ্রগমনে সেই সমস্ত জাতিকে অসার বিবেচনা করিয়া একধারে ফেলিয়া দিয়াছে। আমরা যদি আমাদিগকে রক্ষা করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের জ্বলন্ত মশাল, পবিত্রীকরণ অগ্নি ও বিদ্রোহ সূচক আত্মার দরকার।

আমরা যদি যথার্থই গণতান্ত্রিক হই তাহা হইলে এই পৃথিবী হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক যাহারা, তাহারা মরিয়া নরকগামী হইবে ও তাহারা এখানে বাসের অনুপযুক্ত ইহা চিন্তা করা অনুচিত। যতদিন আমরা দেশের উন্নতি বিষয় অপেক্ষা জাতীয় বিরোধিতা ও আভ্যন্তরিক বিজাতীয় ভাব দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হইব ততদিন আমরা প্রকৃত গণতন্ত্রের অনুপযুক্ত ও সম্যক্ মানসিক পরিণতির পরিচয় দানে অসমর্থ। আমরা যদি এই বর্জ্জনশীল ভ্রম না বর্জ্জন করি তাহা হইলে আমরা বর্ব্বরতার

দিকে ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িব। যথেষ্ট পুষ্টির অভাব, স্বাস্থ্যের উপযুক্ত যত্ন না লওয়া, সুস্থ অবস্থানুযায়ী কার্য্য এবং বিশ্রামের অভাব কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নহে। যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাস লেখা হইবে তখন একথা না বলা যায় যে নিজের নিজের স্বার্থের জন্য এক মতাবলম্বী না হইয়া হিন্দু, মুসলমান, শিখ বা ক্রিশ্চিয়ান দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছে।

"বিদ্রোহী হওয়ার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলেন যে আমরা চতুর্দ্দিক হইতে যৌবনোচিত বিদ্রোহের কথাই শুনিতে পাই। আমার এরকম বিদ্রোহভাবের সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং আমার দুঃখ যে ইহা এখনও বিশেষভাবে দেশব্যাপী হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতাসুলভ আদর্শবাদ আধুনিক জড়বাদরূপে যে পরিণত হইয়াছে তাহা বিদ্রোহের ফল নহে বরং প্রতিক্রিয়া বিশেষ। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মতের সপক্ষে ইহা একটা বিশেষ যুক্তি। যেমন ব্যাধি কিম্বা দারিদ্রের ভিতর আদর্শবাদের কিছু নাই, তেমনি মানুষকে ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহার করার ভিতর আধ্যাত্মিকতার কিছু নাই। জীবের দুঃখ কষ্ট নিবারণার্থে অথবা তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বিধানের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে জড়বাদের অস্তিত্ব কোথায়? যে যুবক সম্প্রদায় বিকৃত সামাজিক প্রথার এবং ধর্ম্মোন্মত্ততার পরিপন্থী তাহাদের উপর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে। যাহারা বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে উদাসীন তাহাদিগকে নিষ্ঠুর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অত্যাচারী প্রভু, অসঙ্গত বিধিনিয়োগ, কলুষিত অধিনায়ক কৃত্রিম শিক্ষক ইঁহাদের নির্ব্বিবাদে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আধিপত্য অটুট থাকার কারণ এইযে কোনকালে কেহ উহার ছিদ্রান্বেষণ করেন নাই বা বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হয় নাই। যদি কেহ অন্ধভুক্ত বা অর্দ্ধাচ্ছাদিত জীবের মানসিক ও শারীরিক দুঃখ উপলব্ধি করিতেন তাহা-হইলে তাহার পক্ষে উদাসীন থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

এই সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি বিদ্রোহের ভাব তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসহিষ্ণুতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরং ইহাকে আন্তরিক সৌজন্য ও জীবের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ অধিনায়ক লক্ষ্য সাফল্যের দিকে, সত্যের দিকে আদৌ ধাবিত হন না। তাঁহাদের কুসংস্কারগুলির সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা-গুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যখন তোমরা সংসারে প্রবেশ কর তখন তোমরা যাহা যথার্থ চিন্তা কর তাহা না বলিয়া লোকে তুমি যাহা বলিবে বলিয়া আশা করে তাহাই বলিতে প্রলুব্ধ হও। প্রজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট অধিনায়কত্ব ও বিদ্রোহসূচক অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া তবে তোমাকে একটা পথ ধরিতে হইবে; আবার যথোচিত গুণসম্পন্ন, সঙ্গঠনক্ষম ও নির্ভীক অধিনায়ক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করেন ও অপব্যয়ী ধ্বংসকর্ত্তা অধি-নায়ক যিনি অতীতের সহিত সংশ্লিষ্ট ইহাদের মধ্যে কাহার মত মানিবে তৎসম্বন্ধেও তোমাকে বিচার করিতে হইবে। নূতন সুপ্রণালী সম্মত ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে কঠোর পরিশ্রম ও গভীর চিন্তাদ্বারা তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সময় হইলে দেখা যাইবে যে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম উপভোগ করিতে

উৎসুক কিম্বা সত্যানুসরণে ও ক্লেশসহনে পটু; বিশ্ববিদ্যালয় তোমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মাহুতিরূপ গুণাবলী দিয়া তোমাকে তৈয়ারী করিয়াছে কিম্বা তোমাকে অতিরিক্ত মানী, অতিরিক্ত সন্তুষ্ট ও অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও কোন কিছু করিতে ভীত এরূপ একটি ফোতো নবাবে পরিণত করিয়াছে। তুমি ভারতবর্ষকে তাহার শৃঙ্খল ছেদন করিতে সাহায্য করিবে না তাহার শৃঙ্খল কঠিন হইতে কঠিনতর করিবে? তোমার জীবনে তোমার কার্য্যাবলী দ্বারা ইহা কি প্রমাণ করিতে পারিবে না যে পরের জন্য ও দেশের জন্য ত্যাগের ও কষ্টসহিষ্ণুতার আকর্ষণীশক্তি তোমার পক্ষে আরামপ্রিয়তা ও স্বার্থ সিদ্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও ইহার বিপরীত বলিয়া যাহারা তোমার চরিত্রে অপবাদ বা দোষারোপ করিতে চেষ্টা করে তাহাদের মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না? সময় ইহার উত্তর দিবে।

নিবেদন।

এই সংখ্যার সহিত নবম বৎসর শেষ হইল। আমাদের গ্রাহকগণের ভিতর এই বৎসরের কোন সংখ্যা যদি প্রয়োজন হয়, তাহা এক সপ্তাহের ভিতর লিখিলে ও ডাক খরচ পাইলে আমরা বিনামূল্যে পাঠাইতে পারি।

পরে শেঠ পূর্ণ করিয়া রাখা হয় এবং শেঠ ভাঙিয়া কোনও সংখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

সম্পাদক,
"স্বাস্থ্য"

দেশীয় মল্ট ঘটিত ঔষধ।

—:*:—

মরূ মল্ট (Morrhu Malt) : এ যাবত ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র জন্য কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাজারে সাধারণতঃ যে সমস্ত কডলিভার অয়েল বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নহে। এবং তাহাতে 'ভাইটামিনের' পরিমাণও কম, বিশেষতঃ কডলিভার অয়েল বিস্বাদ বলিয়া ইহা ব্যবহার করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ কডলিভার অয়েলের সহিত "বি" ভাইটামিনযুক্ত মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত করিয়া "মরূ মল্ট" প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে কডলিভার অয়েলের দুর্গন্ধ নাই, খাইতে সুস্বাদু, এবং ভাইটামিন 'এ' 'বি' ও 'ডি' তিনটীই রহিয়াছে বলিয়া বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা ক্ষয় ফুস্‌ফুসের রোগ প্রভৃতিতে আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়।

মল্ট লেসিথিন ফস্‌ফেইট (Malt Lecithin Phosphate) : ইহাতে মল্ট একষ্ট্রাক্টের সহিত কডলিভার অয়েল, লেসিথিন, গ্লিসারো ফস্‌ফেইট, ষ্ট্রীকনিন, ইত্যাদি মিশ্রিত আছে। উহা ব্যবহারে শরীরের পরিপুষ্টির অভাব, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ ও ক্ষয়, স্নায়বিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অতি শীঘ্র নিবারিত হয় এবং অচিরাৎ স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরিয়া আসে।

মল্ট হাইপোফস্‌ফাইট কোঃ (Malt Hypophosphites Co.) : ইহাতে Malt একষ্ট্রাক্ট এবং কডলিভার অয়েলের সহিত কুইনাইন, ষ্ট্রীকনীন, ক্যালসিয়াম, পটেসিয়াম, আয়রণ, এবং ম্যাঙ্গানিজ হাইপোফসফাইট্‌স্ মিশ্রিত আছে। শেষোক্ত ঔষধগুলি অতি বিস্বাদ কিন্তু মল্ট একষ্ট্রাক্টের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়াশক্তি অক্ষুন্ন রহিয়াছে অথচ উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। যক্ষ্মা, শ্বাসকাশ, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ অতিশয় কার্য্যকরী।

মল্ট ইষ্টন (Malt Easton) : লৌহ ও ষ্ট্রীকনীনঘটিত ইষ্টন সিরাপ স্বভাবতঃই তিক্ত ও বিস্বাদ, কিন্তু মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত ইষ্টন সিরাপ সুস্বাদু ও অতিশীঘ্র উপকার দর্শায়, বিশেষতঃ মল্টের পুষ্টিকারক গুণ থাকাতে Malt Easton উৎকৃষ্ট টনিকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, রক্তহীনতা, বাত ইত্যাদিতেও ইহা অশেষ হিতকারী।

ভাইনো মল্ট (Vino Malt) : (মল্ট একষ্ট্রাক্ট মিশ্রিত ওয়াইন (মদ্য) পেপসিন, গ্লিসারো ফসফেইট্‌স্ ইত্যাদি) এই উপাদানগুলিই ভাইনো মল্টের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার কার্য্যকারিতা নির্দ্দেশ অনাবশ্যক সুস্থ শরীরে অল্পমাত্রায় ব্যবহারে ইহা মন প্রফুল্ল রাখে, শরীরকে শ্রান্ত, ক্লান্ত হওয়ার অবসর দেয় না, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতায় এবং অবসাদগ্রস্ত নিরাশ জীবনেও পরিপূর্ণ সুস্থতা ও শক্তি আনিবার জন্য ইহা আদর্শ আবিষ্কার। যক্ষ্মাগ্রস্থ রোগীতে এবং বার্দ্ধক্যের জরাতে ভাইনো মল্ট অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চালন করে।

রেডিয়েটেড মল্ট (Radiated Malt) : ইহা মল্ট একষ্ট্রাক্ট, ইর‍্যাডিয়েটেড কলেষ্টারিণ, ইষ্ট প্রভৃতি সম্বলিত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত শ্রেষ্ট ভাইটামিন খাদ্য। যাঁহারা ভাইটামিনযুক্ত আহার্য্য গ্রহণে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে রেডিয়েটেড মল্ট একান্ত ব্যবহার্য্য। ইহা শরীরের গ্লানি নিবারণ করে এবং উপরোক্ত কারণে ক্ষয় প্রভৃতি যে সব দুরারোগ্য রোগ জন্মিতে পারে, তাহাদের আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করে। শিশুদিগের ও দুর্ব্বল মাতারও ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ ভাইটামিন শুধু জননীকেই স্বাস্থ্যবতী করেনা উপরন্তু জননীর স্তন্য দুগ্ধের সহিত উহা শিশু শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে।

ম্যারো মল্ট (Marrow Malt) : অস্থি ও মজ্জার যথাযথ পরিপুষ্টি না হইলে, এবং শিশুদের শরীর গঠনের পক্ষে, ইহার উপকারিতা অসীম। বাল্যাবস্থায় ম্যারো মল্ট ব্যবহারে বার্দ্ধক্যের অবসাদ ও জরা হইতে বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সাল-তামামী

(শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল)

মঙ্গলময় যিনি ইচ্ছাস্বরূপ, যাঁর শুভেচ্ছা নির্ব্বাক তর্জ্জনীসঙ্কেতের মতো অশুভকে বারণ কোরে রাখ্ছে, যিনি মানুষকে নিশিদিন অসৎ থেকে সতে, আঁধার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাচ্ছেন, যিনি সৎ যিনি চিৎ যিনি আনন্দ তিনিই আমাদের চালিয়ে নিয়ে এলেন এই ন' বছর ধোরে'। তাঁরই দক্ষিণায় আজ "স্বাস্থ্য" তার ন' বছর বয়স পেরিয়ে দশের অঙ্কে পা দিতে চল্লো।

অনেক ইচ্ছা ছিল আমাদের। যাতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের আয়তন বৃদ্ধি হয় তার চেষ্টা করবো ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আর। দেশের অবস্থা সঙ্গীন্ হোয়ে উঠ্লো। বাজার মন্দা —সে-সময়ে 'একটা নোতুন কিছু করা' পাগলামী হবে ভেবে নিরস্ত হোতে হোলো। তাই আকারে স্বাস্থ্যের কোনো পরিবর্ত্তনই হয় নি। আশা করি, এ অপরাধ মার্জ্জনীয়।

আস্ছে বছর 'স্বাস্থ্যে'র আকার একটু বড়ো করবার ইচ্ছা রইলো। তবে যে রকম বাজার পড়ছে তাতে কতদূর কোরে উঠ্তে পারা যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ। দেখা যাক্।

'স্বাস্থ্য' আজ ন' বছর ধোরে' দেশের সেবা কোরে আস্ছে। 'স্বাস্থ্য' প্রতিবার দেশের লোককে শিখাবার চেষ্টা কোরেছে নানান্ রকমে যে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'। বাঙালী বোঝেনা যে, বাঁচ্তে হোলে, কাজ কোরতে হোলে একটা জিনিসের দরকার। যিশু যখন তাঁর দুই শিষ্যা মেরী ও মার্থার বাড়ী গিয়েছিলেন, মেরী তাঁর কাছে বসে' তাঁর পদসেবা করছিলো, তার পিপাসু হৃদয় পূর্ণ করছিলো যীশুর বচন-সুধায়। মার্থা এদিকে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলো। সে হঠাৎ রাগের মাথায় বোলে উঠ্লো, প্রভু, মেরীকে বলো, ও আমার সাহায্য করুক। যিশু জবাব দিলেন, মার্থা, মার্থা, নানান্ জিনিসে দরকার নেই, দরকার একটা জিনিসের। মেরী তাই সম্বল কোরেছে। যিশু বোঝাচ্ছিলেন যে, সেই একটা জিনিস হচ্ছে ধর্ম্মকথা। কিন্তু সে-যুগ গিয়েছে চোলে। এখনকার যুগে দরকার, অটুট স্বাস্থ্য। বিশ্বকবি সেই বাণী আমাদের প্রাণে ঝঙ্কৃত কর্ছেন,—

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রে আমরা বারবার সেই কথাটা বোল্ছি। বাংলা দেশের লোক যে মরতে

বোসেছে, তাদের বাঁচাতে গেলে যা' যা' না করলে নয় তাই আমরা বোলে দিচ্ছি। রোগের চিকিৎসা ডাক্তার কবিরাজ না ডেকে নিজে নিজে কি কোরে করা যায়,—কি কোরে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়—কি খাওয়া উচিত এ সব কথা আমরা বোল্‌ছি। আর আমরা জোরগলায় বোল্‌তে পারি যে, আমাদের অরণ্যে রোদন হয় নি।

আস্‌ছে বছর আমরা 'স্বাস্থ্য'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কোরে তুল্‌বো, ইচ্ছে আছে। অবশ্য ইচ্ছে হয় অনেক—কিন্তু মানুষ ভাবে এক, পাকেপ্রকারে হোয়ে ওঠে অন্যরকমের। তার ওপর আজকাল-কার ব্যাপার যা' পড়েছে তা'তে কতোদূর কী হবে কে বোল্‌তে পারে? ভগবানের দয়া থাক্‌লে আর আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকা ও অনুগ্রাহকদের সুনজর থাক্‌লে হয়তো আমরা ইচ্ছেটা কাজে পরিণত কোর্‌তে পারি।

গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন—

তাঁহারা যেন আমাদের বাৎসরিক চাঁদা ২৲ মণিঅর্ডার করিয়া শীঘ্র পাঠান যাহাদের নিকট টাকা পাওয়া যাইবে না তাহাদের নিকট ১০ম বৎসরের প্রথম সংখ্যা, ৯ম বৎসরের সূচীর সহিত ভিঃ পিতে পাঠাতে হবে। ডাক খরচা, রেজিষ্টারী ইত্যাদির দাম বাড়িয়াছে ভিঃ পিতে কাগজ লইলে প্রায় ২৷৷০ বাড়িবে অনর্থক কয়েক আনা পয়সা বাজে খরচ না করাইয়া টাকা পূর্ব্বে পাঠাইলে বাধিত হইব।

বিনীত
সম্পাদক

বিবিধ

টেনিস প্রতিযোগিতা

এবৎসর এলাহাবাদে ২৫শে হইতে ৩০শে জানুয়ারী ভারতবর্ষীয় টেনিস প্রতিযোগিতা হইবে। প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা কোনও কোনও যায়গায় বহুবৎসর ধরিয়া হইয়া আসিয়াছে। ভাল টেনিস খেলা দেখিবার ও শিখিবার জন্য ফরাসী, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে টেনিস খেলোয়াড় আনাইয়া তাহাদের খেলা দেখা ও তাহা হইতে শিক্ষা করাও হয় কিন্তু All-India Tournament এই প্রথম এলাহাবাদের টেনিস ও ক্রিকেট ক্লাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।
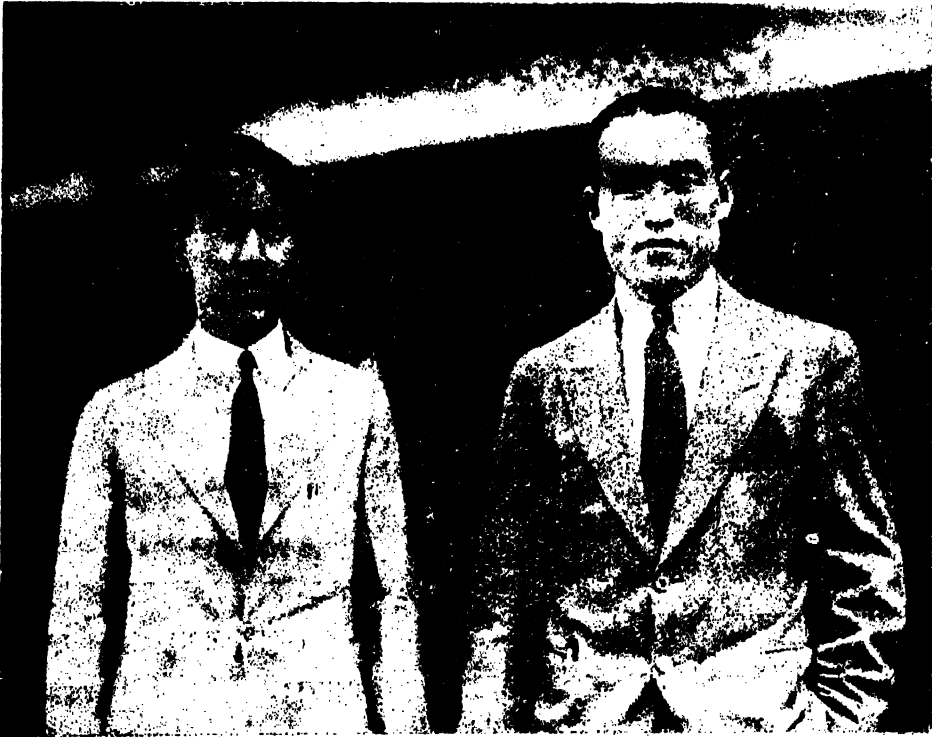
জাপানী টেনিস খেলোয়াড়

Mr. R. Miki ও Mr. Jiroh Satoh জাপানের প্রসিদ্ধ টেনিস খেলোয়াড়দ্বয়কে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাউথ ক্লাব এখানে তাঁহাদের খেলা দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের খেলার কৃতিত্ব দেখিয়া বাঙ্গালার টেনিস খেলোয়াড়গণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার

বাঙ্গলার বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ২রা জানুয়ারী বোম্বাই হইতে কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বোম্বাই হইতে ৩০ মাইল দূরে কল্যাণ ষ্টেশনে ট্রেন থামাইয়া ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেসনে গ্রেপ্তার করা হয়—এবং তাঁহাকে মধ্য ভারতের সিউনি জেলে রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত

সংবাদ আসিয়াছে যে, ভারতবর্ষে নূতন রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভবহেতু শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ ১২ই জানুয়ারী পোর্ট সৈয়দে পৌছিবেন।

তিনটি মূলনীতি

১। জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য—প্রজাগণ যাহাতে (১) যথেষ্ট খাদ্য (২) পরিধেয় বস্ত্র ও (৩) বসবাসের জন্য আশ্রয় স্থান পায় তাহার বন্দোবস্ত করা গবর্মেণ্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

২। দ্বিতীয় নীতি—সাধারণ প্রজাতন্ত্র গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য প্রজাগণ যাহাতে শাসন তন্ত্রের (১) নির্ব্বাচন (২) অপসারণ (৩) কার্য্যতৎপরতা এবং (৪) সালিশী বিষয়ে ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

৩। তৃতীয় নীতি—জাতীয়-ভাব-প্রবণতা—প্রত্যেক প্রজা যাহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসন বিজ্ঞানে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করা গবর্মেণ্টের তৃতীয় কর্ত্তব্য।

চীনাদের রাষ্ট্রনীতির এই মূলনীতিগুলি সেদিন চীনা স্বাধীনতা দিনে বিতরিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ায় কলিকাতাবাসীর তরফ হইতে জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। টাউন হল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মেলা ও একজিবিশনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। জয়ন্তী উৎসব অতি সুন্দর ও সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও বিশেষতঃ ইহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় কলিকাতাবাসীর ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

টেনিস ও স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড

ইংরাজী এই মাসিকখানি কয়েক বৎসরের ভিতরেই খেলোয়াড় (Sportsm n)দের প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ভারতের সকল রকম খেলা শীকার ইত্যাদির সংবাদ ইহাতে থাকে। ছবি সুন্দর, ব্লক থাকে প্রায় প্রতি পাতায় পাতায়—দাম অথচ বাৎসরিক ৫৲ টাকা মাত্র। এবৎসরের বড় দিনের সংখ্যা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা পোষ্ট বক্স, ৭৮৪০ হইতে প্রকাশিত হয়। সকল খেলাধুলার উন্নতিকামী লোকের এই মাসিক পত্র পড়া উচিত।

দমদমে উড়োজাহাজের খেলা

নেপালের মহারাজার সম্বর্দ্ধনা

নেপালের মহারাজার সম্বর্দ্ধনার জন্য দমদমে উড়োজাহাজের আখড়াই হইয়াছিল। এই আখড়াইতে আমেরিকা হইতে আগত বিমানবীর মিঃ রিচার্ড হোল্লী বার্টন এবং মিঃ ষ্টিফেন্স তাঁহাদের লাল, সোণালী এবং কালো রংয়ের উড়োজাহাজের খেলা দেখান।

উপাধি হইতে বঞ্চিত

নাসিক জেলার মালিগাঁওয়ের জমিদার ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য গোলাম আমেদ তুগীমিঞা ওয়াসিরকে অশিষ্টাচরণের অভিযোগে তাহার উপাধি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব

ইউ, বা, সিন ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে এই পদে স্যার জোসেফ অগাষ্টাস মং জি ছিলেন। নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ ছিলেন।
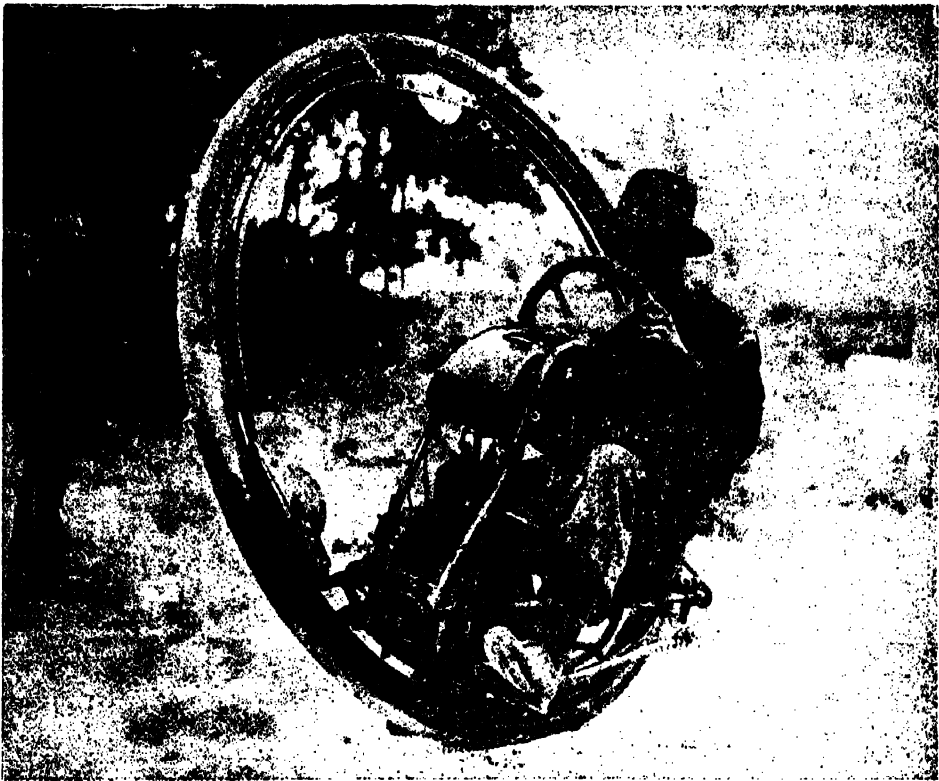
মোটরের চাকায় পৃথিবী ভ্রমণ

মিঃ গরডার (Gerder) এক মোটর গাড়ীর নিরেট চাকার ভিতরে একটি রেল লাগাইয়া সেই রেলের উপর দিয়া একটি এক চাকার সাইকেল চালাইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইয়াছেন—সাইকেলের ইঞ্জিনটি চাকাটিকে ঘুরায় ও এই গাড়ী ঘণ্টায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত যাইবে। গরডার্ সাহেব ফরাসী দেশ হইতে স্পেনে যাইবার পথে এই ছবিখানি তোলা হয় ইতিমধ্যে ইনি ১২,৮০০ মাইল ঘুরিয়াছেন।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়া

কলিকাতার মশকসমস্যা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মেজর কাভেলকে কিছুদিন পূর্ব্বে রাইটার্স বিল্ডিং-এর এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, ইনি তদনুযায়ী শীঘ্রই কলিকাতা আসিয়া ২।৩ সপ্তাহকাল থাকিয়া কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মশকসমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন।

মহাত্মাজীর পশুপ্রীতি

যে ইটালিয়ান জাহাজে মহাত্মা গান্ধী ভারতে ফিরিয়াছেন, তথায় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন এবং এখানে একটী প্রকাণ্ড শীকারী কুকুর ছিল। গান্ধীজী এই কুকুরটির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব করেন। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার সারস, কুক্কুট শাবক এবং পায়রা ও দুইটি "পুরস্কার প্রাপ্ত" বিড়াল ছিল। মহাত্মা গান্ধী জাহাজের ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবিত সুখ-সুবিধা-পূর্ণ ক্যাবিনে থাকিতে অস্বীকৃত হইয়া এই পশু-পক্ষী মহলে বসবাস করেন।

পুতুলের করুণ ক্রন্দন

নিউ ইয়র্কের জনৈক পুলিশ ব্রুক্লিন্ সহরে রাত্রির বেলায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা খেলনা তৈরীর দোকান থেকে করুণ আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়ে সেই দিকে ছুটে গিয়ে দেখে বাড়ীতে আগুন লেগেছে আর সহস্র সহস্র শিশু 'মা, মা' করে অতি করুণভাবে আর্ত্তনাদ করছে। তখুনি ছুটে গিয়ে দমকল অফিসে খবর দিতেই তারা এসে খুব শিগ্গির আগুন নিভিয়ে ফেলে। তা সত্ত্বেও ২৫০০ হাজার পুতুল অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছে। পুতুলগুলি সবই সবাক্ ছিলো। কাঠ, কড়িকাঠের চাপে প্রত্যেকটিই এই রকমভাবে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছিলো। যদিও সেগুলি সজীব নয় তবুও নির্জ্জীবের এই আকুল ক্রন্দন স্থানীয় জনসাধারণের চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত ক'রে তুলেছিলো।

বেঙ্গল ইমিউনিটির ডায়েরী

সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর ১৯৩২ সালের ডায়েরী প্রকাশিত হইয়াছে। ডায়েরীর অংশ ব্যতীত ইহাতে চিকিৎসকগণের নিত্য প্রয়োজনীয় স্মরণীয় বিষয়, ইন্‌জেক্‌সনের ঔষধ ও মূল্য তালিকা, প্রয়োগের পরিমাণ, কোন্ ঔষধে কতদিনে ফল দেয়, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের ক্যালোরিক ভ্যালু, নানা খাদ্যের ভাইটামিনের পরিমাণ, বিভি প্রকারের ওজন নির্ণয়, সর্পদংশনের প্রতিকার, বিষ চিকিৎসার ঔষধের গুণ নির্ণয় প্রভৃতি নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কলিকাতা সহরের রাস্তা সমূহের ডাইরেক্টরী থাকায় বইখানি সকল দিক দিয়া চিকিৎসকগণের অপরিহার্য্য সঙ্গীরূপে ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও জনমত

লাহোরের সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্বন্ধে সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে আছে "সামান্য কারণে মাথা ফাটাফাটি করা প্রজা সাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই লজ্জার কথা" এই বিষয়ে লাহোরের প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ মহম্মদ আলম বলেন যে "সাম্প্রদায়িক কলহে ব্যক্তিগত শান্তি বাহিত থাকে না এবং জাতির উন্নতিতে বাধা জন্মায়।"

পৃথিবীর প্রাচীনতম পুলিশবাহিনী

লণ্ডনের বিখ্যাত 'সিটি পুলিশ' প্রাচীন নয়। টেম্‌স্ নদীর উপকূলের সন্নিকটে সমুদ্র পর্য্যন্ত ৩৬ মাইল স্থানে যে পুলিশ জাহাজ, মালপত্র ও ব্যক্তিবর্গের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, সেই মেট্রোপলিটান রিভার পুলিশ (বা জল-পুলিশই) প্রাচীনতম।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে টেম্‌স্ মেরিন পুলিশ নামে বাহিনীর এই সৃষ্টি।

Regd. No. C 1134.

Printed and Published by Dr. K. B. Mondal at the New Pearl Press,
157-B, Dharamtala Street, Calcutta.